বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা • স্বামী অভেদানন্দ

আষাঢ় ১৩৬৫
২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

STUDENTS
P. G. A.

স্বামী অভেদানন্দ রচিত গ্রন্থাবলী

মরণের পারে : লোকান্তরে সূক্ষ্মশরীরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে—ইহাই স্বামিজীর প্রতিপাদ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য : পাঁচ টাকা, বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ৪·৭৫

পুনর্জন্মবাদ : বৈজ্ঞানিকের সূতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসা এবং যোগীর উপলব্ধি এই উভয় দিক হইতে বিচার করিয়া তত্ত্বদর্শী স্বামিজী 'আত্মার অস্তিত্ব' ও 'অমরত্বের' কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য : দুই টাকা, বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ১·৮৭

হিন্দুনারী : শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারীজাতির অধিকার—নারীজাতির উপনয়ন—নারী-জাতির প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচার—হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি—রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর অধিকার—সাহিত্যে ও সমাজে অবদান—নারীজাতির প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের প্রশ্ন—সতীদাহ বৈদিক কিনা প্রভৃতি বিষয়ে এবং বর্তমান যুগে নারীশিক্ষা কি প্রকার হওয়া উচিত স্বামিজী তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য : আড়াই টাকা। বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ২·৩৭

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম : শিক্ষার যথার্থ রূপ ও রহস্য, সমাজ কি ভাবে চলিলে দেশ, দল ও জাতির কল্যাণ হইবে এবং 'ধর্ম' বলিতে প্রকৃত কি বুঝায় তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মূল্য : আড়াই টাকা। বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ২·২৫

ভারতীয় সংস্কৃতি : ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, সকল-কিছুর খুঁটিনাটির বিবরণ। তৃতীয় নূতন সংস্করণ। মূল্য : ছয় টাকা। বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ৪·৭৫

যোগশিক্ষা : যোগ কি? হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম-প্রণালী বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : দুই টাকা। বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ১·৮৭

[illegible] আত্মা ও আত্মা—প্রাণ প্রজ্ঞা ও জড় ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, [illegible] ব্রাহ্মণত্ব, ঈশ্বর ও [illegible]—আত্মতত্ত্ব-বিচার—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—[illegible] মূর্তির স্বরূপ কি?—এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : [illegible] বিশ্ববাণীর গ্রাহকপক্ষে টা. ১·৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, (পুস্তক-প্রচার-বিভাগ)
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

আষাঢ়, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। ঔদার্য ও সাবল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ	... ১৯৫	স্বামী দুর্গানন্দ
২। গীতগোবিন্দের স্বরূপ	... ২০২	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ.
৩। বৌদ্ধযুগের নারী	.... ২০৮	শ্রীবিজয়ভূষণ সিংহ চৌধুরী
৪। ভারতীয় রসায়ন	... ২১০	ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., ডি.এস.সি.
৫। নাট্যকার দীনবন্ধু	... ২১৫	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ.
৬। কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ২২০	শ্রীমীরা মিত্র
৭। জীব ও ব্রহ্ম	... ২২৩	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। হিউয়েন-সাঙ্ ও প্রাচীন ভারত	.... ২২৯	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম. এ., বি. এল.

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	ভারতের তীর্থদর্শনে : দিল্লী	... ২৩১	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১০।	তুমি (কবিতা)	... ২৩৪	শ্রীহাসিরাশি দেবী
১১।	ভবঘুরে (কবিতা)	... ২৩৬	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য
১২।	সংকলন	... ২৩৭	
১৩।	সংবাদ-সংস্কৃতি	... ২৪১	
১৪।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	২৪২	

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—দত্তনগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দদদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, **অতুলবিহারী দত্ত**, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পায়ে বাবাবর্ষের ঘা, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, সর্বশরীরজ্বালা বা অসাড়তা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুবিপুল চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : **হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর**, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২০৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বিশ্ববাণী

আষাঢ়, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীমন্মথেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বলরামকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

SWAMI ABHEDANANDA IN AMERICA

by

SISTER SHIVANI (Mrs. Mary LePage)

A Unique Volume of Swami Abhedananda's activities in the West by one of his devoted and able American disciples.

Many new incidents of Swami Abhedananda's eventful life and glorious career in America for a quarter of a century are graphically described. This volume also throws much light upon the history of the Vedanta movement in the West.

With a number of original photographs.

Demy 8 vo. *330 Pages* *Rs. 6·50*

For Subscribers of Visvavani Rs. 6·00

●

স্বামী অভেদানন্দ

(কালী তপস্বী)

এই প্রামাণিক জীবনীটি নিঃশেষিত হওয়ার পর বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। কিছু বর্দ্ধিত আকারে পুনরায় শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

সারদামণি

শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

—শ্রীশ্রীমা সারদামণির পুণ্যজীবন কথা। ঐ কথা সব সময়েই সুমধুর। লেখক শ্রীশ্রীমায়ের অখণ্ড মাতৃভাব ফুটাইয়াছেন। উচ্ছ্বাসে তাঁহার ভাষা রূপ পাইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মন-প্রাণ ভরিয়া উঠে। ভাবঘন ভাষার সংবেদনে লীলা মূর্ত হইয়া ফোটে। পুস্তকখানি পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। আনন্দবাজার পত্রিকা তাং—২১.৭.৫৭

অসামান্য এই যুগ-মানবীর জীবন কথা বলবার সময় লেখক তথ্য ও সাহিত্য দুয়ের দিকেই যথোচিত যত্ন নিয়েছেন। অচিন্ত্য কুমারের সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখকের বর্ণন চাতুর্য অবশ্যই মেনে নিতে হয়। এ গ্রন্থের বহুল সমাদর কাম্য। দেশ—২১.৮.৫৭

মূল্য : টা. ১·২৫ বিশ্ববাণীর গ্রাহক পক্ষে এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পুস্তক প্রচার বিভাগ,
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫—১৮০৫

STUDENTS
P. G. A.
COMMON-ROOM

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ৫ম সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৬৫

ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে ও জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতিতে দিব্যচক্ষু লাভ হয়। অজ্ঞতাপ্রসূত আমরা লৌকিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের কিম্বা মানস-রাজ্যের সমগ্র পরিচয় অবগত হইতে পারি না অথবা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া মনের বিচিত্র রহস্য ভেদ করিতেও আমরা অসমর্থ হই। আমরা জানি না কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাদের কর্তব্য কি এবং পরিশেষে আমরা কোথায় যাইব। জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিরূপে বুঝিবে যে, মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মানুষের পার্থক্য কোথায় বা কে শ্রেষ্ঠ। অবোধ লোকে জানে না—পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুটিতে প্রভেদ কোথায়, সুতরাং কিরূপে মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে বা দেবত্বে উন্নীত হইতে পারা যায় এ প্রশ্নও তাহার কাছে অনাবশ্যক। এই জন্য সাধারণ মানুষ মানব-শরীর ধারণ করিলেও অজ্ঞানতার প্রভাবে পশুত্বের অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না; মানব-শরীর ধারণ করিয়াও তাহাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়। বাধ্য হইয়াই তাহাকে পশুর মতই শুধু আহার, নিদ্রা, মৃত্যুভয় ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ এই বৃত্তি চতুষ্টয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; ইহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। এইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি ভোগলালসায় বাসনা কামনার দাস হয়, ফলে স্বার্থান্বেষণেই সর্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ করে; পাশবিক ও আসুরিক শক্তির মোহে কদাচারী, অত্যাচারী ও পরপীড়ক হইয়া ভোগ্য আহরণ করিয়া কপট বেশে লোকের যথাসর্বস্ব অপহরণপূর্বক জগতে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই উৎপীড়নের ফলে জগদ্বাসী যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, সেই সংকট মুহূর্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয় এবং

তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে বিপন্ন জগৎকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে প্রিয় সখা ও ভক্তপ্রবর অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান সেই কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন : 'হে অর্জুন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য প্রতি যুগে আমি জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি।' গীতা ৪।৭-৮। পৌরাণিক উপাখ্যানাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলে এই সত্য আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতেও বুঝিতে পারি যে, শুধু ভারতেই নয়, জগতের অন্যান্য দেশেও পূর্বকথিত ভাগবতী প্রতিজ্ঞানুসারে ভগবানের ঐশীশক্তি আবির্ভূত হইয়া ধর্মবিপ্লব হইতে সেই সেই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেও বহু ঐশ্বরিক-শক্তিমান পুরুষের এইভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা এইভাবে সংকটমোচনের জন্য কোন বিশেষ শক্তি লইয়া জগতে আসেন তাঁহারা অবতার, ধর্মবীর, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, ধর্মাচার্য এবং পরিত্রাতারূপে গণ্য। ভগবান বুদ্ধকে ভারতে অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। তিনি প্রায় ২,৬০০ বৎসর পূর্বে ভারতে কপিলবস্তু নগরে রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতুল ঐশ্বর্য সুখসম্পদ বিলাস—এমন কি ভার্যা ও প্রিয়দর্শন শিশুপুত্রকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া নিপীড়িত জীবের মুক্তির জন্য সন্ন্যাসীর বেশে কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রাণপাত তপস্যার ফলে, তিনি যে সত্যলাভ করিয়াছিলেন, জীবের পরিত্রাণের জন্য,—সর্বোচ্চ আদর্শে জীবকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য অকাতরে তাহাই তিনি আজীবন প্রচার করিয়া হৃদয়বত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে শান্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম তাঁহারই নামানুসারে বৌদ্ধধর্ম বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার আবিষ্কৃত চতুরঙ্গ-আর্য-সত্য (দুঃখের অস্তিত্ব সত্য, দুঃখের কারণ সত্য, দুঃখের নিবৃত্তি সত্য ও দুঃখের নিবৃত্তির পথপ্রদর্শক অষ্টাঙ্গমার্গ সত্য) অদ্যাবধি ম্লান হয় নাই।

শ্রীবুদ্ধ যখন ভারতে তাঁহার সত্য-ধর্মের অমোঘ বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন : তখন পারস্যে আরও এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া পার্সীধর্ম—"জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম" প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহার নাম 'জরথুষ্ট্র'। তিনি মহান ঈশ্বর 'আহুর মাজদা'র প্রিয় চিহ্নিত ভক্ত এবং প্রেরিত পুরুষ। প্রায় সমকালে চীনদেশেও 'লাওট্‌জে' নামে আরও একজন ধার্শনিক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া 'তাওইজম্' ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে 'নেজারেথে' যীশুখৃষ্ট নামে আরও এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য ইহুদীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঘোষণায় পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের বহুসংখ্যক অধিবাসী অনুপ্রাণিত হইয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণে শান্তি-লাভ করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের নামানুসারেই তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে 'খৃষ্টধর্ম' বলা হয়। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে আরবদেশে হজরৎ মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া

মুসলমানধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি পয়গম্বর বা ভগবানের বাণী-প্রচারক। হজরৎ মহম্মদের কিছুদিন পরে দক্ষিণ ভারতে 'শঙ্করাচার্য' নামে আরও এক বিখ্যাত দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন দর্শনশাস্ত্রে অদ্যাবধি তাহা উজ্জ্বল ভাস্কররূপে বিরাজিত থাকিয়া জগতের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। তাঁহারও প্রায় ছয় শত বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যে 'রামানুজ' নামে আর একজন দার্শনিক পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তিনি যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রায় একই সময়ে বঙ্গদেশে 'শ্রীচৈতন্য' মহাপ্রভু, পাঞ্জাবে গুরু 'নানক' এবং অন্যান্য প্রদেশে আরও অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের উপদেশে ভারতের বিভিন্ন অংশে ধর্ম-বিপ্লব ও হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে অতি অল্পকাল পরেই আবার ভারতে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। জড়বাদের প্রচার এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর দল বিশেষতঃ ইংরাজজাতি ও খৃষ্টান পাদ্রীগণের উপদেশে আবার ভারতের নানাস্থানে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইল।

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই আবার ভারতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মদ্বন্দ্বের সূত্রপাত এবং তাহার ফলে সামাজিক অধঃপতন ও নীতি বিপর্যয় উপস্থিত হইল। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অনেকেই তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের প্ররোচনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যীশুখৃষ্ট এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মের প্রশংসা এবং হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা ও নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া অনেকেই খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও স্বধর্মের প্রতি অনাস্থা—এমন কি স্বজাতির প্রতিও আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। খৃষ্টানসম্প্রদায়ের ভোগৈশ্বর্য ও বিলাস বেশভূষার চাকচিক্য দেখিয়া অনেকেরই চক্ষু ঝলসাইয়া গেল এবং দলে দলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান-সমাজভুক্ত হইতে লাগিলেন। অনেকে সমাজবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিলেন এবং খৃষ্টানদের দলে পড়িয়া স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি নির্মম ব্যবহার করিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। ক্রমে এই ভাব সমগ্র দেশে সংক্রমিত হইতে থাকায় দেশব্যাপী একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা কুৎসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, সামাজিক অবনতির ফলে হিংসা দ্বেষে প্রত্যেক সমাজ জর্জরিত হইতে থাকিল। এই সময় ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হইল। এই অভ্যুত্থান খৃষ্টানধর্মের প্রচারের প্রতিরোধকল্পেই হইয়াছিল। এই সংকট মুহূর্তে আবার একজন শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব সূচিত হইল এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আসিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সংক্ষিপ্ত জন্মকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী চন্দ্রা বা চন্দ্রমণি দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা জমিদারের কোপে পড়িয়া ও অত্যাচারিত

হইয়া পিতৃপুরুষের বাসস্থান ছেড়ে গ্রামের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত 'কামারপুকুর' গ্রামে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্ষুদিরামের এই কামারপুকুরের বাটীতেই রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শৈশবে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গদাধর'। এই দেবশিশুর নামের সার্থকতা আছে। গদাধরের জন্মবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত। "বঙ্গাব্দ সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে ভক্তিমান ক্ষুদিরাম বারাণসী ও গয়াধাম দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত স্থানে বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যখন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলেন তখন চৈত্রমাস পড়িয়াছে। মধুমাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদানে পিতৃপুরুষগণের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় জানিয়াই বোধহয় তিনি গয়ায় ঐ মাসে আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস তথায় অবস্থান করিয়া তিনি যথাবিধি ক্ষেত্রকার্যসকল অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দান করিলেন। ঐরূপে যথাশাস্ত্র পিতৃকার্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষুদিরামের হৃদয়ে ঐদিন যে কতদূর তৃপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। ৺ পিতৃকার্য সমাধা করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগের তো কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি শ্রীমন্দিরে গদাধরের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষ সকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্ময় শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। বহুকাল পরে তাঁহাদের দর্শনলাভ করিয়া তিনি যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। ভক্তিগদগদ চিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন যেন অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সসম্ভ্রমে সংযত ভাবে দুই পার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দির মধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদলশ্যাম, জ্যোতির্মণ্ডিত তনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া তিনি যেন তখন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বল চিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক হৃদয়ের আবেগে কত প্রকার স্তুতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন: "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।"

ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই চির দরিদ্র তিনি তাঁহাকে কি খাইতে দিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি চিন্তায় গভীর বিষাদে পূর্ণ

হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন : "না, না প্রভু, আমার ঐরূপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই ; কৃপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন এবং ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সত্য সত্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব ?" এই পুরুষ যেন তখন তাঁহার ঐরূপ করুণ কথা শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন : "ভয় নাই ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব। আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপত্তি করিও না"। দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না। নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন—বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুখ অবলোকন করিতে হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ক্ষুদিরাম গয়াধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার পর সত্য সত্যই ক্ষুদিরামকে যথাসময়ে পুত্রমুখ দর্শন করিতে হইয়াছিল এবং তিনি স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রীগদাধরের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া নবজাত পুত্রের "গদাধর" নামে নামকরণ করিয়াছিলেন।

সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন ইংরাজী ১৮৩৬ খৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্লপক্ষ বুধবারের রাত্রি অবসানের অর্ধদণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে গদাধরের ভূমিষ্ঠ হইবার কথা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' বর্ণিত আছে। প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখকমল দর্শন করিয়া ক্ষুদিরামের আনন্দ হইল বটে, কিন্তু দরিদ্র সংসারে দুঃখের অভাবের জন্য চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সে চিন্তা শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া গেল। তাঁহার উপার্জনক্ষম ভাগিনেয় রামচাঁদ মেদিনীপুরে থাকাকালে মাতুলপুত্রের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হইতে থাকিল। সুতরাং শিশুর লালনপালনের কোন অসুবিধা রহিল না। গদাধর এইরূপে দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় পুষ্ট হইয়া ক্রমে ষষ্ঠ মাসে পড়িলেন। এখন তাঁহার অন্নপ্রাশন দেওয়ার কথা। ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য সমাধা করিবেন ও তদুপলক্ষে দুই চারিজন আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন, কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার গোপন প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন যে, পুত্রের অন্নপ্রাশন দিবসে তাঁহাদের ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে ঐরূপ অনুরোধ করিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম প্রথমে আপনাকে বিপন্ন মনে করিলেন। কারণ পল্লীর সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, এখন তাঁহাদের কাহাকে রাখিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ জানাইবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদের সকলকে বলার সামর্থ্য কোথায় ? সুতরাং 'যাহা করেন রঘুবীর' বলিয়া তিনি ধর্মদাস লাহার সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায়

বুঝিয়া তিনি তাঁহারই উপর উক্ত কার্যভার প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধর্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া কার্য সুসম্পন্ন করিলেন। গদাধরের অন্নপ্রাশনে পল্লীর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ঐদিন ক্ষুদিরামের কুটীরে আসিয়া রঘুবীরের প্রসাদ ভোজনে তৃপ্ত হইয়া তনয়ের দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু গদাধর ক্রমে বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ও সেই সঙ্গে খুব চঞ্চল ও দুরন্ত হইয়া পড়িলেন। বালকসুলভ চাঞ্চল্য অনেক সময় বিরক্তিকর হইলেও তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব হইত না। কিন্তু তাঁহার দুরন্তপনা অন্যায় হইতেছে বলিয়া কেহ যদি তাঁহাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিত তবে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সহজ হইত। ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব ছিল না; কেননা ভয় কাহাকে বলে বাল্যাবধি তাহা তিনি জানিতেন না। যাহা কর্তব্য বলিয়া ধারণা হইত তাহার বিপক্ষে কেহ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। নীতিবিরুদ্ধ আচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, বরং তাহার স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতেন; সে দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখিতে পাইব। বাল্যাবধি তাঁহার নৈতিকবুদ্ধি বেশ প্রখরই ছিল বলিয়া মনে হয়।

বালক গদাধরের সাহসও ছিল অসীম। ভূতপ্রেতের ভয়ে দিনের বেলায় যেখানে যাইতে লোকে সাহস করে না সেই বিভীষিকাসঙ্কুল শ্মশানে রাত্রির অন্ধকারে যাইতেও গদাধর কখনও শঙ্কিত হইতেন না। পরবর্তীকালে গদাধর তাঁহাদের গ্রামের প্রান্তে ভূতিরখাল নামক স্থানে মহাশ্মশানের মধ্যে গভীর রাত্রে একাকী গিয়া তথায় যে সাধন ভজন করিতেন ইহাই তাঁহার দুঃসাহসের পরিচয়। আবার এই অদ্ভুত বালকের ভাবুকতাও ছিল অনন্যসাধারণ। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন ভাবের আবেশ হইত। কখন সাধারণ মানবভাব আবার কখনবা দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া মনের উচ্চ উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া আমরা সেই সব ভাবের ইঙ্গিত পাইয়া থাকি। মন যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গতিতে অল্পে তুষ্ট না হইয়া ভূমার সন্ধানে ছুটিয়া যাইত, সান্ত হইতে অনন্তের দিকে ধাবিত হইত।

বাল্যকাল হইতেই গদাধরের একাগ্রচিত্ত যখন বিষয়-বিশেষে নিবিষ্ট হইত, তখন তাঁহার শরীরের জ্ঞান পর্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত ও তাঁহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। একদিনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি: একদা গদাধর তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে মাঠের মধ্যে সঙ্গীদের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে, কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের কোলে একদল সাদা বককে শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে দেখিয়া, অনন্তের পথে সচ্চিদানন্দভাবে এমনি তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের শরীরজ্ঞান ও জাগতিক বস্তুনিচয়ের জ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া পথের ধারে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীরা খুব ভীত ও বিপন্ন হইয়া বাড়ীতে তাঁহার পিতামাতাকে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহার পিতা ও

আত্মীয়স্বজন তথা হইতে বালককে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে আনিবার পর কিন্তু তিনি সংজ্ঞালাভ করেন এবং নিজেকে পূর্বের ন্যায় সুস্থবোধ করেন। এই ঘটনায় বাটীর সকলেই শঙ্কিত হইলেও বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন: "ঐ অবস্থায় লোকে অন্য কিছু ভাবিলেও তাঁহার মন এক অদৃষ্টপূর্বভাবে বিভোর হইয়াছিল।" তিনি নিজমুখে এই কথা পরবর্তীকালেও তাঁহার ভক্তদের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঘন মেঘের কোলে মালার আকারে বকগুলিকে শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বনফুলের মালা শোভা পাইতেছে। ছয় বা সাত বৎসর বয়ঃক্রমে গদাধর সর্বপ্রথম এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

STUDENTS
P G A
COMMON-ROOM

গীতগোবিন্দের ভাবরূপ

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম.এ.

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা সার্থক। শুধু রূপে নয়, ভাবেও। আর এই সার্থকতা যাচাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর যে পাঠকচিত্ত, সেখানে আজও 'নিকষে কনক-রেখা'র মতই গীতগোবিন্দের প্রতি তার পাঠকসমাজের রস-চেতনা স্বর্ণোজ্জ্বল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর সীমা পেরিয়েও।

কিন্তু রসিক পাঠকদের রসবিচারের উপর চূড়ান্ত রায় দেন পাঠক-সমালোচকেরা। আর তাঁরা এ পর্যন্ত যত রায় দিয়েছেন, তার মধ্যে অধিকাংশই ভারসাম্যহীন।

ভারসাম্যহীন। কারণ গীতগোবিন্দ গ্রন্থটিতে প্রধানতঃ দুটি বস্তুর সমন্বয় দেখা যায়—ধর্মতত্ত্ব ও কাব্যরস। আর সমালোচকেরা এর রসবিচার করতে গিয়ে হয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, আর নইলে কাব্যরসের প্লাবন আনেন, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব ও কাব্যরসের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্মিলনে গ্রন্থটি যে অপূর্ব শিল্পবস্তু হয়ে উঠেছে, তার প্রতি তাঁরা প্রায় উদাসীন। আর তাই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সাহিত্য বা কাব্যকে বৃহত্তর অর্থে শিল্প বলা চলে। এই শিল্পের মধ্যে দুটি জিনিষ প্রধান—একটি তার অবয়ব, অপরটি আত্মা। যে কোন শিল্পবস্তুর মধ্যেই এই দুটি জিনিষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন একটি মার্গসংগীত। তার যে বিভিন্ন স্বরগ্রাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, ছন্দ-তাল-লয়-গতি—এ সমস্তই ঐ সংগীতটির অবয়ব। কিন্তু ঐ সংগীতের একটি ধ্যানরূপ আছে, সেটি সংগীতটি গীত হবার সময় কেবলমাত্র গায়ক ও সহৃদয় শ্রোতার মানস-চক্ষে লীলায়িত হয়ে ওঠে। একে বলা যায় ঐ সংগীতের আত্মা। এই দুইয়ের যে কোন একটির আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটলে শিল্পরসের হানি হয়, আর সার্থক সম্মিলনে উৎপন্ন হয় গীতগোবিন্দের মত অপূর্ব শিল্পবস্তু।

গীতগোবিন্দের যেটি কাব্যশরীর বা কথাশরীর বা অবয়ব, তার একটি স্বতন্ত্র মূল্য ও আবেদন আছে। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা কবি জয়দেবের যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব এই যুগটি সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগ। আবার জয়দেবের অব্যবহিত (পূর্ববর্তী) যে যুগ—ভারবি, ভট্টি, মাঘ, কুমারদাস প্রভৃতি সে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি—এই যুগটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বলা যায় বটে, কিন্তু সার্থক বলা যায় না। কারণ এঁরা সকলেই প্রায় সাহিত্যের অবয়ব নির্মাণ করেছেন, আত্মা সৃষ্টি করেন নি। বুঝতে পারছি, এ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ হতে পারে। কিন্তু মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। এই যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ মস্তিষ্কপ্রসূত বা চিন্তাপ্রসূত। কিন্তু সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চেয়ে যদি বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল হয়, তাহলে তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। সাহিত্যের এই কৃত্রিমতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমার বক্তব্য জয়দেব তাঁর সাহিত্যে এই দুটি যুগের প্রভাব অতিক্রম করতে পেরেছেন এবং কালিদাস সম্বন্ধে এখানে কোনরকম আলোচনা না করেও বলতে পারা যায় যে, কালিদাসের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছেন। আর এই প্রভাবের ফলেই এই দুটি ব্যর্থ যুগের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কালিদাসের কাব্যগুলির মত সার্থক শিল্পবস্তু হ'তে পেরেছে।

জয়দেবের এই সার্থকতার কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে প্রধান, তিনি তাঁর রচনায় একটি অন্যতম স্থায়ী রসকে অবলম্বন করেছেন, যেটি পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের সাহিত্যে আধুনিক ও মানবিক আবেদনসম্পন্ন। সেই রসটিকে বলা যায় শৃঙ্গার রস। এই শৃঙ্গার রসমূলক কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি তাঁর যুগরুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বা এটিকে তাঁর কাব্যের রূপক সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যা প্রসংগানুসারী, তা হচ্ছে এই যে, নারী ও পুরুষের যৌন-চেতনা-প্রভাবিত রহস্যময় সম্পর্ক শাশ্বত। লৌকিক জীবনের এই আদি রসকে জয়দেব তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন এবং শুধু তাই নয়, একে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। বাস্তবকে তিনি করেছেন বাস্তবাতীত, রূপকে রস, লৌকিককে অলৌকিক। আর যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে এই কার্যটি তার চরম পরীক্ষা। জয়দেব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আর গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্যমূল্যও এখানেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, ভাবাদর্শের দিক থেকেও গীতগোবিন্দের কাব্যমূল্য অপরিসীম। গুপ্তযুগের পর থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনও হয়েছে সংকটপূর্ণ। পাল রাজাদের আমলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংহতি কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এর পর সেন রাজাদের আমলে এই সংহতি বর্তমান থাকলেও অনৈক্য গেছে বেড়ে। একদিকে সংস্কৃত-সংস্কৃতির

অভিমানপুষ্ট ব্রাহ্মণ্য চেতনা, অপরদিকে লোক-ভাষাশ্রয়ী লোক-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী অন্ত্যজ শ্রেণী—এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদ ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে। আর দিল্লীর মোগল হারেমের মত ইন্দ্রিয়বিলাস, অত্যাচার, উৎপীড়নের বিভিন্ন দৃশ্যের আভাসও দেখা গেছে এই কালে বাংলাদেশের রাজধানীতে। এই সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবির্ভূত হলেন জয়দেব, রচনা করলেন তাঁর কাব্য গীতগোবিন্দ। যে মহৎ শিল্পীর প্রেরণা সুপ্ত ছিল কবি জয়দেবের মধ্যে, তা এই যুগপ্রভাবে সহজেই জাগরিত হল এবং অনুপ্রেরণা লাভ করলো।

কবির মহৎ শিল্পীগুণ এই প্রভাবের ফলে মূলতঃ দুইভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজের উচ্চ কোটিতে সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর মধ্যে পূজিত পৌরাণিক বিষ্ণু এবং নিম্ন কোটিতে লোকসমাজে আরাধিত রাধিকারমণ কৃষ্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলেন জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে। জাতির নিদারুণ দুর্দিনে সমাজের উচ্চ কোটি ও নিম্ন কোটির মধ্যে মিলনের পথ দেখালেন কবি, মুক্তি-পথের সন্ধান দিলেন শিল্পী।

এর সংগে আর একটি মহৎ কাজ সাধন করলেন জয়দেব। এই যুগের সংগে যাঁরা পরিচিত আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, ইন্দ্রিয়-বিলাস ও ভোগ-সুখে মত্ত সমগ্র জাতির কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি এসেছিল এই সময়ে। এই পরিস্থিতিতে কবি জয়দেব অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের রুচিকে আঘাত না করে অজ্ঞাতে মানসিক উৎকর্ষ সাধন করবার চেষ্টা করলেন তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যের মাধ্যমে। দেহবিলাসকেই তিনি তাঁর কাব্যে আশ্রয় দিলেন। লোক-সমাজে তাঁর কাব্য প্রিয় হল, আর জয়দেব অতি নিপুণভাবে প্রচার করলেন যে, দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিতে সুখ নেই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিতেই সুখ।—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্॥

অর্থাৎ—কাম-বিষ-বিনাশক ও আমার শিরোভূষণ স্বরূপ তোমার ঐ পদপল্লব আমাকে দান কর। রতি-বেদনার তীব্র পীড়নে আমার সমস্ত অন্তর জ্বালাময়; তোমার চরণ-স্পর্শে সে বিকার লয় প্রাপ্ত হোক,—এ শুধু রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি নয়। বিলাসচারী সমগ্র জাতির হয়ে শ্রীভগবানের কাছে কবি এই প্রার্থনা করেছেন, আর শুধু এখানেই শেষ নয়, এর পরেও কবি বারবার এই ধরণের কথা বলেছেন।

শ্রীজয়দেব-ভণিত-হরি-রমিতং
কলি-কলুষং জনয়তু পরিশমিতম্॥

অর্থাৎ—শ্রীজয়দেব-রচিত কৃষ্ণের এই বিলাস-লীলা কামাদি কলিকলুষের বিনাশ সাধন করুক।

কিংবা—

জয়তি-কবি জয়দেব ইতি বিরহ-বিলসিতেন।
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥

অর্থাৎ—কবি জয়দেব রচিত হরির এই বিরহ-বিলাস যাঁদের মনের বৈভব স্বরূপ, সেই পুণ্যবান-গণের হৃদয়ে হরি উদিত হোন।

কবির মতে নরনারীর মিলনসুখে যে আনন্দ, অনাদি পুরুষ প্রকৃতির লীলা-বিলাস দর্শনে তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ। এখানে গীতগোবিন্দের আরো একটি মহান্ কাব্যমূল্য নির্ণীত হল। সংস্কৃত আলংকারিক মম্মট ভট্ট সাহিত্যের ফলশ্রুতির প্রসংগে একটি অতি সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্য হবে কান্তা-সম্মিত। স্বামী-সোহাগিনী নারী যেমন তার সমস্ত সৌন্দর্য এবং মাধুর্য দ্বারা স্বামীর চিত্তকে জয় করে এবং ধীরে ধীরে তাকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিজের অভিপ্রায়মুখী করে তোলে, শ্রেষ্ঠ কাব্যও তেমনি তার সমস্ত রসপ্রেরণার দ্বারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের মংগলের পথে চালিত করে। মহৎ কবি জয়দেবও সেই চেষ্টা করেছেন এবং পুনর্বার তাঁর গীতগোবিন্দের অপরিসীম কাব্যমূল্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

গীতগোবিন্দের কাব্যমূল্যের আলোচনা এখানেই সীমায়িত করা গেল। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা অসম্পূর্ণ। কিন্তু কাব্যমূল্যের আলোচনায় অন্যান্য প্রসংগগুলি নানা জায়গায় নানা ভাবে এত বেশী আলোচিত হয়েছে যে, এখানে সেসব বিষয়গুলি উহ্য রাখলে পাঠক সমাজের খুব বেশী অসুবিধা হবে না বলে মনে করি।

এবার আমরা গীতগোবিন্দের আত্মার সন্ধানে প্রয়াসী। কাব্যের আত্মা অর্থে সংস্কৃত আলংকারিকেরা রসকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমি এখানে গীতগোবিন্দের আত্মা অর্থে কাব্যের রসতত্ত্ব আলোচনা করছি না, এ কথা প্রথমেই বলে রাখা ভাল। মহৎ শিল্পী-প্রেরণার অধিকারী কবি জয়দেবের মানস-রসায়নাগারে ধর্মতত্ত্বের সংগে কাব্যরসের যে কি অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে গীতগোবিন্দ গ্রন্থটিতে এখানে তার আভাষ দেওয়াই আমার অভিপ্রায়, একথা আগেই বলেছি।

গীতগোবিন্দের আত্মা এর অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি জয়দেবের আগেও বর্তমান ছিল শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু ভাগবতে যে তত্ত্বটি কেবলমাত্র বীজাকারে উপ্ত ছিল, কবি জয়দেব তাকে একটি শ্যাম তরুতে পরিণত করেছেন তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে।

ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই। অথচ গীতগোবিন্দের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাবিলাস। কবি জয়দেব এই রাধিকাকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী মতৈক্য আছে এই বিষয়ে যে, কবি সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকেই রাধিকাকে উদ্ধার করেছিলেন। এই উদ্ধার কার্যের দ্বারা কবি তাঁর কাব্যে কি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, সেইটিই এখানে প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর

গ্রন্থটিতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথন প্রসংগে। রায় রামানন্দ বললেন—কান্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য এবং এইটিই শ্রেষ্ঠ প্রেম। কারণ—

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

তা ছাড়া—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

এই সংগে ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি দেখালেন যে, রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড আলিংগিতা কামলুব্ধা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, ললনাশ্রেষ্ঠা নারায়ণ-বক্ষলগ্না পদ্মিনী লক্ষ্মীদেবীও তা পান নি। কিন্তু কান্তা প্রেম সম্বন্ধে এই চূড়ান্ত রায় দিয়েও রামানন্দ বললেন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

প্রশ্ন হল, রাধার প্রেমই যদি সাধ্যশিরোমণি হয়, তাহলে ভাগবতের রাসলীলায় সমস্ত ব্রজরমণীদেরই চরম প্রাপ্তি কৃষ্ণসংগ ঘটতে দেখি কেন? রাধাপ্রেমই যে সাধ্যশিরোমণি একথা স্বীকার করা যায়—

রাধা লাগি গোপিনীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধার কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

রায় রামানন্দ কিন্তু এ কথায় পরাজিত হলেন না। তিনি এবার সাক্ষাৎ ভাবেই গীতগোবিন্দের শ্লোক উদ্ধার করে শুনালেন যে, ভগবান রাধার জন্য সাক্ষাৎভাবেই গোপীদের ত্যাগ করেছিলেন। গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের প্রথম দুটি শ্লোকে মুগ্ধ মধুসূদনের বর্ণনায় আছে—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃংখলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-মনংগবাণ-রূপ-খিন্ন-মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দ-নন্দিনী-তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

অর্থাৎ কংসারি শ্রীকৃষ্ণ আপনার পরিপূর্ণ সার-স্বরূপ বাসনার বন্ধন-শৃংখল শ্রীরাধার অনুচিন্তনে ব্রজসুন্দরীদের সংগ ত্যাগ করলেন। পঞ্চশর-পীড়িত মাধব ইতস্ততঃ অনুসন্ধানেও রাধিকার দর্শন না পেয়ে যমুনা তীরবর্তী কুঞ্জে বিষাদে অনুতাপ করতে লাগলেন।

কবি জয়দেব এইভাবে ভাগবতের চেয়ে গীতগোবিন্দে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। আর তাই গীতগোবিন্দ শুধু শৃংগার-রসাত্মক কাব্য নয়, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বিলাসলীলার তত্ত্বরূপ। এই কারণেই গীতগোবিন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদগ্রন্থ।

গীতগোবিন্দের তত্ত্বকথার আলোচনায় অন্যান্য প্রসংগের অবতারণা এখানেই স্থগিত রাখা গেল। কারণ আমার উদ্দেশ্য তত্ত্বকথার সম্যক্ আলোচনা নয়, কাব্যের আত্মাটির সন্ধান দেওয়া। সম্ভবতঃ তত্ত্বরসের এই একটি প্রসংগের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হতে পারবে যে, এগ্রন্থখানিতে কি অপূর্ব সমন্বয় গড়ে উঠেছে তত্ত্বরসের সংগে কাব্যকথার, আত্মার সংগে অবয়বের।

গীতগোবিন্দ তাই শুধু কাব্যগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্র নয়, এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্ট এক অপূর্ব শিল্পবস্তু। ছদ্মবেশী শিল্পী জয়দেব ভক্তবৃন্দের মুখ চেয়ে এবং আপন অন্তরের আকুতিতে একে একটি উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থরূপে গড়েছেন; আবার তাঁর রচনাকে যুগোত্তীর্ণ ও শাশ্বত সাহিত্যিক মর্যাদা পাবার উপযোগী করবার জন্য অতি নিপুণভাবে এর কাব্যবস্তুও নির্মাণ করেছেন। গীতগোবিন্দ শুধু গোবিন্দ কথা নয়, বা শুধু গীতও (গীতি কবিতা) নয়; মহৎ শিল্পী জয়দেবের মানস-রসায়নে জারিত এ এক অপরূপ রসরূপ ও শিল্পবস্তু।

বৌদ্ধযুগের নারী

শ্রীবিজয়ভূষণ সিংহ চৌধুরী

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় নারীজাতির সম্বন্ধে বলতে গেলে নিঃসন্দেহে বলা চলে—তখনকার "নারীরা জ্ঞানগৌরবে, বিদ্যাগৌরবে ও ধর্মগৌরবে গরীয়সী ছিলেন। যুগবিপ্লবী বুদ্ধদেব প্রাণহীন ও নীরস ভারতবাসীর হৃদয়রূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তাঁর উপলব্ধ সত্যের বীজ বপণ করে অন্তর্দৃষ্টিহীন সমস্যাকুল দেশবাসীকে অমৃতের পথে এনেছিলেন এবং নারীদের শিক্ষার উন্নতির উচ্চতম শিখরে তুলেছিলেন ; এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর শিক্ষার ধারা শাস্ত্রমত ছিল না, তিনি তন্ত্রও জানতেন না। ছোট কি বড় সবাইকে স্নেহভরে ডেকে সরল ভাষায় তাঁর সত্যধর্মের উদার বাণী শোনাতেন, আর সবাই অকপটে তা' শ্রবণ করত। তিনি অন্তরে সহজ সত্য উপলব্ধি করতে বলতেন আর বলতেন একে যেন অনাবৃত, অবিকৃত সত্য বলেই সকলে গ্রহণ করে।

জন-মনে গৌতম বুদ্ধের এই উপদেশ সুফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের আত্মজীবনীর মাধ্যমে বোঝা যায়। কত মূল্যহীন জীবন তাঁর মন্ত্রে অমূল্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। যখন বুদ্ধদেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে তাঁর সদ্ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন, তখন বিমাতা গৌতমীও নবধর্মে দীক্ষিতা হ'য়ে পুত্রের সত্যধর্ম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং কালে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ও ভিক্ষুণী সংঘের শিরোমণি হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা আবার "থেরী" নামে পরিচিত। থেরী শব্দের অর্থ জ্ঞানবৃদ্ধা বা স্থবির। প্রাচীন ভারতে থেরী সংঘ অতি শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। এই থেরীরা ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্ম সাধনায় অসামান্য উৎকর্ষলাভ করেছিল, এর অনেক প্রমাণ আছে। আবার ধর্মনিষ্ঠা আর অন্তর্দৃষ্টির জন্যই যে কেবল তাঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, তা'ই নয়, মনস্বিতার জন্যও খ্যাতি অর্জন করেছেন। শত

শত থেরী ভিক্ষুণী স্বাধীনভাবে সংসার উপত্যকা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে মানবের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা বৌদ্ধশাস্ত্র "খদ্দক থেরীগাথা" নামক গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থে তিয়াত্তর জন প্রসিদ্ধা থেরীর আত্মজীবনীতে এর পরিচয় পাই। বৌদ্ধযুগে নারীরা পিতৃগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন, প্রাচীন ভারতে যে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও পিতামাতা শিক্ষার সুযোগ দিতেন তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রিরা (থেরী) যাতে অবাধ স্বাধীনতা ও অতি উচ্চস্থান পায় এর জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অসামান্য প্রচেষ্টা করতেন এবং তাঁদের সেই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফল হয়েছিল এর নিদর্শনও আছে। থেরীগাথা নামক গ্রন্থে অনেক ছবিও রয়েছে।

পূর্বোল্লেখিত "খদ্দক থেরীগাথা"য় যে তিয়াত্তর জনের নাম উল্লেখ করা আছে, তাদের মধ্যে বৃদ্ধমাতা গৌতমী, পতিতা নারী অম্বাকাশী, কুমারী সুক্কা, ভিক্ষুণী বিমলা, থেরী পটাচারা, সুজাতা, অনুপমা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গৌতমী বলেছেন: "আমি তোমার মা, আবার তুমি আমার পিতা, তুমি ধর্মদুগ্ধ পান করায়ে আমাকে অক্ষয় শান্তি দান করেছ।" অম্বাকাশী বলেছেন: "কাশীর জনপদের যত সম্পদ আমার রূপের তালি ছিল, কিন্তু এখন আমার আর সেই আসক্তি নেই। পাপের মূল কি, কিসে পাপ দূর হয়, কিসে নির্বাণ লাভ হয়, এই জ্ঞান আমি লাভ করলাম তথাগতের শরণাপন্ন হয়ে।" পটাচারা বলেছেন যে, তিনি মাতা-পিতা-স্বামী-সন্তান সব হারায়ে শোক যখন আর রোধ করে রাখতে পারলেন না, তখন বুদ্ধের চরণাশ্রিত হয়ে জ্ঞানচক্ষু লাভ করেছিলেন এবং সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়েছিলেন। থেরী শুভার উক্তিতে বৌদ্ধযুগের মেয়েদের ব্রহ্মচর্যের প্রভাবের পরিচয় আছে। কোন এক যুবক ভিক্ষুণী শুভার প্রণয়াকাংক্ষী হয়ে বলেছিলেন, "তোমার চক্ষুযুগল হরিণ চক্ষুর ন্যায়; এই চক্ষু দেখলে কি প্রেমের তৃষ্ণা বর্ধিত হয় না?" শুভা এর উত্তরে চোখ দুটো উপড়ে দিয়ে বলেছিলেন,—তুমি যে চোখ জোড়াকে ভালবাসো, এই নাও।" এইরূপ কাহিনীর মাধ্যমে নারীদের শক্তির, শিক্ষার, সংযমের ও তাঁদের স্বাধীন মনোবৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিয়াত্তরজন থেরীর গৌরবময় জীবন-কাহিনী বৌদ্ধযুগের শিক্ষার পথপ্রদর্শক ছিল। বুদ্ধের অমৃত-মধুর ধর্মবাণী প্রচার ভারতীয় নারীজাতির কৃতিত্বের ইতিহাসে এক গৌরবময় অবদান।

বৌদ্ধযুগে ভারতের নারীজাতির জন্য যদিও বিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু পারিবারিক শিক্ষায় সকল নারীই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হতেন তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। বৌদ্ধযুগে নারীরা ধর্মশাস্ত্রে ও ললিতকলায় পারদর্শী ছিলেন। তখন অবগুণ্ঠনও ছিল না, আর অবরোধও ছিল না; তাঁরা স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন, ভগবান তথাগত নারীজাতিকে তাঁর ধর্মের শিরোমণি করে সমাজে তাঁদের উচ্চে স্থান দান করে নারীদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের উন্নতির উচ্চতম শিখরে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতীয় রসায়ন

ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,
ডি. এস. সি., (লণ্ডন)

(প্রথম পর্যায়)

মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে প্রকৃতির কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে। সভ্যতার আদিম যুগে শীতাতপ বর্ষা থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাথরের টুকরা ইটের মত ব্যবহার করেছে। মারণ-অস্ত্র তৈরি করেছে পাথর ঘষে চোখা করে। গৈরিক রঞ্জন ব্যবহার করেছে অঙ্গ প্রসাধনে। মাটি দিয়ে গড়েছে নিত্য ব্যবহার্য বাটি, থালা, হাঁড়ি, কলসী। আদিম মানুষ খনিজ ধাতুর টুকরা কুড়িয়ে এনেছে। হলুদ রংয়ে আকৃষ্ট হয়ে সোনা সংগ্রহ করেছে। লালচে রং দেখে তামা সংগ্রহ করেছে। রূপার সাদা জলুষ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

হাজার হাজার বছর পরে খনিজ থেকে ধাতু গড়তে শিখেছে। খনিজের বিবিধ ব্যবহার করেছে। গাছপালা নিজের কাজে লাগিয়েছে, অন্ন বস্ত্র ঔষধের জন্য। সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের উন্নতি সভ্যতাকে বড় করে তুলেছে। সভ্যতার উন্নতিতে বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে।

খ্রীষ্ট জন্মাবার আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন ভারত-ভূমিতে পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়োর ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ খনন করে সেকালের ভারতবাসীর মৃৎশিল্পের কুশলতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গেছে। তখন মাটির পাত্র ও পুতুল গড়ার ব্যবস্থা ছিল। পাত্রের গা চকচকে পালিশ করার ব্যবস্থা ছিল। গায়ের উপর ছবি আঁকা হত এবং পাত্রগুলি আগুনে পোড়ানতে ছবিগুলি গায়ে বসে যেত। ব্যবহার করাতে উঠত না। মৃৎপাত্র অনেক বেশী সংখ্যায় পাওয়া গেছে। তাইতে মনে হয় তখন মৃৎপাত্র গড়া, কেনা-বেচার ব্যবস্থা ছিল। উন্নত মৃৎশিল্পের জন্য ভাল মাটি চেনা, বাছাই

করা, তার থেকে ভাল গঠনের পাত্র গড়া, তাতে ছবি আঁকার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা, এসব জানই সেকালের শিল্পীর ছিল। মৃৎপাত্র পোড়াবার চুলা ব্যবহার হত। চুলাগুলি মাপ করা ইটের তৈরি করা হত। ইটগুলিও ভাল মাটির তৈরি। যাতে বেশী তাপ সহ্য করতে পারে, সেইজন্য বিশেষভাবে গড়া। তাপের জন্য কাঠ বা কাঠকয়লা ব্যবহার হত।

ঐ সব মৃৎপাত্রের রং থেকে জানা গেছে তখনকার শিল্পী কোন লৌহ যৌগিক দিয়ে পাত্রগুলি চিত্রবিচিত্র করত। সেসব লৌহ যৌগিক দগ্ধ হলে ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হত। তাই লাল রংয়ের ছবি পাত্রের গায়ে বসে যেত। ধুলেও উঠত না। লৌহ যৌগিকের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ যৌগিক ব্যবহার করত। তাতে কালো বা চকোলেট রংয়ের চিত্র হত। ম্যাঙ্গানিজ যৌগিকের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে লৌহ যৌগিক মিশান থাকলে কালো রং হত। আর বেশী পরিমাণে লৌহ যৌগিক থাকলে চকোলেট রং হত।

চুলার তাপ ব্যবহার করতে তখনকার শিল্পীর তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও জানা ছিল। এক ইঞ্চি পুরু বড় মৃৎপাত্রও সমানভাবে আগুনে পোড়ান হত। মৃৎপাত্র পালিশের জন্য সোডা আর বালি একত্রে তাপ দিয়ে গলান হত। তাতে পাত্রের উপর চকচকে পালিশ হত। পালিশের রং করার জন্য কপার অক্সাইড মিশান হত। তাতে নীল বা সবুজ রং হত।

কাচের মত পদার্থ দিয়ে তখনকার শিল্পীরা পাত্র গড়েছে। পুঁতি গড়েছে। যতদূর মনে হয় বালিজাতীয় পদার্থ থেকে তাপ দিয়ে গলিয়ে কাচের মত পদার্থ তৈরি করা হত। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকেরা সে পদার্থের শতকরা উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখেছেন: SiO_2 57.99, $Al_2O_3 + Fe_2O_3 - 4.85$, CaO 4.31, MgO 27.2, Alkali Oxides (ক্ষারকীয় অক্সাইড) — 3.54, $CuO - 1.09$, পোড়াতে কমে 2.01 অংশ।

খ্রীষ্টপূর্ব 1400 সালে মিশর দেশে যে কাচ পাওয়া গিয়েছিল, তার শতকরা উপাদান হল—

SiO_2 61.7, $Al_2O_3 - 2.45$, Fe_2O_3 0.72, CaO 10.05, $MgO - 5.14$, Alkali Oxides — 19.21, CuO .32, Mn_2O_3 0.47

উপাদানগুলি তুলনা করলে মনে হয় মোহেঞ্জোদড়োর আমলেও কাচ ছিল। কাচ যৌগিক পদার্থ নয়। এর উপাদান কখনও নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে না। বিজ্ঞানীরা বলেন কাচ স্বচ্ছ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এখনকার দিনে অনচ্ছ ও অর্ধস্বচ্ছ কাচও পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব 2450 বছর আগেও কাচ জানা ছিল। কাচের তৈরি পুঁতির মালা ব্যবহার হত। তার উপাদানের সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর কালের পুঁতির উপাদানের খুব বড় বিজ্ঞানগত পার্থক্য নেই। অথচ সে পুঁতি কাচের তৈরি বলে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট স্বীকার করতে চান না।

না চাইবার বড় হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। আজও বিজ্ঞানীরা কাচকে মিশ্র পদার্থ বলেন। মিশ্র পদার্থের স্থান-কাল-পাত্র ও পদার্থের গুণাগুণ ভেদে উপাদানের অল্পবিস্তর পার্থক্য হয়েই থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাই মনে হয় কাচও সেই খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে এই ভারতে জানা ছিল।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার কোপিয়াতে কাচের জিনিসপত্র ও কাচ তৈরির কারখানা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা অনুমান করছেন এইগুলি প্রায় আড়াই হাজার বছর (খ্রীষ্টাব্দ) আগেকার কাচশিল্পের নিদর্শন। কাচ অবশ্যই আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় 'কাচ' কথাটি ব্যবহার হয়। তক্ষশিলায় কাচের টালি ব্যবহার হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাচের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক প্লিনিও ভারতীয় কাচ অন্য দেশের কাচের চাইতে ভাল বলে গেছেন।

সেই খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে প্লাষ্টার অফ প্যারিসের সঙ্গে চুন বালি মিশিয়ে সিমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হত। বাড়ি তৈরি করতে, দেওয়াল প্লাষ্টার করতে, ড্রেন তৈরি করতে এই সিমেন্ট ব্যবহার হত।

খনিজও সেই প্রাচীন যুগে কম ব্যবহার হত না। চুনাপাথর, বিবিধ মণিমাণিক্য, সিঁদুর, লৌহ যৌগিক, সীসাঞ্জন, সীসাঘটিত সাদা রং সবই ব্যবহার হত।

মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার কালে ধাতুর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হত। মানব-সভ্যতার ধাতু যুগের প্রথম বিকাশ ভারতেই হয়েছিল। আজ তা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। তামার আকরিক থেকে তামাধাতু নিষ্কাশন করা হত। তামাধাতু থেকে বিবিধ বাসন-কোসন, মারণাস্ত্র এমন কি মূর্তি পর্যন্ত গড়া হত। বিশুদ্ধ তামাধাতু তৈরি করতে না পারলেও সে যুগে তামার মিশ্রধাতু তৈরী হত। বিশুদ্ধ ধাতুর চাইতে মিশ্রধাতু শক্ত, ঘাতসহ হয়। তাই মারণাস্ত্র তৈরির সুবিধা হত। ছুরি, ছোরা, কাস্তে, তীর, বল্লম, কুঠার সবই তামার মিশ্রধাতুর তৈরী। মিশ্রধাতু বেশীর ভাগই আধুনিক কালের ব্রঞ্জের মত, Cu 87.42, Sn 10.45, As 1.1, P60.52, Fe O.34, Ni O.17, তামা ও টিন মিশিয়ে গড়া হত। আর্সেনিক ঘটিত মিশ্রধাতু দিয়ে কুঠার তৈরি হত। এ ধরণের মিশ্রধাতু মিসরেও পাওয়া যেত। প্রয়োজন মত ইচ্ছা করে আর্সেনিক মেশান হত কিম্বা কোন তামার আকরিকে আর্সেনিক বর্তমান থাকাতে তামাতেও সেই আর্সেনিক থেকে যেত, তা সঠিক বলা যায় না।

আকরিক থেকে নিষ্কাশন করা তামার গলা পাওয়া গেছে। আকরিক কাঠকয়লা দিয়েও পোড়ান হত। গলন্ত তরল তামা নল বেয়ে মাটিতে কাটা গর্তে এসে পড়ে জমাট বাঁধত। তামা নিষ্কাশন, ব্রঞ্জের ব্যবহার তাঁরা ভালই জানতেন। তামা খুব ভাল না হলেও খানিকটা শোধন করার ব্যবস্থাও তাঁদের ছিল। মুচিতে তামা গলিয়ে শোধন করতে হত। তামার আকরিক দুই রকমের—গন্ধক ঘটিত ও কার্বন ঘটিত। গন্ধক ঘটিত আকরিক থেকে

তামা নিষ্কাশন করা শক্ত। গন্ধক ঘটিত তামার আকরিক থেকেও তখন তামা নিষ্কাশন হত। কাজেই খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেও ধাতুর বিজ্ঞান তাঁদের খুব কম জানা ছিল না। সমসাময়িক জগতের তুলনায় ভালই জানা ছিল বলতে হবে। শক্ত ঘাতসহ ব্রঞ্জ তাঁরা তৈরি করতেন। জিনিসপত্র ঢালাই করে তৈরি করা সুবিধা হবে বলে প্রাচীনেরা তামা-আর্সেনিক মিশ্র ধাতুতে অল্প পরিমাণে সীসাধাতু মেশাতেন। তাতে মিশ্রধাতু সহজে গলত। তরল করে নিয়ে ঢালাই করা সুবিধা হত।

মোহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার লোকেরা সোনা রূপার গহনা ব্যবহার করতেন। মঞ্জিষ্ঠার মূল থেকে রঞ্জন নিয়ে কাপড় রং করতেন। আর্সেনিক ঘটিত ভেষজ ব্যবহার করতেন। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থের বড় নিদর্শন কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে গেছে। শিলাজতু সামান্য পাওয়া গেছে। ভেষজ হিসাবে লাগত। আর হরিণের শিং দেখা গেছে। শিং চূর্ণ ভেষজ হিসাবে ব্যবহার হত।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মোহেঞ্জোদড়োর যুগকে বৈদিক পূর্ব যুগ বলেছেন। ভূগর্ভ থেকে খনন করে যেসব তৈজসপত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার থেকে সে যুগের রসায়ন বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে জানা যায়। সে সময়ের লিখিত কোন গ্রন্থের বা মৌখিক কোন ইতিবৃত্তের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বৈদিক যুগের আগেকার মৌখিক বা লিপিবদ্ধ কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নি। বৈদিক যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও, ভারতে রসায়ন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ সব চেয়ে পুরাতন বলে ধরা হয়। ঋগ্বেদে আর্যদের যা ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তার থেকে মনে হয় ক্ষেত্রকর্ষণ তাঁদের প্রধান কাজ ছিল। এঁরা সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ ব্যবহার করতেন। এ দেশের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ লেগে থাকত। ধাতু দিয়ে তাই তাঁদের অস্ত্রাদি গড়তে হোত। রান্নার জন্যে তাঁরা ব্রঞ্জের তৈরি কড়া ব্যবহার করতেন। সোনার গহনা ব্যবহার করতেন। ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রাদি তৈরি করতেন। ঋগ্বেদে 'অয়স' বলে ধাতুর উল্লেখ আছে। অয়স বলতে আধুনিক লোহা কিনা, এই নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন অয়স শব্দের অর্থ ধাতু। কেননা, উপনিষদে লোহিত-অয়স আর কৃষ্ণ-অয়সের উল্লেখ আছে। লোহিত বর্ণের অয়স বোধকরি তাম্রধাতু, আর কৃষ্ণবর্ণের অয়স লোহা ধাতু। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে অয়স্কান্তমণি বলে একটা কথা আছে। এটির উল্লেখ মহাভারতের যুগে আছে। এটি হল আজকালকার লৌহ আকরিক অক্সাইড, যার বর্ণ কালো, আর যার চুম্বকীয় ধর্ম আছে। এই আকরিক প্রাচীনযুগে চীনারা কম্পাস বা দিগ্দর্শন যন্ত্র তৈরি করতে কাজে লাগাতেন। উপনিষদের যুগ বলা হচ্ছে বৈদিক যুগের ঢের পরে, খ্রীষ্টপূর্ব আটশত বছর আগে। বলা বাহুল্য, হরপ্পা-মোহেঞ্জোদড়োয় লোহা ধাতুর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে বেদে সুরার উল্লেখ পাওয়া যায়। যজ্ঞকালে সুরার পূজা ও

ব্যবহারের উল্লেখ আছে। দধির উল্লেখ আছে। সুরা বার্লির দানা থেকে তৈরি করা হত।

রঞ্জন ব্যবহার করা হত। রক্তবর্ণ রঞ্জনে বস্ত্র রং করা হত। মনে হয় কোন উদ্ভিজ্জ রঞ্জনই ব্যবহার করা হত।

সাম, যজুঃ, অথর্ব বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে। বোধকরি খ্রীষ্টপূর্ব বারশত বছর আগে। শুক্লযজুর্বেদে ছয়টি ধাতুর কথা আছে—অয়স (সোনা), হিরণ্য (রূপা) লোহা (তামা), শ্যাম (লোহা) সীসা (লেড) ও ত্রপু (টিন)। অথর্ববেদে তিনটি—সোনা, রূপা ও তামার উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদে যজ্ঞ, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু ভেষজাদির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন আয়ুবর্ধক অমৃত, কেশবর্ধক উদ্ভিদ। ঔষধ সংক্রান্ত দুইটি শব্দের পরিচয় পাই,—ভৈষজ্যানি ও আয়ুষ্যানি। বিশ্বাস ছিল অদৃশ্য দৈত্যদানবের দৃষ্টিপাতে রোগ হত। সে রোগ দমন করত 'ভৈষজ্যানি' শ্রেণীভুক্ত ঔষধ। আর টনিক বা স্বাস্থ্য ও আয়ুবর্ধক ঔষধ হল 'আয়ুষ্যানি' শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তীকালে আয়ুষ্যানি শব্দের সম অর্থে রসায়ন শব্দ ব্যবহার হল। আরব দেশে রসায়ন শব্দের সমঅর্থে ব্যবহৃত হল আলকিমিয়া শব্দ, যার থেকে ইউরোপীয় ভাষায় অ্যালকেমি ও কেমিস্ট্রি শব্দের উৎপত্তি হল।

STUDENTS
P. G. A.
COMMON-ROOM

নাট্যকার দীনবন্ধু

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
এম. এ.

মাইকেল মধুসূদন বাঙলা নাটকের যে গঠন-রীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮০)। দীনবন্ধুর ন্যায় ভাগ্যবান নাট্যকার খুব কম আছে ; প্রথম আবির্ভাবে সমগ্র দেশকে তিনি যেরূপ চকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ পারে নাই। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং অভিনয়নৈপুণ্যে তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফল বহুমুখী হইয়াছিল। 'নীলদর্পণ' বাঙলা নাটককে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশে ও বিদেশে জনমত গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বাঙলাদেশে নীলচাষের কাহিনী বিশ্বতপ্রায়, অথচ ১৮১৪-১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙলায় উৎপাদিত নীল সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটাইত। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরাজ ব্যবসায়ীদের হাতে নীলের চাষ ও ব্যবসা ন্যস্ত করে। ইহাতে অসামান্য লাভ দেখিয়া নীলকর ইংরাজেরা রাইয়তদিগকে দাদন দিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ করিত এবং তাহাদের সমস্ত জমিতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। ঋণের সুদ ও আনুষঙ্গিক দাবী মিটাইতে রাইয়তদের কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকিত না। তখন তাহাদের উপর চলিত অকথ্য অত্যাচার। বিদেশী শাসক যেখানে নীলকরদেরই গোপন পৃষ্ঠপোষক, সেখানে অসহায় প্রজাগণ প্রতিকার পাইবে কোথায়। বাঙলার নব-প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র ইহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার তখনও সেরূপ শক্তি গড়িয়া উঠে নাই যে, সেই প্রতিবাদে অত্যাচার বন্ধ বা প্রশমিত করিতে পারে।

দীনবন্ধুর জন্ম এবং কর্মস্থানই ছিল নীলচাষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সরকারী কার্যে তাঁহাকে নানাস্থান পরিদর্শন করিতে হইত। কাজেই, নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। তিনি যে নীলদর্পণে একাধিক সত্য ঘটনা সংযোজন করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

P 30408

নীলকরদের অত্যাচার অবলম্বনে বাঙলায় সাহিত্য-রচনা দীনবন্ধুর পূর্বেও হইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহর হইতে "বাপরে বাপ! নীলকরদের কি অত্যাচার" নামে ১৬ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। (ডাঃ সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২—পৃঃ ৬৯)। ইহা নাটকের ছাঁদে গদ্যে-পদ্যে লিখিত। পুস্তিকাটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দীনবন্ধু ইহার সহিত পরিচিত ছিলেন।

দীনবন্ধু স্বভাবতঃ হাস্যরসিক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে আসিলে হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নাটকের অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক। কিন্তু দীনবন্ধুর সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মন বাঙলার রাইয়তদের দুর্দশা দেখিয়া কাঁদিয়াছিল। তাই তিনি এই করুণ কাহিনী দেশবাসীকে নিবেদন করিয়াছিলেন। বাঙলা নাটকের প্রথম অবস্থা হইতেই জনমত গঠনে নাটক-রচনা প্রচলিত ছিল। বিধবা বিবাহ, মদ্যপান নিবারণ, কৌলীন্যপ্রথার দোষ প্রভৃতি লইয়াই বাঙলা সামাজিক নাটক রচিত হইয়া আসিতেছিল। সম্ভবতঃ এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবি-শিষ্য দীনবন্ধু নাট্যকার হইয়াছিলেন।

'নীলদর্পণ' প্রথম প্রকাশের সময়ে নাট্যকারের নাম ছিল না। "নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্"-রূপে নাট্যকার বর্ণিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী দেশীয় জনসাধারণের মনে শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার সাহস সঞ্চার করিয়াছিল। তাই 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় কলিকাতা হইতে বাঙলার পল্লী-অঞ্চলেও প্রসারিত হইয়া বিদেশী কর্তৃক দেশের আর্থিক শোষণের জন্য জঘন্য বর্বরতার নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটিত করে। মাইকেল মধুসূদন দেবনামে ইহার ইংরাজি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সুদূর বিলাতেও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়াছিল। ইংরাজি অনুবাদের প্রকাশক ইংরাজ পাদরি লঙ্ ইংরাজ শাসক কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া বাঙালীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙলার কবি-গানে—'অকালেতে হরিশ ম'ল, লঙের হল কারাগার'—তাঁহার নাম দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। নীলদর্পণের জনপ্রিয়তা দেখিয়া ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

এরূপ অসামান্য অভিনয়-সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করা সত্ত্বেও নাট্যকাররূপে দীনবন্ধুকে উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার নাটকের গঠন-রীতি এবং চরিত্র-সৃষ্টি মধুসূদনের আদর্শ দ্বারা এরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল যে, এদিকে তিনি কোন মৌলিকতা দাবী করিতে পারেন না। সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে বাঙলা নাটকে পাত্র-পাত্রীর সামাজিক অবস্থা দ্বারা তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা নির্ধারণের যে রীতি রামনারায়ণ হইতে আরম্ভ হয়, দীনবন্ধু তাহাই অনুসরণ করায় সংলাপ শুধু কৃত্রিম হইয়া উঠে নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্যকরের পর্যায়ে নামিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাতৃবিয়োগে নবীনমাধবের সাধুভাষায় শোক প্রকাশের উল্লেখ করা যায়।

সহানুভূতিশীল দরদী দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বিভিন্ন উপাখ্যান ও চরিত্র সৃষ্টিতেই দীনবন্ধুর কৃতিত্ব। তাই তাঁহার নাটকে আদর্শবাদ অথবা কল্পনার বিলাস অপেক্ষা সমসাময়িক-কালের বাস্তব রূপ, শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ সর্বপ্রথম রূপায়িত হইয়াছিল। দেশের অত্যাচারিত, উৎপীড়িত জনসাধারণের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল বলিয়া তাহারাই তাঁহার নাটকে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে; মধ্যবিত্ত বা অভিজাত সমাজের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকিলেও ইহারা তাঁহার দু'একটি প্রহসন ছাড়া অন্য কোথাও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'নীলদর্পণ' করুণরসাত্মক নাটক। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কৃষ্ণকুমারী নাটকে গ্রীক-ট্র্যাজেডির যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন, দীনবন্ধুও তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাই নীলদর্পণের কাহিনীর মধ্যে চারিত্রিক পরিণতির অথবা মানবজীবনের কোন মৌলিক সমস্যা কিম্বা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির চিত্ত-সংঘর্ষ চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে কেবল নিরুপায়, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের কতকগুলি দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। যখন সরল, সৎ ও নিরপরাধ মানুষের উদ্বেগহীন শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বহিঃশক্তির রূঢ় আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, তাহাকে সুখকর জীবন যাপনের ক্ষেত্র হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে, তখন ভাগ্যের অমোঘ, নিষ্ঠুর বিধানের সম্মুখে মানুষের অসহায় অবস্থা আমাদের মনে কারুণ্য রসের সঞ্চার করে। 'নীলদর্পণ'-এর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। কিন্তু নাটকের শেষে মৃত্যুর অসঙ্গত আতিশয্য ট্রাজেডির গুরুত্ব হ্রাস করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দরদী প্রচারক দীনবন্ধু নাটক রচনার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার জন্য তিনি অতি মাত্রায় করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিতে গিয়া ট্রাজেডিকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। গোলোকচন্দ্রের আত্মহত্যা তাঁহার স্বভাবের পক্ষে অসঙ্গত; সরলার মৃত্যু নাটকের পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য নহে।

নীলদর্পণের কাহিনী নাট্যশাস্ত্র অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছে। ইহার মূল কাহিনী গোলোক বসুর পরিবারকে এবং উপ-কাহিনী সাধুচরণের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াছে। ১ম অঙ্কে সংঘাতের আভাস—ইহাতে গোলোক চিত্রিত এবং সাধুচরণ বিবৃত। ২য় অঙ্কে সংঘাতের সূচনা—গোলোককে কারারুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রের আরম্ভ। ৩য় অঙ্কে চূড়ান্ত অবস্থা —নবীনের প্রজাদের পক্ষ গ্রহণ ও নীলকরদের সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষ, গোলোকের কারাগারে বাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার। ৪র্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি—কারাগারে গোলোকের আত্মহত্যা। ৫ম অঙ্কে গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবারের সর্বনাশ সম্পূর্ণ। কাহিনীর চরিত্রগুলির সহিত নীলকরদের সংঘাতই ইহার প্রধান আকর্ষণ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। পদী ময়রাণী ও গোপীনাথ নীলকর সাহেবদের সহায়তা করার ফলে চরিত্রগুলির পরিণতি করুণ হইয়াছে। বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামে রাইয়তদের

দুঃপভোগ, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার, নবীনমাধব ও তোরাপের সহসা আবির্ভাব ও তাহাকে উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার উত্তেজনা, চমক ও আকস্মিকতা নাটকের গতিবেগ দ্রুত করিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টিতে 'নীলদর্পণ'-এর প্রধান অপেক্ষা অপ্রধান চরিত্রগুলিই সার্থক হইয়াছে। আদুরী, তোরাপ, রাইচরণ, এমন কি, পদী, পোপীনাথ, রোগ, উডও একান্ত সজীব; অথচ নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী ও সরলা প্রভৃতির চরিত্র নিতান্ত নিরস হইয়াছে। নবীনমাধব নাটকের নায়ক; কিন্তু তাহার চরিত্রে দীনবন্ধু যে নাটকীয় সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন, তাহার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে তাহাকে ভাগ্যের ক্রীড়নক করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর বাস্তবনিষ্ঠা তাঁহাকে একটি গুরুতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করিবার সুযোগ দিয়াছে। তাঁহার রচনায় অনেক সমালোচক অশ্লীলতার সন্ধান পাইয়াছেন। বাঙলার গ্রাম-সমাজে চাষী রাইয়তদের মধ্যে যে ভাষা এখনও প্রচলিত, সেই ভাষাতেই দীনবন্ধু তাহাদের কথোপকথন দিয়াছেন। সেই ভাষার সহিত বর্তমান নাগরিক সমাজ অপরিচিত বলিয়াই যে সেগুলিকে অশ্লীল বলিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। যাহাদের চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাদের ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ না করিলে চরিত্রগুলি কখনও সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠিত না।

'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) নাটকে দুইটি কাহিনী শিথিল ভাবে গাঁথা হইয়াছে; রমণীমোহন ও তপস্বিনী—বিজয় ও কামিনীর প্রেম ও বিচ্ছেদ এবং জলধর-অগস্থা ও মল্লিকা-মালতী-বিনায়কের হাস্যরসাত্মক কাহিনী। শেষোক্ত কাহিনীতে সেক্স্‌পীয়ারের মেরি ওয়াইভ্‌স্ অফ্ উইণ্ডসরের প্রভাব স্পষ্ট; মল্লিকা ও মালতী মেরি ওয়াইভ্‌স্-এর ছাঁচে গঠিত। কিন্তু ইংরাজ-রমণীর সাহসিকতা বঙ্গললনার চরিত্রে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। এই নাটকেও দীনবন্ধু দুই রকম ভাষা এবং মধ্যে মধ্যে মিশ্র ও অমিশ্র পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তথাপি ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য নাটকের গতি বৃদ্ধি করিয়াছে।

'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুকরণে রচিত। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ১৯শ শতকের মধ্যভাগের ইয়ং বেঙ্গলের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া। দীনবন্ধু স্বয়ং প্রতিবাদ করিলেও নিমচাঁদের চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন-চরিত্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই নাটকটি এক হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কাহিনীর জটিলতা অথবা নাটকীয় চমকপ্রদ আকস্মিকতা কিছুই নাই, কিন্তু পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনার বিচিত্রতা নাটকটিকে গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইলেও মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকেরই ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। ভক্তপ্রসাদ রাজীবের মতই বিবাহের ইচ্ছায় প্রতান্বিত। প্রাচীন সংস্কারবিরোধী সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করিতেই নাটকটি রচিত হইয়াছে।

রামমণি ও গৌরমণির চরিত্র যেভাবে চিত্রিত তাহাতে মনে হয় যে, দীনবন্ধু বিধবা বিবাহ-আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

এই নাটকের কৌতুকাবহ ষড়যন্ত্রই উল্লেখযোগ্য এবং ইহাই হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

'লীলাবতী' (১৮৬৭) নাটকের কাহিনীতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য এত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, নাটকীয়তার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। দীনবন্ধু এই নাটকে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা এবং ব্রাহ্মধর্ম ও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া প্রধান চরিত্র লীলাবতীকেই কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, ঈশানাদি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে।

এই নাটকে প্রেমের দৃশ্যগুলি ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু অরবিন্দ, যোগজীবন, চাঁপা ও তারার পরিচয়-রহস্য লীলাবতীর প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনার সংঘাত ও আকস্মিকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

'জামাই বারিক' (১৮৭২) কৌলীন্য প্রথার গৌণ কুফল দেখাইবার জন্য রচিত। ইহার ঘটনা বাস্তব আশ্রিত, যদিও ইহাতে কামিনীকুমারের প্রভাব দেখা যায়।

নাটকটি স্ত্রীচরিত্র-প্রধান। দীনবন্ধু বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃপুরের একটি বাস্তব ও সহৃদয় বর্ণনা দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, নাটকের ভোতারাম ভাট চরিত্রটি লালবিহারী দে-কে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে; লালবিহারী দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকে স্ত্রী-অবজ্ঞাত অভয় করুণ রসের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত করাইলেও ইহা একটি বিশুদ্ধ প্রহসন।

'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) দীনবন্ধুর শেষ নাটক। ইহার কাহিনী নবীন তপস্বিনীর ন্যায়। ইহা ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত; কিন্তু অতিমাত্রায় রোমান্টিকতা ও প্রহসনের পরিবেশ ইহার গুরুত্ব ও নাটকীয়তার হানি করিয়াছে। বঙ্কেশ্বর চরিত্রটি মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের বিদূষক-চরিত্রের প্রভাবে রচিত।

'কমলে কামিনী' নাটকে দীনবন্ধু এরূপ দৃশ্য সংযোজন করিয়াছেন যাহা মঞ্চে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইহাকে অভিনয়ের অনুপযুক্ত বলিতে হইবে।

এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনয়ে সফলতা লাভ করিয়াছিল। দেশের অতি-পরিচিত সমাজ-চিত্র মঞ্চের উপর অভিনীত হইতে দেখিয়া বাঙলার জনসাধারণ ইহাদের সাগ্রহে গ্রহণ করে। দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তায় বাঙলা নাটকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার প্রয়োজনে বাঙলা নাটক রচনার প্রচেষ্টা, সর্বসাধারণের কাছে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতির সূত্রপাত দীনবন্ধুর সময় হইতেই দেখা গিয়াছিল। এই হিসাবে বাঙলা নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধু চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমীরা মিত্র

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুরেশচন্দ্র মিত্র ব্যবস্থা ক'রে এলেন রাধাবাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফ কোম্পানীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দাঁড়ানো অবস্থার ছবি তোলাবেন। তার আগে তাঁর সমাধিস্থ বসা অবস্থায় একবার ছবি তোলেন অবিনাশচন্দ্র দাস ও কেশব-মন্দিরে ভাবসমাধি ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আর একটি ছবিও তোলা হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর। ছবি তোলাতে ভারি নারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে তাঁর ভারি আপত্তি। ভাবের জগতের যিনি অধিবাসী, প্রাণের মাঝে সত্যকে যিনি পেয়েছেন, বাইরের আড়ম্বর তাঁর ভাল লাগবে কেমন ক'রে। প্রথমে তাই তিনি কিছুতেই রাজী হন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভক্তের একান্ত ইচ্ছাই জয়ী হোল। স্নেহাতুর-শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশবাবুর একান্ত আগ্রহের বিরুদ্ধে রুঢ় হ'য়ে তাঁকে ব্যথা দিতে পারলেন না। একখানি গাড়ী ভাড়া করা হোল, সুরেশবাবু নিয়ে চললেন তাঁকে ; সঙ্গে গেলেন কালীপ্রসাদ ও লাটু, দোকানে উপস্থিত হ'লেন সকলে, ফটোগ্রাফার সাজ-সরঞ্জাম ঠিক ক'রে নকল একটি থামের উপর বাঁ হাত রেখে দাঁড়াতে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। একটি লালপাড় ধুতি, কোট আর পালিশ করা চটি—এই ছিল তাঁর সেদিনের সাজ। ছবি যখন তোলাতেই হ'চ্ছে তখন ফটোগ্রাফারের নির্দেশমত দাঁড়ানো ছাড়া উপায় কি। তাঁর কথামত বাঁ হাতটি থামের উপর রেখে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু সেই অবস্থায় বেশীক্ষণ তাঁর বাহ্যজ্ঞান রইল না। পলকের মধ্যে দেখা গেল তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েছেন। প্রসন্ন জ্যোতিতে উজ্জ্বল মুখে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ হাসি। ফটোগ্রাফার সেই অবস্থায় ফটো নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল তাঁর বাহ্যজ্ঞান। সুরেশবাবু ব্যস্ত

হ'য়ে পড়লেন, তাড়াতাড়ি একটি গাড়ী ভাড়া ক'রে তুলে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, লাটু ও কালীপ্রসাদকে। হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিমূঢ় বিস্ময়ে কালীপ্রসাদ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন তার গূঢ় তাৎপর্য।

এই সময় কালীপ্রসাদ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে এসে থাকতেন। আচার্যের সান্নিধ্যে,—তাঁর নির্দেশ ও প্রেরণায় আপ্রাণ যত্নে গঠন করবার চেষ্টা করতেন নিজের জীবন। দেখতেন কত বিচিত্র প্রকৃতি—বিচিত্র ভাবধারা নিয়েই না লোকে আসতো তাঁর কাছে। আর তাঁর গুরু কেমন সহজে—যে যেমন তেমন হ'য়ে মিশতেন তাদের সঙ্গে। দিতেন আশা, দিতেন ভরসা, যোগাতেন প্রেরণা। গৃহীর কাছে আলোচনা করতেন পাকা গৃহীর বুদ্ধি নিয়ে, তেমনি করেই উপদেশ দিতেন চারদিকে আঁট রাখতে, আবার তার মধ্য দিয়েই দেখাতেন আলোর পথ। তারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে যেত এই জেনে যে, ভগবানকে গৃহের গণ্ডীর মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁর আরাধনা করতে গৃহ ছেড়ে না গেলেও চলে। বিরহী তাঁর মাঝে খুঁজে পেত সত্যিকারের দরদী। যাঁর সহানুভূতির প্রলেপে ব্যথার তাদের উপশম হোত, মনে হোত তাদের অন্তর-বেদনা অমন দরদী প্রাণ নিয়ে আর কেউ হয়তো উপলব্ধি করে নি। আবার ত্যাগীর কাছে নিরাভরণ ত্যাগীর জলন্ত মূর্তি নিয়ে যেন জলে উঠতেন—অবাক হয়ে দেখতেন কালীপ্রসাদ সকল অহঙ্কার, সকল মোহ যেন ভস্ম হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর অঙ্গে। বৈরাগ্য বুঝি বাস্তব রূপ নিয়ে বসে আছেন তাঁর স্নেহাসক্ত গুরুর আসনে। সেই মানুষই আবার কেমন ক'রে শিশুর সারল্যে মেতে উঠতেন ভোলানাথের মতন। বালকের কাছে এবং বালক-ভাবাপন্ন লোকের কাছে তিনি বালক হয়েই বন্ধুত্ব করতেন। বুঝতে পারতেন না কালীপ্রসাদ —এ' কেমন ক'রে সম্ভব হয়। হারিয়ে ফেলতেন নিজেকে দিশেহারা হ'য়ে তাঁর আচার্যের এই বহুরূপ এর লীলার আবর্তনে। তবু একটি সত্য বড় স্পষ্ট অনুভব করতেন,—অনুভব করতেন যে নির্বিশেষে সকলেই তাঁর শান্তির প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হোত। অঞ্জলি ভ'রে নিয়ে যেত শান্তি-সুধা তাঁর গুরুর ক্ষয়হীন উৎস থেকে।

অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্যদের সাহচর্যে যখন থাকতেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক রূপ। কখনো মধুরভাবে স্নেহে কোমল হ'য়ে তাদের বোঝাচ্ছেন। কখনো দৃঢ়ভাবে সংযত করছেন, সংশোধন করছেন তাঁদের ভুল। কঠিনভাবে ছিন্ন করছেন ভ্রান্তি। কখনো নিজের শক্তি সংক্রমণ করে তাদের মাঝে আনছেন তেজের দীপ্তি।

শোনা গেল রমেশ মিত্রের মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে নরেন্দ্রনাথের বিয়ের। বহু টাকা পণ দেবার জন্য প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন তিনি। কাউকে কিছু বললেন না শ্রীরামকৃষ্ণ—না ভাল, না মন্দ। একদিন একটি গাড়ী ক'রে উপস্থিত হ'লেন নরেন্দ্রের বাড়ী। নরেন্দ্র এলেন ব্যস্ত হ'য়ে। এ' কথা সে কথার পর তাঁর হাতের গুলি টিপে বললেন: "তোর বিয়ে হবে না, স্ত্রী সঙ্গও হ'বে না"। হোলও তাই। বিয়ে নরেন্দ্রনাথের আর হোল না।

গুরুকে যেন চিনেও চিনে উঠতে পারেন না কালীপ্রসাদ। সর্বদা তাই উৎসুক হ'য়ে থাকেন। চোখ, কাণ—প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রাখেন, তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ কণায় কণায় গ্রহণ করবার জন্ত।

সাকার নিরাকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপকেও মানতে হয়। যে রূপ চিন্তা ক'রে ধ্যান করে—সাধক সেই রূপই দর্শন করে। পরে আবার সেই রূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার হয়ে যায়"। এমনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন: "যারই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন ছাদ আর সিঁড়ি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য। লীলা—যেমন ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায়-অবতার"। "নরলীলা কেমন জানো? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হড় হড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে আসছে। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রকে ভরদ্বাজ প্রভৃতি ১২ জন ঋষি মাত্র অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন। ভক্তের জন্তই নরলীলা। ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে বলে। মা, বাবা, ভাই, বোন, সন্তান-এর মতন ক'রে ভগবানকে স্নেহ, ভালবাসা দিতে পারবে বলেই ঈশ্বর ছোট হয়ে লীলা করতে আসেন"। ভগবান অবতার হ'য়ে জীবকে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। "ঈশ্বরই নররূপে লীলা করছেন। সেই সচ্চিদানন্দই বহু রূপে জীব হ'য়েছেন, তিনিই মানুষ-এর রূপ নিয়ে লীলা করেছেন—এই বিশ্বাস হলে পূর্ণ জ্ঞান হয়"। কথায় কথায় একদিন বললেন: "আমায় তোদের কি মনে হয়?" আবার নিজেই বলেন: "আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। গদাধর স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবো। বাবা স্বপ্নে বলেন, 'ঠাকুর! আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন করে আপনার সেবা করবো? গদাধর বলেন, তা হ'য়ে যাবে"। কালীপ্রসাদ জানলেন গুরু তাঁর পূর্ণ অবতার, সত্যিই প্রেম ভক্তির শিক্ষা অতুল প্রেমের মধ্য দিয়ে শেখাবার জন্তই পৃথিবীর গ্লানি মেনে নিয়েছেন। নিজেকে ধন্ত ব'লে মনে করেন তিনি। তাঁর পবিত্র সাহচর্য, তাঁর অসীম স্নেহ, গভীর করুণা লাভ করতে পেরেছেন যে জীবনে, সে জীবন তুচ্ছ নয়। আত্মবিশ্বাস আর আচার্যের প্রতি গভীর নির্ভরতাকে পাথেয় ক'রে এগিয়ে চলেন কালী-প্রসাদ জীবনের নব উন্মেষের পথে, ধীর, দৃঢ় পায়ে কালের তালে তালে।

জীব ও ব্রহ্ম

শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, অর্থাৎ জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম" ব'লতে আমরা কি বুঝি? 'বৃহত্বাৎ ব্রহ্মেতি'—যার চেয়ে বড় কিছু নেই। তিনি সর্বব্যাপক, দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। তিনি অনাদি, অনন্ত, অসীম; বাক্য ও মনের অগোচর: "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"—(কঠ, ৬।১২)। সাধারণতঃ বস্তুর নির্দেশ করা হয় রূপ ও গুণকে ধরে, কিন্তু নির্গুণ বস্তুর নির্দেশ তো সম্ভবপর নয়। তাই বাস্তাল ব্রহ্ম বিষয়ে বাধ্ব ঋষিকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলে, ঋষি মৌন অবলম্বন ক'রে ব্রহ্ম-নির্দেশ করেছিলেন (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ৩।২।১৭)।

উপনিষৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে: "যত্তদ্ অদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্ অগোত্রমবর্ণমচক্ষুশ্রোত্রম্ তদপাণি-পাদম্" (মুণ্ডক ১।৬)—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, যার চক্ষু নাই, কর্ণনাই, হস্ত নাই ও পদ নাই, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে অবস্থান ক'রে সর্বব্যাপক ব্রহ্মের চিন্তা করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারের অপরাপর বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও আত্মার যে আকার নাই, তিনি 'সর্বব্যাপী' এ' বিষয়ে সকলে এক মত। যেখানে কার্য-কারণভাব, সেখানেই কালের সম্বন্ধ এবং ক্রমানুভাবকতা ব্যতীত কার্য-কারণভাবও আবার থাকতে পারে না। মনের দ্বারা আমরা ক্রম বা পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করি, তাই দেশ, কাল ও নিমিত্ত মনের অন্তর্গত। মন মায়ারাজ্যের ভিতর, কিন্তু ব্রহ্ম মনের ধারণার অতীত, আর তাই স্বয়ং ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অধীন নন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর True Psychology গ্রন্থে বলেছেন: "The unchanging Reality cannot be many. It is one. It is beyond time and space. It is infinity". সুতরাং যে সত্তার পরিবর্তন নাই—নিত্য, তা এক, বহু নয়। তা' দেশ ও কালের অতীত, সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অসীম ও অনন্ত। আর জীবের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তা' প্রকৃত

স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। সসীম মনোমধ্যে 'চিৎ'-এর প্রতিবিম্বন থেকেই কালোপলব্ধি-রূপ 'অহং' অভিমানী পরিচ্ছিন্ন জীবভাবের অভিব্যক্তি হয়। জীবের জন্ম সম্বন্ধে কোনরূপ শ্রুতি নাই, বরং শ্রুতি জীবের নিত্যত্ব স্বীকারই করেছে :

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ,
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
(কঠ, ৪৭।১৮)

জীবের জন্ম-মৃত্যু নাই। সে দেহে লিপ্ত থাকে না। জন্ম-মৃত্যু দেহের ধর্ম। যার উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে। উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রের ছটি বিকার থাকে, যথা : জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, সমূলতা, অপক্ষয় (ক্ষীণতাপ্রাপ্তি) ও বিনাশ। কিন্তু আত্মার উক্ত ছয় প্রকার বিকার না থাকায়, তিনি নির্বিকার; সুতরাং দেহের ধ্বংসে আত্মার নাশ হয় না, আত্মা নিত্য ও অজ।

কঠোপনিষদে ৯৮।১২ শ্লোকে পাই :

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি—ইত্যাদি।

অর্থাৎ আত্মা বশী (সর্বনিয়ন্তা), ও সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ। তিনি এক হয়েও নিজের একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্যক ও মনুষ্যাদি ভেদে বহুপ্রকার করে থাকেন, ইত্যাদি। "একদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বেত, ৬।১১)—এক পরমাত্মাই সর্বভূতে জীবাত্মাস্বরূপে প্রচ্ছন্ন আছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে জীবের কার্য-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে ; সুতরাং জগৎ ও জীবাদি নিত্য বস্তু নয়, মায়াকল্পিত। পরমাত্মা বা ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, জীব ব্রহ্মের উপাধিভূত ব্যবহারিক আভাস। তবে শ্রুতিতে যে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় তা আত্মার জীবত্ব বা উপাধিবশতঃ। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন" (বৃহ—৩য় অঃ, ৭ম ব্রাঃ) এবং "সুখমহমস্বাপ্সম ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদি শ্রুতি থেকে বুঝা যায় যে, জীব জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দময় 'অহং' পদবাচ্য নিত্য উপলব্ধিতে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবের তিনটি অবস্থা। সৎস্বরূপ আত্মা এই অবস্থাত্রয়েরই সাক্ষী। যখন আত্মা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে স্থূল বিষয় অনুভব করেন তখন আত্মা দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় আকারে পরিণত হয় এবং এটিই জীবের জাগ্রত অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় জীবের মনের কার্য চলতে থাকে, সুতরাং আত্মার মনের বন্ধন থেকে যায়, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য না থাকায় জ্ঞানশক্তিবলে কামনার অনুরূপ বিষয়সকল ভোগ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় মনের বন্ধন থাকে না। আত্মা তখন সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে আনন্দময় রাজ্যে ব্রহ্মের

সঙ্গে একীভূত হ'য়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। তবে সুষুপ্তির আনন্দ সুষুপ্তির অবস্থার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, কারণ সুষুপ্তি ভেঙে গেলে অজ্ঞানের বীজ থাকায় জীবকে স্বপ্নরাজ্যের পথ দিয়ে বিষয়রাজ্যে উপনীত হ'তে হয়। সুতরাং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি : জীবের এই তিনটি অবস্থাতে আত্মার নিত্যরূপ সত্তার প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আত্মা নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ, তিনি উৎপত্তিমান নহে।

শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে বলেছে : "যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতি ত্বোয়েন জীবান্ বৎসর্জ্জকৃষ্যাম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে প্রসূতা ব্রহ্মশক্তিরূপিণী মায়া বা জীবচৈতন্যরূপিণী প্রকৃতি-জগতের প্রসূতি। সেই ব্রহ্মশক্তি থেকেই অচেতন পদার্থ ও চেতন জীবের উৎপত্তি হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাই : "সম্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" (৬।৮।৪) ইত্যাদি।—প্রজা বা জীবসমূহ ব্রহ্মোৎপন্ন ; কেননা চরাচর সমস্ত "সৎ" থেকে উৎপন্ন।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার ক'রলে আমরা পাই, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। পরমাত্মাই তার ঈক্ষণ দ্বারা এক থেকে বহু হলেন, অর্থাৎ জীব ও জগৎ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অনুস্যূত হ'লেন। গোপালতাপনীতে আমরা এই ভাবের উক্তি পাই : "পূর্ব্বমেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাৎ অব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহান্ মহতো বা অহঙ্কার তস্মাৎ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ-তন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি" ইত্যাদি ; অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, যাঁর থেকে সত্ত্বরজোতমোগুণময়ী অব্যক্ত প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), পঞ্চতন্মাত্র থেকে ভূতাদির উৎপত্তি হয়েছে, এবং সেই পঞ্চীকৃত ভূতাদি 'অক্ষর' জীবচৈতন্যকে উপাধি বা শরীর রূপে আবৃত করে। মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্যেরও উক্তি অনেকটা এই প্রকারের। তিনি বলেছেন অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় : মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-তন্মাত্রার উৎপত্তি। এখানে ভূতাদি উপাধি বা শরীররূপে আবৃত ; সুতরাং স্বয়ংসিদ্ধ নয় উপাধির নাশে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই থাকে, যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ। ঘটাকাশ উপাধিজনিত দুই বলে মনে হয় ; কিন্তু উপাধির বিলোপে ঘটাকাশ মহাকাশে লব্ধপ্রাপ্ত হওয়ার মতো জীব ও ব্রহ্মে অভেদ প্রতিপন্ন হয়।

প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তিই মুখ্যপ্রাণ (Divine Energy)। এই মুখ্যপ্রাণের বিক্ষেপে প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো চেতন জীব ও অচেতন পদার্থের উৎপত্তি হয় ; সুতরাং যা কিছু নাম ও রূপে বিদ্যমান সেই সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপ। নাম ও রূপ তাই ব্রহ্মের মায়িক প্রকাশ। মায়া বা অবিদ্যাই জীবভাবের মূল। যতক্ষণ এই জীবভাব, ততক্ষণই ভেদ, দিব্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে জীব ও ব্রহ্মের ভেদভাব বিদূরিত হয়। তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি হয়।

হিউয়েন-সাঙ্ ও প্রাচীন ভারত

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবনমোহন লাহিড়ী, এম. এ., বি. এল.

শীতপ্রধান বৈশালী নগর হইতে পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ গ্রীষ্মপ্রধান মগধ-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এই রাজ্যে উত্তম চাষবাসের ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। 'মহাশালি' ও 'সুগন্ধিকা' নামক উৎকৃষ্ট চাউল ধনীসম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবহার করিত। গ্রামাঞ্চলের নিম্নভূমিতে বর্ষাকালে জলপ্লাবন হেতু জনপদবাসীরা নৌকার সাহায্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন করিত। লোকেরা সৎ ও সরল স্বভাব-বিশিষ্ট ছিল ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। মগধ প্রদেশের ৫০টি সঙ্ঘারামই মহাযানপন্থীর ধর্মযাজকের দ্বারা পরিচালিত হইত। ১০টি হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও ছিল এবং তাহাতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা পূজা উপাসনা করিত।

গঙ্গানদীর দক্ষিণভাগে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হিউয়েন-সাঙ্ দেখিয়াছিলেন। ইহার প্রাচীন নাম ছিল কুসুমপুর এবং কিছুকাল পরে ইহাকে পাটলিপুত্র বলা হইত। বৌদ্ধদের পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, পূর্বকালে এইস্থানে 'পাটলিগাঁও' নামক একটি গ্রাম ছিল। সম্রাট অজাতশত্রু (যিনি ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন) বৃজিজাতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া এই গ্রামকে সুদৃঢ় ও বিস্তারিত করিয়াছিলেন। সম্রাট অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল এবং সম্রাট অশোক রাজগৃহ হইতে

পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয়ন পাটলিপুত্র নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যদিও মহাবংশে উদয়নকে অজাতশত্রুর পুত্র বলা হইয়াছে। সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র নগর রক্ষার জন্য তাহার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর ভ্রমণকালে প্রাচীন পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ, পরিখা, সঙ্ঘারাম ও মন্দিরাদি সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; কেবল ধ্বংসস্তূপের গণনার দ্বারা প্রাচীন প্রাচীরের অস্তিত্ব ও মন্দিরাদির সংখ্যা নির্ণয় করা যাইত। প্রাচীন পাটলিপুত্রে একটি বৃহৎ স্তূপের নিকট ভগবান বুদ্ধের উভয়পদচিহ্নসমন্বিত এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত ছিল। উভয় পদচিহ্নের মধ্যে চক্র, মৎস্য ও পুষ্পের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সম্রাট অশোক এই প্রস্তরখণ্ডকে ভক্তিসহকারে পূজার্চনা করিতেন। ইহার নিকটেই একটি 'বিহার' (মঠ) বর্তমান ছিল যাহার মধ্যে একটি প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভে নিম্নলিখিত খোদিত লিপি ছিল—"রাজা অশোক প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ জম্বুদ্বীপকে তিনবার বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন এবং তিনবারই তাঁহার অসংখ্য ধনরত্ন দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন—সেইজন্য ইহা শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে'।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পর্বতের উপর অনেকগুলি প্রস্তর-নির্মিত গৃহ বর্তমান ছিল। কথিত আছে যে, সম্রাট অশোক সেইগুলি নিজগুরু সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও অন্যান্য অর্হৎগণের বাসের জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে একটি প্রস্তর নির্মিত গম্বুজের ধ্বংসাবশেষ ছিল ও তাহার পার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী ছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, সেই পুষ্করিণীর জলে স্নান করিলে সর্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রাচীন নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে 'কুক্কুটারাম' নামক সঙ্ঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণকালে কুক্কুটারামের ধ্বংসাবশেষ ও সেই সঙ্ঘারামের প্রাচীর দেখিয়াছিলেন।

সেইকালে দাক্ষিণাত্যে নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক মতবাদের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দেব বোধিসত্ত্ব নামক তাঁহার এক উপযুক্ত শিষ্য ছিল। দেব বোধিসত্ত্ব হিন্দু দার্শনিকদিগকে তর্কে পরাস্ত করিবার পর বৌদ্ধ রাজা 'ঘণ্টাস্তূপ' স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধগণ হিন্দু দার্শনিকদিগের নিকট বৈশালীতে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় সমস্ত বৌদ্ধমঠে ঘণ্টাবাদ্য বন্ধ ছিল। দেব বোধিসত্ত্বের জয়লাভের পর সমস্ত বৌদ্ধমঠে পুনরায় ঘণ্টাবাদ্য আরম্ভ হয়।

'কুক্কুটারাম' সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার পর চৈনিক পরিব্রাজক 'তিলোদক' সঙ্ঘারাম দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহা 'নালন্দা' নগরীর ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। সেইকালে তিলোদকের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন প্রজাতন্ত্র নামক একজন সুপণ্ডিত ধর্মযাজক। প্রজাতন্ত্রের পর প্রজাচন্দ্র নামক আর একজন সর্বগুণশালী ধর্মযাজক মঠাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

'তিলোদক' সঙ্ঘারাম বিম্বিসর রাজার শেষ বংশধর নাগদাসক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। নাগদাসক নন্দবংশের নয়জন সম্রাটের পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারামে চারিটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ গম্বুজ ও কয়েকটি সিংহদরজা ছিল। এইখানে তৎকালে এক সহস্র মহাযানপন্থী ধর্মযাজকগণ বাস করিত। মধ্যভাগের সিংহদরজার সম্মুখস্থ পথের অপরদিকে অন্য তিনটি 'বিহার' অবস্থিত ছিল এবং প্রত্যেকটি কারুকার্যখচিত ছিল। ইহার একটিতে ভগবান বুদ্ধের ৩০ ফিট উচ্চ একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্তির বামভাগে 'তারা' বোধিসত্ত্ব ও দক্ষিণ ভাগে 'অবলোকিতেশ্বর' বোধিসত্ত্বের মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিব্বতীয়গণ সর্বপ্রথম 'তারা' দেবীর মূর্তি উপাসনা করিত; পরে তিনি 'যোগাচার' সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হইতেন।

'তিলোদক' সঙ্ঘারাম ও এই তিনটি বিহারের কিয়দ্দূরে একটি বৃহৎ শ্বাপদসঙ্কুল পর্বতমালা বিরাজিত ছিল। কথিত আছে যে, এই পর্বতে ঋষিগণ বাস করিতেন এবং ইহার চূড়া হইতে ভগবান তথাগত মগধদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি সঙ্ঘারাম ছিল। কথিত আছে যে, গুণমতি বোধিসত্ত্ব এইস্থানে হিন্দু দার্শনিকদিগকে দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ইহার নিকটেই হিউয়েন-সাঙ 'শীলভদ্রষষ্ঠ' দেখিয়াছিলেন। শীলভদ্র ছিলেন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, পরে তিনি ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইস্থান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহুদূর গমন করিয়া চৈনিক পরিব্রাজক নৈরঞ্জনা নদী (বর্তমান ফল্গু) পার হইয়া গয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই নগর কয়েকটি পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল ও ইহার জনসংখ্যা অধিক ছিল না। সেইখানে এক সহস্র ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেন এবং তাঁহারা কোনও প্রাচীন ঋষির বংশধর ছিলেন। রাজা ইঁহাদিগকে প্রজা বলিয়া গণ্য করিতেন না এবং ইঁহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ এই নগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূর গমন করিয়া গয়া পর্বতের উপরে অশোকরাজ নির্মিত একটি স্তূপ দেখিয়াছিলেন। এইস্থানে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার 'রত্নমেঘ' সূত্রগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। সেইকালে গয়া নগরকে ব্রহ্মগয়া বলা হইত এবং ইহা বুদ্ধগয়া হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। নিকটস্থ প্রাগ্‌বোধি পর্বত অতিক্রম করিয়া ভগবান বুদ্ধ বোধিদ্রুমের নিকট আসিয়াছিলেন। অশোকরাজ ভগবান তথাগতের সেই আগমনপথ অনেকগুলি স্তম্ভ ও স্তূপের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া গৌতমবুদ্ধ বোধিলাভ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ সেই বোধিবৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দেখিয়াছিলেন। প্রাচীরের ভিতরে ও বাহিরে বহুবিধ বৃক্ষ ও লতারাজির দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় সেই স্থানটি মনোরম উদ্যানে পরিণত হইয়াছিল। এই পুণ্যস্থান বেষ্টন করিয়া বহুসংখ্যক স্তূপ ও বিহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যভাগে বজ্রাসন

স্থাপিত ছিল। কথিত আছে যে, এইস্থানে ভদ্রকল্পের এক সহস্র বুদ্ধ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানকে বোধিমণ্ডও বলা হয়। বোধিবৃক্ষ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ৪০।৫০ ফিট উচ্চ ছিল ও এই পিপ্পলবৃক্ষমূলে ভগবান তথাগত 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভ দিবসে বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গ ও ভিক্ষু শ্রমণ ও অর্হৎগণ এবং ভক্তগণ সুগন্ধি জলের দ্বারা এই বৃক্ষকে সিঞ্চিত করিয়া বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনির সহিত রাত্রিকালে মশাল প্রজ্বলিত করেন।

হিউয়েন-সাঙ্ লিখিয়াছেন যে, অশোকরাজ সিংহাসন আরোহণকালে বৌদ্ধধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সম্বোধিবৃক্ষের শাখা ও পল্লব ছেদন করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃক্ষে নূতন শাখা ও পল্লব বাহির হইয়াছিল। এই ঘটনায় তাঁহার মনে গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় ও তিনি সেই বৃক্ষের রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ১০ ফিট উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক এই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বহু মঠ ও 'বিহার' ধ্বংস করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে মগধের রাজা পূর্ণবর্মা (সম্রাট অশোকের শেষ বংশধর) এই বৃক্ষমূলে এক সহস্র গাভীর দুগ্ধ সিঞ্চন করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা ও প্রার্থনা করিবার পর সেই স্থান হইতে একরাত্রেই নূতন শাখা ও পল্লব বাহির হইয়াছিল। পূর্ণবর্মা সেই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চতর প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং হিউয়েন-সাঙের সময় ২০ ফিট উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে ১৬০।১৭০ ফিট উচ্চ একটি নীলবর্ণের ইষ্টক নির্মিত 'বিহার' ছিল। ইহার দক্ষিণভাগে মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বের ও বামভাগে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের রৌপ্য নির্মিত ১০ ফিট উচ্চ মূর্তি স্থাপিত ছিল। কিন্তু এই বিহারের অভ্যন্তরে ভগবান বুদ্ধের কোনও মূর্তির কথা চৈনিক পরিব্রাজক উল্লেখ করেন নাই। তথাগত সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবার পর সাতদিন সাতরাত্রি বজ্রাসন হইতে উঠেন নাই। তাহার পর তিনি বোধিবৃক্ষের উত্তর দিকে ১০ পদ এবং পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে ১০ পদ বিচরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সেইকালে তাঁহার চরণ-চিহ্ন স্পর্শ করিয়া দিব্যসুগন্ধযুক্ত পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বোধি-বৃক্ষের পশ্চিম দিকে একটি বিহার ছিল ; তাহাতে ভগবান বুদ্ধের রত্নখচিত পিত্তল মূর্তি ছিল। বোধিবৃক্ষের উত্তরে অন্য এক বিহারেও বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপিত ছিল। বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ ভাগে অশোকরাজ নির্মিত একটি ১০০ ফিট উচ্চ স্তূপ ছিল। এইস্থানে গৌতম বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীতে স্নানান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। বোধিবৃক্ষের পূর্বভাগে চৈনিক পরিব্রাজক আরও দুইটি স্তূপ দেখিয়াছিলেন যেস্থলে মার-রাজ (মায়া) তথাগতকে সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান ও তাঁহাকে চক্রবর্তিন্ সম্রাট করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল। মার-রাজের এই প্রস্তাবে তথাগত অবিচলিত থাকায় মায়া-কন্যাগণ বহুবিধ কৌশলে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে বোধিসত্ত্বের অপরিসীম আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাহারা পরমা-

সুন্দরী যুবতী নারীর রূপ ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা নারীর রূপ গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার এই বৃহৎ মন্দির ও তৎসংক্রান্ত প্রাচীন কাহিনী ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বুদ্ধগয়া' নামক পুস্তকে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে বুদ্ধগয়ার বিরাট মন্দির চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এবং হিউয়েন-সাঙের মধ্যবর্তী যুগে নির্মিত হইয়াছিল।

বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি স্তূপ ছিল যেখানে ভগবান বুদ্ধ 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভের পর দুইটি মেষপালিকা কন্যাপ্রদত্ত পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্বোধি বৃক্ষের দক্ষিণে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান ছিল যাহাতে ভগবান বুদ্ধ 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভের পর স্নান করিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর পূর্বদিকে নির্জন অরণ্যমধ্যে একটি হ্রদ ছিল। কথিত আছে যে, মুচিলিন্দ নামক নাগ-রাজ এইস্থানে ভগবান বুদ্ধের মস্তকের উপরে তাঁহার অসংখ্য ফণা বিস্তারপূর্বক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নৈরঞ্জনা নদীর নিকটেই অন্য একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল যেস্থানে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার স্বর্গতঃ মাতা মায়াদেবীর জন্য ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, স্বর্গ হইতে মায়াদেবী ধরাধামে আসিয়া এই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইস্থানের নিকটেই উরুবিল্ব কাশ্যপ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং তাহাদের এক সহস্র অনুচরবর্গকে তথাগত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সম্বোধি বৃক্ষের উত্তরভাগে একটি 'মহাবোধি' সঙ্ঘারাম বর্তমান ছিল। কথিত আছে যে, সিংহলের রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত বহুমূল্য রত্নখচিত বুদ্ধমূর্তি বর্তমান ছিল। সেই সঙ্ঘারামে এক সহস্র শ্রমণ ও পুরোহিতগণ বাস করিত। তাহারা সকলেই মহাযান-পন্থী ছিল। সিংহল ও বহুদূরদেশাগত বৌদ্ধ শ্রমণেরা এই স্থানে পর্বোপলক্ষে আগমন করিতেন। এই সঙ্ঘারামের প্রস্তর-ফলকে খোদিত এক লিপি ছিল—তাহা এইরূপ : "উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র নির্বিচারে সমস্ত জীবকে সাহায্য করাই ধর্ম এবং দয়াই ধর্মের মূল। এই নীতিবাক্য পূর্বাপর সমস্ত সাধুবৃন্দ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য আমি (সিংহলরাজ) এই সঙ্ঘারাম নির্মাণ করাইয়াছি যাহাতে সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ ভারতবর্ষে স্বাধীন-ভাবে বসবাস করিয়া তথাকার সঙ্ঘের সহিত ভ্রাতৃভাবে অবস্থান করিতে পারে—তাহার সুযোগ দেওয়া হইল।"

বুদ্ধগয়া হইতে হিউয়েন-সাঙ্ গিরিব্রজ অর্থাৎ রাজগৃহ অভিমুখে গমন করিলেন।

ভারতের তীর্থদর্শনে : দিল্লী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৭৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর ইতিহাস বিশ্বসনীয়ভাবে পাওয়া যায়। তুমর বংশের রাজা অনঙ্গপালের রাজ্যাভিষেক উৎসব ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে তিনি এখানেই রাজত্ব করেন ; পরিশেষে তাঁহার বংশধরগণ কনৌজে যান। কিন্তু তথাকার রাজা চন্দ্রদেব তাহাদিগকে সেস্থান হইতে বিতাড়িত করেন। তারপর দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজধানীর চারিধারে উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করেন। কুতুবমীনারের আশে পাশে যত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সবই রাজা অনঙ্গপালের রাজধানীর চিহ্ন। অনঙ্গপালের রাজত্বের সময়ে লৌহস্তম্ভের উপর লেখা হইয়াছিল "সম্বৎ দিহলী ১১০৯ অনঙ্গপাল বহী" অর্থাৎ ইংরাজী ১০৫২ খৃষ্টাব্দে। তারপর প্রায় একশত বৎসর পরে তুমরবংশের শেষ রাজা তৃতীয় অনঙ্গপালের শাসন সময়ে অজমেরের রাজা বিশালদেব চৌহান দিল্লী জয় করেন। এই বিজয়ী রাজা অনঙ্গপালকে একেবারে সর্বহারা না করিয়া তাঁহাকে একটি ছোট রাজত্ব প্রদান করিয়া নিজের অধীনে রাখেন এবং তাঁহার বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলেই পৃথ্বীরাজ চৌহানের জন্ম হয়। পৃথ্বীরাজই ভারতের হিন্দু স্বতন্ত্রতা রক্ষার শেষ রাজা ছিলেন। তিনি দিল্লীতে "রায়পিথৌরা" নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, এবং অনঙ্গপালের নির্মিত দুর্গপ্রাচীরের পার্শ্বে অন্য আরো একটি দুর্গ এবং তাহার চারিধারে উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করান, এবং এরূপ সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেন, যাহাতে কোনও শত্রু সহজে দিল্লী জয় করিতে না পারে। কিন্তু হায়! ভারতের স্বাধীনতার

উপর কালের করাল দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পৃথ্বীরাজের অজেয় দুর্গ ও তাহার সুদৃঢ় প্রাচীর কোনও কাজেই লাগিল না। ভারতের স্বাধীনতা পৃথ্বীরাজের শাসন সময়েই লুপ্ত হইল। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ বিপুল বিক্রমে তাহার প্রতিরোধ করেন, এবং স্থানেশ্বরের যুদ্ধে ঘোরীকে পরাভূত করেন। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে মোহাম্মদ ঘোরী দুর্বার বলে পুনরায় দিল্লীনগরী আক্রমণ করেন, এবং অন্যান্য দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হিন্দু রাজাদের সহায়তায় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করেন ও দিল্লী নিজের হস্তগত করেন। দিল্লীর হিন্দুরাজত্ব এখানেই নিঃশেষ হইল এবং ভারতের মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হইল।

মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবীণ সেনাপতি কুতুবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনের অধিপতি হইলেন। ইনি গোলাম্ অর্থাৎ দাস ছিলেন বলিয়া ইহার বংশধরগণ গোলাম বংশ বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমান দিল্লী সহরের যে ভাগকে পুরাতন দিল্লী বলা হয়, সেখানে কুতুবুদ্দীনের নির্মিত একখানি পুরাতন মসজিদ এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। বিশ্ববিখ্যাত "কুতুবমীনার" বিজয়স্তম্ভ বাদশাহ কুতুবুদ্দীনেরই অতুলকীর্তি। কেহ কেহ বলেন, রাজা পৃথ্বীরাজ এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন। রাণী সংযুক্তা ইহার উপর হইতে যমুনা দর্শন করিতেন। পরে কুতুবুদ্দীন এই স্তম্ভকে আরো উচ্চ করেন এবং তাহা সম্পূর্ণ নির্মাণ করিয়া নিজের নামেই স্তম্ভের নামকরণ করেন। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে খিলজী ও তুগলক্ বংশের বাদশাহেরা রাজত্ব করেন। তুগলক বংশের গিয়াসুদ্দীন তুগলক দিল্লী সহরের পূর্বদিকে চার মাইল দূরে একটি উচ্চ স্থানের উপরে "তুগলকাবাদ" নামে রাজধানী নির্মাণ করান। এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্তমানে সেখানে কোনও লোকালয় নাই। এই বংশেরই অন্য বাদশাহ মোহাম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে নিজ রাজধানী দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে প্রতিষ্ঠা করিতে তিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন তাঁহার শাসন সময়েই ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে নরপিশাচ তৈমুরলঙ্ দিল্লী আক্রমণ করেন এবং পনের দিন পর্যন্ত ক্রমাগত লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া দিল্লী সহরকে রক্তরঞ্জিত ও মহাশ্মশান সদৃশ করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যান। সেই ভয়াবহ দৃশ্য ও অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভারত আজও পর্যন্ত ভুলিতে পারে নাই।

অপর এক বাদশাহ ফিরোজশাহ তুগলক্ দিল্লী হইতে নিজ রাজধানী অন্যত্র স্থাপন করেন ও তাহার নামকরণ করেন ফিরোজাবাদ। বর্তমানে সেই সহরের ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হুমায়ুন বাদশাহের সমাধির সন্নিধানে বিদ্যমান আছে। এই বিধ্বস্ত প্রাসাদের দক্ষিণ দরজার নিকটে সম্রাট অশোক-নির্মিত বিজয় স্তম্ভ আছে। তাহার উপরে পালি ভাষায় অশোকের শিলালেখ আছে। স্তম্ভটির উচ্চতা ৪২ ফিট এবং ইহা খৃষ্টপূর্ব ৩০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহাকে এখন "কীরোজশা হকীলাট"

বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বাদশাহ ফীরোজশাহ এই স্তম্ভ যমুনাতীরস্থ ফিরোজবাদ নামক স্থান হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। ইহা সত্য হইলে এই বিজয়-স্তম্ভ দ্বারা ফীরোজশাহের রাজধানীর সঠিক স্থান নির্ণয় করা অসুবিধাজনক।

ফীরোজশাহের পর কিছুদিন করিয়া দিল্লীতে সৈয়দবংশ ও লোদীবংশ রাজত্ব করেন। এই সময় তাঁহারা দিল্লী হইতে রাজধানী আগরা সহরে স্থানান্তরিত করেন। লোদীবংশের শেষ বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর সহিত ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরের সঙ্গে বিখ্যাত পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়। বাবর বিজয়ী হইয়া দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাদশাহ বাবরও নিজ রাজধানী আগরাতেই রাখেন, এবং তিনি সেখানেই বাস করিতেন। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হন, এবং তিনি দিল্লীতেই পুনঃ রাজধানী স্থাপন করেন ও ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীন ভূমিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই দুর্গ আজও ঐস্থানে বিদ্যমান এবং তাহা দিল্লীর "পুরাণাকিলা" নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য শেরশাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি দিল্লী সহরের চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং সহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য স্থানে স্থানে কয়েকটি ফাটক রাখেন। সেই সব ফাটকের মধ্যে "লালদরওয়াজা" নামক ফাটক এখনও পর্যন্ত রহিয়াছে।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সলীম দিল্লীর বাদশাহ হন, এবং তিনিও "সলীমগড়" নামক দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সময়ে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিল্লীতে হুমায়ুন বাদশাহের সমাধিস্থান অতি প্রসিদ্ধ ও শিল্পকলাপূর্ণ। হুমায়ুনের পর, মোগল সম্রাটগণের মধ্যে যিনি সুপ্রসিদ্ধ সেই আকবর-শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। ইনি আগরা, অজমের ও লাহোর প্রভৃতি সহরে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন; সেজন্য দিল্লীতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোনও কীর্তি নাই। আকবরের পুত্র জহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ হইয়া পিতার ন্যায় আগরা প্রভৃতি সহরেই বেশীর ভাগ বাস করিতেন; ইহাতে তাঁহার শাসনকালেও দিল্লীর খ্যাতি বৃদ্ধি পায় নাই। তৎপরে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের পর বাদশাহ শাহজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি দিল্লী নগরীর অপূর্ব শোভা বর্ধন করেন। এই বাদশাহের সুন্দর ও শিল্পকলাপূর্ণ ভবনাদি নির্মাণ করিবার বিলক্ষণ অভিরুচি ছিল। সেজন্য তিনি দিল্লীতে "শাহজাহানাবাদ" নামক এক নূতনসহরের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যেস্থানকে নূতন দিল্লী বলা হয়, সেইখানেই এই শাহজাহানাবাদ অবস্থিত ছিল। দিল্লীর বিখ্যাত 'লালকিলা' ও তন্মধ্যস্থ সুরম্য রাজপ্রাসাদসকল, জুম্মা মসজিদ এবং যমুনা নদীর খাল প্রভৃতি নির্মাণ, এই বাদশাহের অতুল কীর্তি। বর্তমানে ঐ সমস্ত স্থানই দিল্লীর প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান বলিয়া গণ্য হয়। ইহা ব্যতীত আগরাতে নিজ প্রিয়তমা বেগমের স্মরণার্থ অপূর্ব শিল্পকলাপূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত "তাজমহল" বাদশাহ

শাহজাহানের অতুল কীর্তি। বহুমণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ-নির্মিত প্রসিদ্ধ 'ময়ূর-সিংহাসন' প্রস্তুত করাইয়া তিনি স্বীয় অতুল বৈভবের পরিচয় বিশ্বজগতে দিয়া গিয়াছেন।

শাহজাহানের পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ছলে বলে কৌশলে দিল্লীর অধিপতি হন। সমগ্র ভারত ভূমিতে স্বীয় মুসলমানধর্ম প্রচারের লালসায় হিন্দুজাতির উপর তাঁহার নানারূপ অত্যাচার, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি সকলের ধ্বংস আর, সকলের উপর তাঁহার ঘোর অবিশ্বাস—এই সব কারণে তাঁহার প্রজাসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ইহার শাসনকালেই সুদৃঢ় মোগল রাজত্বের পতন আরম্ভ হয়। জীবনের অধিকাংশ ভাগই প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে ইনি অতিবাহিত করেন; সেজন্য তিনি দিল্লীর বৈভব কিছুমাত্রই বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার পর মোগল বংশের কয়েকজন "নামমাত্র" দিল্লীর বাদশাহ হন। এই সময়েই মহারাষ্ট্র-প্রধান বালাজী বিশ্বনাথ পেশবা দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং তদানীন্তন বাদশাহের নিকট বাৎসরিক কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নরপিশাচ ইরাণের বাদশাহ নাদিরশাহ দিল্লীর অতুল বৈভব লুণ্ঠন করিতে আসেন। প্রায় ৬৮ দিন ধরিয়া দিল্লীবাসী ধনী বণিকদিগের ধনসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ও বহু নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, নাদিরশাহ দিল্লী হইতে প্রায় দশ কোটী টাকা মূল্যের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান

দিল্লীর বাদশাহকে ক্ষীণবল দেখিয়া, পুনরায় প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণোদ্ধার করিয়া সেই পবিত্র স্থানে পুনঃ হিন্দুরাজ্যের স্থাপন করিবার ইচ্ছায়, দিল্লীর সিংহাসনের উপর মহারাষ্ট্রীয় বীরদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু বিনাযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকটে পরাভব স্বীকার করা বা দিল্লীর গৌরবশালী সিংহাসন ত্যাগ করা তৎকালীন বাদশাহের অভিপ্রেত ছিল না। সেজন্য তিনি আহমদশাহ দুরানীর সহায়তায় পানিপথের রণস্থলে মহারাষ্ট্র-বীরগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্বের জন্য যেরূপ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ দিল্লীর সিংহাসন লইয়া পানিপথেও এই যুদ্ধ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পূর্ণ পরাভব হয়। যুদ্ধে অপরিমিত জন-ক্ষতি হওয়ায় জন্য মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ কিছুদিনের জন্য উৎসাহহীন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু "কর্তিত বৃক্ষ যেরূপ সজোরে পুনর্বার বর্ধিত হয়" সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ কিছুদিন পর পুনরায় বিপুলবিক্রমে দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং দিল্লীর বাদশাহ শাহআলমকে পরাজিত করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রপ্রস্থে হিন্দু সাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী পুনরায় উড্ডীন করেন।

বুদ্ধ

শ্রীহাসিরাশি দেবী

কথা কও হে নীরব! কেন আজও ও দুটি অধরে,
যুগান্তের হাসি খেলা করে।
কেন আজও নিমিল নয়ন,
জীবনের প্রাণ-যজ্ঞে হ'লো না—হ'লো না উন্মোচন!

কতকাল চ'লে গেল? কতদিন, আরও কত রাত
নিয়ে এল মধ্যাহ্ন, প্রভাত,
দাঁড়াইল সায়াহ্ন প্রহরী,
তবু তুমি দাঁড়ালে না ঐ ধ্যানাসন ত্যাগ করি!

আজ বল, কতকাল আগে,
রাজ-রথ-চক্র পথে উড়াইল বৈরাগ্যের ধূলি,
বল, বল, কত যুগ আগে,
বিলাস-ব্যসন-মদ-মত্ত-মন উঠিল আকুলি'
মুক্তিপণ লাগি,
কত অন্ধকার নিশি জাগিয়া একাকী
অন্তরের গুহা-মাঝে। নিরুদ্ধ ক্রন্দন শুধু তার,
অসহায় আর্তনাদে ফিরে ফিরে এল বারবার—
"মুক্তি চাই। মুক্তি চাই সহস্র এ নাগপাশ ছিঁড়ে।"

রাজা হ'লো মহা ভিক্ষু, হাতে নিল ভিক্ষাপাত্রটিরে।
তারপর,—
কত কাল কালান্তের সুদীর্ঘ প্রহর-
গুলি একে একে আসে আর যায়,—
তুমি তবু ব'সে আছ নিশ্চল, আপন মহিমায়।

কথা কও হে নীরব। ভাক' ধরি জন্মান্তের নাম,
বল, "তুমি ডেকেছিলে,—
তাই আমি এসেছিলাম।"

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

(Robert Louis Stevenson, 1850-1894)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

যে-জীবনটি বাস্‌ছি ভালো, দাও তা আমার প্রতি,
পরিত্যক্ত রইলো বেজন দাও যেতে মোর পাশে,
দাও গো আমার উর্ধ্বে আকাশ ঝল্‌মলে-রূপ অতি,
একটি সরু পন্থা আঁধার দাও এ-অধীন দাসে।
স্বোপের ভেতর শয্যা থাকুক, দেখুক তারাগুলি,
নদীর জলেই ভিজিয়ে নিতে চাইগো খাবার রুটি,
আমার মতো মানুষের এই জীবন খোলাখুলি,
যাবৎ জীবন এই জীবনই চাইছি মোটামুটি।

পড়ুক এসে হঠাৎ-দুঃখ আজ্‌কে কিম্বা কাল,
আমার ওপর ঘটবে যা তা ঘটুক্ এখন তবে,
চারদিকে মোর দেখতে দাও এ-ধরণীর মুখ লাল,
সুবিস্তৃত রাস্তা আমার সামনে থাকুক্ তবে।
ধনৈশ্বর্য খোঁজ করিনে—কিম্বা আশা প্রীতি,
কিম্বা কোনো বন্ধুকে নয় জানতে আমার কভু;
যা কিছু খোঁজ করি সে ঐ উর্ধ্বে আকাশ নিতি,
নিম্নে আমার রাস্তাটাকে চাইছি সদাই তবু।

শরৎ এসে পড়বে যদি পড়ুক আমার 'পরে,
মাঠের ওপর ঘুরবো না হয় আমি ইতস্ততঃ,
গাছের ওপর থাকুক পাখী নেহাৎ চুপটি করে',
কাম্‌ড়াক নীল আঙুলগুলো পাকুক্ তারা যত।
শান্ত সম সফেদ্-সাদা তুষার-ঢাকা মাঠ—
চুলোর পাশের আরামের ঠাঁই গরম থাকে কত—
দম্‌বো নাকো দেখে' কভু শরৎ ঋতুর ঠাট,
শীত্‌কে কভু করবো না ভয়, চাইনে হতে নত!

পড়ুক এসে হঠাৎ-দুঃখ আজকে কিম্বা কাল,
আমার ওপর ঘটবে যা তা ঘটুক এখন তবে,
চারদিকে মোর দেখতে দাও এ-ধরণীর মুখ লাল,
সুবিস্তৃত রাস্তা আমার সামনে থাকুক্ তবে।
ধনৈশ্বর্য চাইনে আমি, কিম্বা আশা প্রীতি,
কিম্বা কোনো বন্ধুকে নয় জানতে আমার কভু;
যা কিছু চাই সে ঐ বটে উর্ধ্বে আকাশ নিতি,
নিম্নে আমার রাস্তাটাকে চাইছি সদাই তবু।

॥ जगत्कल्याणं ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

RESOLUTION—II.

Mr. N. N. Ghose, in proposing the second Resolution said :

Rajah Peary Mohun Mookerjee and gentlemen, the Resolution which I have been asked to move is in the following terms : "That this meeting tenders its best thanks to Dr. J. H. Barrows, the Chairman, and Mr. Merwin-Marie Snell, the President of the Scientific Section, of the Parliament of Religions at Chicago, and to the American people generally, for the cordial and sympathetic reception they have accorded to Swami Vivekananda". I think, you will agree with me, on a very slight reflection, that this Resolution which offers thanks to certain individual American gentlemen and to the American people generally, is not by any means of a merely formal or ceremonial character. Swami Vivekananda has distinguished himself by speeches which we can read, appreciate and admire. It seems only natural that he should be entitled to our gratitude. At the same time, the success of any worker, whether he is a speaker or a writer, a discoverer, a thinker or a man of action, depends as much on the appreciation he gets from the community to

which his work is addressed, as on his own intrinsic merits. From the days of Socrates downwards, the instances have been numerous of great teachers whose teaching has not only not been appreciated by their contemporaries, but has been positively despised, resented and rebelled against, and has led to their persecution. Two factors, therefore, must always contribute to success, namely, first the intrinsic value of the work, and, second, the due appreciation of it by those to whom it is offered. No success could be more sudden or brilliant than Vivekananda's. Indeed, there is hardly anything more striking in the history of oratorical achievements. There was a Hindu monk, unknown to fame, addressing, in semi-oriental costume, an assembly, the majority of whom could hardly pronounce his name, upon a subject removed, as far as possible, from their thoughts and securing at once their applause and esteem. The merits of the speaker and the performance must have been great and surprising. But let us not forget that credit is at least equally due to those who appreciated him, encouraged him, found opportunities for his speaking, and gave him a patient and kind hearing. Vivekananda had gone to expound the principles of Hinduism, and if a people, professing a different religion, had received him with coldness, raised difficulties, technical or other, in the way of his speaking, and generally shown him disfavour, their conduct might have been excused as being under the circumstances only natural. But very different was the treatment they actually gave him. I am informed that the delegates had, as a rule, been invited. Vivekananda had not been invited, and therefore it would have been a very easy thing to exclude him on technical grounds from speaking at the Parliament. But Dr. Barrows, by a special act of kindness, waived all technical objections, introduced him to the audience, and permitted him to speak. Vivekananda did not say altogether fine and smooth things about Christianity, but gave occasionally hard knocks. His audience, at any rate, the American section of it, nevertheless gave him an indulgent hearing, and were warm in their acknowledgment of its merits. It is in no conventional sense, therefore, and not as a mere formality, that our thanks are due to the President of the Parliament of Religions and to the American people, for the recognition they have given to our countryman and our representative. Vivekananda spoke with lucidity, a grace and a logical power which astonished and charmed

his audience ; but I am not sure, whom to admire the more, the speaker for his magnificent feat or the American people for their quick insight and ready appreciation. A triumph, more signal and more sudden, has scarcely been known in history. None of the great religious teachers of the world, Buddha, Jesus Christ, Mohammet or Confucius made converts by the hundred by a first attempt. But this Hindu preacher, this orange monk, as he has been called, dispelled, by one effort, some of the illusions of ages from the minds of hundreds of people, and roused them to some sense of the truths of a religion, which they had either never heard of, or must have always despised. And this is an age, not particularly distinguished for religious spirit. Vivekananda has been, however, you must remember, no single-speech Hamilton. His speech at the Parliament of Religions brought him into notice, but his work did not end there. In political slang, he has been often "heckled", and his answers to the questions of inquirers have been quick and effective. He has been invited to address many meetings and appears to have invariably justified expectations. Indeed, he seems to be a general favourite and he finds it difficult to meet all the engagements that are thrust on him. Consider, gentlemen, what kind of people it is that have thus received our gifted countryman. We know very little of America directly, she is so far removed from us. But we can know something of her, through Professor Bryce's monumental work on the American commonwealth. Professor Bryce is a historical scholar of established reputation, respected all over England, and may be trusted as an authority. He informs us that in the United States, Christianity, though it is not a State-supported religion, is truly a national religion. The Americans conceive that the religious character of a Government consists in nothing but the religious belief of the individual citizens, and the conformity of their conduct to that belief. They deem the general acceptance of Christianity to be one of the main sources of their national prosperity. They deem themselves to be a special object of divine favour. The influence of Christianity on the people, both as regards numbers and the education of those influenced, is greater than it is in Western Europe. I rely also on Professor Bryce for the assertion that, as regards veracity, temperance, the purity of domestic life, tenderness to children and to the weak, and general kindliness of behaviour, the native Americans stand rather higher than the English

or the Germans. Well, now it is a people like that, a people stepped in Christian tradition, Christian in doctrine, and Christian in life, that has given to Vivekananda a cordial and sympathetic reception. Their appreciation of him was instantaneous, electric. We would do well not only to thank the Americans, but to profit by their example. Their treatment of Vivekananda teaches us a lesson as to the way in which we should have to treat him or other workers like him that may appear before us on future occasions. This meeting is said to have been called to do honour to Vivekananda, and to the American people.

I am not in the secrets of those who have called it, but I think, I shall not be very far wrong, if I make a guess as to their motives. If I probed their hearts, I think, I should discover that this meeting was convened not merely to offer thanks to others, but also to wipe away our own shame and reproach. Vivekananda is a Bengali, he went to America as the representative of the Hindu religion, but we gave him no sort of recognition, and no sort of help. He was taken in hand by the people of the southern Presidency, men whose vernacular was different from his own. And now that, having gone to America, he has won his laurels, and can command respect wherever he goes, we come forward as worshippers of success, and honour ourselves under the pretence of honouring him. Well may he repudiate our admiration with scorn and contumely, as Dr. Johnson repudiated the Earl of Chesterfield's praise of his Dictionary. Here, indeed, we have to take a lesson from the Americans. We, as a people, be it said to our eternal discredit, have never exhibited a faculty for appreciating our own great men. It is not until a countryman of ours has gone to Oxford, London or New York, and won the applause of men of another complexion that we discover, we had a very hero in our midst. Let us learn from Vivekananda's reception in a distant land, and among a strange people, professing a different religion, not to be guilty of neglect of native worth in the future, as we have been in the past. Vivekananda's achievements in America, remarkable as they have been, I regard, however, rather as promises than as performances. His real work will have to be done in India.

(to be continued)

সংঘ-বার্তা

স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজের পরিভ্রমণ

মুসাবনীর পোস্টমাস্টার শ্রীযুত সুনীলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজী গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঠ হইতে রওনা হইয়াছিলেন ও ভক্তবৃন্দের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি মুসাবনী, ঘাটশীলা ও খড়্গপুরে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

যেখানে যে কয়দিন স্বামিজী ছিলেন সর্বত্রই স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট প্রত্যহ সকাল-বৈকালে সমবেত হইতেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, প্রভৃতির জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মুসাবনী ও ঘাটশীলায় কয়েকজন দীক্ষার্থীর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া স্বামিজী তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলে তাঁহারা প্রাণে পরমশান্তি লাভ করেন।

মুসাবনীতে স্বামিজীর আগমন উপলক্ষে সেখানকার দুর্গাবাড়ীতে একদিন এক ভক্ত সম্মেলন হয়। স্বামিজী ঐ সম্মিলনীতে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলেন এবং সংগীত-বিশারদ বীরেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয় কয়েকটী ভজন সংগীত গান করেন। বক্তৃতা ও গান শুনিয়া উপস্থিত সকল ভক্ত নরনারী পরম আনন্দ পাইয়াছিলেন।

স্বামিজীর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনী কথকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ আনন্দ প্রকাশ করেন।

কার্শিয়াং-এ বুদ্ধোৎসব

বিগত ২০শে বৈশাখ, ইংরাজী ৩রা মে, শনিবার কার্শিয়াং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা কেন্দ্রে ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব তিথি-উৎসব স্থানীয় বৃদ্ধভিক্ষুগণের সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে।

এতদুপলক্ষে সেবাকেন্দ্র-পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের একটী শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ঐদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তমণ্ডলী আশ্রমে কীর্তন গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

(শনিবার, সন্ধ্যা ৭৪০)

৫ই জুলাই, ১৯৫৮ :

বিষয় : **বৈদিক সংস্কৃতি**

বক্তা : ডাঃ শ্রীমতিলাল দাস, এম. এ., বি. এল., পি. এস. ডি.

১২শে জুলাই :

বিষয় : **বাঙ্গালার বাউল**

বক্তা : অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ.,

২৬শে জুলাই :

বিষয় : **উপনিষদের বাণী**

বক্তা : শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তভূষণ।

প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার :

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

বক্তা : পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,
সাংখ্য বেদান্ত-ভক্তিতীর্থ।

প্রতি বুধবার :

কঠ-উপনিষদ (শঙ্করভাষ্যসহ)

বক্তা : শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ,
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

প্রতি রবিবার :

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা :

সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি শনিবার, বৈকাল ৩টায় :

রামনাম-কীর্তন :

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা • স্বামী অভেদানন্দ

শ্রাবণ ১৩৬৫
২০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বামী অভেদানন্দ রচিত গ্রন্থাবলী

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্যতম YOGO PSYCHOLOGY বাহির হইতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল !

SWAMI ABHEDANANDA IN AMERICA

By

SISTER SHIVANI (Mrs. Mary Lepage)

A unique Volume of Swami Abhedananda's activities in the West by one of his devoted and able American disciples.

Many new incidents of Swami Abhedananda's eventful life and glorious career in America for a quarter of a century are graphically described. This volume also throws much light upon the history of the Vedanta movement in the West.

With a number of original photographs.

Demy 8 vo. 330 Pages Rs. 6·50

For Subscribers of Visvavani Rs. 6·00

স্বামী অভেদানন্দ

(কালী-তপস্বী)

এই প্রামাণিক জীবনীটি নিঃশেষিত হওয়ার পর বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। কিছু বর্দ্ধিত আকারে পুনরায় শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

সারদামণি

শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমা সারদামণির পুণ্যজীবন কথা। ঐ কথা সব সময়েই সুমধুর।

মূল্য : টা. ১·২৫ বিশ্ববাণীর গ্রাহক পক্ষে এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, (পুস্তক-প্রচার-বিভাগ)
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

শ্রাবণ, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। ঔদার্য ও সাবলো শ্রীরামকৃষ্ণ	... ২৬৩	স্বামী ভূতানন্দ
২। পরমারাধ্য শ্রীমা'র সহিত কথোপকথন	... ২৬৯	শ্রীশান্তিকুমার মিত্র
৩। উপনিষদের শিক্ষা	.... ২৫৭	শ্রীবিধুভূষণ জ্যোতিষ-তীর্থ
৪। সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা	... ২৬০	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি., ডি. এস ই.
৫। ভারতীয় রসায়ন	... ২৬১	ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., ডি.এস.সি.
৬। বুদ্ধদেবের অন্তিম ভোজন	... ২৭০	শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী, এম.এ., পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ
৭। প্রাচীন ও নবীন সংগীত	... ২৭৪	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীত শাস্ত্রী
৮। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-প্রীতি	.... ২৭৮	শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম.এ., এইচ ডিপ. এড্ (ডাবলিন)

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	প্রাপ্তি বহস্য (কবিতা)	২৮১	শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
১০।	ফিরে এসো (কবিতা)	২৮১	শ্রীঅলোককুমার সেন
১১।	তামসী-তপস্বিনী (কবিতা)	২৮৪	অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, এম. এ.
১২।	দান (কবিতা)	২৮৪	শ্রীকালীপদ কোঙার
১৩।	গ্রন্থ-সমালোচনা	২৮৫	
১৪।	সংকলন	২৮৬	
১৫।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	২৯০	

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

॥ এম. এ. ক্লাশের ॥

শিক্ষার্থীর উপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল রকম গ্রন্থ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গায়ে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ত্বকের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২৩৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বিশ্ববাণী

শ্রাবণ, ১৩৬৫

সম্পাদক :
স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :
স্বামী দুর্গানন্দ
অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ
শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত
ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :
শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
শ্রীদেবকুমার বসু
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :
ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

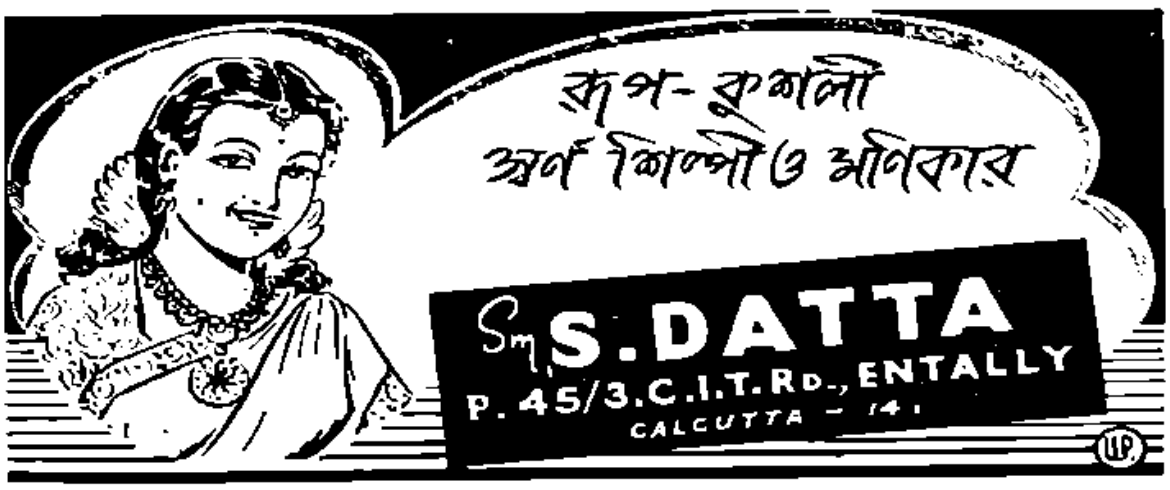

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

STUDENTS' COMMON-ROOM

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৬৫

ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

(তৃতীয় পর্যায়)

বাল্যকালে গদাধরের ভাবপ্রবণতার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কৈশোরেও অনুরূপ দুইটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। কামারপুকুরের অনতিদূরে আনুড়গ্রামে আগতা দেবী বিশালাক্ষীমাতার পূজা দিবার অভিপ্রায়ে একদিন গ্রামের কতকগুলি প্রতিবেশী রমণীকে যাইতে দেখিয়া বালক গদাধর তাহাদের সহিত যাইতে জিদ ধরিল এবং ঐ সকল স্ত্রীলোক তাঁহাকে কিছুতে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রমণি দেবীকে জানাইতে গেলেন এবং তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাতাও তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া পাঠাইতে সম্মত হইলেন। গদাধর মায়ের আদেশ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীযাত্রীগণের সহিত যাত্রা করিল। পথ চলিতে চলিতে যাত্রীগণ বিশালাক্ষীমাতার মাহাত্ম্যই আলোচনা করিতেছিলেন, গদাধরও তাহা শ্রবণ করিতে করিতে সঙ্গে যাইতেছিল। গদাধর কখনও বা আপন মনে দেবদেবীর ভক্তিমূলক গান গাহিতে গাহিতে চলিতে-ছিল। তাঁহার মধুর সুরের গানগুলি শুনিয়া যাত্রীগণ আনন্দ পাইতেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, মাঠ পার হইয়া গ্রামে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার গান হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল ও কথাবার্তা বন্ধ হইল। সঙ্গের যাত্রীগণ মহাচিন্তায় পতিত হইলেন, হঠাৎ বালকের কি হইল বুঝিতে পারিলেন না, সর্দিগর্মী হইয়াছে ভাবিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া চোখে মুখে ও মাথায় দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই গদাধরের সংজ্ঞা হইল না। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নময়ী নামে একজন বর্ষীয়সী মহিলার মনে হইল, বিশ্বাসী সরল বালকের উপর মা বিশালাক্ষী দেবীর ভর হয় নাই তো? এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ভক্তিভরে

দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল: "মা বিশালাক্ষী প্রসন্না হও, মা—রক্ষা কর, মা—মুখ তুলে চাও, মা—অকূলে কূল দাও!" আশ্চর্যের বিষয়, রমণীদিগের এইরূপ প্রার্থনায় দেবীর নাম উচ্চারণ হইতে গদাধরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং অল্পক্ষণ সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল ও অবিলম্বে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিল; শরীরের কোন গ্লানি বা অবসন্নতা পর্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। গদাধরের বয়স তখন মাত্র অষ্টম বর্ষ। এই ঘটনায় সেদিন ধর্মদাস লাহার পবিত্রস্বভাবা ভক্তিমতী কন্যা প্রসন্নময়ী বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পরবর্তী ঘটনা। একবার শিবরাত্র ব্রত উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীরা রাত্রি-জাগরণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় পাইনদের বাটীতে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অভিনয় হইবে শিবের মহিমা বিষয়ক, কিন্তু যে লোকটি শিব সাজিত সে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহাবিভ্রাট ঘটিল, যাত্রাগান বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এখন একজন শিব সাজিবার লোক পাইলেও চলিতে পারে এইরূপ চিন্তা করিয়া গদাইকে শিব সাজাইবার জন্য বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিল। গদাই বালক হইলেও দেখিতে বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা, তাহাকে শিব সাজাইলে দেখিতে ভালই হইবে। সেই কথা গদাধরকে বলা হইল। সরল বালক কিন্তু তাহাতে আপত্তি না করিয়া সম্মত হইল এবং সাজঘরে প্রবেশ করিয়া শিবের সাজে সজ্জিত হইল। সাজঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, ডাক আসিলেই তাহাকে আসরে যাইতে হইবে; কিন্তু যখন ডাক আসিল তখন সে শিবের চিন্তা করিতে করিতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। গদাধরের কয়েকজন বয়স্য আসিয়া যখন তাহাকে আসরে যাইবার জন্য আহ্বান করিল, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও কেমন উন্মনা ভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। শিবের ভাবে বিভোর অন্তর্মুখী মন, বাহ্যজ্ঞান নাই, নির্নিমেষ দৃষ্টি, অধর কোণে ঈষৎ হাস্যরেখা। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। পল্লীবাসিনীরা এই অপার্থিব ভাবাবেশ দর্শন করিয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিল এবং পল্লীগ্রামের প্রথামত গ্রামবাসিরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই মনে করিল গদাইয়ের শরীরে শিবের আবির্ভাব হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কারণ গদাই কথাও বলিতেছে না, নড়াচড়াও করিতেছে না দেখিয়া বয়োবৃদ্ধেরা কাছে গিয়া দেখেন যে গদাধরের কোন হুঁস নাই। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন ও চোখেমুখে জল দিয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সংজ্ঞালাভ হইল না। অবশেষে কয়েকজন মিলিয়া গদাধরকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। সে রাত্রে তাহার সংজ্ঞা হইল না, পরদিন প্রাতে সজ্ঞানে নিদ্রোত্থিতের মতো জাগরিত হইল। ইহাতে তাহার শরীর ও মনের কিছু গ্লানি বা হানি হয় নাই, সে কিন্তু বেশ প্রফুল্লই ছিল। এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে হইতে

লাগিল। ধ্যান করিবার কালে ও দেবদেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে এখন হইতে সে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার মন অল্প বা অধিকক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইত।

সন ১২৭৯ সালের আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে ক্ষুদিরাম, ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে মেদিনীপুর-জেলার সেলামপুর-গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ও জ্বরে শয্যাশায়ী হন। নির্বিঘ্নে তিনদিন দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন ও বিজয়ায় প্রতিমা বিসর্জনাদির পর রাত্রে সজ্ঞানে রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই দুঃসংবাদ যখন কামারপুকুরে পৌঁছিল, তখন তাঁহার বাটীতে শোকের রোল উঠিল। গ্রামের সকলে সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল ও সমবেদনায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ যাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল তাঁহারা শোকে মুহ্যমান হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার পিতৃহীন হইয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও নিজেকে অসহায় ভাবিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। সংসারের চিন্তায় তিনি প্রমাদ গণিলেন। শোকসন্তপ্তা জননী চন্দ্রাদেবী সংসারের এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার চিন্তায় ও রঘুবীরের সেবাদির চিন্তায় নিজেকে বিপন্না ভাবিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে মহাকষ্টের সঙ্গে দুঃখের দিনগুলি কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের যৎসামান্য আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া কাটাইতে হইবে। দেবসেবা ও কনিষ্ঠ পুত্রকন্যা প্রভৃতির লালনপালন করিতে মহাকষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু চিন্তা করিলে কি হইবে, আর তো কিছু উপায় নাই? সাত বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর ও চারি বৎসরের কন্যা সর্বমঙ্গলার চিন্তা তাঁহাকে সংসারের দিকে আকর্ষণ করিল। বাধ্য হইয়া তিনি সকল কষ্টই বরণ করিয়া লইলেন। কিশোর বালক গদাধর মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও পিতার অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন হইতে কিছু শান্ত হইল এবং চিন্তাশীল ও নির্জনপ্রিয় হইয়াছিল। অনেক সময় মাতার কাছে থাকিয়া দেবসেবা ও গৃহকর্মাদিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ও আনন্দে রাখিতে যত্নবান হইল। কোন জিনিষের জন্য মায়ের কাছে আর অন্যায় আবদার করিত না, মায়ের প্রতি বালকের আচরণ এখন দিন দিন শান্তশিষ্টের মতই হইতে থাকিল। মাতার প্রতি তাঁহার কর্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হইল।

পিতৃবিয়োগের পর গদাধর কিছুদিন পাঠশালায় যাইতে পারে নাই। এখন আবার পূর্বের মতই পাঠশালায় গিয়া পড়াশুনায় মনোযোগী হইল। পুরাণের কথা শুনা, কোথাও যাত্রা-গান হইলে শ্রবণ করা এবং চিত্রাদি অঙ্কন ও দেবদেবীর মূর্তি গঠন করা এখন হইতে তাহার বেশী প্রিয় হইয়া উঠিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর গ্রামের জমিদার যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে সাধু-বৈরাগীরা অনেক সময় এই পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গ্রামে গিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। গদাধর সংসারের অনিত্যতা ইতঃপূর্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন

এবং পিতার মৃত্যুতে এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ও লাভ করিলেন। সাধু-বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কালযাপন করেন এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরম-শান্তিদানে কৃতার্থ করে, এ কথা জানিয়া বালক গদাধর সরল বিশ্বাসে সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশায় উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। সাধুদিগের রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করা, তাঁহাদের পানীয় জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ দিয়া ও গদাধরকে কাছে লইয়া সকলে মিলিত হইয়া ভোজ করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। যে সকল সাধু পান্থনিবাসে অধিক দিন বাস করিতেন তাঁহাদিগের সহিতই বালকের ঐভাবে মিশিবার সুবিধা হইত। গদাধরের বয়স তখন মাত্র অষ্টম বর্ষ।

গদাধর যে মাঝে মাঝে গিয়া ঐভাবে সাধুদের সহিত মিশিত একথা প্রথম প্রথম তাঁহার মাতা জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন কোন কোন দিন সাধুদের কাছে বেশীক্ষণ থাকিয়া ও ভোজনাদি করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইত না তখন মাতা জিজ্ঞাসা করিলে সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করিত। তাহার মাতা প্রথম প্রথম ইহাতে উদ্বিগ্ন হইতেন না, বরং কোন কোন দিন গদাধরের দ্বারা সাধুদের সেবার জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্যও পাঠাইতেন। কিন্তু বালক যখন কোন কোন দিন বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া বা তিলক ধারণ বা পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধুদিগের ন্যায় কৌপিন ও বহির্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া বলিতেন: 'মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন দেখ', তখন চন্দ্রাদেবীর মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না তো? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন শান্ত করিতে পারিল না, তখন সাধুদের নিকট আর কখনও যাইবে না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া জননীকে ঐ কথা বলিয়া নিশ্চিন্তা করিল ও শেষ বিদায় লইবার জন্য সাধুদের কাছে গিয়া সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিল: আর আমি এখানে আসিব না।

সাধুরা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন ও বালকের সহিত চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন: গদাধরকে ঐরূপে সঙ্গে লইবার সংকল্প তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ছাড়া ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করেন। তখন চন্দ্রাদেবীর মনে পূর্বাশঙ্কা বিদূরিত হইল এবং তিনি পূর্বের মত গদাধরকে তাঁহাদের

নিকট যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। বালকের সরলতার এখানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

বালক গদাধরের বয়ঃক্রম তখন নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। পিতৃহীন বালকের অগ্রজ রামকুমারই তখন অভিভাবক; সুতরাং তাঁহাকেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাতার সহিত সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রামকুমার উপনয়নের যাবতীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে গদাধর জিদ ধরিলেন যে উপনয়ন লইয়া প্রথমেই সে গ্রামবাসিনী কামার-কন্যা 'ধনী'র হস্তে ভিক্ষাগ্রহণ করিবে। রামকুমার তাহাতে আপত্তি করিলেন। তাঁহাদের বংশে এইরূপ প্রথা নাই, ব্রাহ্মণকন্যা ছাড়া অন্য জাতির হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করা চলিবে না। গদাধর তাহার উত্তরে বলিল, 'আমি অঙ্গীকার করিয়াছি; সুতরাং তাহা পালন না করিলে অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে, তাহাতে আমায় মিথ্যাবাদী হইতে হইবে। মিথ্যাবাদী যজ্ঞসূত্র লইয়া ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না'।

গদাধর যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন ঐ কামার-কন্যা ধনী সূতিকাগারে থাকিয়া তাঁহার মাতাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সন্তান প্রসব হইলে ধাত্রীর ন্যায় শিশুকে পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধাত্রীমাতাও বটে এবং শিশুর লালনপালন করিতে থাকিয়া তাঁহার যে মাতৃস্নেহের উদয় হইবে তাহাও বিচিত্র নহে। এই সকল কারণে তাঁহার অন্তরে ইচ্ছা ছিল যে, শিশু বড় হইলে যেন তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করে। তাই সময় বুঝিয়া 'ধনী' একদিন বালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন: তিনি যেন উপনয়ন-কালে তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে। উদারচেতা বালকও তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকার করে। দরিদ্রা ধনী বালকের কথায় বিশ্বাস করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ উপনয়নের অপেক্ষায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গদাধরের সেই আবদার রামকুমার খুব অন্যায় বলিয়া ভাবিলেন এবং নানারূপে বুঝাইয়া তাহাকে ঐ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি বিফল হইলেন। কর্মসম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এখন কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া রামকুমার তাঁহার পিতৃবন্ধু গ্রামবাসী ধর্মদাস লাহা মহাশয়ের যুক্তি লইবার জন্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি সকল বিষয় অবগত হইয়া একটা মীমাংসা করিবার উপায় স্থির করিয়া মধ্যস্থরূপে বলিলেন: দেখ রামকুমার, এইরূপ অনুষ্ঠান তোমাদের বংশে ইতঃপূর্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্ব্রাহ্মণের বংশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সেজন্য সমাজে নিন্দভাগী হইতে হইবে না। বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই'।

প্রবীন পিতৃবন্ধুর এই কথায় রামকুমার আর আপত্তি করিলেন না, যথাকালে উপনয়ন-কার্য সুসম্পন্ন হইল এবং উপনয়নান্তে গদাধরও তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপে মনোনিবেশ করিল। এরূপ ঘটনায় সরলতা ও উদারতার সহিত সত্যরক্ষার ভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ রমণীর পরিবর্তে সে সময়ে সংকীর্ণ সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া কর্মকার-জাতীয়া 'ধনী' নাম্নী স্ত্রীলোককে ভিক্ষামাতা-রূপে বরণ করা বড় কম আশ্চর্য বা কম উদারতার পরিচায়ক নহে। অপুত্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়া শূদ্রকন্যার দান গ্রহণ করা অসম্ভব হইলেও গদাধরের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কারণ সে যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছিল, কাহাকেও হীন বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। এজন্য গদাধরকেও সকলে সুহৃৎ বন্ধু প্রিয়সখা বা নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে করিত।

গদাধরের উপনয়ন কার্য সখাসময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এখন সে প্রফুল্লচিত্তে দেব-দেবীর নিত্যপূজা শিখিয়া লইল এবং গৃহদেবতা ৺রঘুবীর ও শ্রীশ্রীশীতলামাতার পূজা করিবার অধিকার পাইয়া নিজেকে ধন্য ভাবিয়া নবানুরাগে স্বয়ং পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার ভক্তি বিশ্বাসও ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। ইতঃপূর্বে গদাধর শুনিয়াছিল—'তাহাদের আশ্রিত গৃহদেবতা ৺রঘুবীর তাহার পিতাকে কিরূপে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আনিয়া বাটীতে স্থাপিত করিতে বলিয়াছিলেন এবং ৺রঘুবীর বিগ্রহের শুভাগমনে তাহাদের 'লক্ষীজলা' নামক সামান্য একখণ্ড জমিতে কিরূপে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া সংসারের অন্নাভাব দূরীভূত হইয়াছিল, এমন কি উহাদ্বারা অতিথি অভ্যাগতের আতিথেয়তাও সচ্ছলে রক্ষিত হইত।

পরমারাধ্য 'শ্রীম'র সহিত কথোপকথন

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

জনৈক অবিবাহিত আমেরিকান ভক্ত স্বদেশ হইতে ভারতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইনি ডাক্তার। স্বদেশেই সাধন ভজন করেন, সেখানেই স্বামিজীর কৃপালাভ করেন। তখন হইতেই ঠাকুরের ত্যাগী ও অন্যান্য সন্তানদের দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই।

আমেরিকান ভক্ত। I see St. John here, (আমি সেণ্ট্ জন্‌কে দেখছি)।

শ্রীম। আপনি স্বামিজীকে দর্শন ক'রেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন, আপনি ধন্য। আর ঠাকুরকে জান্‌তে হ'লে স্বামিজীর মাধ্যমেই জানা দরকার নচেৎ তাঁকে বোঝা যায় না। আমাদের কথা—আমরা তাঁকে তাঁর কৃপাতে দর্শন করেছি—নয় ত' আমাদের কি সাধ্য যে তাঁকে দর্শন করি—না আছে সাধন-ভজন আর না আছে জ্ঞান-ভক্তি।

আঃ ভক্ত। আমি যেখানেই তাঁর সন্তানদের দর্শন ক'রছি—সেখানেই আমার মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে স্থির হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু স্বদেশে এই মন স্থির করতে কত চেষ্টা ক'রতে হয়।

শ্রীম। তিনি সবে এসে গেছেন কিনা, সেজন্য বায়ুমণ্ডল এখনও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ (The atmosphere is still surcharged with spirituality)।

আমেরিকান ভক্তটি আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর "শ্রীম"র হার্ট দুর্বল বলিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ বয়সের পক্ষে ঠিক আছে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি ফটো ও একটি ঘড়ি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ "শ্রীম"কে দিয়া এইবার বিদায় লইতেছেন।

শ্রীম। ওঃ—তাঁর ওপর এঁদের কি ভালবাসা। কোথায় আমেরিকা আর কোথায়

ক'লকাতা। ? তিনি যেসব স্থানে গিছলেন, তা' দর্শন ক'রে, দক্ষিণেশ্বর ও তাঁর পার্ষদদের দেখে —এবার কামারপুকুর—জয়রামবাটী যাওয়ার ইচ্ছা, তা এত কষ্ট ক'রে যখন এসেছেন—ঠাকুর, মা—এঁদের জন্মস্থানও দর্শন হবে।

ঠাকুর বলতেন "ব্যাকুলতা এলেই তাঁকে পাওয়া যায়"। দেখ—এঁদের কি ব্যাকুলতা।

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিতেছেন—সাহেব ঠিক ধরেছে—I see St. John here.

শ্রীম (একটু বিরক্ত হইয়া) দেখ, ছোটবেলায়, Picwicks paper ব'লে একখানা বইতে Self admiration society-র কথা পড়া গেছল—এ ওকে সুখ্যাত করছে, সে তাকে সুখ্যাত ক'রছে—এতে কি লাভ? কি ক'রে তাঁকে পাব—এইটী হ'চ্ছে আমাদের Problem—তার আবার সব সংসারে প'ড়ে রয়েছি। এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়—কলঙ্ক সাবধে ভাসে, কলঙ্ক না লাগে গায়। সাধন ভজন আর তাঁর শরণাগতি—এই নিয়ে কিছুদিন প'ড়ে থাকতে পারলে তাঁর কৃপা হয়। তা' আবার আর হয় না বয়স হ'য়েছে।

তবে সাধন ভজনই বল আর যা কিছু বল—These are all means to an end, but not an end, in itself. (এগুলি তাঁকে পাওয়ার উপায় মাত্র, কিন্তু এগুলি ক'রলেই তাঁকে পাওয়া হ'ল না)। সবই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে and that will lead to the goal (কৃপাই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে)।

জনৈক ভক্ত। কেন সাধন ভজন ক'রে কি তাঁকে পাওয়া যায় না?

শ্রীম। হ্যাঁ, সাধন ভজন ত' দরকার। ঐগুলি ক'রলে তবে তাঁর কৃপা হয়—তবে বস্তুলাভ। আর তাঁর কৃপাতেই সাধন ভজনের ইচ্ছা হয় নচেৎ জোর ক'রে কি কিছু হয়? তবে নিয়ম করে সাধন ভজনের জন্য ব'সতে হয়। তিনি ত' আমাদের হাতে পড়েন নি—আমরাই তাঁর হাতে প'ড়েছি, তাই শরণাগত হ'য়ে তাঁর কৃপার জন্য প্রার্থনা ক'রতে হয়। তা' ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে? চাই ব্যাকুলতা। আর সেইজন্য শ্রীগুরুর উপদিষ্ট কর্ম, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, জপ,তপ,—এসব একান্ত দরকার।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, সারাদিন খাটতে হয়, জপ, করতে করতে আসনে বসে ঘুম পায়। ভোরবেলা ত' প্রায়ই এমন হয়।

শ্রীম। তাঁর আদেশ "রাত্রি ৩টার সময় উঠে বসে জপ, ক'রবে," পরে না হয় একটু ঘুমুলে। আর এরকম হ'লে চ'লবে কেন? কাপড় ছাড়া, মুখ ধোওয়া—ওসব ক'রেও একবার ব'সতে পার, কিন্তু ওসময় তাঁকে ডাকা চাই। শরীর পরিশ্রান্ত বা অসুস্থ থাকলেও ঠিক সময়ে বসে জপ করবে। Now or never. পাউরুটি দুধে ভিজিয়ে ধরলে, খস্ খস্ ক'রে পড়ে। আত মুখুজ্জে অর্থকরী বিদ্যার জন্য টেবিলের উপর বই রেখে, রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন, পাছে ঘুম পাবে ব'লে, আর পরমার্থ লাভ—একি অমনি হয়? নামমাত্মা

বলহীনেন লভ্যঃ। কোমর বাঁধ। এখানে যুদ্ধ করতে এসেছ—like a soldier in a battle field. যো সো ক'রে তাঁকে পেতে হবে। দেখ না বুদ্ধদেব—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্। দেহ ত' থাকবে না—ওটি থাকতে থাকতে তাঁকে জেনে নিতে হয়। আজ মা দেখে আছেন—দেখে যাব, কাল পরীক্ষা, পরশু হয়ত আর একটা কিছু—এরকম হ'লে কি চলে? এইজন্য সাধুরা সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—এক লক্ষ্য—কি ক'রে তাঁকে পাব। প্রকৃতিতে কিছু কর্ম হয়ত রয়েছে—তা' আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার মত কাজ কর। দেহ থাকতে ত' কাজ ছাড়বার যো নেই—নিশ্বাস প্রশ্বাসও কাজ। তবে সমাধিস্থ অবস্থার আলাদা কথা। সব ভার তাঁর উপর দাও। ওটি শুধু মুখে ব'ললে হবে না—প্রতি কাজে অভ্যাস ক'রতে হবে—তবে ত' উপলব্ধি হবে? তবে সংস্কার যাওয়া বড় শক্ত। ফুটপাথের উপর একটি বেড়ালছানা মর মর হ'য়ে প'ড়েছিল দেখে, সেটাকে এনে গরম দুধ খাওয়াতে বাঁচল। কিছুদিন পরে দেখি সে একটা পায়রা মেরে খাচ্ছে। তখন ভাবলাম "আমি এর জন্য ভাব্‌ছি কেন? এই এর সংস্কার।" এই রকম সকলেরই ভালমন্দ সংস্কার আছে—ভাল কাজ ক'রে মন্দ সংস্কার নষ্ট ক'রতে হয়, আর তাঁর শরণাগত হ'তে হয়। তিনি 'কপাল মোচন'—অর্থাৎ বিধিলিপিও খণ্ডন করতে পারেন—এ কথা স্বামীজী নিজে ব'লেছেন। তাঁর নামেতে জন্মজন্মান্তরের খারাপ সংস্কার কচ্‌ কচ্‌ ক'রে কেটে যায়। তাই শ্রীরামপ্রসাদ গাইতেন—"নামের তরণী মাগো, করি যা কেবল।"

হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি—বাজীকর সকলকে ব'লছে "খোল" কিন্তু খুলতে গেলে আরও গাঁট প'ড়ে যায়। বাজীকর কিন্তু দড়ির একটি end (প্রান্ত) ধরে নাড়তেই সব গাঁটগুলি একেবারে খুলে গেল।

পাপ, তাপ, সংস্কার—যা কিছু বল তাঁর নামেতে সব কেটে যায়—দেহ মন পবিত্র হয়—তিনি আর তাঁর নাম কি আলাদা?—এক।

* * * *

বেলা প্রায় ৫টা। দু'টী ভক্ত চারিতলার ছাদে কথোপকথন করিতেছেন ও হাসিতেছেন। "শ্রীম" ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি বেঞ্চে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি গো! তোমাদের কি কথা হ'চ্ছে?"

ভক্তদের মধ্যে একজন।—মহাশয়, ইনি বেলুড় গেছলেন, সেখানে জনৈক সাধু মফস্বল থেকে ট্রেণে বেলুড় আসবার সময় একটি বৃদ্ধা কি প্রশ্ন ক'রেছিলেন ও সাধুটী তার কি উত্তর দিয়েছিলেন—এইসব কথা হ'চ্ছে।

শ্রীম।—(একজনকে লক্ষ্য করিয়া) তা' তুমিই বল। তবে মঠের কথা এমন ক'রে বলবে, যেন আমার মনে হয় যে আমিও সেখানে উপস্থিত রয়েছি।

ভক্ত।—সাধুটী ট্রেণে বেলুড় আসছিলেন। একটী বৃদ্ধা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "বাবা! তোমার এমন অবস্থা কেমন ক'রে হ'ল?"

সাধু।—সালসা খেয়ে।

বৃদ্ধা।—সালসার নামটা লিখে দেবে বাবা। আমার নাতি এত ভালমন্দ খায়, কিন্তু তার শরীর সারে না।

সাধু।—সালসার নাম আর কি লিখবো—সকলেই জানে "শ্রীরামকৃষ্ণ চরণামৃত সালসা", খেলে শরীর, মন, ইহকাল পরকাল, সব ভাল হয় মা, খাইয়ে দেখুন।

বৃদ্ধা প্রথমে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম?"

সাধু।—এ সালসা ত' টাকা দিয়ে কেনা যায় না। তবে সাধুসঙ্গে ধীরে ধীরে মনের পরিবর্ত্তন হ'লে, এই সালসা খেতে ইচ্ছে হয়, আর খেলে তার ফলও পাওয়া যায়।

শ্রীম—(কে ভাবস্থ) এক একবার বলিতেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ চরণামৃত সালসা"। ওঃ কি কথাই ব'লেছে। শুনলে চৈতন্য হ'য়ে যায়। সাধু কিনা? সর্বদা ঐ এক চিন্তা। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে সর্বদা মুখ ক'রে থাকে, সরিয়ে দিলেও ঠিক উত্তর দিকেই যাবে। আমার এক একবার মনে হয়, সংসারীরাই হ'চ্ছে ত্যাগী—কিনা তাঁকে লাভ করা—যা কিনা মানবজন্মের উদ্দেশ্য তাই, ত্যাগ ক'রে, কি সব নিয়ে রয়েছে। "খাঁড়া বড়ি, খোঁড় আর খোঁড় বড়ি খাঁড়া"। তাই Christ ব'লেছিলেন, "Man doth not live by bread alone" (মানুষ শুধু খাদ্যেই বাঁচে না)। শুধু কি এইসব ভাল লাগে? মনের খোরাক না হ'লে কি চলে?

তবে এখন সুবর্ণ সুযোগ! যে নিতে পারবে তারই চৈতন্য হবে। অবতার সবে এসে গেছেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কত ধুলো ঐ দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে মিশে রয়েছে। তিনি ওখানে ৩০ বৎসর বাস ক'রে গেছেন। পার্ষদদের সঙ্গে ওখানে কত লীলাখেলা হ'য়েছে—এসব ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয় (অন্যমনস্কভাবে) অনেক দিনের কথা—শ্রীশ্রীমা একটী মেয়ে ভক্তকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "এত লোক আসে মা, কই তাঁর মত কাহাকেও দেখি না"। উত্তরে মেয়ে ভক্তটী ব'লেছিলেন, "তা, কি করে হবে মা? তিনি এসেছিলেন উদ্ধার ক'রতে আর এরা এসেছে উদ্ধার হ'তে"। কি জান? তিনি ছিলেন যেন জলন্ত আগুন—তাঁর দর্শনেই পাপ তাপ সবই যেন পুড়ে যেত। একদিন তাঁকে দর্শন ক'রে এলে প্রায় ১৫ দিন নেশার ঘোরের মত কাটত। কি সব দিনই গেছে। তবে সংসারে থাকতে গেলে মন মলিন হ'য়ে যায়। তাই অনবরত সাধুসঙ্গ দরকার। সংসারীদের surrounding atmosphere (পারিপার্শ্বিক অবস্থা) দেখনা—মহামায়ার পূজা ক'রবে—মায়ের কাছে প্রার্থনা ক'রছে—ধনং দেহি, যশো দেহি ইত্যাদি। আর সাধুরা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে "ভক্তিং দেহি, জ্ঞানং দেহি, বৈরাগ্যং দেহি"—এই সব প্রার্থনা ক'রছে—দেখ কত তফাৎ। তা' মা সকলের প্রার্থনাই শোনেন। তবে যখন দেখেন যে, প্রার্থনা পূরণ ক'রলে, ছেলের অমঙ্গল হবে, সেটা পূরণ করেন না। ছেলে বায়না ধরেছে "পয়সা দাও,

ঘুড়ি কিনব"—মা জানেন ছোট ছেলে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে প'ড়ে গিয়ে প্রাণান্ত হবে, তাই পয়সা দেন না—বাক্স বন্ধ ক'রে, চাবী আঁচলে বেঁধে রাখেন।

অনৈক ভক্ত।—মহাশয়, ত্যাগী না হ'লে কি তাঁকে পাওয়া যাবে না? আর সকলেই যদি ত্যাগ করে তাহ'লে সৃষ্টিই বা কি ক'রে চ'লবে।

শ্রীম।—তা' তাঁর কৃপাতে সংসারেও তাঁকে লাভ করা যেতে পারে, তবে ত্যাগীর অনেক সুবিধা। 'সংসারীর তাঁকে লাভ ক'রতে প্রতি মুহূর্তে বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়—অর্থাভাব, রোগ, শোক—এসব ত' লেগেই আছে। যে মন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দেবে, তাই যদি সর্বদা সংসারের ভাবনা ভাববে—তা হ'লে কি ক'রে হবে? সরিষার একটী পুঁটলী—যদি সরষেগুলি ছড়িয়ে পড়ে—ত' সেগুলিকে একত্র করা বড় দায়। মনেরও ঠিক সেই অবস্থা। ছড়ানো মন কুড়িয়ে না আনলে কিছুই হবে না। সরষে কুড়ুতে কুড়ুতেই সময় কাটে। আর সৃষ্টিরক্ষার কথা যা ব'লছ—তা' এমনও ত' হয় যে, বিবাহিত লোকেরও ছেলেপুলে হ'ল না? আর তুমি ব'ললেই কি সকলে ত্যাগ ক'রতে পারবে। বাজনার যন্ত্রের থেকে তিন রকম পর্দায় সুর বেরোয়—উদারা, মুদারা, তারা। এও তাই—তিনি যা'কে যে সুরে বেঁধেছেন—সেই সুরই বেরুবে—তাই বলে—যার যা' প্রকৃতি। তিনি প্রকৃতিভেদে—(১) যোগী, (২) যোগী-ভোগী ও (৩) ভোগী সৃষ্টি ক'রেছেন। যোগী কিনা ত্যাগী ভক্ত সর্বদাই তাঁর সঙ্গে যোগ, যোগী-ভোগী—এরা সংসারে আছে বটে, সংস্কার হিসাবে ভাল মন্দ কাজও হয়ত ক'রছে, কিন্তু তাঁর শরণাগত, তাঁর দাস হ'য়ে প'ড়ে আছে—যেমন বেড়ালছানা মিউ মিউ করে—কিন্তু তার সব ভার মায়ের উপর—মা যা করে। আর ভোগী—ঘর সংসার নিয়ে একেবারে ডুবে রয়েছে, একবার ভুলেও তাঁকে ডাকে না।

ত্যাগী বা যোগীভক্ত—যেন সুমেরু পর্বত। আর গৃহীভক্ত (যোগী-ভোগী) যেন গোষ্পদের জল।

তবে বন্ধন—এতেও আছে ওতেও আছে।

সংসার কিনা Iron chain (লোহার শিকল), ত্যাগী হ'লে Golden chain, (সোনার শিকল)—কিনা শ্রীগুরুর আদেশমত কাজ ক'রতে হবে। এ দুয়ের বার হ'য়ে, যেখানে তোমায় কেহ চেনে না, সেখানে গিয়ে নির্জনে গোপনে সাধনভজন ক'রতে পারলে বেশ হয়।

দুটী জিনিষ আছে—শ্রেয়ঃ আর প্রেয়।

শ্রেয়টা সাধুরা নিয়েছে—প্রেয়টাকে ত্যাগ ক'রে।

মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ, লোকমান্য-প্রতিষ্ঠা—তারা এসব কিছুই চায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লতেন "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" আর বলতেন—"মা। লোকমান্য, অষ্টসিদ্ধি নবসিদ্ধি—এসব কিছুই চাই না, শুধু তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা, বিমলা, অহৈতুকী ভক্তি দাও"।

উপনিষদের শিক্ষা

শ্রীবিভূভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ

মানুষের জীবন যাহাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে, তাহাই সমস্ত শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার সমস্ত পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবের অন্তরাত্মা যাহাতে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তম জগতের সহিত নিজের আত্মিক যোগ স্থাপন করিতে পারে—বিশ্বজনীন অনুভবের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ এই পরিদৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বেও যাহাতে নিজের সত্তাকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে, মূলতঃ সেই আদর্শ লইয়াই সমস্ত সাধন-বিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়। স্থান, কাল ও প্রয়োজনের বৈচিত্র্যের দরুণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনের অধিকতর উন্নতি এবং সুযোগলাভই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ আত্মবিকাশের দিকেই শিক্ষার গতি। কারণ, ব্যবহারিক সমুন্নতি এবং সামাজিক অভ্যুদয়, সুখসম্ভোগ প্রভৃতিও আত্মবিকাশেরই একটা স্তর এবং আনুষঙ্গিক ফল।

দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষাই প্রধানতঃ মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দেয়, বুদ্ধি সুসংস্কৃত এবং পরিমার্জিত করিয়া আচরণে, ব্যবহারে সর্বত্রই একটা সুসমঞ্জস শালীনতা আনিয়া দেয়, তার ফলে ব্যবহারিক জীবন মধুর ও সুখময় হইয়া উঠে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারে, স্বীয় প্রতিভাবলে দুর্জ্ঞেয় তথ্য আবিষ্কার করিয়া নিজের তথা জগতের কল্যাণ সাধন করে। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য শিক্ষার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মানুষ একান্ত স্বাধীন প্রাকৃতিক শক্তিকে যতদূর সম্ভব নিজের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলে। কিন্তু এখানেই মানুষ

থামিয়া যায় না, অসীম সুখসম্ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে নিজের জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াও মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যলাভের বাসনা শেষ হয় না, অন্তরের ক্ষুধা আরও কিছু লাভের জন্য প্রবল হইয়া উঠে, চাওয়ার বা পাওয়ার মত যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে—কেবল মাত্র তাহা হইলেই মানুষ পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। সুতরাং জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের জন্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই শেষ লক্ষ্য হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়াতীত একটা অপার্থিব শাশ্বত আনন্দের অনুভূতিই জীবন-বিকাশের প্রকৃত সহায়ক। এইজন্যই জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের লক্ষ্য লইয়াই শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হয়—তাহার চরম উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন অনুভবের ভিতর দিয়া মহত্তর জীবনের অনুভূতি জাগ্রত করা। স্রোতস্বিনী যেমন সলিল-স্পর্শে ভূমির উর্বরতা সাধন করিয়া ফলে, ফুলে, শস্যে বহু দেশ সমৃদ্ধ করে এবং তাহার একমাত্র গন্তব্যস্থল অনন্ত সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়া যায়, শিক্ষাও তেমনই মানুষের জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পবিত্র স্পর্শে সঞ্জীবিত করে, আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠায় সমৃদ্ধ করে, কিন্তু আসল লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় অমৃতলোকে মানবকে উত্তীর্ণ করিয়া সার্থক হইয়া যায়।

শিক্ষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক জাতীয় শিক্ষা—যাহা জাগতিক পদার্থের সহিত মানুষের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, সুস্থ সুন্দর নাগরিক জীবনযাপনের অনুকূল বুদ্ধি ও অবস্থা সৃষ্টি করে এবং পারিপার্শ্বিকতার সহিত সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া নিজের ও অপরের কল্যাণকর পন্থা উদ্ভাবনের শক্তি সঞ্চার করে। ইহার নাম বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবহারিক শিক্ষা।

অপর জাতীয় শিক্ষা—আধ্যাত্মিক শিক্ষা। যেই শিক্ষার ফলে মানুষ ধরণীর ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশূন্য পর্যন্ত সর্বত্র এক পরম সত্য-শিব-সুন্দরের সত্তা অনুভব করিতে পারে, বিপুল বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সহিত একটা গভীর আত্মিক যোগ উপলব্ধি করিতে পারে, বিশ্বজনীন অনুভূতির মাধ্যমে নিজেকে সর্বব্যাপী বিরাট সত্তার সহিত অভিন্নরূপে বুঝিতে পারে তাহাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। এই শিক্ষাই জীবনের বৃহত্তম সত্তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করাইয়া চরম কাম্য শাশ্বত আনন্দের অমৃতধারায় সিঞ্চিত করে।

বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা সামাজিক জীবনযাপনের প্রধান সহায়ক। শরীর ও মন সুগঠিত করিয়া রীতিনীতি, শৃঙ্খলা, কর্তব্য প্রভৃতি নির্ধারণ করিতে না পারিলে আনন্দমুখর সুসমঞ্জস জীবনযাপন অসম্ভব।

প্রতি পদেই মানুষের অনেক কিছু শিখিবার আছে, জানিবার আছে। সংসারের পিচ্ছিল পথে অসতর্ক পদ-বিক্ষেপে অথবা অজ্ঞতার বশে ভুল করিয়া বসিলে তাহার ফলে জীবনের অনেক ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য প্রথম হইতেই জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কিছু উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লইলে সংসারযুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনাই সমধিক হয়। দেহ সুগঠিত করিতে হইবে—তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। মন সুসংস্কৃত এবং সংযত করাও শিক্ষা ভিন্ন অসম্ভব। এইভাবে প্রথমতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সার্থকতা লাভের জন্যই

বিভিন্নমুখী শিক্ষার প্রয়োজন হয়। বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা বহুমুখী পথ ও মতের মাধ্যমে জীবনের এই পরম প্রয়োজন পূর্ণ করে। ব্যবহারিক জীবনের ঊর্ধ্বে মহাজীবন বা শাশ্বত জীবনের যেই অনুভূতি মানুষকে অমৃতময় করিয়া তোলে, সেই একান্ত কাম্য সুখময় জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্যবহারিক জীবনকে সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করিতে হয়। কারণ, মূঢ়তার বশে উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত কখনও অপার্থিব আনন্দ বা উচ্চতর জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়।

উপনিষদ কেবল অধ্যাত্মরাজ্যের রত্নরাজি আহরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই মর্ত্যলোকের নশ্বর জীবনও কিভাবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হইতে পারে, কেমন করিয়া কিরূপ শিক্ষার ফলে মানুষ ব্যবহারিক জগতে সুখী হইতে পারে, তাহারও নির্দেশ উপনিষদে উল্লিখিত আছে। অবশ্য উপনিষদে অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশেরই প্রাচুর্য—ইহা নিঃসন্দেহে সত্য।

সমস্ত শিক্ষার ভিতর নীতিশিক্ষা বা আদর্শ স্থির করিয়া দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ প্রধান বিষয়। কারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশই শিক্ষার মূল লক্ষ্য; নীতিরহিত, আদর্শশূন্য জীবন কখনও প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। এইজন্য বাল্যকাল হইতেই আমাদের প্রথম শিক্ষা দেওয়া হয়—"সদা সত্য কথা বলিবে", "পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না" ইত্যাদি। উপনিষদেও এইরূপ লৌকিক শিক্ষার বিধান পরিদৃষ্ট হয়।

আচার্য শিষ্যকে কি কি উপদেশ দিবেন সেই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদের একাদশ অনুবাকে বলা হইয়াছে—"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ"। ইত্যাদি। সত্য বলিবে, ধর্মাচরণ করিবে, অধ্যয়ন হইতে বিচ্যুত হইবে না।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে: "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"।—অপর কাহারও ধনে লোভ করিও না। লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সংসারের পথে অগ্রসর হইয়া মিথ্যার সর্বনাশা মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে এই কয়টী উপদেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে শুধু নীতিবাক্য বলিয়াই উপনিষদ বিরত হয় নাই, সামাজিক সুন্দর জীবনের উপযোগী আচার ব্যবহার কি রকম হওয়া প্রয়োজন তাহাও উপনিষদ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। তৈত্তীরিয়োপনিষদের একাদশ অনুবাকেই আছে—"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়া উপাস্যানি নো ইতরাণি"।—মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিবে। অভ্যাগত অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করিবে। শিক্ষাদাতা আচার্যকে দেবতা মনে করিবে। যে সমস্ত কাজ নিন্দনীয় নহে, তাহাই করিবে, অন্যরূপ অর্থাৎ নিন্দনীয় কাজ করিবে না। যাহা আমাদের শুভ ও সৎকাজ এবং আচরণ, তাহাই অনুষ্ঠান করিবে, অন্যরূপ করিও না।

এইভাবে ব্যবহারিক জীবনের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার মধ্য দিয়া পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সুগঠিত করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সমস্ত বিধানই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের জীবনে জন্ম ও মৃত্যুর মত এমন একান্ত সত্য আর কিছুই নাই। ব্যবহারিক শিক্ষায় বর্তমান যুগতেও এই দুইটি বিষয়ের বহু আলোচনা হইয়াছে। কিভাবে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, কেমন করিয়া পিতামাতার শুক্রশোণিত সংযোগে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ হইতে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া এই রক্তমাংস-অস্থি-মজ্জাময় মানবদেহ পরিণতিলাভ করে, কেমন করিয়াই বা তাহাতে চেতনার সঞ্চার হয়। কতদিন মাতৃজঠরে থাকিয়া মানবশিশু পৃথিবীর আলোক দেখিতে পায়—উপনিষদ তাহার কোন কিছুই বাদ দেয় নাই। "গর্ভোপনিষদে" এই বিষয়ে অতিবিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি গর্ভোপনিষদ পাঠ করিলেই এই বিষয়ে সম্যক্ তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

আবার কেমন করিয়া এই সুগঠিত দেহে জীবনের স্পন্দন থামিয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল করিয়া কিভাবে ধীরে ধীরে মরণের অন্ধকার মানবের চেতনা বিলুপ্ত করিয়া দেয় তাহারও বিস্তৃত আলোচনা উপনিষদে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অঃ ১ম খঃ ২য় মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ম খণ্ডের ১—৮ম মন্ত্র পর্যন্ত; ৮ম অঃ ৬ষ্ঠ খঃ ৪র্থ ও ৫ম মন্ত্র; বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৪র্থ অঃ চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১—৪র্থ মন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সৌরবিজ্ঞান মানুষের একটি পরম প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়। সূর্য হইতেই বিশ্বভুবন কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত হইয়াছে "সূর্যোপনিষদে" (নির্ণয়সাগর প্রকাশিত ঈশাদ্যুপনিষদ গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ডে ৫০৮ পৃঃ) তাহার আলোচনা রহিয়াছে।

উপনিষদে এই স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলা হইয়াছে। এই দেহ পরিরক্ষণ প্রভৃতির উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অন্নং বহু কুর্বীত"।

এই ব্যবহারিক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার ভিতর দিয়া উপনিষদ মানবচিত্তকে ক্রমশঃ এমন এক মহাসত্তার সহিত মিশাইয়া দিয়াছে যাহার অনুভূতি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের চরম নিদর্শন। পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সমস্তই যে এক মহাসত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, মূলতঃ এক বিরাট সত্তাই যে জীবজগতের মেরুদণ্ডস্বরূপ, উপনিষদে বহু স্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি মাত্র কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতেছে। "বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌কে ইহা পরীক্ষা করিবার মানসে রাজর্ষি জনকের আহূত-যজ্ঞসভায় তদানীন্তন ভারতের সমস্ত মনীষিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর সেই সভায় সুবর্ণশৃঙ্গমণ্ডিত সহস্র ধেনু গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সকলের ঈর্ষার পাত্র হইলেন এবং সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রখর প্রতিভাশালী যাজ্ঞবল্ক্য একে একে

সমস্ত পণ্ডিতগণের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলে অবশেষে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিয়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওতঃপ্রোতভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আকাশ নামে অভিহিত; এবং আকাশও যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করেন। এই অক্ষরই পরম ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপক, সর্বশক্তির মূলকেন্দ্র স্বরূপ, সমগ্র বিশ্ব ইহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিলেই সমগ্র জগতকে জানা হয়, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়।"

এইভাবে ব্যষ্টির ভিতর দিয়া সমষ্টির সহিত মূল ঐক্যসূত্র স্থাপিত হইলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন বিশ্বজীবনে পরিণত হয়, নিজের সত্তার সহিত সমগ্র সত্তার অখণ্ডানুভূতি উৎপন্ন হইয়া জীবন বিকাশের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। ইহাই উপনিষদের বস্তুতান্ত্রিকশিক্ষার চরম ফল।

ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহৎ জীবনের অমৃত স্বাদ অনুভব করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই পর্যন্ত মানব সমাজ সমস্ত শিক্ষার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যা কিছু আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করি, সেই অতি পরিচিত পৃথিবী, জল, আলো, বাতাস প্রভৃতিকে মূল পদার্থ বিচারের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলে কি পাওয়া যায় তাহার আলোচনার ভিতর দিয়াই উপনিষদ অগ্রসর হইয়াছে। নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বস্তুতান্ত্রিক জাগতিক জ্ঞানের ভিতর দিয়াই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা হৃদয়ঙ্গম করার পথ উপনিষদ এই ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রথম সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ," সম্পদের দ্বারা মানুষের চরম তৃপ্তি হয় না। কারণ ভোগমুখী চিত্ত ক্রমশঃ অধিক ভোগের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠে। অতএব "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতের অধিকারী হইতে পারে। যাহা কিছু ভোগ করা যায় তাহাও আসক্তিশূন্য চিত্তে ত্যাগমুখী মনোবৃত্তি লইয়াই ভোগ করা কর্তব্য। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের মনোভাব লইয়াই ভোগ করিতে হইবে। শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা মনকে সংযত করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া শরীরকে সুগঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত শাস্ত্র উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার মর্মার্থ গ্রহণের ক্ষমতা জন্মিবে, তাহার পর আত্মা বা ব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, যুক্তি তর্কের সাহায্যে সেই বিষয়ের সমস্ত সংশয় দূর করিতে হইবে। তাহা হইলেই নিদিধ্যাসন বা সমাধির সাহায্যে পরম দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি

হইলে মানুষ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই এক পরমাত্মার সত্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, কেবল বিভিন্ন নাম ও রূপের মাধ্যমেই পরস্পর বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। যেমন একই মাটির দ্বারা নির্মিত পাত্র আকারগত তারতম্যের ফলে ঘট, শরাব প্রভৃতি ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও মূলতঃ তাহা মৃত্তিকাই, রূপ ও নাম ভিন্ন ভিন্ন মাত্র, তেমন সমস্ত বিশ্বজগতের মূল ও এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, অবস্থাভেদে তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই মানুষের সমস্ত-আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে, মানুষ পরম শান্ত শিব সুন্দরের সচ্চিদানন্দ-ময় অনুভূতি লাভ করিয়া জন্ম মরণরূপ সংসার চক্রের আবর্তনের হাত হইতে রেহাই পায়, সমস্ত দুঃখের চির নিবৃত্তি ঘটে। ইহাই উপনিষদের শিক্ষা।

STUDENTS COMMON-ROOM

সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি.,
ডি. এস্. ই.

(তৃতীয় পর্যায়)

॥ অলঙ্কার প্রসঙ্গ ॥

॥ অলঙ্কারবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস ॥

কবির কাব্যের আস্বাদে চমৎকৃত হয়ে রসিক পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে "কিসের জন্য এই চমৎকারিত্ব ? কোন্ গুণে সাধারণ বাক্য কাব্যে পরিণত হয়" ?

এই যে কৌতূহল, এটাই হ'ল কাব্য-জিজ্ঞাসার মূল প্রেরণা।

যে শাস্ত্র এই কাব্য-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে, ভারতবর্ষে সেই শাস্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "অলঙ্কার শাস্ত্র"। সুতরাং কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কারের একটা নিবিড় সম্পর্ক যে একদিন এদেশে স্বীকৃত হয়েছিল, সেটা অনস্বীকার্য।

ভারতের একদল সমালোচক হয়ত একদা লক্ষ্য করেছিলেন যে, কবিদের রচনার ভঙ্গীটা ঠিক হাটবাজারের কথাবার্তার মত "আটপৌরে" ভঙ্গী নয়, তার মধ্যে যেন একটা সাজ-সজ্জার ঝলমলানি আছে। তাঁরা হয়ত এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, সাধারণ কথাকে একটু সাজপোষাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেই সেটা যেন সুন্দর ও কাব্যময় হয়ে ওঠে। অতুল গুপ্ত দেখিয়েছেন—শব্দ সুন্দর হয়ে ওঠে যমক অনুপ্রাসে, অর্থ সুন্দর হয়ে ওঠে উপমা, রূপক প্রভৃতির সাহায্যে।

সেইজন্যই একদল পণ্ডিত মনে করেছিলেন যে, কাব্যের কাব্যত্ব অলঙ্কারে। এই ধারণাটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিল, তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। প্রাচীনতম যে "অলঙ্কার শাস্ত্র" আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভরত মুনির "নাট্যশাস্ত্র" (খৃঃপূঃ ১ম শতক)। তিনি অলঙ্কার স্বীকার করলেও রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তিনি "অলঙ্কার-

প্রস্থান"-এর সমালোচক নয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বহু পূর্ব-সূরীর উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে অলঙ্কার প্রস্থানের কেউ ছিলেন কিনা জানা নেই। অলঙ্কার প্রস্থানের প্রথম আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায় ভামহের (৭ম শতাব্দী) মধ্যে। পরে উদ্ভট (৮ম, ৯ম) রুদ্রট (৯ম, ১০ম) প্রভৃতি এই অলঙ্কারবাদকে পরিপুষ্ট করেছিলেন।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে একটি মাত্র শব্দালঙ্কার (যমক) এবং তিনটি অর্থালঙ্কার (উপমা, দীপক, রূপক) স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ভামহ উল্লেখ করেছেন তিনটি শব্দালঙ্কার ও বত্রিশটি অর্থালঙ্কার। এই পরিণতিটি একই দিনে একই লোকের দ্বারা ঘটে নি। কাজেই মনে করা যেতে পারে ভরতের পর থেকে ভামহ পর্যন্ত এই আট নশো বছর ধরে সাহিত্য সমালোচকেরা রসবাদ ছেড়ে অলঙ্কারবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত অলঙ্কার শাস্ত্রকে "সপ্তম বেদাঙ্গ" বলে অভিহিত করেছেন।

॥ অলঙ্কার শব্দের অর্থ ॥

অলম্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূষণ। অতএব যার দ্বারা ভূষিত করা যায় সেটাই অলঙ্কার। সুতরাং এক হিসাবে অলঙ্কার শাস্ত্র হচ্ছে কাব্যের সৌন্দর্য শাস্ত্র। এই হিসাবেই এটা আখ্যা হয়েছে এবং এর মর্যাদা ইংরাজী Poetics বা Aestheticsএর অনুরূপ।

॥ অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের মত ॥

কাব্যের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে ভামহ বলেছিলেন "ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্"—প্রিয়ার মুখ স্বভাবসুন্দর হলেও বিনা অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য ফোটে না। (কাব্যালঙ্কার ১।১৩)

অগ্নিপুরাণেও এই জাতীয় কথা বলা হয়েছে "অর্থালঙ্কার রহিতা বিধবেব সরস্বতী" অলঙ্কারের এই যে প্রয়োজনীয়তা, এটা অন্যান্য বহু আলঙ্কারিকই স্বীকার করেছেন। এমন কি "রীতি প্রস্থানের" বামনও বলেছেন "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" অর্থাৎ কাব্য উপাদেয়, কারণ তাতে অলঙ্কার আছে। এই বাক্যের দ্বারা তিনি অবশ্য অলঙ্কারকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেন নি। কারণ তাঁর মত ছিল "রীতিই কাব্যের আত্মা"। তাহলে অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কি ? বামন বলেন "সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ"। এই সৌন্দর্যই কাব্যকে গ্রাহ্য বা উপাদেয় করে তোলে।

"ধ্বনিবাদের" ব্যাখ্যাতা মম্মট ভট্টও (১২শ শতক) পরোক্ষভাবে অলঙ্কারের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন "দোষহীন গুণযুক্ত কোথাও বা অনলঙ্কার শব্দার্থের নাম কাব্য" এইটুকু বলেই পাছে "অনলঙ্কার" শব্দটি "অলঙ্কারহীন" এই অর্থে ধরা হয়, সেই ভয়ে তিনি বলেছেন "সর্বত্র সালঙ্কারো কচিৎ তু স্ফুটলঙ্কার বিরহে অপি ন কাব্যত্ব হানিঃ" এখানে "কচিৎ" ও "অপি" শব্দ দুটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। এই শব্দ দুটি দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, কাব্য হতে হলে সব ক্ষেত্রেই অলঙ্কারযুক্ত বাক্যের প্রয়োজন ; তবে কোথাও

কোথাও অলঙ্কার পরিস্ফুট না হলেও কাব্যত্বের হানি হয় না। এতে অলঙ্কারের প্রয়োজনই পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হল।

॥ অলঙ্কার ও কাব্যের সম্পর্ক ॥

ভরত মুনি কাব্যের জন্য মাত্র চারটি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছিলেন :

"উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যদ্যৈতে হ্যলঙ্কারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" ১৬:৪১

কিন্তু ভরতের মতে এই অলঙ্কারগুলি হচ্ছে গুণ বা রীতির মত কাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র। কাব্যের শোভার অন্তরঙ্গ কারণ হচ্ছে "লক্ষণ"। ভরত মুনি কথিত ৩৬টি কাব্য-লক্ষণের মধ্যে সংশয়, দৃষ্টান্ত, নিরুক্তি, অতিশয়, বিশেষণ, অর্থোৎপত্তি, লেশ প্রভৃতি অনেকগুলি "কাব্য-লক্ষণ"-ই পরবর্তী যুগে প্রায় অবিকৃত নামেই অলঙ্কার রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। কাজেই অলঙ্কারটা কাব্যের প্রাণ না হলেও তার অন্তরঙ্গ কারণ হিসাবে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

রসবাদী বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর "সাহিত্যদর্পণ"-এ রসকে কাব্যের প্রাণ, রীতিকে অবয়ব সংস্থান, এবং অলঙ্কারকে "কটক-কুণ্ডলাদির মত" অঙ্গসজ্জার উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এত অলঙ্কারের প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় না। সুন্দর দেহ নিরাভরণ হলেও সুন্দর, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহলেও কোন্ দরদী লোক সুন্দর দেহকে সুন্দর অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে সুন্দরতর করে তুলতে না চায়? সুন্দরীর "সোনার হাত" সুন্দর। কিন্তু ঐ "সোনার হাতে সোনার কাঁকন" "কে কার অলঙ্কার" হয়ে সেই হাতের গৌরব বৃদ্ধি করে না কি? সোনার কাঁকন যদি নাও জুটে, কিশলয় কুসুমেও সেটা সাজাতে হয়, তবেই ত শিল্পীর তৃপ্তি। আমরা জানি "সদসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যম্" (পদ্মটি শেওলামাখা হলেও সুন্দর দেখতে হয়) কিন্তু তবুও শৈবালও তো দরকার হয়েছে, ঐ শৈবালই এখানে সরসিজের অলঙ্কার হয়ে উঠেছে।

ডাঃ সুধীর দাশগুপ্ত তাঁর কাব্যালোকে অলঙ্কারের এই বহিরঙ্গতাকে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, অলঙ্কার জিনিসটা কাব্যের অনিত্য বা অস্থির ধর্ম নয়। এটা নিছক কটক কুণ্ডলের মত বাইরের জিনিস নয়। দণ্ডী অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিয়েছেন "কাব্য শোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষ্যতে" (কাব্যাদর্শ ২।১)। বামন বলেছেন "সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ" (কাব্যালঙ্কার ১।১।২)। এই সংজ্ঞা দুটিতেই অলঙ্কারকে কটক (বালা)-কুণ্ডলের মত বাইরের জিনিস বলা হয় নি। এই সূত্র দুটিতে মনে হয় অলঙ্কারটা ভিতরের জিনিসও হতে পারে। কারণ সৌন্দর্য জিনিসটা কটক-কুণ্ডলের মত বাইরের জিনিস দিয়েও ফুটে উঠতে পারে, আবার ভিতর থেকেও ফুটে উঠতে পারে। যে সৌন্দর্য ভিতর থেকেই ফুটে ওঠে, সেটা রসবাদীদের রসের সগোত্রীয় জিনিস। এই সৌন্দর্যকেই হয়ত জগন্নাথ "রমণীয়তা" বলে অভিহিত করেছেন।

॥ কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা ॥

কাব্য জিনিষটা হচ্ছে হৃদয়ের প্রাচুর্যের সৃষ্টি। এর মধ্যে অভিব্যক্ত হয় "হৃদয়ের সীমাহীন আশা", জেগে ওঠে "অন্তরেতে অনন্ত চেতনা জীবনের অনন্ত পিপাসা"। সেই আশার বাণী যাতে গুঞ্জিত হয়, চেতনার বাণী যাতে কম্পিত হয়, সেটা প্রাত্যহিক জীবনের হাট-বাজারের অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা দিয়ে সম্যক্‌ভাবে অভিব্যক্ত হয় না। তার জন্য অলঙ্কৃতির প্রয়োজন হয়। উৎসবের সময় আনন্দের প্রাচুর্যকে যেমন হাস্তে লাস্তে বসনে ভূষণে আলোক-সজ্জায় ভঙ্গীতে সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলতে হয়, হৃদয়োৎসবের আনন্দবাণীকেও সেইভাবে অলঙ্কারের দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে তুলতে হয়। প্রিয় যেমন তার প্রিয়াকে "কুসুমে রতনে কেয়ূরে কঙ্কণে" সাজিয়ে তোলে, ভক্ত যেমন তার প্রাণের ঠাকুরকে কুসুমে চন্দনে মাল্যে গন্ধে অর্ঘ্যে উপচারে সাজিয়ে তোলে, কবিও তেমনি তার কাব্যলক্ষ্মীর প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলেন। এই সাজাবার ব্যাপারটাই ত অলঙ্কার। এটা কাব্যের আত্মা না হলেও কাব্যের সৃষ্টিতে পরিহার্য নয়। কোনও শিল্পীই তার কাব্যলক্ষ্মীকে বিবসনা নিরাভরণা করে প্রতিষ্ঠিতা করতে চায় না।

"ফেলো গো বসন ফেলো ঘুচাও অঞ্চল,
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আভরণ।"

এ' উক্তি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি প্রযুক্ত হ'তে পারে না।

বস্তুতঃ জগতের সাহিত্যে নিরলঙ্কার কাব্য একান্তই দুর্লভ। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর "অলঙ্কার চন্দ্রিকা"-য় দেখিয়েছেন যে, মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের ৬৬৬টি পংক্তির মধ্যে উপমাদি অলঙ্কার আছে ৫০টি, রবীন্দ্রনাথের "মানস সুন্দরী"-র ৩৩৮টি পংক্তিতে আছে ৮৪টি, সুকান্তের "রাণা"-র কবিতায় ৫১টি পংক্তিতে আছে ১৮টি। কাজেই মনে হয় বর্তমান যুগের কাব্যেও অলঙ্কারের প্রয়োজন হ্রাস পায় নি। তত্ত্বমূলক বা তথ্যমূলক রচনার মধ্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন ততটা নেই। কিন্তু সেখানেও দু' চারটি সুপ্রযুক্ত অলঙ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যকে সুন্দর করে তোলে, অস্পষ্টকে উদ্ভাসিত করে তোলে, জ্ঞানের ক্লান্তিকর অনুসন্ধানকে সুন্দরের আনন্দাভিসার করে তোলে।

তথ্যমূলক রচনার মধ্যেই যদি অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়, তাহলে কাব্য রচনার মধ্যে সে প্রয়োজনটা আরও বেশী হবেই। কারণ ভাবপ্রবণতা ছাড়া কাব্য হয় না। এই ভাব-প্রবণতাজনিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের ভাষাকে অলঙ্কৃত করতে হবেই।

কবির চরম আকাঙ্ক্ষা কি? জগৎকে যেভাবে পেয়েছি, তার চেয়ে সুন্দরতর করে তাকে তৈরী করা; যে সুন্দরকে আমরা দেখেও ঠিক দেখতে পাই না, তাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাদের আনন্দের জগৎকে প্রসারিত করা; যে তত্ত্বকে বুঝতে পারি না, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দিয়ে তার উপলব্ধি করা; যে কথাকে বুঝিয়ে বলতে পারি না, সেটাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে

তোলা। রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতাতে কবির কামনাটি অনমুকরণীয় ভাষায় বিবৃত হয়েছে :

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধা মাখা বাস সুকোমল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাবো ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ'পরে
শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু' চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

এই যে challenge, এটা কি সহজে সার্থক হয়? ভাল কথা ত আমরা অনেক শুনি। বক্তৃতায় ধর্মোপদেশে হিতোপদেশে অনেক ভাল কথাই ত আমরা শুনেছি। তাতে ফল কি হয়েছে? হিতকথা প্রায়ই আমাদের ভাল লাগে না ; "হিতং মনোহারী দুর্লভং বচঃ"। কিন্তু কবির এমনই ক্ষমতা যে, তারা হিতকথাকেই মনোহারী করে বলতে পারেন। ফলে তাতে কাজও হয়, হয়ত শাস্ত্রকথার চেয়েও বেশীই কাজ হয় ; কারণ শাস্ত্রের কথায় সাধারণ লোক কান দেয় না, কিন্তু কাব্য-কথায় সাধারণ লোকে কান দিতে বাধ্য হয়। কাব্যের রসের আকর্ষণে তারা আকৃষ্ট হয়, ভোগ করে কাব্যানন্দ, তারপর নিজেদের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দীক্ষিত হয় কবির মঙ্গলাদর্শে। রামায়ণ, মহাভারত কাব্য বলেই তার হিতকথা মনোহারী হ'য়ে ভারতের চিত্ত জয় করেছে, ভারতের জাতিগত আদর্শকে সজীব করে তুলেছে। এই ব্যাপারে রামায়ণ মহাভারত যতটা কাজ করেছে, সমগ্র বেদ বেদান্ত ততটা করতে পারে নি।

কাব্যের এই যে শক্তি, এটা কি নিরাভরণ ভাষায় সৃষ্ট হয়? শব্দে ঝঙ্কারে ইঙ্গিতে

ব্যঞ্জনায় অলঙ্কারে ঐশ্বর্যে সাধারণ কথা যখন অসাধারণ হয়ে ওঠে, তখনই তার মধ্যে অলৌকিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ; এই শক্তির প্রভাবেই—

"One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown,
And three, with a new song's measure,
Can trample a kingdom down"

কাজেই দেখা যাচ্ছে অলঙ্কার কাব্যের পক্ষে অবহেলার জিনিস নয়।

ভারতীয় রসায়ন

ডাঃ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডি. এস. সি., ডি. আইসি.

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বৈদিক যুগে ক্ষুতাপসারণ, মারণ, উচাটন, কবচধারণ, কোপদৃষ্টি নিবারণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল। সে সকল ব্যাপারে সোনা ও সীসার ব্যবহার হত। সোনা সীসাধাতু, সোমরস ও অন্যান্য ভেষজকে কেন্দ্র ক'রে বৈদিক যুগে রসায়নের ব্যবহার প্রসারিত হল। ঔষধ প্রস্তুত করার সঙ্গে রসায়ন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হল। ধর্মগত ক্রিয়াকর্মাদির সঙ্গে ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ জড়িত হল। রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি সকলই দেবদেবীর বাণীসম্ভূত বলা হল। প্রাচীন পুঁথিতে ঔষধ প্রস্তুতাদির বিবরণ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি সকলই দেবতাদের উক্তি বলে বিবৃত হল। বৈদিক-উত্তর আয়ুর্বৈদিক যুগে ও তান্ত্রিক যুগে এই সব প্রক্রিয়াদি হর পার্বতীকে বলছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর লেখক বৌদ্ধ হলে বুদ্ধই ভেষজ বিজ্ঞান বা আয়ুর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা যেখানে রূপকবহুল, দেবতার বাণী বলে প্রচারিত, যেখানে রোগ-লক্ষণ ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানার কাজ বলে বর্ণিত, ভেষজ যেখানে ভূত প্রেত পিশাচের প্রভাব অপসারণে সমর্থ বলে বিবেচিত, সেখান থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণ পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আয়ুর্বেদের অর্থ হ'ল আয়ু বা জীবন বেদ বা বিজ্ঞান। অথর্ববেদ থেকে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বলে মনে হয়। বুদ্ধের কাল পর্যন্ত আয়ুর্বিজ্ঞান বা রসায়নের তেমন প্রসার দেখা যায় না। তার চেয়ে বেশি প্রসার হল ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি তত্ত্বের। তখন বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিক, অণু পরমাণু ইত্যাদির ধারণা করা হল।

অথর্ব বেদে রোগ সারাবার, আয়ু বাড়াবার উপকরণের তালিকা পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে উপকরণাদির প্রয়োগও বৃদ্ধি পেল। আয়ুর্বৈদিক যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে, রঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, নীল ও মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জন হিসাবে ব্যবহারের কথা (সম্যক নিকায়তে) জানা যায়।

তারপর ঐতিহাসিক যুগে উপনীত হওয়া গেল। খৃষ্টপূর্ব ৩২০ বছর আগে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের যুগ। চাণক্য তাঁর অমাত্য। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র যিনি পড়েছেন, তিনি তখনকার রাজসরকারের ব্যবস্থার কথা দেখে বিস্মিত হবেন। রাজ্য শাসনের জন্য আজকাল যেমন বিভিন্ন বিভাগ আছে,—অর্থ, সেচ, কৃষি, অন্তঃশুল্ক, শুল্ক ইত্যাদি, চাণক্যও সেই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থশাস্ত্রে খনিজ, আকরিক, ধাতু, তাদের চেনবার উপায়, আকরিক থেকে ধাতুনিষ্কাশনের উপায় বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ ধাতুতে অন্য ধাতু মিশিয়ে মিশ্রধাতু উৎপাদনের বিধান আছে। মিশ্রধাতু থেকে মুদ্রা তৈরী প্রণালীর উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্তের যুগে রসায়নের ব্যবহারিক দিকের অনেকটা খবর অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সোনা, রূপা, তামা, সীসা ও লোহার আকরিকের উল্লেখ আছে। সোনার আকরিক সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে,—সুবর্ণ আকরিক ভারী। পাকা হলুদের মত রং তার। বালুস্তরের সঙ্গে মিশে থাকে। সোনার সঙ্গে তামা বা রূপা মিশিয়ে মিশ্রধাতু উৎপন্ন হয়।

রূপার আকরিকের রং শঙ্খের মত, পায়রার গ্রীবার রংয়ের মত। রূপার আকরিকে সীসা আকরিক মিশ্রিত থাকে।

তামার আকরিকের রং সবুজ, লাল বা হলুদ হতে পারে।

সীসার আকরিক রং গোপিত্তের মত।

টিনের আকরিকের মেটে রং। লোহার আকরিক লাল রংয়ের।

খনিজ ও খনির তত্ত্বাবধায়কের তামা ও অন্যান্য খনিজের জ্ঞান থাকা দরকার। তাঁর পারদ পরিস্রাবণ ও মণিমাণিক্য চিনতে পারা উচিৎ। তিনি খনিজ আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ঘন্ত্রপাতি, যেমন মুচি, ব্যবহার করবেন। কাঠকয়লা ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহার করবেন। শ্রমিকের সাহায্যে কাজ করবেন। খনিজের তত্ত্বাবধায়কের নাম হল, লোহাধ্যক্ষ। তিনি তামা, সীসা, টিন, পিত্তল, ব্রঞ্জ প্রভৃতি তৈরি করবেন। 'লোহা' কথাটি ধাতু অর্থে ব্যবহার হল।

ট্যাঁকশালের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। রৌপ্য মুদ্রায় চার ভাগ তামা, এগার ভাগ রূপা আর এক ভাগ সীসা, টিন বা লোহা মিশাবার বিধান দেওয়া আছে। তাম্রমুদ্রায় চারভাগ রূপা, এগার ভাগ তামা, আর এক ভাগ সীসা, টিন বা লোহা মিশাবার ব্যবস্থা আছে।

সোনা আর রূপার ধাতুগত ধর্মের কথা বলা আছে—যেমন, সোনা আর রূপাকে টেনে

তারের মত লম্বা করা যায়, মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা যায়। সোনার গহনায় পাথর বসান যায়।

অর্থশাস্ত্রে কাচের উল্লেখ আছে। হীরাজহরতের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। লবণ ও সমুদ্রজাত শঙ্খাদি পদার্থ সংগ্রহের উল্লেখ আছে। দুগ্ধজাত অন্নের কথা আছে। বীজ থেকে তেল সংগ্রহের কথা আছে। তিসি, নিম, তিল, ইঙ্গুদী, তেল নিষ্কাশনের উল্লেখ আছে।

কিণ্বের সাহায্যে মদ্য পাচনের প্রণালীর বর্ণনা আছে। অন্তঃশুল্ক বিভাগের শুল্ক নির্ধারণের জন্য মদ্যের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

ভাত থেকে পাচন করে মেধক উৎপন্ন হয়। মদনা পাচন করে প্রসন্ন, চিনি ও মধু পাচন করে আসব, গুড় আর পিপুল ও ত্রিফলা মিশ্রণ করে মৈরেয়, আর দ্রাক্ষারস থেকে মধু নামে মদ্য প্রস্তুত করা হত। অরিষ্ট হল স্বাস্থ্যবর্ধক মদ্য।

কিণ্ব তৈরি করা হত মাষকলাই বাটা আর ভাত থেকে। আমের রস থেকেও মদ তৈরি হত। তাতে সুগন্ধ দ্রব্য মেশান হত। তাকে বলা হত মহাসুরা। রাজা যে মদ ব্যবহার করতেন, সে পরিমাণের উপর শুল্ক ধরা হত না। অন্যদের জন্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ৫% ভাগ শুল্ক ধার্য ছিল। মেলা বা উৎসবের সময় ধরে চারদিনের জন্য মদ তৈরী করলে তাতে কর ধরা হত না। জনপদবাসী বিভোর হয়ে নিঃশুল্ক মদ্য পান করতেন।

চন্দ্রগুপ্তের সময় বলতে গেলে রসায়নের প্রসার ভালই হয়েছিল। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশনপ্রণালী উন্নত ছিল। পারদ যৌগিক জানা ছিল ও পারদ ধাতু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। পিতল, ব্রঞ্জ, সোনা, রূপার মিশ্রধাতু তৈরি হত, তাদের ব্যবহারও হত। হিঙ্গুল বা সিঁদুর আসত চীন দেশ থেকে; টিন আকরিক মালয় বা পারস্য থেকে। রূপার আকরিক আসত আফগানিস্তান থেকে।

চরক আর সুশ্রুতের আমলে ভেষজবিজ্ঞান বৃদ্ধি পেল। বহু রাসায়নিক প্রণালী উদ্ভাবিত হল। চরক সোনা, রূপা, তামা, সীসা আর টিন ধাতুর উল্লেখ করেছেন। এই সব ধাতুর যৌগিক ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। চরক সোরা, সম্ভব লবণ, সামুদ্রিক লবণের কথা বলেছেন। উদ্ভিজ্জ ঔষধের সঙ্গে ভুঁতে মিশিয়ে লেপনের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক পটাশকার্বনেট বা ক্ষার তৈরি প্রণালী বর্ণনা করেছেন। পলাশ গাছের শুকনা ডাল পুড়িয়ে ছাই করে নিয়ে জল দিয়ে কোটালে, ক্ষার জলে দ্রবিত হয়। তারপর পরিস্রাবণ করলে জলে ক্ষার দ্রবিত থাকে। পরিস্রুত দ্রবণে তাপ দিলে জল বাষ্পাকারে উবে যায় আর সাদা ক্ষার চূর্ণাকারে পাওয়া যায়।

চরক মরিচা বা লৌহ অক্সাইড থেকে ঔষধ তৈয়ারির কথা বলেছেন। মদ্য তৈরির জন্য শস্য, ফলমূল, কিণলয়, বল্কল, ইক্ষু ব্যবহার করার কথা বলেছেন। চুয়ানী রকম মদের উল্লেখ

করেছেন। অথর্ববেদের শ্রেণীভাগ অনুযায়ী চরকও ঔষধকে ভৈষজ্যানি ও আগদানি বলেছেন।

সুশ্রুতসংহিতায় প্রস্তুত প্রণালীর কথা বলেছেন। বলেছেন ক্ষার তিন রকমের—মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ। ক্ষার ও অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। তাতে ক্ষারত্ব নষ্ট হয়। কাঞ্জিক অম্ল, ভাত পচলে যে অম্লের সৃষ্টি হয়, তাতেই ক্ষারত্ব নষ্ট হয়। সোহাগার কথা বলা হয়েছে। সোহাগাকে এক জাতীয় মৃদু ক্ষার বলা হয়েছে।

সুশ্রুত ঔষধ হিসাবে তুঁতে, হীরাকস, ফটকিরি ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

সুশ্রুতও মদ্য পাচনের ব্যবস্থা উল্লেখ করেছেন; দ্রাক্ষারস থেকে, খেজুর থেকে, আখের রস থেকে, মধু থেকে, ভাতের মণ্ড ও বালি থেকে মদ তৈরির কথা বলেছেন।

বুদ্ধদেবের অন্তিম ভোজন

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এম. এ., পুরাণরত্ন,
বিদ্যাবিনোদ

১

বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীর শেষ যামে কুশীনগরে মল্লদিগের শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তৎপূর্ববর্তী দিবস বুদ্ধদেব বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ পাবা নগরে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন (পাবায়ং বিহরতি চুন্দস্স কম্মারপুত্তস্স অম্ববনে)। চুন্দ ছিলেন মহাধনাঢ্য এবং পূর্ব হইতেই বুদ্ধদেবের প্রতি একান্ত অনুরাগী। তিনি আর্য শ্রাবক হইয়া স্বীয় আম্রকাননে বিহার নির্মাণপূর্বক ভগবান্ তথাগতকে দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ পাবায় আসিলে তথায় অবস্থান করিতেন।

স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ যখন শুনিতে পাইলেন যে, বুদ্ধদেব পাবায় শুভাগমন করিয়া তাঁহারই আম্রকাননে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন চুন্দ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা পথপ্রদর্শন করিলেন (সন্দস্সেসি), পথ গ্রহণ করাইলেন (সমাদপেসি), সম্যক্ প্রকারে উৎসাহিত করিলেন (সমুত্তেজেসি) এবং অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিলেন (সম্পহংসেসি)।

বুদ্ধবাণী চারি লক্ষণ বিশিষ্ট ;—(১) ইহা পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে, (২) গন্তব্যপথে আনিয়া স্থাপন করে, (৩) তাহাকে মহা উৎসাহে উদ্দীপিত করে এবং (৪) তাহার চিত্তকে মহা আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেয়।

অনন্তর চুন্দ ভগবানের ধর্মদেশনায় উজ্জীবিত হইয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্! আমার পুণ্যার্থ আগামীকল্য নদীপ গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান্

মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চুন্দ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২

স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ সেই রাত্রি প্রভাত হইলে বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য নানাপ্রকার উত্তম খাদ্যদ্রব্য এবং বিশেষ করিয়া প্রচুর 'শূকর মদ্দব' (সূকরমদ্দবং) প্রস্তুত করাইলেন। আহার্য প্রস্তুত হইলে চুন্দ ভগবানকে সংবাদ জানাইলেন। ভগবান্ পূর্বাহ্ণ সময়ে পাত্রচীবর ধারণপূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত চুন্দের গৃহে গমন করিলেন। তথায় ভোজনার্থ সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া আহার্য দ্রব্যাদির বিষয় অবগত হইলে বুদ্ধদেব চুন্দকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন :

যন্তে চুন্দ সূকরমদ্দবং পটিয়ত্তং, তেন মং পরিবিস, যং পনঞ্ঞং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিয়ত্তং, তেন ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসাতি।—(মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, ৪।১৭)

হে চুন্দ! তুমি যে 'শূকর মদ্দব' প্রস্তুত করিয়াছ তাহা আমাকেই পরিবেশন কর; আর অন্যান্য খাদ্য ভোজ্য যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই সমুদয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন কর।

ভগবানের নির্দেশ অনুসারে চুন্দ 'শূকর মদ্দব' শুধু তাঁহাকেই পরিবেশন করিলেন এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন।

এক্ষণে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে 'শূকর মদ্দব' পদার্থটি কী এবং বুদ্ধদেবের উক্তরূপ নির্দেশের তাৎপর্য কী?

উদান গ্রন্থের টীকাকার 'শূকর মদ্দব' শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন,—

(১) মহা অট্ঠ কথার মতে 'শূকর মদ্দব' শব্দে শূকরের মৃদু বা কোমল তৈলাক্ত মাংস বুঝায়। নাতিতরুণ, নাতিজীর্ণ বন্য বরাহের মৃদু স্নিগ্ধ মাংস ঔষধযোগে পক্ক করিয়া 'শূকর মদ্দব' প্রস্তুত করা হইত।

(২) কেহ কেহ বলেন, 'শূকর মদ্দব' অর্থ শূকরের মাংস নহে, শূকরের পদমর্দিত কন্দ-বিশেষ, বাঁশের কোঁড় বা কচি বাঁশ।

(৩) কাহারো কাহারো মতে শূকরের দ্বারা মর্দিত স্থানে যে 'অহিচ্ছত্তক' বা ব্যাঙের ছাতা (mush-room) জন্মে তাহাই শূকরমদ্দব নামে অভিহিত।

(৪) মতান্তরে ইহা একপ্রকার রসায়ন। রসায়ন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ আসন্ন জানিতে পারিয়া ভক্ত চুন্দ এই রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন যেন তিনি আরও কিছুদিন জীবনধারণ করেন।

দেবগণ জানেন যে, ভগবান্ তথাগতের অন্তকার আহারই শেষ আহার, তিনি আর আহার গ্রহণ করিবেন না। সেই হেতু দ্বিসহস্র দ্বীপ পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপের দেবগণ শূকরমদ্দবে দিব্য ওজ প্রক্ষেপ করেন। দিব্য ওজ প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহা অতি উৎকৃষ্ট ভোজনে পরিণত

হইয়াছিল। সেই কারণে বুদ্ধদেব তাহা অপরকে পরিবেষণ করিতে নিষেধ করিলেন। নিজে গ্রহণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রোথিত করিতে চুন্দকে নির্দেশ দিলেন।

তিব্বতীয় বুদ্ধজীবনচরিতে 'চুন্দ' স্থানে 'কুন্দ' নাম দৃষ্ট হয়। তাহাতে 'শূকর মদ্দবের' কথা নাই, আছে খাদ্যবিশেষের উল্লেখ আছে।

৩

আহারান্তে ভগবান্ তথাগত স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চুন্দ, তোমার পাত্রে আর যে শূকর মদ্দব অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা গর্তে পুতিয়া ফেল।" চুন্দ তাহাই করিলেন। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে ধর্মোপদেশ দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

চুন্দের প্রদত্ত খাদ্য ভোজনের পর মুহূর্তেই বুদ্ধদেবের ভীষণ রোগ উৎপন্ন হইল; রক্ত আমাশয় হেতু তীব্র বেদনা আরম্ভ হইল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও সংপ্রজন্য সাহায্যে উহা সহ্য করিতে লাগিলেন। (স্মৃতি = mindfulness, সংপ্রজন্য = self-possession)। গাথায় উক্ত হইয়াছে :

চুন্দস্স ভত্তং ভুঞ্জিত্বা কম্মারপুত্তিয়ো মে সুতং।
আবাধং সম্ফুসীধীরো পবাল্হং মারণন্তিকং॥

স্বর্ণকার পুত্র চুন্দের অন্নভোজন করিয়াই ভগবান্ মরণান্তিক বিষম রোগাক্রান্ত হইলেন, এইরূপ শুনিয়াছি।

ভুত্তস্স চ সূকরমদ্দবেন
ব্যাধিপ্পবাল্হো উদপাদি সত্থুনো।
বিরেচমানো ভগবা অবোচ
গচ্ছামহং কুসিনারং নগরন্তি॥

শূকরমদ্দব ভোজন করায় শাস্তার প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইল। পুনঃ পুনঃ বিরেচন হইলেও ভগবান্ বলিলেন, আমি কুশীনগরে যাইব।

পাবা হইতে কুশীনগর ৩ গব্যূতি (= ৬ মাইল) ব্যবধান। মধ্যাহ্ন সময়ে পাবা হইতে যাত্রা করিয়া বুদ্ধদেব সূর্যাস্ত সময়ে কুশীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে ককুধা নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া ভগবান্ অপর তীরবর্তী আম্রবনে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

৪

বৈশাখী পূর্ণিমা অপরাহ্ণকাল। শ্রান্ত ক্লান্তদেহ বুদ্ধদেব সিংহশয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আনন্দ, যদি কেহ স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে এইরূপ বলিয়া তাহার অনুতাপ উৎপাদন করে যে, চুন্দ, তোমার কি কুক্ষণে জন্ম হইয়াছিল!

তথাগত সর্বশেষে তোমারই পিণ্ড ভোজন করিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। চুন্দ এই প্রকারে অভিযুক্ত হইলে তুমি তাহাকে বুঝাইবে,- বন্ধো চুন্দ! তোমার কত বড় সৌভাগ্য, কি শুভমুহূর্তে তোমার জন্ম হইয়াছিল যেহেতু তথাগত তোমারই শেষ পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আনন্দ, তুমি চুন্দকে বলিবে,—হে চুন্দ! আমি ভগবানের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারই নিকট শিখিয়াছি যে,—

"দ্বে মে পিণ্ডপাতা সমা সমফলা, সমবিপাকা অতিবিয় অঞ্ঞেহি পিণ্ডপাতেহি মহপ্ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ।"

আমার দুইটি পিণ্ডপাত সমান, সমফল, সমবিপাকপ্রদ, অপর পিণ্ডপাত হইতে অত্যধিক ফলপ্রদ ও অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ।

কোন্ দুইটি পিণ্ডপাত (ভোজন)? (১) যেই পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সংবোধি লাভ করেন অর্থাৎ সুজাতার পায়সান্ন এবং (২) সেই পিণ্ডপাত ভোজনান্তে তথাগত অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ চুন্দের প্রদত্ত শূকর-মদ্দব।

স্বর্ণকারপুত্র আয়ুষ্মান চুন্দ এই পুণ্যের ফলে দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য, সুখ, যশ এবং স্বর্গলাভ করিবে। হে আনন্দ! তুমি এই সব কথা বলিয়া চুন্দের মনস্তাপ দূর করিবে।

অনন্তর ভগবান্ দানফল ও শীলাদি মাহাত্ম্য বিষয়ে এই প্রীতি-গাথা (উদান) উচ্চারণ করিলেন:

দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি
সঞ্ঞমতো বেরং ন চীয়তি।
কুসলো পজহতি পাপকং
রাগদোসমোহক্খয়া সনিব্বুতোতি॥

(মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, ৪।৫১)

দানকারীর পুণ্য বর্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির হৃদয়ে বৈরিভাব বৃদ্ধি পায় না, কুশল ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করেন এবং রাগ দ্বেষ মোহের ক্ষয় হেতু নির্বাণলাভ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন ও নবীন সংগীত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

নবীন যখন পুরাতনের স্থান দখল করে, তখন একদল এই ভেবে খুশি হন যে, একঘেয়ে ভাব দূর হয়ে টাট্‌কা নূতনের জয় হ'ল ; আর একদল যাঁরা প্রাচীনকে শুধু প্রাচীন বলেই শ্রদ্ধা জানাতে অভ্যস্ত, তাঁরা এই ভেবে দুঃখ করেন যে, প্রাচীনের গুরুত্ব এবং মূল্যবোধ আধুনিকপন্থীর মনে আর স্থান পাচ্ছে না। এই দুটি বিপরীত মনোভাবের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে অদৃশ্য শক্তি লীলা করে বেড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস। কোনো একটা ব্যাপারের পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেবার সময় আমরা প্রায়ই বিশেষ ভাবনা চিন্তা করে মত দিই না,—মতটা জমাট বাঁধা সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই পুষ্টিলাভ করে। অথচ অনুসন্ধানের ফলে এই কথাটাই অনেক সময় আমরা মানতে বাধ্য হই যে, আমাদের এতদিনকার ধারণাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তির সাহায্যে রচিত হয় নি।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মনে আছে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ একদিন খাঁ সাহেব আবদুল করিমের গান শুনে আমার কাছেই বলেছিলেন : "এই যদি খেয়াল হয়, তা হ'লে ঠুংরি বলব কোন্ গানকে ?" তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি কাল্লে খাঁ, তসদ্দুক হোসেন খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ প্রভৃতির গান শুনেছেন এবং তাঁদের গানকেই তিনি খেয়ালের আদর্শ বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর ধারণা অনুসারে আবদুল করিমের গান একটু আলাদা ধরণের মনে হবার কারণ ছিল বৈকি ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব, কতকগুলি পরিবর্তন এবং অভিনব সৃষ্টির ফলেও আবদুল করিমের গান যে খেয়ালই ছিল, সে কথাটা বুঝবার উপযোগী মনের প্রস্তুতি আমার এই বন্ধুটির ছিল না। এক কথায় খেয়ালের রূপ বিবর্তনের ধারা তাঁর জানা থাকলে তাঁর মনে এই প্রশ্নটা জাগত না যে, আবদুল করিমের গানে খেয়ালের বীজ বিদ্যমান ছিল কিনা।

আবদুল করিম সাহেবের গান হয়ত তখনকার আমলের অনেক শ্রোতার পক্ষে শোনা সম্ভব হয় নি। এই কারণে আর একটা গীতরীতি নিয়ে আলোচনা করছি,—সেটা হচ্ছে ধ্রুপদ। আমরা বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে ধ্রুপদ শুনতে পাই—অন্তত যাঁরা শোনে নি তাঁদের পক্ষে

ধ্রুপদ শোনবার সুযোগ মেলা শক্ত নয়। এই ধ্রুপদ যিনি শুনেছেন তিনিই ধরে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, ধ্রুপদ সুরের সবল এবং সাবলীল প্রয়োগ আছে, কিন্তু আলংকারিক প্রয়োগ বিষয়ে তা খেয়ালের তুলনায় দরিদ্র। ধ্রুপদের এই দারিদ্র্যের প্রতি অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং তার ফলে বর্তমানে সঙ্গীত বিষয়ে প্রতিভাসম্পন্ন কোনো শিক্ষার্থীই আর ধ্রুপদ শিখতে চেষ্টা করেন না, সঙ্গীতের আসরেও ধ্রুপদ শ্রোতার মনে আগেকার মত আনন্দ আর উদ্দীপনারও সৃষ্টি করে না।

অথচ, তর্কের খাতিরে আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য, আমাদের যাবতীয় রীতি-নিবদ্ধ সঙ্গীতের ভিত্তি হচ্ছে ধ্রুপদ। সব রাগে খেয়াল গাওয়া হয় না, অতি অল্পসংখ্যক রাগেই টপ্পা বা ঠুংরি গাওয়া হয়, কিন্তু এমন কোনো রাগ নেই যাতে ধ্রুপদ গাওয়া যায় না, এমনকি কোনো একটা রাগে ধ্রুপদ গাওয়া হয় না, এমন কথা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সে রাগটা রাগপদবাচ্যই নয়।

কিন্তু তা হ'লে কি হয়? ধ্রুপদের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও সমাদর নেই।

মর্যাদাসম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি গীতরীতি কি কারণে শ্রোতৃসমাজের সমাদর লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হোলো তার কারণ খুঁজতে হবে।

এটা ঠিক কথাই যে ধ্রুপদ গায়কগণ, বিশেষ করে বাংলাদেশে, গলার জোরের ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেন, তাললয়ের দিকে যতটা নজর দেন, কণ্ঠের সৌন্দর্য বা স্বরবিশুদ্ধির জন্য ততটা পরিশ্রম চেষ্টা করেন না। নানারকমের লয়ের ও বাঁটের মারপ্যাঁচের পরে সমে পৌঁছে যাবার নিপুণতায় তাঁরা যতটা দক্ষ এবং সেই দক্ষতা-প্রদর্শনের পুরস্কারস্বরূপ সমবেত শ্রোতৃকণ্ঠে একটা "হাঁ" শুনে তাঁরা যে গৌরব অনুভব করেন, স্বরজ্ঞানসম্পন্ন শ্রোতারা প্রায়ই যে সেই হাঁ-তে অন্তরের সঙ্গে সায় দেন না, এরকম ব্যাপার অনেক আসরেই লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্রোতার অন্তরকে এই গান স্পর্শ করতে অসমর্থ হওয়ার ফলেই এর স্থান সঙ্গীতের আসরে আর বিশেষ হচ্ছে না। এদিকে দূর থেকে মর্যাদার নমস্কার লাভ করেই ধ্রুপদগায়ক সন্তুষ্ট আছেন, তবে গানে গলদ কোথায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না।

খেয়ালের অবস্থা অন্য রকমের। নিত্য নূতন অভিনবত্বের আমদানি করে খেয়াল তার সজীবতা রক্ষা করতে কখনো কুণ্ঠিত নয়। খেয়ালের নানা ঘরাণার শৈলীই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ধ্রুপদ তার চিরাচরিত অভ্যাসকে ত্যাগ করতে পারছে না, আর এই না পারাটাকেই সে তার উচ্চাঙ্গত্বের লক্ষণ মনে করে গৌরব অনুভব করে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যে অভ্যাস বা ধারাকে আমরা চিরাচরিত বলেছি, সেটা কি বাস্তবিকই চিরাচরিত? সেটা কি এতই প্রাচীন যে, কেউ হলফ করে বলতে পারেন "এখনকার দিনের ধ্রুপদ গান আর তানসেনের গানের শৈলী একই? এখনকার ধ্রুপদ গায়ক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তানসেনের যথার্থ উত্তরাধিকারী?" যদি বলেন 'হ্যাঁ, তাই', তা হলে সঙ্গে

সঙ্গে জবাব দিতে পারব যে, তানসেনের গায়কী আর শৈলীতে প্রশংসার মত কিছুই ছিল না, দিল্লীর বাদশাহের পামপেয়ালী আর অনুগ্রহই ছিল তানসেনের খ্যাতির একমাত্র কারণ, এবং এখনকার উন্নত ধরণের শিল্পরসিক শ্রোতার বিচারে তার কোনো দাম নেই বলেই ধ্রুপদ আজ ধরাশায়ী হ'তে চলেছে।

কিন্তু এটা আমাদের মনের কথা নয়, এটা ধ্রুপদ সম্বন্ধে আধুনিক কালের ধারণা যে ঠিক নয়, সেই কথাটা পাড়বার মুখে একটা ভূমিকা মাত্র।

যাঁরা মনে করেন ধ্রুপদগানের সুরে বলিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম অলংকার প্রয়োগ নেই, মোটা-মোটা মীড় গমক আর দুটই তার একমাত্র অলংকার, তাঁদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আছে :

(১) তাঁরা কি দাবী করেন না যে, ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর্ণযুগে ধ্রুপদই একমাত্র গীতরীতি ছিল ?

(২) তাঁরা ধ্রুপদকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসম্মত গীতরীতি বলে দাবী করেন না কি ?

(৩) তাঁরা কি একথা বললে বিস্মিত হবেন যে, সেই স্বর্ণময় যুগে লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিই আজকের দিনে বেশি পরিমাণে লভ্য ?

(৪) মধ্যযুগের অধিকাংশ সঙ্গীতগ্রন্থে অজস্র পরিমাণে অলংকারের বর্ণনা আছে, এটা কি তাঁরা লক্ষ্য করেছেন ?

(৫) ধ্রুপদে যদি তাই সব অলংকার অপ্রযোজ্য হয়ে থাকে, তা হলে তাদের প্রয়োগ হ'ত কোন্ কোন্ গীতরীতিতে ? এবং

(৬) সেই সব গীতরীতির স্বরূপ কি, আর ধ্রুপদের তুলনায় তাদের স্থান কোথায় ?

(৭) ধ্রুপদাতিরিক্ত এই সব গীতরীতি যদি তেমন উচ্চশ্রেণীর না হয়ে থাকে, তা হলে শাস্ত্রকারগণ কি জন্য সেই সব রীতির পোষক অলংকারগুলির সবিস্তার বর্ণনা করলেন, আর ধ্রুপদকে করলেন অবহেলা ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে স্বাভাবিকভাবে এই কথাই মনে হবে যে, ধ্রুপদে এমন অনেক অলংকার তখনকার দিনে প্রয়োগ করা হ'ত যেগুলি আজকাল আর করা হয় না। ধ্রুপদকে এইভাবে নিরলংকার করার ফলেই যে ধ্রুপদ যে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে এ' বিষয়ে সন্দেহ করবার বাস্তবিক কোনো অবকাশ নেই।

এদিকে খেয়ালগানের বিবর্তন লক্ষ্য করলে এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন গীতজ্ঞীর আওতায় গঠিত বিভিন্ন ঘরাণার নানা গুণীর ক্রমাগত চেষ্টা ও কল্পনার আশ্রয়ে অজস্র বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়ে, খেয়াল আজ সর্বজন সমাদৃত গীতরীতিতে পরিণত হয়েছে। এই সব বৈচিত্র্যের সবগুলিই যে সমর্থনযোগ্য তা বলছি না,—উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি ঘরাণার তানবাজীর অতিরিক্ত প্রয়াস ও উৎসাহ শিল্পবোধের ওপরেও স্থান দিয়েছে কদরত বা কায়িক

ব্যায়ামকে। তানবাজীর এই আতিশয্যকে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতে স্থান না দেওয়াই উচিত। কিন্তু খেয়ালের শুধু স্থায়ী অন্তরাতে যে সমস্ত অলংকার বা 'গমক' প্রয়োগ করা হয় সেগুলির সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। আমার মনে হয় এই জাতীয় অধিকাংশ 'গমক' (আধুনিক অর্থে নয়) কোনো না কোনো সময়ে ধ্রুপদের অঙ্গে স্থান পেতো। খেয়ালের জন্ম হয়ত অনেককাল আগেই হয়েছে, কিন্তু এর পরিপুষ্টি আর সর্বাঙ্গীন উন্নতির ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়, অন্তত মধ্যযুগের সঙ্গীতগ্রন্থ রচনার পরেই এই ইতিহাসের আরম্ভ। সুতরাং ধরে নিতে আপত্তি নেই যে, ঐ সব গ্রন্থের বর্ণিত অধিকাংশ 'গমক' ধ্রুপদগানেই প্রযোজ্য ছিল। গমকের বৈচিত্র্য গীতরীতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয় এতে আর কোনো ভুল নেই, আর ঐ বৈচিত্র্যের জন্যই এক সময়ে ধ্রুপদের গায়কী অনুসারে তার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক হয়েছিল। সেই শ্রেণীবিভাগ থেকেই আমরা ধ্রুপদের চারটি বাণী—গোবরহার, খাণ্ডার, ডাগুর এবং নওহার পেয়েছি। এখনকার প্রচলিত ধ্রুপদে বাণীর এই বৈচিত্র্য আর সেই বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগের কথা আমাদের চিন্তাতেও আসে না।

ধ্রুপদের বাণী সম্বন্ধে এমনকি গুণীদের ধারণাও যে অনেকদিন আগেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর সেই কুয়াশার আবরণে আত্মগোপন করে যে অনেক সঙ্গীতগুণী নিজেদের পরিচয়কে অযথা গৌরবমণ্ডিত করতে আরম্ভ করেছিলেন, তার নিদর্শন এই চলতি আমলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছি। ফলে চার বাণীর কোন্‌টার স্বরূপ কি, আর কোন্ গুণীর বংশে কোন্ বাণীটি অবলম্বিত হয়ে আছে কি নেই সে খবর নিতান্তই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

নবীন সঙ্গীত বলতে আমরা আধুনিক বাংলা গানের পর্যায়ের সঙ্গীতের কথা বলছি না, তথাকথিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরই বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলছি। আমাদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, নবীন পরিস্থিতির মধ্যে বিপর্যয় ঘটুক বা প্রাচীনের ধ্বংসাবাহনের ফলে নবীন বিদায় গ্রহণ করুক। যেহেতু সঙ্গীত পরিবর্তনশীল, সেই হেতু পরিবর্তনকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। তবে অভিনবত্বের দাপটে প্রাচীনের উচ্চস্তরের প্রণালীবদ্ধ শিল্পসৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে শিল্পের নামে কলাকার কল্পনা আমাদের পেয়ে না বসে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে।

আমরা বলি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তিস্বরূপ যে ধ্রুপদ, সেই ধ্রুপদকে তার প্রাচীন গৌরবে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ' কাজ সভাসমিতি করে শুধু ওজস্বিনী ভাষায় ধ্রুপদের জয়গান করলে হবে না। দেখতে হবে ধ্রুপদের স্বর্ণযুগে এর গীতিপদ্ধতি কি ছিল, কোন্ কোন্ গমক বা অলংকার তাতে প্রযোজ্য ছিল, এর জন্য কি ধরণের কণ্ঠমার্জনা আবশ্যক হোতো, ইত্যাদি। এই সব উপাদানের মধ্যে যা যা এখনকার রুচির প্রতিকূল বলে মনে হবে, সেগুলি বাদ দিয়ে, আর প্রয়োজন মত নূতন কোনো গায়কী যোজনা করে, পরিবেশন-প্রণালীর মধ্যে শিল্পবোধসম্মত উপায় অবলম্বন করে এই প্রাচীন গীতিকে নবীনের উপযোগী করে তুলতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটবে একথা নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-প্রীতি

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ. (কলিঃ),
এইচ. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন)

উপনিষদের শুভ্ররসে পুষ্ট, ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের কাব্যরসে আবাল্য পালিত রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন তপোবন ও আশ্রমের প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মহর্ষির শিক্ষা ও উপদেশও তাঁহার মনকে বিপুলভাবে আশ্রমমুখীন করিয়াছিল, ইহা কল্পনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হইবে না। সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ও তপোবনের যে মনোরম ও গৌরবময় চিত্র পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পরে মহর্ষির সহিত নগরীর কলকোলাহল হইতে দূরে শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এই ভালবাসা আরও গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠে। প্রথমে যা ছিল ভাবময় সত্তা, পরিণত বয়সে তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠিল বিশ্বভারতীতে।

কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম হইলেও মানুষের সৃষ্ট এই কৃত্রিম নগরীকে কবি কোনদিন ভালবাসিতে পারেন নাই—সেখান হইতে সম্ভবমত দূরে দূরেই থাকিয়া গিয়াছেন। নগরকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, "আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশঃই চারদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে। চুণ-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।"

বনের সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় সম্বন্ধ তাকে কবি কোনদিনই নির্জীব, শুষ্ক বা পৃথক বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। তপোবন ভারতবর্ষের চিত্তকে চিরদিন যে কিরূপ নিবিড়

STUDENTS ... COMMON-ROOM

স্নেহের রসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, তাহা বিগত দুটি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে ; বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবনে, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন ; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নাই, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।"

য়ুরোপের মত ভারতবর্ষেও নগর, রাজ্য, সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রকৃতি ভিন্ন। ভারতবর্ষ নগরের সহিত অরণ্যের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল—অরণ্যকে বিলুপ্ত করে নাই। "অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নাই, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল ; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার অরণ্য—যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে ; কিন্তু যোগের আশ্রম নয়।"

অরণ্যের নিকট ঋণ বা তাহার সহিত নিবিড় সম্বন্ধ প্রাচীন ভারত কোনদিন অস্বীকার করে নাই। মহাতেজা তপস্বীরা যাঁরা বনকে আপন করিয়া লইয়া বনেই আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁদের তপঃপ্রভাব রাজা মহারাজাকে বনে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাঁদের সে সাধনা ব্যর্থ হয় নি। তাই দেখা যায় সেই পুণ্যপ্রভাবে ভারতবর্ষ তপস্যাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়াছিল এবং তপস্বীদেরই আদিপুরুষ বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। এ বিষয়ে কবির নিজ বক্তব্য শুনা যাক্।

"তপস্যাকেই সে সকল প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ ব'লে মেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ কথায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবন স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার চেষ্টা করে নি ; কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকে তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে।.....কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে।"

রঘুবংশে তপোবনের যে শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যের বর্ণনা আছে, তা কবিকে অভিভূত করিয়াছে। সেখানকার সরল, অনাড়ম্বর জীবন, পশু-পক্ষীর নিঃশঙ্ক ভাব, প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় মিলন ও সেই মিলনের পূর্ণতা, আশ্রমের শান্ত সমাহিত ভাব কবি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন,—

"সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের

সন্তানের মতো, তারা নীবার-ধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখীরা নিঃশঙ্ক মনে আলবালে জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে ···এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানের চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।"

তাই "কবি মনে করেন মানুষের যথার্থ শিক্ষার স্থান তপোবন। "আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে। তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।"

সাধনা ও শিক্ষা প্রাচীন ভারতে একদিন একসাথে মিলিত হইয়া মানুষের জীবনকে সিদ্ধির পথে আগাইয়া দিয়াছিল, চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না দিয়া তাহার পুঞ্জীভূত শক্তিকে মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইয়াছিল।

"এদেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল; সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া ও দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই, তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"

প্রাচীন আশ্রমের আহ্বান যে কত মধুর ও মর্মস্পর্শী, তাহার এক অনবদ্য চিত্র কবি তাঁর অতুলনীয় ভাষায় আঁকিয়াছেন:

"সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্-শিবমদ্বৈতম্ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি না কেন, তিনি ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না; তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীকে পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।"

লোকে হয়ত বলিতে পারে মানুষের আবাস হইতে দূরে, নিভৃত স্থানে আশ্রম করিলে, তাহার মধ্যে নূতনত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যকে তাহাতে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া

সম্ভব হইবে না। ভালমন্দ, আলোছায়া লইয়াই সংসার—মন্দের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এইভাবে আপনার চারিদিকে বেড়ার জাল বুনিলে মন্দকে এড়াইতে ত পারা যাইবেই না, উপরন্তু লোকালয়ে থাকিয়া মন্দের সহিত যুঝিয়া যে আত্মশক্তি লাভ করা যায়, তাহাও হারাইতে হইবে। তাহার উত্তরে কবি বলিয়াছেন :

"এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার একটা সৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই ; সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোন কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে ; কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই ; কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের ? সে জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো।.....হয়ত বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠাপড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া ? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকারের গোলাপ ; আর বার বার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।.....আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য দিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপোস করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকে।.....আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো একটা অদ্ভুত অসম্ভব সুপ্রদুর্লভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থূলদেহের ঐক্য আছে, একথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম আত্মাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই যেখানে তাহার আত্মখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ ; তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে।"

আশ্রম সম্বন্ধে পুনরায় কবি বলিতেছেন :

"আশ্রম বলিতে আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে, যে ভাবটি ভরিয়া উঠে, তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা

আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি ; তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তর সঙ্গে তাহার ভারি একটা সংগতি দেখিতে পাই, এই জন্যই তাহাকে এমন সত্য, এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে।.....এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্ত বায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে এ সমস্তই যে সত্য ; চিরকালের সত্য।..... সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে, আমাদের কাব্য-পুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে ; সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব।"

তাই, কবি তাঁর ধ্যানের বিস্তারতন শান্তিনিকেতন লোকালয় হইতে দূরে নির্জন প্রান্তরে স্থাপন করিলেন। তাঁহার কল্যাণময় হস্তের স্পর্শে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব জীবন যুক্ত হইল। সেখানে,—

"ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা সেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোন সংকীর্ণ দেশকাল-পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, সেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ-সংগীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে, সেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবন চেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, এবং সেখানে ছোটোবড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।"

কবিতা

(১)

প্রাপ্তি-রহস্য

শ্রীকপিভূষণ চক্রবর্তী

জীবন ভরিয়া শুধু পেতে চাও—চাও না কিছুই দিতে ;
বিফল প্রয়াস—হায় রে কৃপণ ! পারিবে কি কিছু নিতে ?
ভাণ্ডারী বড়ো হুঁশিয়ার, তার হিসাবে হয় না ভুল ;
যে যেমন দেয়, সে তেমন পায়—দেওয়াই পাওয়ার মূল।

রুদ্ধ রাখিয়া দ্বার, বাতায়ন—আলো-বায়ু পেতে চাও ?
যে বাতাস থাকে রুদ্ধ মাঝারে, দূষিত হয় যে তাও।
খুলে দাও দ্বার যতো বাতায়ন—নব আলো, বায়ু পাবে ;
পুরাতন যদি হয় নিঃশেষ নূতনে ভরিয়া যাবে।

জমায়ে রাখিতে পারিবে না কিছু, প্রকৃতি কাড়িয়া লবে ;
মমতাপূর্ণ যতো সঞ্চয়—একদা দিতেই হবে।
দিতে হবে প্রিয় জীবন তোমার যৌবন-ধন-মান ;
বীরের মতন হাসিমুখে তাই স্বেচ্ছায় করো দান।

নদী আপনার জলধারা ল'য়ে ধায় সাগরের পানে ;
সাগর পূর্ণ করে যে নদীরে বিপুল সলিল দানে।
ক্ষুদ্র ত্যজিলে বৃহৎ মিলিবে—গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দাও ;
সসীম জীবন দান করো, যদি অসীম জীবন চাও।

(২)

ফিরে এসো

শ্রীঅলোককুমার সেন (বয়স—১৭)

পরমপুরুষ ! তুমি গেছ চলি' বহে তাই আঁখিনীর,
খালি হয়ে গেছে বুকখানি আজ সমস্ত পৃথিবীর।
ধরার ধূলি বিদায় নিয়েছ কোন্ দেশে অভিমানে,
ফিরে এসো আজ বিশ্বদুলাল ফিরে এসো ধরা পানে।

যাদের দুঃখ ঘুচাবার তরে কেঁদেছিল তব প্রাণ,
তারা যে আজিকে কত অসহায় দেখ এসে ভগবান।
তব পথ চেয়ে বসে আছে তারা আবার আসিবে বলে,
তুমি ছাড়া আজ কে দিবে তাদের জ্ঞানের প্রদীপ জেলে।

হে রামকৃষ্ণ। ফিরে এসো তুমি কাতর পৃথিবী বুকে।
শান্তির হাসি আবার ফুটুক বিশ্বমায়ের মুখে।

(৩)

তামসী-তপস্বিনী

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম এ

সীমাহীন বুকে নিয়ে নীরবতা জাগছে আকাশ,
রাতের গভীর ক্ষণে তারা-জ্বলা নীল অবকাশ।
চারিদিকে বয়ে যায় বিপুল প্রবাহ তমসার,
এখন আকাশ ধরা কালো ও ছায়াতে একাকার!
স্বপ্ন জেগে ওঠে ওই আঁধার-ছোঁয়ানো দিক ভ'রে—
অরণ্যের পরিবেশ অলক্ষ্যে শিহরে
নিশীথের বাতাসের রোমাঞ্চ কম্পনে।
রূপকের মায়া দিয়ে সব কিছু ঢাকা সুগোপনে!
আঁধারের পটে আঁকা একটি মূরতি জাগে, চিনি মনে হয়,
কেটে যায় জিজ্ঞাসার জমে'-ওঠা কুয়াশা-সংশয়!
মনে হয়, চিনি তারে চিনি,—
তপস্যায় ডুবে আছে যেন এক শিব-সিমন্তিনী!
জ্যোতিষের জপগুটি নিয়ে হাতে তার,
সূর্যের বীজমন্ত্র জপে বারবার,—
তমসার শিলাসনে বসে' :
কালোর কোরক যেন ভ'রে তোলে আলোকের রসে।
তপস্বিনী হয়ে জাগে রাতের তামসী,
সূর্যের রূপের স্পর্শে আঁধারের যবনিকা যাবে তার খসি'।

(৪)

জ্ঞান

শ্রীকালীপদ কোঙার

তোমার গভীর প্রেমে
কোন দিন দিইনি সম্মান,
তোমার স্নেহের দানে
বার বার করিয়াছি হেলা,
তবুও করেছ দয়া
তবুও করেছ প্রেমদান,
অনুতপ্ত হৃদে মোর
তব নাম তাই মন্ত্রমালা।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ— স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান —শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

স্বামী সিদ্ধানন্দ ইতঃপূর্বে 'সৎকথা' নামক উপাদেয় গ্রন্থ দুইখণ্ডে প্রকাশ করিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। "অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ" তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ। স্বামী অদ্ভুতানন্দ নিরক্ষর হইয়াও অক্ষরজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। পিতৃদত্ত নাম ছিল তাঁহার শ্রীরাধেশ্যাম। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারে তিনি লাটু বা লাটু মহারাজ নামে সুপরিচিত। ছাপরা জেলার কোন এক অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র মেষপালকের গৃহে তাঁহার আবির্ভাব—বাল্যে জনক-জননীর মৃত্যু। পরে বিধির অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় তাঁহার কোন এক সম্বন্ধীয় পিতৃব্যের সহিত কলিকাতাতে আগমন ও শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে কর্মকরের বৃত্তি গ্রহণ—এবং এই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তাঁহার শুভমিলন। ইহা ব্যতীত এই মহাপুরুষের বালক ও কিশোর জীবনের অন্যান্য ঘটনা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আত্মজীবনী আলোচনা করিতে এই নিরভিমান আত্মস্থপুরুষ সদাই সংকোচ বোধ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার সাধকজীবনের সুসম্বদ্ধ ইতিহাসও আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের নিকট অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন স্বামী সিদ্ধানন্দ। এই সময়ে কথা ও প্রশ্নপ্রসঙ্গে যে সকল উপদেশ শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজ সমবেত ভক্তগণকে দিতেন তাহা তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সংগৃহীত এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া স্বামী সিদ্ধানন্দ পূর্বে সৎকথা এবং বর্তমানে আলোচ্য পুস্তকখানা সংকলন করিয়াছেন। 'সৎকথা' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই নিরক্ষর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপদেশের মধ্যে নাই কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম সমালোচনা; অথবা বিরুদ্ধ কোন মতবাদের খণ্ডন-মণ্ডন মুখে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপনের নাই কোন প্রয়াস; কিন্তু আছে ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় বৈরাগ্যদীপ্ত ও গুরুসেবায় উৎসর্গীকৃত এক সরল সাধকপ্রাণের অপরোক্ষানুভূতির মর্মকথা, আর আছে অল্প কথায় পরম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পথ নির্দেশক সহজ ইঙ্গিত। এইজন্যই এই মহাপুরুষের উপদেশাবলী এত মধুর—এত প্রাণস্পর্শী ও এত সর্বজনীন। ধর্মনির্বিশেষে সকল সাধকই এই পুস্তকপাঠে প্রকৃত উপকৃত হইবেন—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় উদ্বোধনে "শ্রীশ্রীমা"-এর সেবায় ব্যয়িত হইবে—এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় সংকলক এই পুস্তকের ভূমিকাতে।

॥ সংকল্প ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

RESOLUTION—II.

The redemption of India, I feel persuaded, lies not through her politics, but through her religion. Politics are in this country as superficial garb, put off and put on at pleasure. They sit loosely on the people. Religion is vital and essential, and inherited with their blood. It reaches the inmost depths of their nature, touches the marrow of their bones. This meeting is only a small testimony to its reality in this town. It has been organised by men, unused to the arts of agitation. Most of the active workers have been *Sannyasis* who go about barefooted, in characteristic yellow costume. If they had known to employ the machinery, customarily used for getting up political demonstrations, the meeting, large as it is, might have been ten times larger. Political demonstrations, however, are merely an imitation of the practices of the West. Religion is of the soil. The strongest, if not the only, convictions of the people are religious. I do not see, why in a meeting like this, we should assume an apologetic attitude, as if our purposes bordered on the sinister. Ours is a liberal Government, whose policy has been one of the religious toleration from the beginning, which, in matters like marriage, inheritance and

succession, has left unfettered the operation of the national laws, and which has granted to us the rights of public meeting and discussion. Why, then, should we, on so innocent a subject as religion, speak with bated breath, as if we had met for some nefarious purpose? Why must we be moved with a tremulous fear, as if we were bent on something dark and disloyal, and as if detectives dogged our steps, and scanned our actions. If people can come with a bold front to a political meeting for purposes of agitation, surely there is no reason why their steps must falter, when they are called upon to give a voice to the only real convictions they possess. Whoever knows the life of the people, and can distinguish appearance from reality, knows that questions, affecting religion and society, are nearest to their heart, and any public demonstration must be misleading which does not bear out that truth. If an English woman like Mrs. Besant can openly profess Hinduism, and a European *savant* like Professor Max Müller can grow eloquent over the philosophy of the *Upanishads*, there is no reason why Hindus must shrink from avowing their faith in their own religion or expressing gratitude to one of its interpreters. It must be a matter of satisfaction and pride to all Hindus that gleams of a new light have made themselves visible, that their religion, after having remained under a cloud for centuries in the eyes of other nations was just beginning to emerge from its gloom. That the Americans, by no means a godless people, or a people lukewarm in their belief, or a people professing a faith akin to Hinduism, had been able quickly to seize some of its salient points, was a good augury. There is reason to hope that the light that has dawned will spread. It would be enough if other nations brought themselves to study and appreciate the principles of Hinduism. Christian people need not repudiate Chistianity, but they may read it by a new light. Hinduism seeks no other conversion than propagation of its doctrines. It may suggest a new interpretation of old religions. It does not deny incarnation, for instance, but instead of accepting a single fact as *the* incarnation, it believes, in many incarnations, and is, therefore, large enough to enclose many systems in its folds. Its purposes, however, are not aggressive, and it would be content if it could only be seen as it was, and not condemned as a degrading, slavish, ignorant superstition. It would be enough for the present, if the religion of the Hindu was recognised as containing truths no less sublime and

spiritual than any that have been elsewhere embodied. Professor Max Müller has said that the Hindus had cultivated every art save that of killing. We have no desire to make up our deficiencies in that line, but we may be pardoned if we cherish a hope that some day the doctrines of a neglected Eastern creed may win hearts by peaceful methods. An ancient Roman poet has said: "Conquered Greece conquered her conquerors". That is, the literature and philosophy, the arts and science of Greece extorted the admiration of the Romans and proved to them the instruments of a higher education. Let us hope that conquered India may conquer her conquerors, not, of course, by steel and gunpowder; those were weapons we had never cared for, and we have no need to make their acquaintance now, for we are under the protection of a mighty power, and we have no fears. But the world has yet to see the last of her civilization. Let us hope that not only the race to whose care we are committed, but the entire human race may some day draw some of its spiritual inspirations from the ancient religion of this land, that the East and West may thus make their full contribution to the perfection of humanity; and that the last civilization of the world, like her first, may be a civilization, not of struggle and warfare, but of peace, sympathy, charity and harmonious co-operation to a great end.

The Resolution was seconded by Babu Khettra Nath Mullick.

In supporting the Resolution, Babu Kally Nath Mitter said :— Before referring to the 2nd Resolution, I would like to make some preliminary remarks. It is rarely, if ever we meet in this celebrated hall for the noble purpose of thanking a foreign nation. We have hitherto met for the purpose of ventilating our grievances against the Government of the country or for adopting measures for securing political advantages. It is a matter of great satisfaction to me, and I have no doubt, also to the promoters of this meeting that there is such a large gathering. We have amongst us not only the very *elite* of our society, but also gentlemen of position who take great interest in Hinduism. To my mind, it augurs well of our people that we have made a departure from the usual rule, and I hope and trust that this departure will not prove an isolated one, but will become frequent, as time goes on. Now I come to the Resolution. Its terms are such that neither any argument nor eloquence is needed to recommend it to your acceptance. I believe, it is universally admitted that gratitude

is one of the pre-eminent qualities of the Hindus ; that being so, is it necessary that I should persuade you to accept this Resolution ? I believe, I speak the sentiment of one and all present in this hall that it is not necessary ; it is quite evident that you are impatient to vote it, but I have to ask you to bear with me a little, for I have to say something of the noble nation whom we have met today to thank.

Gentlemen, I need not remind you that in the memorable year 1776, American Independence was declared, and after a noble and glorious fight, it was secured. Since then, 118 years have elapsed, certainly not a long period for the regeneration of an Empire, and yet with unequalled assiduity, enterprise and devotion to work, they have been able to come to the forefront, and occupy one of the first places in this nether world. From a feeble beginning of thirteen weakly colonies, with a scattered population of three millions people, struggling with war and debt, they have now attained to the colossal growth of nearly 40 great commonwealths, and 40 millions inhabitants, and, in respect to whatever relates to man's material and moral advancement, found themselves unexcelled by any Empire or Kingdom on the face of the wide earth. The four new wonders of the world were discovered during this period. The Electric Light, the Telephone, the Phonograph and the Microphone ; and the Americans may well claim them to be offsprings of their own land ; what they are, you all know, they may with justice be called miracles of science. I think, it may safely be asserted that they are not behind any nation in the world, either in learning, or material prosperity or in martial power. Can you, for a moment, doubt that the country which gave birth to the illustrious and ever-memorable George Washington and John Adams, should come out of obscurity in the manner she has done ? What wonder, then, that the noble principles of Hindu religion would recommend themselves to their intelligent mind ? I have advisedly used the expression noble, for otherwise it would not have been possible for it to outlive the ravages of times, to survive the bitter persecutions by the Mahomedan rulers, and get over the charming eloquence of the Christian Missonaries. Is it too much to say that the sayings and teachings of Krishna shall outlive time, or that the Vedas, Upanishads and Gita will, in all time and ages, shine as the brightest jewels of Hindu religion.

(*to be continued*)

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, গ্রন্থাগার, কলিকাতা

(শনিবার, সন্ধ্যা ৭৷৷০)

২রা আগষ্ট, ১৯৫৮ :

বিষয় : **সংস্কৃতির রূপ**

বক্তা : ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম. এ., ডি ফিল এট্ সেট, এম. পি.

১৬ই আগষ্ট :

বিষয় : **শ্রীশ্রীসারদাদেবী**

বক্তা : শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

৩০শে আগষ্ট :

বিষয় : **'বাংলার লোকসাহিত্য'—"ছড়া"**

বক্তা : অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ.,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার :

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

বক্তা : পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,
সাংখ্য বেদান্ত-ভক্তিতীর্থ।

প্রতি বুধবার :

কঠ-উপনিষদ (শঙ্করভাষ্যসহ)

বক্তা : পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ,
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

প্রতি রবিবার :

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা :

সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি শনিবার, বৈকাল ৩টায় :

রামনাম-কীর্তন :

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা • স্বামী অভেদানন্দ

ভাদ্র ১৩৬৫
২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

STUDENTS
P. G. T.
COMMON-ROOM

স্বামী অভেদানন্দ রচিত গ্রন্থাবলী

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্যতম YOGO PSYCHOLOGY বাহির হইতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল !

SWAMI ABHEDANANDA IN AMERICA

By

SISTER SHIVANI (Mrs. Mary Lepage)

A unique Volume of Swami Abhedananda's activities in the West by one of his devoted and able American disciples.

Many new incidents of Swami Abhedananda's eventful life and glorious career in America for a quarter of a century are graphically described. This volume also throws much light upon the history of the Vedanta movement in the West.

With a number of original photographs.

Demy 8 vo. 330 Pages Rs. 6·50

For Subscribers of Visvavani Rs. 6·00

স্বামী অভেদানন্দ

(কালী-তপস্বী)

এই প্রামাণিক জীবনীটি নিঃশেষিত হওয়ার পর বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। কিছু বর্দ্ধিত আকারে পুনরায় শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

সারদামণি

শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমা সারদামণির পুণ্যজীবন কথা। ঐ কথা সব সময়েই সুমধুর।

মূল্য : টা. ১·২৫। বিশ্ববাণীর গ্রাহক পক্ষে এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, (পুস্তক-প্রচার-বিভাগ)
১১বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ	... ২৯১	স্বামী হৃর্গানন্দ
২। প্রসাদী সঙ্গীতে সাধনতত্ত্ব	... ২৯৮	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ.
৩। ভারতীয় রসায়ন	.... ৩০৩	ডাঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি.এস.সি.
৪। সাহিত্য-দর্পনের ভূমিকা	... ৩০৮	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি., ডি. এল. ই.
৫। কুকুরের সামগান	... ৩১২	শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ
৬। বিশ শতকের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	... ৩১৮	শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু
৭। বৌদ্ধ রামায়ণ	... ৩২২	শ্রীজয়দেব রায়, এম. এ.
৮। গল্প ও শিশু-মন	.... ৩২৫	শ্রীমানিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম. এ.

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৩২৭	শ্রীমীরা মিত্র
১০।	জাগো (কবিতা)	... ৩৩০	শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী
১১।	সংকলন	... ৩৩১	
১২।	সঞ্চয়ন	... ৩৩৪	
১৩।	সংঘ-বার্তা	... ৩৫৭	
১৪।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	... ৩৩৮	

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১ ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :— বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

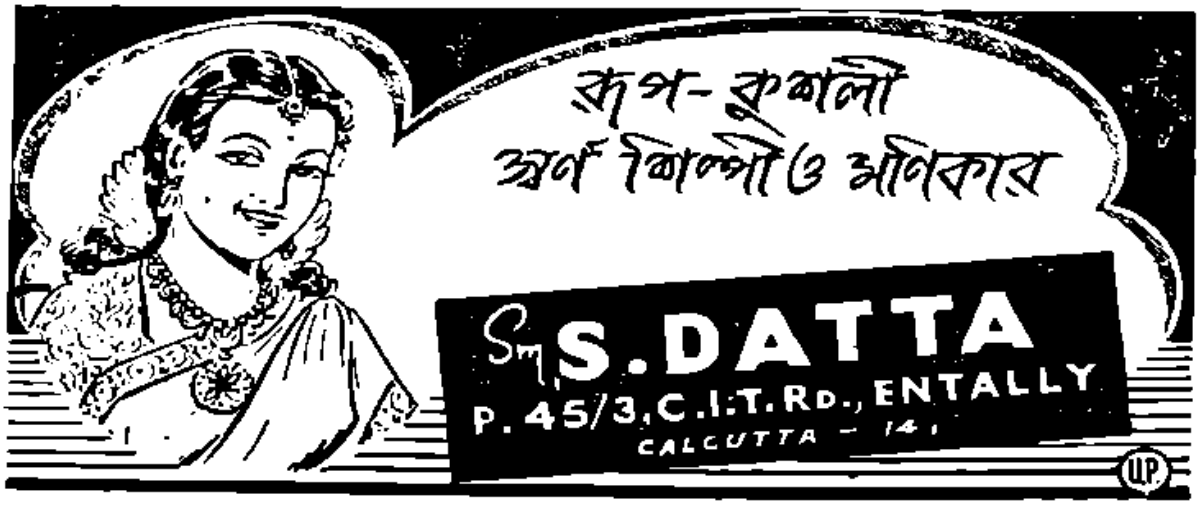

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীসুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

॥ এম. এ. ক্লাশের ॥

শিক্ষার্থীর উপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল রকম গ্রন্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা বিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর
—কুষ্ঠ—

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পায়ে মামাবর্ষের ঘাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেতি

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : **হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর**, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২৩৫৯)

শাখা : **৩৬নং হ্যারিসন রোড**, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল — বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সকল প্রকার ছাপার কাজের জন্য

হিন্দ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩এ, গঙ্গানারায়ন দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—বরানগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দমদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ., এম্. ডি., বি. এল. আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

অগস্ত্যকল্পধ্বজ

অব্যর্থ মুক্তাভিস্মসহ কণায় পরিণত নির্দিষ্ট মাত্রার ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিশ্লেষণের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (১ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব সুসম্পন্ন নবকল্পিত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী

তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্, শাড়ী

জহরলাল পান্নালাল

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ও চৌক বেনারস, অমৃতসহর

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

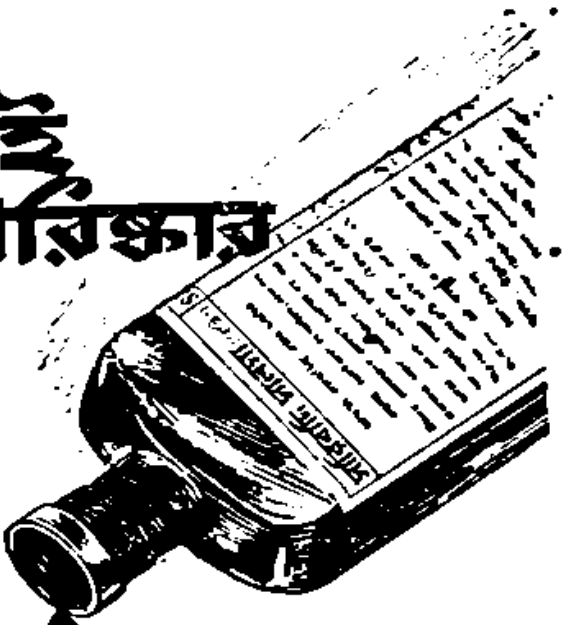

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও অঙ্গ গঠিত হয়, তারা প্রত্যেকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মরতে সুরু করে; তাই রক্তের প্রয়োজন প্রথম উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন অকালেই বিবিধ জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

রক্তবাহী সমস্ত ধমনী ও শিরার মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত পৌঁছে দেওয়াই হৃৎপিণ্ডের কাজ। হৃৎপিণ্ডের সামান্য দোষেও মাথার ভেতর যন্ত্রণা হয়, ঘোর, শরীর দুর্বল হয়, একটুতেই হাঁপ ধরে, হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি, ঘাম ও রক্তে অম্লবায়ু সংমিশ্রণের সময় ঠিক মত কোষ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, সিরোসেই ক্রিয়া ব্যাহত হয়, ত্বক রুক্ষ শাদা এবং শরীরে স্ফোট বিস্ফোট সুরু হয়ে সংক্রামিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

ডাক্তার নীলমণিলাল ঘোষ, বি.এস., আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এল.এম.এস (বেঙ্গল), এল.এম.এস (কলিকাতা), ডাইরেক্টর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ভূতপূর্ব ডাক্তার।

কলিকাতা ফোন—৩১১ ফরেস্ট ফোন, এল-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ আচার্য। ঔষধ: ঘোড়াসাকো ফোন, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

পূজা ও প্রবেশী-পূর্বিটির সর্বত্র

সদ্য প্রকাশিত!

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবন তথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে' সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্য্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

॥ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ॥

মহাভারতের গল্প

মহাভারত হচ্ছে এমন একখানি গ্রন্থ যার মূল অনুবাদ পড়াশুনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই মহাভারতের যা মুখ্য অংশ তারই একটি সুসংবদ্ধ ধারা গল্পের মাধ্যমে উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য ক'রে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বহুচিত্র শোভিত। দাম—৪·৫০

॥ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥

প্রেমের গল্প

বাংলার সমসাময়িক খ্যাতিমান লেখকদের লেখা প্রেমের গল্পের এরূপ বিরাট সচিত্র সংকলন এই প্রথম। লেখকদের চিত্রসহ জীবনী। রয়েল সাইজে মোট ৩৩০ পৃষ্ঠা। দাম—৭·৫০

॥ শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

জাহ্নবী যমুনার উৎস-সন্ধানে

দুশ্চরতীর্থ-ভ্রমণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। ৩·৫০

ফোন: ৩৪-০৬৫২] রীডার্স কর্নার :: ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি:-৬ [তালিকার জন্য লিখুন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

॥ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ॥

॥ গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সংগীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ॥

॥ বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

॥ ডিমাই সাইজে দুইশত পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন অপ্রকাশিত ভাস্কর্য-চিত্র ॥

প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

॥ রাগ ও রূপ ॥

(১ম ভাগ)

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রয়াল সাইজ ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, বহু চিত্র সম্বলিত।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (থিওরি) অংশ ও ৬ রাগ ও ৩০ রাগিনীর (হনুমন্মতে) সুবিস্তৃত পরিচয়, স্বরলিপি ও রাগ চিত্রসহ।

প্রাদেশিক সরকার অর্থ-সাহায্য করার জন্য মূল্য : ৭৷৷০ টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

'প্রবর্ত্তক'-এর সুনির্বাচিত গ্রন্থ

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২-৭৫

(অগ্নিযুগের নিখুঁত প্রামাণ্য চিত্র এই গ্রন্থে মিলিবে)

জীবনসঙ্গিনী—৫৲

(বাংলা সাহিত্যে অনুপম অবদান। সত্য কিন্তু উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। উপহারের সেরা বই। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা, ইম্পিরিয়াল সাইজ।)

বেদান্ত দর্শন—৭-৫০

'শনিবারের চিঠি'-র মন্তব্য : "ব্রহ্মসূত্রের এমন বিশ্লেষণমূলক সহজ ব্যাখ্যা বাংলায় আর নাই। ইহা নূতন সৃষ্টি।" ডিমাই সাইজ, প্রায় ৭০০ পৃঃ।

পরমহংস উপানন্দ মহারাজ ॥ **আত্মার আলো ১৲**

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ **প্রজ্ঞার আলো ১-২৫**

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ॥ **গীতার আলো—১-৫০**

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর ॥ **সাহিত্যিকী ২৲**

Prof. S. Bhattacharjee

Society & Education—Rs. 2/-

শ্রীগণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ **শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব** (সংবর্ধিত ২য় সং)—৭·৫০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স ৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—**স্বামী শ্যামানন্দ (গ্রন্থকার)**

১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমাদের সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট নিবেদন—বর্তমানে কাগজ ও ছাপা প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা বর্ধিত কলেবর শারদীয়া সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৬৫) "বিশ্ববাণী"-র জন্য আট আনা অধিক মূল্য ধার্য করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা জানি সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকা বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নানান বিষয়ে দুর্মূল্যের কথা অনুধাবন করিতে পারিবেন। আট আনা পয়সার 'ডাক টিকিট' ডাকযোগে পাঠাইলে তাহা তাঁহাদিগের সহানুভূতিপূর্ণ দান হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিব। মাত্র শারদীয়া সংখ্যার জন্যই এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আগামী আশ্বিন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে উক্ত আট আনা অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইবেন। নিবেদন ইতি

ম্যানেজার
বিশ্ববাণী পত্রিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৬
১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৮

শারদীয়া সংখ্যা

বিশ্ববাণী

এইবারের 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা, (কার্তিক, ১৩৬৫) চিন্তাশীল লেখক-লেখিকাগণের বিচিত্র প্রবন্ধে সুশোভিত হ'য়ে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রীশ্রীমহাপূজার পূর্বেই। জীবনী, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস, ভ্রমণ, বিভিন্ন কবিতা প্রভৃতি শারদীয়া বিশ্ববাণীর অঙ্গীভূত হইবে।

মূল্য : দেড় টাকা

STUDENTS'
P. G. A.
COMMON-ROOM

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৬৫

ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

(চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

কথিত আছে, গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম ছিলেন প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক। একদিন তিনি প্রয়োজন বশতঃ গ্রামান্তরে গিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে ক্লান্ত হইয়া পথের ধারে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে করিতে ঘুমঘোরে অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া, আনন্দে জাগরিত হইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন : নবদূর্বাদল শ্যামবর্ণ শ্রীরামচন্দ্র যেন বালকবেশে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন : "আমি অনেকদিন এখানে অযত্নে ও অনাহারে রহিয়াছি, আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল। তোমার সেবা গ্রহণ করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি।" এই স্বপ্নদৃষ্টে তিনি জাগ্রত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে স্বপ্নদৃষ্ট স্থানটি দেখিতে পাইলেন এবং তথায় দ্রুত উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি শালগ্রাম শিলার উপরে এক কাল ফণী ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তখন ক্ষুদিরাম অত্যধিক আনন্দে উহা গ্রহণ করিবার অভিলাষে দ্রুতপদে ঐদিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই ভুজগটি অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং শালগ্রামটি তথায় বিদ্যমান রহিলেন। ক্ষুদিরাম তখন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দেবতার আদেশ সত্য হইয়াছে জানিয়া ভক্তিভরে ঐ শালগ্রাম শিলা উঠাইয়া বক্ষে ধারণপূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম শিলার লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিলেন, সত্যই উহা 'রঘুবীর-শিলা'। শুনা যায়—এই রঘুবীর-শিলা প্রাপ্তির

পূর্বে ক্ষুদিরাম শ্রীরামচন্দ্রের পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। যাহা হউক, এই ঘটনার পরে তিনি যথাশাস্ত্র "রঘুবীর"কে গৃহদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া সস্ত্রীক ইষ্টজ্ঞানেই তাঁহার যথাসাধ্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

ক্ষুদিরাম দেশত্যাগী হইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিতেছেন। অবস্থা একেবারে নিঃস্ব। রঘুবীরের নিত্যসেবা তাঁহার পক্ষে চালান দুঃসাধ্য; কিন্তু আশ্চর্য, ঐরূপ একান্ত অন্নাভাব দেখিয়া তাঁহার বন্ধু সুখলাল গোস্বামী লক্ষীজলা নামক স্থানে এক বিঘা দশ ছটাক ধান-জমি স্বচ্ছায় তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এখন এই জমির উৎপন্ন ধান্য হইতেই ৺রঘুবীরের কৃপায় তাঁহার সংসারে অন্নাভাব ঘুচিয়াছিল এবং রঘুবীরের নিত্যভোগেরও কোন অসুবিধা রহিল না। শুনা যায় ঐ জমিতে ধান্যবীজ বা চারা রোপন করিবার সময় সর্বাগ্রে ক্ষুদিরাম স্বহস্তে রঘুবীরের নাম করিয়া তিন গোছ চারা রোপন করিয়া দিতেন। ফলে তাঁহার ঐ যৎসামান্য জমিতে অন্য জমির তুলনায় প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত।

এই ঘটনা সরল বালক গদাধরের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। গদাধরের বিশ্বাস ছিল তাহার পিতাকে রঘুবীর যেভাবে দেখা দিয়াছিলেন, তাহাকেও একদিন ঐভাবে দেখা দিবেন, এবং সেই বিশ্বাসে নিত্যপূজা সমাপনান্তে প্রত্যহ ধ্যানস্থ হইয়া দীর্ঘ সময় ঐ চিন্তায় অবস্থান করিত; ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাহার ভাবসমাধির আবেশ ও দিব্য-দর্শনাদি হইতে থাকিল। যে সমাধিপ্রাপ্তির জন্য যোগীদের সুদীর্ঘকাল কঠোর তপশ্চর্যা করিতে হয়, গদাধরের তাহা সহজসাধ্য হইয়া পড়িল, এমন কি উহা যেন স্বাভাবিক ও ইচ্ছাধীন হইয়া উঠিল। ধ্যানান্তে ভক্তিমূলক গান গাহিতে গাহিতেও অনেক সময় তাহার ভাবসমাধি হইত। বাল্যকাল হইতে তাহার এই ভাবপ্রবণতা যেমন ছিল স্বাভাবিক তাহার ধর্ম-প্রবণতাও ছিল তেমনি উদার। বিভিন্ন দেবদেবী বা নানা শ্রেণীর উপাসকদের প্রতিও কখন তাহার বিদ্বেষভাব ছিল না বরং উদারভাবেই তাহাদের দেখিত। সকলকেই এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া তাহার ধারণা হইত এবং সেজন্য ভাই ভগিনীর মত সকলকে ভালবাসিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিল। যদিও সে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দুপরিবারে অক্ষুণ্ণ প্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি সামাজিক বদ্ধমূল কুসংস্কার তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। নীচ জাতি বলিয়া তাহার কাছে কেহ হেয় ছিল না, সে সকলকে সমান চক্ষে দেখিত এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদারভাব পোষণ করিত।

রঙ্গ-পরিহাসপ্রিয়তায় উদারপ্রাণ সরল বালক গদাধর ছিল সিদ্ধ হস্ত। লোকের মনোরঞ্জন করিতে কৌতুকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া নরনারী বালকবালিকা প্রভৃতিকে যে আনন্দ দান করিত, তাহাতে গদাধর প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। গদাধরকে পাইলে সকলেই আনন্দিত হইত, তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, এমন কি অনেকেই

তাহাকে দেবশিশুজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠ বা হরিনাম সংকীর্তনাদি হইত এবং তথায় এই সকল অনুষ্ঠানে গ্রামের ইতর-ভদ্র বালক-বালিকা যুবক-বৃদ্ধ অনেকেই যোগদান করিত। গদাধরও ঐ সকল ক্ষেত্রে সকলের সহিত যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিত। পুরাণাদি পাঠকালে ধর্মতত্ত্বের গূঢ় অর্থ গদাই যেমন বুঝিত ও ভঙ্গির সহিত যেমন তাহা সকলকে বুঝাইতে পারিত, তেমনটি আর কেহ করিতে পারিত না। সুতরাং যেদিন যেখানে থাকিত সেদিন তথায় আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত। সংকীর্তনকালে ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে যেমন ভক্তিভাবে করুণ সুরে নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিয়া কীর্তন গানকে আরও শ্রুতিমধুর করিয়া তুলিত, অন্য কেহ সেরূপ করিতে সমর্থ হইত না। নরনারীর আচরণ ঠিক ঠিক অনুকরণ করিয়া এমনভাবে অভিনয় করিত যে, দর্শকগণ অবাক হইয়া যাইত। নূতন নূতন গল্প ও গানের আখরগুলি যথাযথ স্থানে সংযোজনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন ও সকলকে পুলকিত করিতে তাহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। এইজন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অনেকেই গদাধরের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিত। গ্রামের প্রান্তে মাণিকরাজার আম্রকুঞ্জে তাহারা বাল্যক্রীড়া করিত। সহপাঠী ও রাখাল বালকবালিকাগণের সহিত বৃন্দাবন-লীলার অভিনয় করিয়া প্রত্যেক বালকবালিকার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। একবার দাহা-বাবুদের বাটীতে এক শ্রাদ্ধবাসরে বহু দেশের পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর এক জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া তাহার অপূর্ব মীমাংসা করিয়া গদাধর সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। পণ্ডিতগণও তাহার বুদ্ধি-চাতুর্য দেখিয়া সাগ্রহে তাহার পরিচয় লইয়াছিলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা সহকারে সস্নেহে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। গদাধরের উপনয়নের কিছুদিন পরে ৯।১০ বৎসর বয়সকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

কৌতুকপ্রিয় গদাধরের একটি কৌতুকাবহ ঘটনার সংক্ষিপ্ত কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রামের বণিকপল্লীতে সীতানাথ পাইন এবং দুর্গাদাস পাইন ইহারাই ছিলেন ধনী গৃহস্থ। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা এবং একান্নবর্তী বহু আত্মীয় বন্ধু থাকায় গোষ্ঠীটি বেশ বড়ই ছিল। তিনবার ঘায় নিত্য তাহাদের বাড়ীতে রান্নার প্রয়োজনে দশপানি শিলে বাটনা বাটা হইত। এই পাইনদের বাড়ী গদাধরের বাটীর সন্নিকটে থাকায় প্রতিবেশীসূত্রে তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকগণ নিত্যই গদাধরের মাতার কাছে যাওয়া আসা করিত ও শিশুকাল হইতে সুদর্শন গদাধরকেও তাহারা ভালবাসিত। গদাধর এখন বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছেন তবুও তাহাদের ভালবাসা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। গদাধরের সুমিষ্ট গলায় ভক্তি-মূলক গান এবং রঙ্গ-পরিহাস ও তাহার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্ত্রী বা পুরুষবেশে অভিনয়—

এগুলি দেখিয়া তাহাদের বাটীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশী আনন্দ পাইতেন এবং এইজন্ত তাঁহারা অনেক সময় প্রিয়দর্শন বালককে তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া অভিনয় দেখিতেন ও আনন্দ করিতেন। অভিনয় করিবার জন্ত তাঁহারা সোনার মুরলী ও স্ত্রীপুরুষ বেশ ধারণের উপযোগী পরিচ্ছদ প্রভৃতিও প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। অভিনয় করিবার সময় কখন কখনও ভাবসমাধি দর্শন করিয়া গদাধরকে তাঁহারা অনেকেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে পূজাও করিয়াছিলেন শুনা যায়। গদাধর বণিকপল্লীর মধ্যে সীতানাথ পাইনের বাড়ীতেই শিশুকাল হইতে যাওয়া-আসা ও খেলাধূলা করিত। সীতানাথই বাড়ীর কর্তা, তিনি গদাধরকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষগণ গদাধরের সদ্‌গুণাবলীর সহিত পরিচিত থাকায় তাঁহারাও অসংকোচে তাহাকে ভালবাসিতেন। গদাধরও প্রীতির বন্ধনে গ্রামের প্রত্যেক নরনারী বালকবালিকাকে চিরদিনের মত আবদ্ধ করিয়াছিল। গদাধরের বয়স এখন প্রায় ষোল বৎসর, যৌবনের সূচনা। এখনো তাহাকে সীতানাথ পাইনের অন্দরমহলে গিয়া অভিনয় করিতে দেওয়া খুব অন্যায়, কারণ গৃহস্থের বাড়ীতে অন্য পুরুষের অবাধ গতিবিধি অশোভনীয়, বিশেষতঃ সীতানাথের বাড়ীতে অনেকগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, সুতরাং কঠোর অবরোধপ্রথা শিথিল করা অকর্তব্য ইত্যাদি অভিযোগ করিয়া কেহ কেহ সীতানাথকে সাবধান করিলে, সীতানাথ বলিতেন: "তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি।" যাঁহারা আপত্তি করিতেন তাঁহারা উত্তর শুনিয়া বেশী আর কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু একমাত্র দুর্গাদাস পাইন ঘোর আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধাভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধ প্রথা কাহারো জন্ত কোনকালে শিথিল হইতে দিতেন না। তিনি সময় সময় অহঙ্কার করিয়া, "আমার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং আমার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই" ইত্যাদি কথা সীতানাথ প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে বলিতেন। সীতানাথ কিন্তু ঐরূপ কঠোর অবরোধপ্রথা সমর্থন করিতেন না। সুতরাং দুর্গাদাসের কঠোর সমালোচনায় বিচলিত হইলেন না।

একদিন দুর্গাদাস ঐভাবে তাঁহার কোন আত্মীয়ের কাছে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, —এমন সময় ঘটনাক্রমে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া সকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং তদুত্তরে বলিলেন, "অবরোধ প্রথা দ্বারা কি কখনও রমণীগণকে রক্ষা করা যায়? সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিতা হন। ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি"। দুর্গাদাস তাহাতে আরও বেশী গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার জান দেখি?" গদাধরও "আচ্ছা দেখা যাইবে" বলিয়া সেদিন চলিয়া গেল এবং পরে একদিন অপরাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একখানি মোটা ও মলিন শাড়ী ও রূপার পৈছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায় রমণীর ন্যায় বেশ ধারণপূর্বক একটি চুবড়ী কক্ষে

লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন বাহির বাড়ীতেই বন্ধুগণের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। রমণীবেশধারী গদাধর আপনাকে তন্তুবায় রমণী বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিল : "আমি হাটে সুতা বেচিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গিনীরা ফেলিয়া যাওয়ায় এখন আমি বিপন্না হইয়া পড়িয়াছি ও রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" দুর্গাদাস তাহার কথা শুনিয়া কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই একটি প্রশ্ন করিয়া ও উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা অন্দরে গিয়া স্ত্রীলোকদের কাছে আশ্রয় লও"। গদাধরও তাহাতে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্বের মতই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া নানাবিধ বাক্যালাপ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিল। তাহার অল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং বিশ্রামের স্থান দেখাইয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য তাহাকে কিছু মুড়ী ও মুড়কী প্রদান করিলেন। গদাধরও মুড়ী খাইতে খাইতে সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে ভাল ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের কথায় যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও ভুলিল না, কিন্তু এমনি আশ্চর্য যে, গদাধরের নারীবেশে কথাবার্তা, চাল-চলন, হাবভাব দেখিয়াও কেহই তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল, কিন্তু গদাধর বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া মাতা চন্দ্রাদেবী তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন এবং অনেক সময়ে গদাধর বণিকপল্লীতে গিয়া থাকে জানিয়া সেখানেই তাহার খোঁজ লইবার কথা বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেই হেতু প্রথমেই সীতানাথ পাইনের বাটীতে আসিয়া খবর লইলেন এবং জানিলেন বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর তিনি দুর্গাদাস পাইনের বাড়ীর কাছে আসিয়া গদাধরের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া দুর্গাদাসের অন্দর হইতে 'দাদা, যাচ্ছিগো' বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিতে পারিয়া এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণে তাহারা দরিদ্র তন্তুবায় রমণীর বেশ ধারণ ও চালচলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথ প্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকট তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রাণ, পবিত্রস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সপ্রেম সরল

ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীবাসীগণের মনে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সত্যই অভাবনীয়। ঘটনাগুলি "লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে সংগৃহীত।

সন ১২৭৯ সালে গদাধরের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলার ১২৫৪ সালে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের পত্নী ১২৫৫ সনে একটি পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছেন। রামকুমারের বয়স এখন ৪৪ বৎসর মাত্র। তিনি সংসারের অভাবের তাড়নায় দেশ ত্যাগ করিয়া উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়ায় কামাপুকুর পল্লীতে ছাত্রদের জন্য একটি টোল খুলিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং পিতার তিরোধানের পর এই দীর্ঘ দশ বর্ষ প্রায় গদাধর বাড়ীতে থাকিয়া কিছুদিন হইল পাঠশালার পাঠ বন্ধ করিয়া মাতার সাহায্যার্থে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে এবং মাতৃহীন শিশু অক্ষয়কুমারকে কোলে লইয়া লালন পালন করে ও সময় সময় বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া সময় অতিবাহিত করে। আবার কখনবা সন্ধ্যাকালে বিভিন্ন পল্লীতে যাইয়া পুরাণাদি পাঠে যোগদান করে, কীর্তনাদি গান গাহিয়া আনন্দ এবং নিত্য গৃহদেবতাদির পূজান্তে ধ্যান, জপ ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে। অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষায় তাহার এই বাল্যকাল হইতেই বীতরাগ ছিল। অনেক সময় বলিত, 'চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিব না', এবং এখন হইতেই তাহার মনে হইত যেন তাহার জীবন অন্য কার্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, যেন সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাকে ধর্ম-সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, নিঃসঙ্গ বিচরণ ও সন্ন্যাসীর ন্যায় ভিক্ষায় ভোজন ইহাই যেন আদর্শ বলিয়া তাহার মনে হইত। সন্ন্যাসিগণের সঙ্গ করিয়া এবং সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়া আনন্দে মাতার কাছে আসিয়া বর্ণনা করায়, পূর্বেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আবার কখন বা মাতার কথা চিন্তা করিয়া ও ভ্রাতাদিগের সংসারের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া মনে হইত তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করাই কর্তব্য। আবার দেশের জনসাধারণকে এমন আপনার করিয়া লইয়াছিল যে, তাঁহাদের সুখদুঃখে নিজেও সুখদুঃখের অনুভব করিত। এইরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় এবং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে বলিতেছিল—'আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা সেতো স্বার্থপরতা, এমন কিছু কর যাহাতে ইহারা সকলেই উপকৃত হয়।' ইহাতে তখন তাহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত এবং সরল প্রাণে ৺রঘুবীরকে স্মরণ ও তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিত। পাঠশালার পাঠ বন্ধ করিয়া গদাধরের দিনগুলি এইভাবেই কাটিতে লাগিল।

এদিকে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার সন ১২৫৬ সালে কলিকাতায় আসিয়া তিন বৎসর হইল ঠনঠনিয়া কামাপুকুর পল্লীতে 'টোল' খুলিয়া ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াইতেছেন,—স্মৃতি, ন্যায় ইত্যাদি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, দশকর্ম ইত্যাদি ক্রিয়ায় বেশ প্যাতিলাভ হইয়াছে এবং অধ্যাপক হিসাবে বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণাদিও আসিতেছে

উপার্জনও মন্দ হইতেছে না, বৎসরে অন্ততঃ একবার দেশে গিয়া মা ও ভাই স্ত্রীদের তত্ত্ব লইয়া আসেন। কিন্তু গদাধর বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন জানিয়া খুব চিন্তিত হইলেন। কি উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিলেন—তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিবেন এবং তাহাতে তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট সাহায্য হইবে এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবারও সুবিধা হইবে। এখন মায়ের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য রামকুমার মার কাছে গিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং মাতাও তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। গদাধরকেও সকল কথা বলা হইল—তাহাতে সে অমত করিল না। বরং পিতৃস্থানীয় দাদার কাজে সহায়তা করিতে হইবে জানিয়া আনন্দিতই হইল। অনন্তর শুভদিন শুভক্ষণে রামকুমার গদাধরকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে গৃহদেবতা ৺রঘুবীর ও শীতলা মাতাকে প্রণামপূর্বক এবং জননীর পদধূলি গ্রহণান্তে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছুকালের জন্য ভঙ্গ হইল।

প্রসাদী সঙ্গীতে সাধনতত্ত্ব *

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ.
(প্রথম পর্যায়)

রামপ্রসাদের শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতগুলিকে আমরা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বলিয়াই জানি। সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ জর্জরিত মানবহৃদয় রামপ্রসাদী সুরে প্রসাদী সঙ্গীত শুনিলে শান্তি ও সান্ত্বনা পায়; মানুষের বিষয়-বাসনা মুহূর্তের জন্য তিরোহিত হইয়া শ্রেয়োবোধ জাগে, আত্মা পরমাত্মার আভাস পায়। তাই সঙ্গীতগুলি উচ্চাঙ্গের কাব্যরূপে জনপ্রিয়। মানুষের পারিবারিক পটভূমিকায় রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে মধুর আন্তরিক সম্পর্ক, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সঙ্গীতের অনেকগুলি রচিত বলিয়া ইহারা জনপ্রিয়। গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, শিক্ষিত অথবা মূর্খ, হিন্দু অথবা মুসলমান,—সকলেই মায়ের সন্তান। তাই প্রসাদী সঙ্গীত জাতিধর্মের এবং জাগতিক ভেদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষমাত্রকেই অভিভূত করিয়াছে।

কিন্তু প্রসাদী সঙ্গীতের কি ইহাই একমাত্র পরিচয়? রামপ্রসাদ কি শুধু কবি-ই ছিলেন? তাঁহার সঙ্গীতগুলি হইতে তাঁহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

হালিসহর কুমারহট্টে রামপ্রসাদের ভিটা, পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডির আসন কালের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া এখনও বিরাজ করিতেছে। তাহা হইলে তো, রামপ্রসাদ পঞ্চবটীতে পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। এইরূপ সাধনা কোন্ শাস্ত্র অনুসারে হইয়া থাকে?

তন্ত্রোক্ত সাধনার যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে দেখি যে, সাধক প্রথমে সাধনার উপযোগী একটি নির্জন স্থান নির্ধারণ করিবেন। সেখানে শাস্ত্রমতে পঞ্চবট প্রতিষ্ঠা করিবেন; তারপর পঞ্চমুণ্ডি অথবা একমুণ্ডি আসনের উপর শুদ্ধ চর্মাসনে বসিয়া দেহের সাধনায় ভূতশুদ্ধি,

* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সাংস্কৃতিক বৈঠকে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে।

ন্যাস, প্রাণায়াম, মানসপূজা করিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন এবং যে অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তি জীবদেহে মূলাধারে কুণ্ডলিনীরূপে সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া দেহের চক্রে চক্রে চালনা করিবার সাধনা করিবেন।

সুতরাং ঐতিহাসিকের ভাষায়, রামপ্রসাদ সম্পর্কে যে বস্তুপ্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামপ্রসাদ তন্ত্রনির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি আমরা পঞ্চবটী অথবা পঞ্চমুণ্ডির আসন না পাইতাম, তাহা হইলে এ কথা বলা যাইত কি? প্রসাদী সঙ্গীত হইতে কি রামপ্রসাদের সাধনার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সঙ্গীতগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি কিনা তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

প্রসাদী সঙ্গীতে আমরা পাই :

১। হৃদাহ্লাদে দক্ষিণা-কালিকা করে ধ্যান,

২। এ শরীরে কাজ কি ভাই দক্ষিণা প্রেমে না গ'লে,

৩। প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি,

৪। ভুলো না দক্ষিণে কালী বস্ত হবে যারা জ্বালে,

৫। দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্য রায়,

৬। দক্ষিণ বাতাস মূলে　　পৃষ্ঠদেশ অনুকূলে
কাল পবে চেয়ে।

৭। ওরে জান নাকি গেঁথে রেখেছি হৃদয়ে দক্ষিণা কালী।

STUDENTS P. G. A. COMMON-ROOM

রামপ্রসাদ দক্ষিণা কালীর উপাসক ছিলেন। তন্ত্রসারে দক্ষিণা কালীর বর্ণনা এইরূপ :

"দক্ষিণ কালিকা দেবী করালবদনা, ভীষণাকৃতি, আলুলায়িত কেশা এবং চতুর্ভুজা। দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বাম ভাগের অধঃকরে সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড এবং ঊর্ধ্বকরে খড়্গ এবং দক্ষিণ ভাগের অধোহস্তে অভয় ও ঊর্ধ্বহস্তে বরমুদ্রা বিদ্যমান আছে। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং দিগম্বরী। উঁহার গলে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইয়া সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে, তাঁহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে বিরাজমান। ইহাতে দেবীর আকৃতি অতি ভীষণ হইয়াছে। দশনপংক্তি অতি ভীষণ; স্তনযুগল স্থূল ও উচ্চ, এবং শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী কটিদেশে শোভমান আছে। কালিকাদেবী হাস্যবদনা, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত শোণিতধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর শব্দ অতিশয় গভীর। ইনি নিরন্তর শ্মশানে অবস্থিতি করেন। ইহার চক্ষুদ্বয় নবোদিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত এবং কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী শিবোপরি সংস্থিতা। তাঁহার সমভ্যাৎ শিবাগণ ভৈরব রব করিতেছে। তিনি মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রত্যাসক্ত রহিয়াছেন। দেবীর মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও হাস্য বিকশিত।

অরূপ ধ্যান : কালিকাদেবী অঞ্জনগিরির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তাঁহার মুখ বিস্তৃত। গলদেশে মুণ্ডমালা, কেশ আলুলায়িত, বদনমণ্ডল সহাস্য, স্তনযুগল স্থূল ও উচ্চ। ইনি মহাকালের হৃদয় কমলোপরি বিপরীত রত্যাসক্তা ও ভুজগনির্মিত যজ্ঞোপবীতধারিণী। ইহার নয়ন অতি ভীষণ ও ললাটে অর্ধচন্দ্র আছে। দেবী সর্ববিধ বিভূষণ ও মুণ্ডমালাতে সুশোভিতা। দেবী সহস্র শবহস্ত দ্বারা কটিদেশে কাঞ্চী নির্মিত করিয়া বন্ধন করিয়াছেন। এই দেবী কোটি শিবা এবং সহস্র যোগিনীগণ কর্তৃক সেব্যমানা ও দিগম্বরী। ইহার বদনকমল রক্তধারা পরিপূর্ণা; দেবী সুরাপানে প্রমত্তা। বহ্নি, সূর্য, চন্দ্র—এই তিনটি দেবীর নেত্রস্থানীয়; ইহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ। দেবী দুইটি মৃতশিশু দ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন। ইহার কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডমালা হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইয়া সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে। ইনি নিরন্তর শ্মশানবহ্নি মধ্যে বাস করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহার উপাসনা করিতেছেন। ইহার করচতুষ্টয়ে যথাক্রমে মুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয় মুদ্রা বিদ্যমান।

রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতে এই রূপই রূপায়িত করিয়াছেন :

(১) এলো চিকুর নিকর, নিতম্বকর কটিতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, সহন নয়ন
বয়ানবরে বসি শশী॥
শবশিশু ইকু শ্রুতিতলে
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয়বর
বরাঙ্গনা রূপ মসী॥

(২) বামা ওকে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি ত্বরে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে,
নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে॥

(৩) এলোকেশে কে শবে এলো রে বামা।
নগর নিকর হিমকরবর রঞ্জিত
ঘন তনু মুখ হিমধামা॥

(৪) শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ সুধাকর মণ্ডল বদনী রে ॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে

(৫) সমর করে ওকে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন-মোহিনী ॥
ললাট-নয়ন বৈশ্বানর
বাম বিধু বামেতর তরণি
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল।

(৬) ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধরাধর, রুধির ধারা নিকর
কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে।

(৭) আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।
কে রে নবীনা নগনা লাজ-বিরহিতা
ভুবন মোহিতী একি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবর গতি আসব আবেশ,
লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্ক করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে কে দনুজদলনী ॥
কে রে নব নীলকমল কলিকাদল
বলিয়া দংশন করিছে অলি
নখচন্দ্রে চকোরগণ অধর অর্পণ করত
পূর্ণ শশধর বলি।

কে রে অঘন সুচারু
কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে
তদূর্দ্ধে কটি বেড়া, নরকর ছড়া
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে।

করতল স্থল নলদল অতিশয়
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়

(৮) চলিতে চলিতে কে আসে।
গলিত চিকুর আসব আবেশে॥
বামা রণে দ্রুতগতি চলে
দলে দানব দলে
ধরি করতলে গজ গরাসে॥

শেষোক্ত সঙ্গীতটির শেষে 'গজ গরাসে' কথাগুলি লক্ষ্য করিবার মত। একাধিক প্রসাদী সঙ্গীতে কমলে কামিনীর 'গজ গরাস' উল্লিখিত আছে। ইহাও রামপ্রসাদের সাধন-তত্ত্বের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

শাক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শক্তির বিচিত্র প্রভাবে সরিষা-পরিমাণ বীজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিণ্ড মনুষ্যশরীরে জড়জগৎ নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী বুদ্ধি এবং আকাশ অপেক্ষাও তরল, ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

তন্ত্রশির বেদ বলে—প্রাচীনা হইলেও শক্তি নিত্যা নবীনা। গুপ্তভাব হইতে ব্যক্তা হইলেই নবীনা বলিয়া প্রতীয়মানা। শক্তির লোপ তো দূরের কথা, তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও নাই। ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়াই আমরা উহার কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি, আবার কখনও লোপ কল্পনা করিয়া থাকি।

ভারতীয় রসায়ন

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
ডি. এস্‌সি., ডি. আই-সি.

(তৃতীয় পর্যায়)

ভারতের কাচ শিল্প অতি প্রাচীন। মোহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত পদার্থকে কাচবৎ বললেও পরবর্তীকালে, ঐতিহাসিক যুগে কাচ ভারতে তৈরি হত নিশ্চিত জানা গেছে।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমলে এ দেশে কাচ তৈরী হত, এবং স্ফটিক বা কেলাস পদার্থ থেকে তার পার্থক্য আছে বলা হত। প্লিনি ভারতীয় কাচের কথা ত উল্লেখ করেইছেন, এমনকি বলেছেন ভারতীয়রা স্ফটিকের মত পদার্থ রং করে নকল জহর তৈরি করতে পারে। বাসবদত্তা নাটকে (6th century A. D.) মণিরকান্তি রংয়ের কাচের কথা উল্লেখ আছে। কোশিয়ায় (এলাহাবাদ, U. P.) খৃ পূ ৫০০ বছর আগেকার কাচের কারখানা আবিষ্কার হয়েছে। ছোট আধারে সুরক্ষিত বুদ্ধাস্থি ও তৎসহ পুঁতি, মুক্তা, সোনা রূপার পাত ইত্যাদি খনন করার সময় পাওয়া গেছে। আধারে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি থেকে বুঝা যায় এইগুলি খৃ পূ ৫০০ বছর আগেকার জিনিস।

নেপালের নিকটবর্তী রামপুরবা অঞ্চলে ঢালাই করা তামার দণ্ড পাওয়া গেছে। দণ্ডটি ২৪½ ইঞ্চি লম্বা, মধ্যে ১৪" মোটা, আর ডগার দিকে ১২" মোটা। ঐতিহাসিকরা মনে করেন খৃ° পূ° ৩০০ বছর আগে, এই রকম ঢালাই তামার কাজ এদেশে হত। ভাগলপুর অঞ্চলের সুলতানগঞ্জে তামার তৈরী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি ৭'৬" লম্বা, এর ওজন প্রায় ২৭ মণ। বৌদ্ধ মঠের কাছাকাছি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাই ঐতিহাসিকরা ঐ মূর্তি মাত্র পঞ্চম শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) গড়া হয়েছে বলে মনে করেন।

পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ নালন্দার কাছে ৪০ ফুট উঁচু বুদ্ধের তাম্রমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। খৃ পূ ৩০০ বছর পূর্বে ভারতবর্ষে তাম্র মুদ্রা ব্যবহার হত। বড় বড় তামার থালা পূজার সময় ব্যবহার হত। খৃ পূ ৩০০ বছর আগেও এদেশে এরকম তামার থালা ব্যবহার হত বলে জানা গেছে।

হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রাচীনকালে তামার আকরিক খনন করা হত, এবং তার থেকে তামা তৈরি করা হত। ভূতাত্ত্বিকদের মতে দুই হাজার বছর আগে এই ভাবে তামার তৈরির প্রথা ঐ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। রাজপুতানা অঞ্চলে অনেক তামার খনির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নেপালে ভাল তামার আকরিক পাওয়া যেত। পুরাকালে নেপাল আকরিকের নাম ছিল। আজও নেপালে ও সিকিমে প্রাচীন পদ্ধতিতে তামা নিষ্কাশন করা হয়। তার থেকে বাসনপত্র তৈরী করা হয়।

তামার মিশ্র ধাতু হিসাবে ব্রঞ্জ, পিতল ও কাঁসার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুশ্রুত ব্রঞ্জের পাত্র থেকে জলপানের নির্দেশ দিয়েছেন। মনু পিতলের তৈরি বাসনপত্রের কথা বলেছেন। কাঁসার থালার কথা বলেছেন। মনু অবশ্য খুব প্রাচীন নন। তাঁর সময় বোধকরি প্রথম খৃষ্টাব্দে।

প্রাচীন ভারতে পিতল যে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হত সে বিষয় সন্দেহ নেই। হিউয়েন সাঙ্ পিতল দিয়ে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের কথা বলেছেন। রাজা শিলাদিত্যর সময় ১০০ ফুট লম্বা বিহার গঠনের উদ্যোগ হয়েছিল। ভাগ্যবশে তা' আর শেষ পর্যন্ত শেষ হয় নি।

নিকেল ও তামা ঘটিত মিশ্রধাতু গহনার জন্য ব্যবহার হত। খৃ পূ প্রায় ১০০ বছর আগে এ মিশ্র ধাতু আমাদের দেশে ব্যবহার হত।

তক্ষশিলা থেকে বহু সোনা রূপার তৈরি জিনিস খনন করা গেছে।

লোহা নিষ্কাশন ও লোহা ধাতুর গঠন দেওয়া প্রাচীন ভারতে যে হোত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ তার এক বড় সাক্ষী। এই বিজয়স্তম্ভ বোধকরি চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল। এরও অনেক আগে এ দেশে লোহার তৈরি মারণাস্ত্র তৈরি হ'ত। মাদ্রাজে প্রচুর সংখ্যায় লোহার তৈরি তরবারি, বল্লম, ছোরাছুরি, তীর, দণ্ড প্রভৃতি খনন করে পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন এগুলি খৃ পূ চারশ' বছর আগেকার জিনিস। বুদ্ধগয়ার কাছে লোহাধাতু নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত ধাতুমল খনন ক'রে পাওয়া গেছে। খৃ পূ ৩০০ বছর আগেও এদেশে লোহা নিষ্কাশিত হ'ত বলে জানা গেছে।

সেকালে ভারতীয়েরা খুব ভাল জাতের পেটা লোহা তৈরি করতেন। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ খুব ভাল জাতের পেটা লোহার তৈরি। এতে শতকরা ৯৯'৭২ ভাগ লোহার সঙ্গে কার্বন '০৮, সিলিকন '০৪৬, গন্ধক '০০৬, ফসফোরস '১১৪ মিশ্রিত আছে। দীর্ঘ শত শত বছর ধরে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করলেও এ' লোহায় মরিচা পড়েনি।

উড়িষ্যায় লোহার বরগা ব্যবহার হয়েছে আনুমানিক ৬৪০ খৃষ্টাব্দে। প্রাচীন কালে তৈরি লোহা সবই পেটা লোহা। কাঠ জালিয়ে চুলার তাপে লোহার আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হ'ত। এত তাপ পাওয়া যেত না যে লোহা গলে তাতে তরল লোহায় পরিণত হয়। চুলার উষ্ণতা বাড়াবার জন্য বড় বড় হাপর দিয়ে বায়ু পাওয়ান হ'ত।

সেকালে ভাল ইস্পাতও তৈরি হ'ত। খৃ পূ ৪০০ বছর আগেও এদেশের ইস্পাত ভারতের বাইরে পারিস্য ও অন্যান্য দেশে সমাদর পেত। গ্রীক বণিক পেরিপ্লাস প্রথম খৃষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করতে আসতেন। তিনি বলেছেন আফ্রিকা অঞ্চল থেকে আবিসিনিয়ায় ভারতীয় ইস্পাত রপ্তানী হ'ত। দামাস্কাসের তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে গড়া হত। এ' প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার কথা।

বলতে গেলে অনেকটা এখনকার প্রণালীতেই সেকালে ইস্পাত তৈরি হ'ত। পেটা লোহা তৈরি করার পর, সেই লোহার সঙ্গে কাঠের টুকরা ও কাঁচা কাঠ মিশিয়ে বন্ধ পাত্রে নিয়ে কাঠের আগুনে তাপ দেওয়া হত। মাঝে মাঝে হাপর দিয়ে আগুন জোরাল করা হত। চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পেটা লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি হত। গরম ইস্পাত জলে চুবিয়ে শক্ত করা হত। তাতে অস্ত্র তীক্ষ্ণ করার সুবিধা হ'ত।

প্রাচীন ভারতীয়েরা সিমেন্টের ব্যবহার জানতেন। বিশেষ চূর্ণের বর্ণনায় 'বজ্রলেপ', 'বজ্রসংঘট' প্রভৃতি শব্দ, ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগে মঠ মন্দির নির্মাণের জন্য এই সব লেপ ব্যবহার করা হত। আঠা বা ধুনা জাতীয় পদার্থযুক্ত গাছের বাকল চূর্ণ করে জল দিয়ে ফুটিয়ে আঠা তৈরি করে দেওয়ালে লেপা হ'ত।

গরু ঘোড়ার খুর থেকে শিরীষের আঠা তৈরি করেও লেপন করা হত। এমন কি পিতল সীসা মিশিয়ে গলিয়ে তপ্ত অবস্থায় লাগিয়ে মন্দির গাঁথা হ'ত।

চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে (বাৎসায়ন কামসূত্র)

সুবর্ণ পরীক্ষা—সোনা জহরতের মূল্য নিরূপণ,

ধাতুবাদ—ধাতু নিষ্কাশন ও ধাতু বিজ্ঞান,

মণিরাগকর জ্ঞানম্—মণি রং করার বিজ্ঞান অন্যতম কলা বলে পরিগণিত হয়েছিল।

শুক্রনীতিসারে শুক্রাচার্য কলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন,

(১) পাথর ছেঁদা করা কিংবা ভস্ম করা,

(২) ভেষজের সঙ্গে ধাতু যোগ করা

(৩) মিশ্র ধাতু উৎপাদন করা

(৪) ক্ষার তৈয়ারি করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে।

STUDENTS P. G. COMMON ROOM

মধ্যযুগে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, হাতে কলমে কাজ করা উচ্চবর্ণের কর্ম নয় ব'লে প্রচারিত

হ'ল। আদি যুগে সুশ্রুত শব ব্যবচ্ছেদ বিনা শল্য চিকিৎসা শেখা হয় না বলেছিলেন। পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখা সম্ভব নয়। আর মধ্যযুগে মনু বললেন, শব ছুঁলে উচ্চ বর্ণের লোকের জাত যাবে। হাতে-কলমে কাজ, উদ্ভিদিত কলার চর্চা আর শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে রইল না, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হল। বিজ্ঞানের কার্যকারণ-তত্ত্বগত দিকটা নষ্ট হল।

অথচ বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিকেরও এদেশে উন্নতি হয়েছিল।

প্রাচীনেরা পদার্থের তেজ বা গতিশীল বা সক্রিয় অবস্থার কল্পনা করেছেন। একে রজোগুণ বলেছেন। বলেছেন, গতিশীল পদার্থ রজোগুণ প্রধান। তেজের বিবিধ রূপবিকারের কথাও বলেছেন। যা'কে আধুনিক ভাষায় বলা হয় শক্তি (তেজের) রূপ পরিবর্তন।

প্রাচীনেরা (পাতঞ্জল সাংখ্য) যৌগিক পদার্থ দুই রকম বলেছেন,—একই পদার্থের পরমাণুর সন্নিবেশে গঠিত, এ হল আধুনিক কালের মৌলিক পদার্থ। আর অন্যটি বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সন্নিবেশে গঠিত, এ হল আধুনিক কালের যৌগিক পদার্থ।

সেকালে অণু পরমাণুর পার্থক্যের কথাও বলা হয়েছে। পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম কণাকে পরমাণু বলা হয়েছে। এটি অবিভাজ্য। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুগুলি সংযুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থের অণু উৎপন্ন হয়।

পরমাণুগুলি সব সময়ে যুক্ত হয়ে থাকতে চায় (কণাদ) এবং দুইটি, তিনটি, চারটি পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়।

জগতে রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য তাপের প্রয়োজন, সেই তাপের উৎস হচ্ছে সূর্যের তাপ (উদয়ন)। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে সূর্যের তাপের জন্য আম পাকে। তাতে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন হয়।

অণুর আকার গোল (পরিমণ্ডল)। অণু সব সময় গতিশীল (পরিস্পন্দ)। এমন কি বায়ু বা গ্যাসীয় পদার্থের অণু সর্বদাই চঞ্চল।

আণবিক শাস্ত্র অধ্যয়নে আজকাল আমরা wave motion কথাটি ব্যবহার করে থাকি। সেকালের ঋষিরা তাকে অভিহিত করেছেন গতি-সনাতন বলে। যেটাকে vibration বলা হয়, তাকে স্পন্দন বা কম্প-সনাতন বলেছেন। জল, শব্দ আর আলো ত্রিবিধ গতি সনাতনের কথা বলা হয়েছে। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে জলের তরঙ্গ অপেক্ষা শব্দের তরঙ্গ তাড়াতাড়ি চলে, আলোর তরঙ্গ আরও তাড়াতাড়ি চলে।

অতএব বলতে হয় কি তত্ত্বে, কি ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ভারত তখন সমসাময়িক জগতে অগ্রণী ছিল। ঐতিহাসিকদের সাল তারিখ নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা বাদ দিয়েও মোটামুটি বলা চলে খৃঃ পূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেও ভারতে সোনা, তামা, ব্রঞ্জ, মৃৎপাত্র, ইঁট প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সমসাময়িক মিশর ও আরবদেশে এ সবের ব্যবহার দেখা যায়।

খৃ পূ আড়াই হাজার বছর আগে রূপা, সীসা, তামা-আর্সেনিক মিশ্র ধাতু, কাচবৎ পদার্থ বা কাচ, সিঁদুর, অম্ল, পালিশ করা মৃৎপাত্র, পিপঙ্গমের সিমেণ্ট জাতীয় পদার্থ ব্যবহার হত। চীন দেশে ঐ সময়ে তামা ব্যবহার হত। মিশরে সেই সময়ে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হত। ব্রঞ্জ, পারদ, কাচ, নীল রং করা কাচ, নীল ও অন্যান্য ঔষধ দ্রব্য ব্যবহার হত।

খৃ পূ দেড় হাজার বছর আগে ভারতে টিন ধাতু প্রচলিত হয়েছে। চীনে তখনও তামা আর ব্রঞ্জ চলেছে। ভারতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সবের উল্লেখ চীন, মিশর, আরব দেশে তখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

খৃ পূ নয়শত বছর আগে লোহা ধাতু ভারতে প্রচলিত হয়েছে। চীনেতেও হয়েছে এরও চারশ বছর পরে। যদিও মনে হয় মিশরে ভারতের আগে হয়েছে।

সাংখ্য-পতঞ্জল অণু পরমাণু তত্ত্বের অবতারণা করলেন বোধকরি খৃ পূ ৬০০ সালে। কণাদ পরমাণু তত্ত্বের সম্বন্ধে বললেন, খৃ পূ ৫০০ সালে। তত্ত্বগত আলোচনার উল্লেখ সমসাময়িক গ্রীসে শোনা গেল। ঐ রকম সময়ে ইস্পাত উদ্ভাবন হল। ইউরোপের হয়ত এর অনেক আগেই ইস্পাত জানা ছিল।

ঐ রকম সময়ে আয়ুর্বিজ্ঞান, ঔষধ বিজ্ঞান ভারতে বিকশিত হয়েছিল। সমসাময়িক জগতে তখন ঔষধ বিজ্ঞানের উল্লেখ নেই।

কাজেই সংক্ষেপে বলা চলে প্রাচীন ভারত সমসাময়িক জগতের চাইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে পেছিয়ে ছিল না। বিজ্ঞানেও ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। চীন, মিশর, আরব, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলি ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে লাভবান হয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রের ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত অবদানে ভারত যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিরলঙ্কার বর্ণনা কাব্য হতে পারে কি ?

অবশ্য এমন লেখা বহু পাওয়া যায় যেখানে অলঙ্কারটা পরিস্ফুট নয়, অথচ তার কাব্যত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের কণিকার "আষাঢ়" কবিতায়—.

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউশের খেত জলে ভর ভর,
কালি মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে, দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন, ধবলীরে আনো গোহালে,
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখাল বালক কী জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে॥

এই অংশটুকুতে একটু অনুপ্রাসের আমেজ থাকলেও অলঙ্কারের বৈচিত্র্য নেই, তাহলেও এর কাব্যত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নিরলঙ্কার বর্ণনাও যে কাব্য হতে পারে, তার প্রমাণ বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর "সাহিত্য দর্পণে" দিয়েছেন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' থেকে। পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন ঘটাতে হবে, সমাধি-মগ্ন শিবের আশ্রমে তাই দেবতাদের চক্রান্তে এলো অকাল বসন্ত, দাম্পত্য প্রেমে মুগ্ধ হ'ল বিশ্বের যত প্রাণী, প্রেমিক জানায় প্রেমাস্পদের কাছে প্রেমের অভিব্যক্তি; এই বিশ্বজোড়া প্রেমলীলার মধ্যে একটি খণ্ড দৃশ্য ফুটে উঠেছে ভ্রমর-দম্পতি ও মৃগ-দম্পতিকে নিয়ে—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥　　(৩।৩৬)

একটি ফুলকে পানপাত্র স্থির করে ভ্রমর বধূ তা থেকে মধুপান করেছিল, প্রিয়ার অনুবর্তন করে ভ্রমরও মধুপান করলো সেই কুসুম-পিয়ালা থেকে; দয়িতের স্পর্শসুখে হরিণবধূর চোখ নিমীলিত হয়ে আসছে, আর হরিণ তাকে আদর করছে তার পায়ে শিং বুলিয়ে দিয়ে।—এই বর্ণনার মধ্যে অলঙ্কারের ঘটা নেই, অথচ মনোহারিত্বে এটা যে কাব্যময় সেটা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এই জাতীয় উদাহরণ থেকে প্রমাণ দেওয়া যাবে না যে, নিরলঙ্কার বাক্যও ভাল কাব্য হতে পারে; কারণ রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হলো,—সেগুলির মধ্যেই আছে একটা বিখ্যাত অলঙ্কার, তার নাম হচ্ছে "স্বভাবোক্তি" অলঙ্কার। নিসর্গ বস্তুর সূক্ষ্ম (কবিজন বোধ্য) এবং যথাযথ বর্ণনার নাম "স্বভোবোক্তি" অলঙ্কার। "স্বভাবোক্তি দুরূহার্থ ক্রিয়া রূপবর্ণনম্" সাহিত্য দর্পণঃ ১০।১২১ (দুরূহার্থ—কবিমাত্র বেদ্যঃ) কবিমনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি না থাকলে "স্বভাবোক্তি" অলঙ্কার সম্ভব হয় না।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের কাব্যত্ব

কুন্তক প্রভৃতি আলঙ্কারিকরা বলেন "কোনও বস্তুর যথাবৎ বর্ণনায় কাব্যত্ব হয় না"। কাজেই স্বভাবোক্তিটা অলঙ্কারই নয়। কিন্তু কুন্তকের প্রতিস্পর্ধী মতও আছে। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার হিসাবে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন। বিলাতের কবি Wordsworth "Poetic diction" নিয়ে সমসাময়িক সমালোচকদের সঙ্গে তর্কপ্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে এই স্বভাবোক্তিরই সমর্থন করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বভাবোক্তিটা সত্যিই কি অলঙ্কার? এই সম্বন্ধে ডাঃ সুশীল দাশগুপ্ত তাঁর কাব্যালোকে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন (৫৫-৫৭ খৃঃ)। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে স্বভাব-সুন্দর জিনিষের এমন একটা নিজস্ব মহিমা আছে, যে তার আর অনুরঞ্জন চলে না, অলঙ্কার চলে না। অলঙ্কারই তার স্বরূপকে আবৃত করে, মাধুর্যকে বিকৃত করে। এই জাতীয়

জিনিষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে অলঙ্কারমুক্ত স্বাভাবিক বর্ণনায়। এই স্বাভাবিক বর্ণনাতেই বস্তুর সঙ্গে পাঠকের ঘটে চিত্তের স্পর্শ, অলঙ্কার এই স্পর্শের মধ্যে শুধু ব্যবধানেরই সৃষ্টি করে। এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলঙ্কার ;
তোমার কাছে রাখেনি তার
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে,
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তা'র
মুখর ঝঙ্কার।

সাজের অহঙ্কারে আর অলঙ্কারের মুখর ঝঙ্কারে সেই স্বভাব-সুন্দর জিনিসের সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের মিলন ব্যাহত হয়, তাই তার জন্য প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় বর্ণনা। এই নিরলঙ্কার বর্ণনাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, স্বভাবোক্তি অলঙ্কার, দণ্ডীর মতে এইটিই হচ্ছে আদি অলঙ্কার—

"নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতি র্যথা" ॥ (কাব্যাদর্শ ২।৮)

অর্থাৎ "পদার্থ সমূহের নানা অবস্থার সাক্ষাৎস্বরূপ যাতে সাক্ষাৎ ভাবে বিবৃত হয়, তাই স্বভাবোক্তি বা জাতি, তাই আদ্য অলঙ্কার"।

রসোক্তি, বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি

স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার বলে স্বীকার করলে অন্যান্য অলঙ্কারগুলিকে অস্বীকার করা হয় না কি ? সব ক্ষেত্রে হয় না। যে বর্ণনার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত দিকটা (Subjective element) বা রসবোধের দিকটা বড় হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে রসোক্তি অলঙ্কারের রাজ্য, এখানে কবি তাঁর কাব্য দিয়ে পাঠককে করেন ভাবসিক্ত, তার আবেদন হচ্ছে হৃদয়ে, যে বর্ণনার মধ্যে ভাষার কৌশল ও সাজসজ্জাটা বড় হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে বক্রোক্তি অলঙ্কারের রাজ্য, এখানে কবি তাঁর বর্ণনার কৌশলে পাঠকের বুদ্ধিকে করেন চমৎকৃত, তার আবেদন হচ্ছে মস্তিষ্কে ; আর যে বর্ণনার মধ্যে এই উভয় রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করে কবি-চিত্তের ব্যক্তিগত টীকা টিপ্পনি বাদ দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ (objective) ভাবে নিসর্গ বস্তুকে তার মহিমায় প্রকাশ করা হয়, সেটা হচ্ছে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের রাজ্য, এখানে কবি নিজে আড়ালে থেকে নিসর্গ বস্তুর সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের সোজাসুজি মিলন ঘটান, তার আবেদন হচ্ছে

আত্মিক। রসোক্তি হচ্ছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বর্ণনা, বক্রোক্তি হচ্ছে শব্দার্থ-কেন্দ্রিক বর্ণনা, আর স্বভাবোক্তি হচ্ছে বস্তু-কেন্দ্রিক বর্ণনা।

কাব্যে অলঙ্কারের সমর্থতা ও ব্যর্থতা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই তিন জাতীয় বর্ণনারই প্রয়োজন আছে, কাজেই এই তিন জাতির বর্ণনার মধ্যে যা-কিছু অলঙ্কার আছে, সেগুলির সমস্তের সঙ্গেই সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক আছে। সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সব অলঙ্কারই কাব্যলক্ষ্মীর শরীর-সুষমাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু সার্থকভাবে অলঙ্কারের প্রয়োগটা সহজ কাজ নয়, এইখানেই আছে রুচির প্রশ্ন ; শিল্প-প্রতিভার প্রশ্ন, "শক্তি"র প্রশ্ন। এই রুচি বা শিল্পপ্রতিভা বা "শক্তি" জিনিসটা মোটেই সুলভ পদার্থ নয়। অগ্নিপুরাণকার বলেছেন :

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যাতত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

এই শক্তি বা শিল্প-প্রতিভাটা সুদুর্লভ সামগ্রী বলেই অলঙ্কার প্রয়োগের ব্যর্থতা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। শরীর-শোভা বৃদ্ধির জন্য আপামর সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করে, কিন্তু সকলের অলঙ্কারই সার্থক হয় না। অস্থানে অসময়ে অশোভন অলঙ্কারের ব্যর্থতাও আমাদের কম পীড়া দেয় না।

"অলম্" কথাটার মধ্যে একটা নিষেধাত্মক ব্যঞ্জনাও আছে ; যেমন "অলম্ বিবাদেন"। যে অলঙ্কার সার্থক নয়, সেটা ভূষণ না হয়ে দূষণ হয়ে ওঠে এবং রসিক মনকে পীড়া দেয়। তখন বলতে ইচ্ছা হয় "অলম্" ; আর নয় বাপু, খুব হয়েছে, এখন বন্ধ করো তোমার বাহাদুরী। কাব্যের এই জাতীয় ব্যর্থ সাজসজ্জাও "অলঙ্কার"। তবে সে অলঙ্কার "ভূষণ-কৃতি" নয়, "সমর্থ-কৃতি" নয়, সেটা "ব্যর্থ-কৃতি" ; সে অলঙ্কার কাব্যলক্ষ্মীর আত্মাও নয়, আর বহিরঙ্গ ভূষণও নয়।

কুকুরের সামগান

শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১২) একটি কাহিনীর অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে যে—বক-শ্রাব নামধারী এক ঋষি একদা বেদাধ্যয়নের উদ্দেশ্যে (স্বাধ্যায়ম্) গ্রামের বাহিরে নির্জন স্থানে জলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন—(উদ্-বব্রাজ)। তখন ঋষিকে অনুগ্রহ করিবার জন্য (তস্মৈ) একটি শ্বেত কুকুর আবির্ভূত হইলেন, এবং ঐ শ্বেত কুকুরের অনুসঙ্গী অন্য কুকুরেরা তাহার নিকট গিয়া (উপসমেত্য) বলিল—"আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদের জন্য গানের দ্বারা অন্নের ব্যবস্থা করুন (আগায়তু)। শ্বেত কুকুর অন্য কুকুরগুলিকে প্রাতঃকালে আসিতে বলিলেন,—ঋষিও সেখানে অপেক্ষা করিলেন। তদনুযায়ী প্রাতঃকালে কুকুরগুলি আসিয়া শ্বেত কুকুরকে ঘিরিয়া বহিষ্পবমান যজ্ঞে স্তোত্র-গায়কদের ন্যায় পরস্পরকে ধরিয়া সর্পগতিতে (সর্পন্তীত্যেব) পরিসর্পন করিল (সংস্থুঃ), এবং সামগানের ছন্দে—"আমরা ভোজন করিব ;—হে জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারি, প্রজাপতি ও জগৎ-প্রসবিতা সূর্য ! এখানে অন্ন আহরণ করুন"—বলিয়া হিংকার করিতে লাগিল।

এই পর্যন্ত বলিয়া কাহিনীটি শেষ করা হইয়াছে। এখন বিচার করিতে হইবে—বেদপাঠের জন্য গ্রামের বাহিরে নির্জন স্থানে গমনকারী ঋষিকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কিরূপ শ্বেত কুকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার অনুসঙ্গী কুকুরই বা কি এবং কয়টি ; রাত্রে তাহাদের ক্ষুধা জন্মিলে লোকালয়ে না গিয়া নির্জন স্থানে ঋষির সমক্ষে অন্ন-প্রার্থনাই বা কেন ; আবার গান করিয়াই যদি অন্নের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ক্ষুধার সময় রাত্রেই গানের ব্যবস্থা না করিয়া প্রাতঃকালে আসিবার জন্য বলা কেন ? প্রাতে আসিলে শ্বেত কুকুর কিরূপ ব্যবস্থা করায় সর্পগতিতে চলিয়া সূর্যের স্তুতিমূলক একটি গান গাওয়া হইল,—এবং ইহার ফলে

কিরূপ আশাই বা পাওয়া গেল,—ক্ষুধানিবৃত্তি হইল কিনা? ঋষির বেদ-পাঠেরই বা কি হইল? কুকুরের গান-শ্রবণ ও অন্নভোজন দর্শনেই তাঁহার বেদপাঠের ফল লাভ হইয়া গেল কিনা?

স্বাধ্যায়—স্ব+অধি+ই+ঘঞ্, এক অর্থে গুরুর আদিষ্ট ও নির্দিষ্ট অংশের অধ্যয়ন। অপর অর্থে ঐ পাঠের বা প্রচেষ্টার অন্তিম লক্ষ্যে (goal) গিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান। যেমন পদের দ্বারা গমনও হয়, আবার গমনের অন্তিম লক্ষ্য পরম-পদও হয়। এখানে ঋষির "স্বাধ্যায়ম্" নিজের অভীষ্ট অন্তিম লক্ষ্যে অধিষ্ঠান।

উদ্-বব্রাজ—উদ-বব্রাজ নয়। ঋগ্বেদে (৬।৪৭।২১) শম্বরাসুরের "উদ-ব্রজ" নামক নগরের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখিয়াছেন—"উদকানি ব্রজন্তি যস্মাৎ", অর্থাৎ নদীর উৎস, পর্বতের শিখর-দেশ। এখানে কিন্তু শব্দটি হইল—"উৎ"—ঊর্ধ্বগতি-জ্ঞাপক। "বৃজ্" ধাতুর অর্থ মোচড় দিয়া ঘোরান (twist)। নিজের স্থিতিকেন্দ্রকে মোচড় দিয়া বহির্মুখী গতির নাম—প্র+বৃজ—প্রব্রজ্যা। আবার ঋত-অনুযায়ী বহির্মুখী প্রবাহিত ধারা বা ধর্মকে মোচড় দিয়া অন্তরাবর্তন করিলে কেন্দ্রকোষস্থ অণু-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—"প্রবৃত্তধর্মমনুমেতমাপ্যা" (কঠঃ ১।২।১৩)। সেইভাবে নিম্নমুখী ধারাকে মোচড় দিয়া ঊর্ধ্বমুখী করার নাম—উৎ-বৃজ্; এবং বক-শ্রাব ঋষি নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য উৎ-বব্রাজ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব-গতি করিয়াছিলেন—went out of himself upwards.

এই বৃজ্ ক্রিয়ার শক্তির নাম ঊর্জশক্তি—lever action force; তাহা হইতেই ওজঃ, বাজ (তু—কঠোপনিষদের বাজশ্রবা ঋষি)। একস্তরে আসিয়া পৌঁছিলে—ইহা হইয়া যায়—ঋজু বা সহজ। যেমন মাটি হইতে ভারি প্রস্তরখণ্ড মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিতে হইলে প্রথমে ঊর্জশক্তির ক্রিয়া জোরে চলিল; স্কন্ধের সমান্তরালে আসিলে উহা ঋজু বা সহজ হইয়া গেল,—এখন অনায়াসেই মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বক-শ্রাব ঋষি তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার মানসে বহির্মুখী চিত্তকে বৃজ্ করিয়া ঊর্ধ্বে আজ্ঞা-চক্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন,—সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন। এখন যেরূপ—

"মূর্ধানমস্য সংসিব্য অথর্বা হৃদয়ং চ যৎ।
মস্তিষ্কাৎ ঊর্ধ্বঃ প্রেরয়ৎ পবমানোঽধিশীর্ষতঃ॥" (অথর্ববেদ ১০।২।২৬)

—অথর্ব ঋষি হৃদয়ের সহিত মূর্ধাকে সেলাই করিয়া (অনাহত ও সহস্রারকে সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা একযুক্ত করিয়া) পবমান সোমকে মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বে উজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সেইভাবে তিনি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত হইবার অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। এখন তাঁহাকে ছান্দোগ্যোক্ত—হৃদয় হইতে মস্তকের ব্রহ্মতালুর সহিত যুক্ত এক-নাড়ী (ব্রহ্ম-নাড়ী) পথে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। (ছাঃ ৮।৩।৬)।

এই সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতের সন্ধিস্থল—যোগ-পথে আজ্ঞাচক্রের "রুদ্র গ্রন্থি"।—"সে

বড় বিষম ঠাঁই—শুরুশিষ্যে ভেদ নাই"; এখানে মাণ্ডুক্যোপনিষদের বার দফা—"নেতি—নেতি"; ইহা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের "অ-তমঃ, ন্ যৎ ন দিবা-ন রাত্রি, ন সৎচ-ন অসৎচ" (৪।১৮); ইহা কঠোপনিষদের নচিকেতার তৃতীয় রাত্রি; গীতার (৮।৯) ও ছান্দোগ্যের (৭।২৬।২) "তমসঃ", এবং চণ্ডীদাসের "তিমির-অন্ধকার"—ইহা ঘোর রাত্রি। এই অন্ধকার পার হইলেই—"তমসঃ পরস্তাৎ" (গীতা ৮।৯), "তমসস্পারং" (ছাঃ ৭।২৬।২), সহজ, প্রাতঃকাল,—"পূর্বরূপম্ বিবেকজম্ জ্ঞানম্—উষা যথা ন্নবেঃ" (পাতঞ্জল ৩।৩৩)। তখনই যমের নিকট হইতে মৃত্যুর পরপারের সন্ধান জানিয়া যোগবিধিমতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিরজঃ, বিমৃত্যুঃ হওয়া যায় (কঠঃ ২।৩।১৮)। তখন বেদান্তের "ঋতং চ সত্যং চ"র দুই 'চ' অন্তর্হিত হইয়া ঋত-সত্য মিশিয়া যায় ও শুধু "তৎ" থাকে।

এই অবস্থায় বক-ভাব ঋষির প্রাণবায়ু রুদ্ধ বা যম হইতে হইবে, এই দেহে আর তাহাদের ক্রিয়া চলিবে না। তাই প্রথম মুখ্য ও শুদ্ধপ্রাণ আসিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিভাত হইলেন, এবং সঙ্গে অপান, সমান, ব্যান ও উদান নামক তাহার চারটি অনুচর (প্রশ্ন ৩।৪) ও থাকিলেন।

কিন্তু প্রাণকে 'শ্ব' বা কুকুর বলা হইল কেন? তালব্য "শ" অর্থে তালুর আকৃতিতে (concave) কেন্দ্রীভূত উষ্মা। একখানি তালব্য (concave) কাচ রোদে ধরিলে আকাশে বিচ্ছুরিত সূর্যের তাপকে কেন্দ্রীভূত (concentrate) করিয়া আনে এবং আগুন জ্বলিয়া উঠে। একটি বীজের তালব্য দল পৃথিবী ও জলের উষ্মা কেন্দ্রীভূত করিয়া আনাতে ইহার অন্তস্থ জীবনীশক্তি বহিরোন্মুখ (উ) হয়, অর্থাৎ "শূ" হয়, এবং তখনই বীজটি ফুলিয়া উঠে—অর্থাৎ উৎ-শূন বা উচ্ছূন হয়। সেইভাবে যে 'শ'তে সৃষ্টির উপাদান বীজ—"ব" (অপ্‌তত্ত্ব Sperm) কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে—তাহা "শব" এবং সেই উষ্মাতে শক্তির প্রবাহ বা গতির (ই) ভাব থাকিলে তাহার নাম "শিব"। আকাশ ও তালব্য (concave), তাহার মধ্যে সৃষ্টির উপাদানবীজ কেন্দ্রীভূত ও গতি-ভাবযুক্ত হইয়া আছে বিধায়—আকাশ ও শিব একই অর্থ-বাচক (ছ)। তাই ব্রহ্মসূত্র মতে আকাশই ব্রহ্ম এবং প্রাণ—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ—অতএব প্রাণঃ" (১।১।২৩-২৪)। এই 'শ' ও 'ব'-এর এককেন্দ্রীগত ও একত্রীভূত অবস্থা বা প্রাণ-শক্তিই 'শন্' বা "শা"। সেইজন্য শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রের স্তুতিতে বলা হইয়াছে—"নমো শেভ্যো শপতিভ্যশ্চ বো নমোনমঃ" (৬।৫।২৪); আবার রুদ্রকে বলা হইয়াছে—"শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তেঽস্তু" (৬।৬।৮)।

আবার ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে,

"অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।" (ঋ ১।৮৯।১০)

অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারিণী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত অখণ্ডশক্তিই অদিতি মাতা। সেই

মাতার মধ্যে (মাতরি) ঐ উদ্গীথযুক্ত সৃষ্টির উপাদান বীজের যে কেন্দ্রীভূত অবস্থা বা প্রাণ, তাহাই হইল—"মাতরি-শ্বা"। সেইজন্য প্রশ্নোপনিষদে প্রাণকে মাতরিশ্বা বলা হইয়াছে (২।৬১)।

প্রাণের ক্রিয়া তথা গতাগতির বাহ্যিক লক্ষণ নাসিকায় প্রবাহিত শ্বাস-প্রশ্বাসে। সেইজন্য দেবতারা "নাসিক্যং প্রাণম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ ১।২।২)—নাসিকায় অবস্থিত ঘ্রাণাখ্য প্রাণকে উদ্গীথ কর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। আবার ব্রহ্মের চারিপাদের মধ্যে নাসা অন্যতম (ছাঃ ৩।১৮।২)।—জীবের মধ্যে একমাত্র কুকুরেরই নাসিকাশক্তি অতি প্রবল। অন্য জীব যে ঘ্রাণ পায় না, কুকুর তাহা পায়। হত্যাকৃত লোকের বস্ত্রের রক্তের গন্ধ শুঁকিয়া দূর দূরান্তে গুপ্তস্থানে অবস্থিত হত্যাকারীর সন্ধান বাহির করা কুকুরের মাতরিশ্বা শক্তিরই পরিচায়ক। তাই কুকুরের নাম ও "শ্বা"। ঋগ্বেদোক্ত সরমা কুকুরী কর্তৃক বেকনাটা নালার মধ্যে (বেকনাটা—৮।৬৬।১০) পনীগণ কর্তৃক আবদ্ধ গাভীর অন্বেষণে যাওয়ার কাহিনীও প্রাণশক্তির ক্রিয়ার রূপক (প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য)।

এই প্রাণ-কুকুরই বক-শ্লাব ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা পাঁচটি। (১) প্রধান বা মুখ্য প্রাণ—শুভ্র, শ্বেতবর্ণ; চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় তাহার অধিষ্ঠান। তাহারই শাসনে পরিচালিত ও দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ক্রিয়ায় নিয়োজিত (২) অপান (৩) সমান (৪) ব্যান ও (৫) উদান (প্রশ্নঃ ৩।৪, ৫)। সুতরাং ঋষি যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পৌঁছিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন প্রথম মুখ্য, শুভ্রপ্রাণ স্ব-স্বরূপে প্রতিভাত হইলেন, অন্য প্রাণগুলিও দেহের ক্রিয়া ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু রুদ্র-গ্রন্থি ভেদ না করিলে ইহা সম্ভবপর নয়। আবার, এই গ্রন্থিভেদের সময় অনেক প্রকার অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পায়, সাধক অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন; যোগের ভাষায় সংস্কার মরিলেও সংস্কারের সংস্কার থাকিয়া যায়। সুতরাং এই নিশা দূর না হইলে—অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাতঞ্জলের উষার উদয় না হইলে কুকুরগুলির ক্রিয়া শেষ হইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই—অন্য কুকুরগুলিকে প্রাতঃকালে আসিতে বলা হইল।

তবে প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে হইলে অন্ন-ভোজন কেন?—অন্ন=অদ্+ত—একটি শৃঙ্খলিত ধারায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাহা জীর্ণ হয়, তাহাই অন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন—ওষধি-জাত স্থূল পদার্থরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে, উহার স্থূলতম অংশ—মল, সূক্ষ্ম অংশ—মাংস ও সূক্ষ্মতম অংশ মন—এই ত্রিরূপে পরিণত হয় (৬।৫।১)। আবার বলা হইয়াছে—প্রস্তাবের দেবতা প্রাণ, যেহেতু চরাচর-ভূতবর্গ উৎপত্তিকালে প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং প্রলয়কালে প্রাণেই বিলীন হয় (১।১১।৬-৭)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তুর শেষ পরিণতি প্রাণে। সৃষ্টির উপাদান পঞ্চ-তত্ত্ব: প্রথম ব্যোম্ (আকাশ =প্রাণ), ব্যোম্ হইতে বায়ু (চাঞ্চল্য, গতি), বায়ু হইতে তেজ (অগ্নি, রূপায়িকা শক্তি),

তেজ হইতে অপ্ (তারল্য, রীঢ় তত্ত্ব), অপ্ হইতে ক্ষিতি (স্থূলত্ব, কাঠিন্য)-র সৃষ্টি। মূল ব্যোমের সৃষ্টি আবার কাম (ক) হইতে, (স অকাময়ত বহু স্যাম্), এবং কাম আবার কেন্দ্র-কোষস্থ বিন্দুর (Nucleus) মনের রেতঃ হইতে—"কামস্তদগ্রে সমবর্তত মনসো রেতঃ যৎ প্রথমং আসীৎ" (ঋঃ-১০।১২৯।৪)। মনের রেতঃ (emanation) হইতে জাত কামই প্রথম স্পন্দন-কারক। সুতরাং মন, কাম, প্রাণ বা ব্যোম্ এবং ক্রমান্বয়ে স্থূল সৃষ্টি ঋত এবং সত্য এবং এতদুভয়ের সমন্বয় ছন্দ অনুসারে তরঙ্গ (wave-pattern) ও সর্পগতিতে (gliding) সাধিত হইতেছে, এবং এই সমস্তের মধ্যে প্রাণশক্তি পঞ্চধা-বায়ুর ক্রিয়া করিতেছে। তাই প্রশ্নোপনিষদে (২।১১) অপ্, তেজ, বায়ু, চক্ষু, শ্রোত্র আদি প্রাণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে প্রাণ! তুমি অত্তা, অর্থাৎ অন্নভোজনকারী. এবং "বয়ম্ আপস্ত দাতারঃ"—আমরা তোমার অন্ন যোগানকারী। কঠোপনিষদ বলিলেন, পরমপদের অন্ন (ওদনঃ) হইল—ব্রহ্ম (বৃহ্+মন্— expansiveness) এবং ক্ষত্র (energy associated with it)।—সুতরাং, এখন যদি প্রাণকে স্থূলদেহ ছাড়িয়া নিজের শুদ্ধস্বরূপে কামে এবং অতঃপর মনে তথা কেন্দ্রকোষে ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে উল্টাগতিতে (বামাগতি—reverse process) পূর্বের ক্রমবর্ধমান তত্ত্বগুলিকে অন্নরূপে ভক্ষণ করিয়া প্রাণে জীর্ণ করিতে হইবে। তখন—

"পৃথ্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে পঞ্চগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।" (শ্বেত ২।১২)

—যোগীর দেহ যোগাগ্নিময় হওয়াতে পৃথিবী আদি পঞ্চতত্ত্ব ক্রমোর্ধগতি করিয়া স্ব-স্বরূপে পরিণত ও জীর্ণ (sublimation) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সাধকের ভাষায় "জোত্মে জোত্ মিল যাই" হওয়ায় রোগ, জরা, মৃত্যুর অতীতাবস্থা অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং কুহূরগুলি এখন সত্যসত্যই বুভুক্ষিত, তাহারা ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম্ রূপ অন্ন ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধপ্রাণের সহিত এক হইয়া বিশ্বপ্রাণে পরিণত হইবার জন্য লালায়িত।

'গ্রাব' শব্দের অর্থ সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিবার দুই খণ্ড চাকি-প্রস্তর। তাহাদের মধ্যে সোমলতা রাখিয়া প্রস্তরের চাপ দিলেই সোমরস নিষ্কাশিত হয়। শিলাময় পর্বতের নিজের চাপে তাহার মধ্য হইতে তাহার রেতঃস্বরূপ শিলাজিৎ নিঃসারিত হয়, ঠিক যেমন কেন্দ্রকোষের (Nucleus) চাপে তাহার মনের রেতঃস্বরূপ 'কাম' উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ কাম হইতেই স্পন্দন (vibration) এবং তৎসহ সৃষ্টির প্রসব (স), আনন্দ (আ) ও পূর্ব-ব্যঞ্জনা (ম—ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ অক্ষর) অর্থাৎ সামলীলা, এবং ইহার যে রস তাহার নামই সোম (thrillful bliss of primordial creative action), বা গ্রাব। সুতরাং স্থূল সৃষ্টির উপাদান বীজ 'ব' (অপ্ তত্ত্ব) কামনা "ক"-র সহিত যুক্ত হইয়া সোম বা গ্রাবের অবস্থায় যাওয়ার নামই "বক-গ্রাব"। এখন বাকী থাকিল শুদ্ধপ্রাণ হইয়া মনস্ হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রকোষের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া এক হইয়া যাওয়া।

ইহা করিতে হইলে সামের ছন্দ ধরিতে হইবে। বীজের আবরণ ভেদ করিয়া কাণ্ড, কাণ্ডভেদ করিয়া শাখা, শাখা ভেদ করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল হওয়া ঋতের কার্য ; আবার আবরণের বাধা ভেদের পর ঠিক ঠিক যাহা জন্মিবার তাহা জন্মিতেছে,—ইহা হইল সত্যের ক্রিয়া। আবার ঋত ও সত্যের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণশক্তি-শোভাসম্পন্ন বৃক্ষের পূর্ণ ব্যঞ্জনা ; ইহা ছন্দের ক্রিয়া। কেন্দ্রকোষজাত স্পন্দন একটি বিশেষ ধারায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ছন্দগতিতে বৃক্ষে রূপায়িত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেকটি ব্যাপারে এইরূপ সামের ছন্দ-ক্রিয়া চলিতেছে।

সৃষ্টির স্পন্দনের যে ছন্দে মেঘের বা অগ্নির সৃষ্টি হইতেছে, আমি যদি আমার কণ্ঠোত্থিত স্পন্দনকে সেই ছন্দে আকাশে ঊর্ধ্বগতিতে উড়াইয়া দিতে (উদ্-গীত) পারি, তাহা হইলে আমিও মেঘ বা অগ্নি সৃষ্টি করিতে পারি,—ইহাই মেঘমল্লার রাগ বা দীপক রাগিণী। —ইহাই সোমযজ্ঞের সামগানের উদ্-গীথ।

সুতরাং, পঞ্চতত্ত্বরূপ অন্ন ভক্ষণ করিতে হইলে উহারা মূল স্পন্দন হইতে যে ছন্দে নিম্নমুখী হইয়া (fall out) এই তত্ত্বরূপ ধারণ করিয়াছে—অর্থাৎ হ্রস্ব ও স্থপ্ গতিতে—প্রাণকুকুর-গুলিকে উল্টাগতিতে ঐ ছন্দের সামগান গাহিতে হইবে। বকনারের নিকট প্রাণ-কুকুরগুলি তাহাই করিল।

প্রশ্নোপনিষদ বলিলেন—এই বিশ্বের সৃষ্টি ক্রিয়া চালু রাখিবার শক্তি (ইন্দ্র), রক্ষণ করিবার শক্তি (রুদ্র), জ্যোতিঃ ও কিরণপ্রদানশক্তি (চন্দ্র, সূর্য) ও বর্ষণ-শক্তি সবই মূলতঃ প্রাণ (২।৯,১০)। ছান্দোগ্য বলিলেন—আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রাণশক্তি আসিয়া জীবের ব্রহ্মতালুপথে প্রবেশ করিয়া একটি নাড়ীযোগে হৃদয়ের গূঢ়তমঃ প্রদেশে অধিষ্ঠিত হয়, আবার হৃদয় হইতে ঐ নাড়ীপথে নির্গত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলে গিয়া মিশিয়া যায় (ছাঃ ৮।৬।২)। সুতরাং, কুকুরদের অন্নভোজনের সামগান শেষ পর্যন্ত ঐ জ্যোতির্ময় ও বর্ষণকারী সবিতার উদ্দেশে।

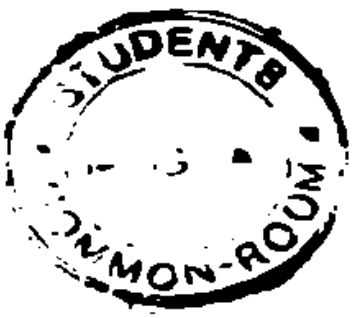
STUDENTS
COMMON-ROOM

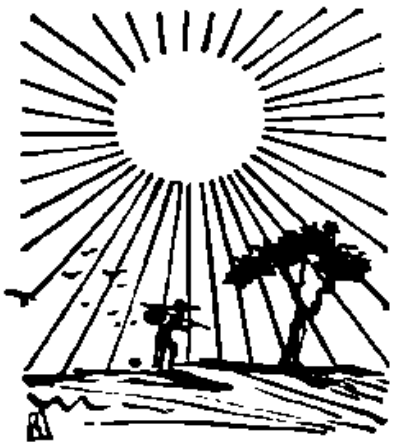

বিশ শতকের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১৮৮৭—১৯৫০)

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু

কবিকর্ম :

(১) মরীচিকা (১৩০০)।
(২) মরুশিখা (১৩০৪)।
(৩) মরুমায়া (১৩০৭)।
(৪) সায়ম্।
(৫) ত্রিযামা।
(৬) নিশান্তিকা।

উনিশ শতকের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ শতকে উত্তরণ। বিশ শতকের দুঃখবাদে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। এই শতকে বিজ্ঞানজগতে যেমন যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে ভোগের উপকরণ বেড়েছে সেই সঙ্গেই সমস্যার জাল ঘুনীপাকের মত জীবনযাত্রাকে জটিলতর করে তুলেছে। এই জটিলতার বেদনাবোধে মানবচেতনা আদর্শ লোক থেকে বাস্তবের যুক্তিলোকে অবতরণ করেছে। বাস্তববাদী যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এই বুদ্ধিবাদ প্রকট হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন বাস্তবকার। শত ক্ষুদ্র উপকরণে সৌধ নির্মাণই প্রধান কাজ। মন কিন্তু এর বিপরীত কাজ করে চলেছে। মানুষের মনে আদর্শের সৌধের প্রতি তাঁর মন সংশয়াকুল হ'য়ে পড়েছে। তাই মানস-সৌধের মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন।

গৌতম বুদ্ধের মতে জগৎটা কিছুই নয়—একটা প্রাতিভাসিক রূপ মাত্র। জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই—সবই সর্পতে রজ্জুভ্রমের মত ভ্রান্তিমাত্র। কর্মশৃংখলে মানুষের যত দুঃখ ভোগ, এই শৃংখল ভাঙতে পারলেই নির্বাণ ; জন্মমৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তি।

জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন, জগৎ দুঃখময়। সুখের লেশ কোথাও নেই। যাকে আমরা সুখ বলি,—তা আদপেই সুখ নয়, দুঃখের সাময়িক অভাব মাত্র। বাঁচা কেবল নিজের জীবন-সংগ্রাম নয়, অপরের সংহারের কারণ। সভ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগের

সামগ্রী বাড়ছে—তাতে দুঃখ কমছে না—বরং চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই চলেছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি তীক্ষ্ণ হ'চ্ছে। আর দুঃখও বাড়ছে। বাইরের দুঃখ আসল দুঃখ নয়—তার বাস অনুভূতিলোকে। দুঃখবোধ যত বাড়ছে দুঃখও তত বাড়ছে। বিশ শতকের মানুষের অনুভূতিবোধ উনিশ শতকের চাইতে বেশী। কাজেই বিশ শতকের মানুষ বেশী দুঃখী। এ দুঃখকে ভোলাবার জন্যে কবিরা অনেক বড় বড় কথা বলেছেন, সৌন্দর্যের মায়া-লোকের কল্পনা করেছেন—যে সৌন্দর্য ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। কিন্তু বিশ শতকের বুদ্ধিবাদের জল হাওয়ায় যে কবি বেড়ে উঠেছেন, বর্তমানের জীবন ট্রাজিডি যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর কাছে জীবন-জিজ্ঞাসা একটু জটিল পথ ধরবে বৈকী। কবি নিজে মুক্ত পুরুষ—সব কিছুর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। দুঃখের আবর্তে পড়ে আকুলি বিকুলি করেন নি। বিনয় বা বিদ্রোহ কিছুই করেন নি—কেবল ঘটনাস্থলের একটু দূরে বসে সবকিছু দেখেছেন আর মুক্ত পুরুষের মত প্রশ্নের তরঙ্গ তুলেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা চলে একটু বক্রগতিতে ব্যঙ্গের পথ ধরে।

জগৎজোড়া এই অনিয়ম আর দুঃখে কবিহৃদয় ব্যথায় রঙীন হ'য়ে ওঠে। কেবল দুঃখবাদী বললেই যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব বলা শেষ হবে না। তাঁর কবিধর্মের মৌল বস্তু হোল জীবনবাদে। তিনি চান জীবন সুন্দর হোক—সব দুঃখ অপসৃত হোক—কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। জীবন নশ্বর এবং জগৎ দুঃখময়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের এই সংঘাত তাঁর হৃদয়কে করেছে বেদনাতুর, কাব্যমনোভূমিকে করেছে অশ্রুসজল। এই বেদনার মনোভূমিতে কাব্যের জন্ম—মানুষ যা চায় তা পায় না—এই চিন্তার বেদনা তাঁর কাব্যের মূল সুর। জগৎজোড়া এই অনিয়ম চলেছে তাই কর্মশৃংখলার প্রতি বিদ্রূপে তাঁর কণ্ঠ তীক্ষ্ণতর হ'য়েছে। জগৎস্রষ্টার প্রতিও মাঝে মাঝে অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হ'য়েছে। তা বলে তিনি নাস্তিক নন। ঘোর আস্তিক—নিয়ম-শৃংখলায় বিশ্বাসী। তাইতো অনিয়মে বেদনা আর অশান্তিতে দুঃখ!

এই আস্তিক্যবুদ্ধিই তাঁর কাব্যকে মহনীয় করেছে। জগৎকারণের প্রতি গভীর আস্থার জন্যেই এই দুঃখবোধ। কিন্তু কবির মানসভূমিতে এই জগৎকারণের স্থান সুদৃঢ়। কবি জানেন সমগ্র জগতের তাবৎ দুঃখের কারণস্বরূপ যিনি তিনি নিজে কি সুখী হতে পারেন? তিনি সকলের দুঃখ বহন করেন। তা'হলে সবচেয়ে অসুখী তিনিই। সেই দুর্জ্ঞেয় পুরুষও বেদনার সমুদ্রে ভাসমান। মানুষের খণ্ডদুঃখের সমাহারে সেই পরম দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তির সৃষ্টি। কাজেই সান্ত্বনা বাণী খোঁজা অপচেষ্টা মাত্র। জগৎকারণই দুঃখ—অতএব দুঃখই একমাত্র সত্য। মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মতবাদের সঙ্গে কবির মতবাদের সাধর্ম্য রয়েছে এখানে।

কিন্তু বাস্তববাদী হ'লেও যতীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিকতার আমেজ আছে। পরম রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় পুরুষটির প্রতি তাঁর প্রেম নিছক কল্পনাবিলাস নয়। তাঁর সঙ্গে কবির প্রেমের সম্পর্ক। পরম দুঃখময়ের সঙ্গে কবির দুঃখের একটা আত্যন্তিক যোগ রয়েছে,—তার বেদনা-

বোধের ট্রাজিডিই কবিজীবনের ট্রাজিডি। কবিমানসের এই বেদনাবোধই তাঁর কাব্যের রোমান্টিকতা।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে অবশ্য এ সুর আকস্মিক নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল আদর্শের মধ্যে জগতের রীতি নিয়মের প্রতি একটা আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ চাপা দুঃখের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল মধুসূদনের কাব্যে। তারপর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাব্যে সংশয়-বোধের অবতারণা দেখা গেল। দ্বিজেন্দ্রলালে সেই দুঃখবাদ অন্য সুরে ধ্বনিত হ'লেও তার পদচারণা স্পষ্টাঙ্কিত।

আগেই বলেছি যতীন্দ্রনাথ ঘোর আস্তিক। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে আস্থাশীল। তিনি মঙ্গলময়—আবার বিশৃংখলতার দুঃখে দুঃখী। ঈশ্বরের মধ্যে এই দুটি সত্তা রয়েছে। স্রষ্টার একান্ত অনুরাগী বলে নিজের মধ্যেও কবি এই দ্বৈত সত্তার অস্তিত্বের কল্পনা করেছেন। দ্বিতীয় সত্তাকে বলেছেন 'বন্ধু'। এই 'বন্ধু' বাইরের কেউ নন—তিনি কবি-পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষ। এই বন্ধুকে মাঝে রেখেই তিনি প্রিয় পরিবাদের সমালোচনা করেছেন।

যতীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছেন তির্যকভাবে। কাব্যেও তাই সেই তির্যকতা বর্তমান। মোহমুক্তি ঘটিয়ে সত্যস্বরূপকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর আন্তরিক। তাই তাঁর কাব্য যুক্তিধর্মী, ব্যঙ্গাত্মক।

আগেই বলেছি কবি যতীন্দ্রনাথ মুক্তপুরুষ। নাট্যকারের অনাসক্তি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন এবং নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কাব্যে এর পরিচয় সুস্পষ্ট।

বিশ শতকের সার্থক কবি যতীন্দ্রনাথ। চিন্তাশ্রয়ী কবিকর্মে তাঁর তুলনা মেলা ভার। বিশ শতকের সমস্যাজর্জর সমাজকে তিনি অন্যভাবে দেখেছেন। তাই উচ্ছ্বাস অপেক্ষা তাঁর কাব্য তত্ত্বাশ্রয়ী, ভাবাবেগপ্রধান অপেক্ষা যুক্তিধর্মী।

আলোচনা কেবল তত্ত্বাশ্রয়ী নয়—কাব্যাশ্রয়ী ও বাঞ্ছনীয়। এতক্ষণ কেবল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কবিরা কেবল তাত্ত্বিক নন, প্রধানতঃ তাঁরা কবি। কবিকর্মের আলোকেই তাঁরা ভাস্বর। তত্ত্ব ও তথ্য প্রাবন্ধিকের মুখ্য আলম্বন। রসিক সমাজে শিল্পীক সৌন্দর্য অধিকতর বরণীয়। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা অভিযোগ শোনা যায়—তাঁর কবিতা প্রধানতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী। এর উত্তরে বলা যায় যে কবির হৃদয়-প্রাবল্য অধিক ছিল না। তিনি বুদ্ধিজীবী কবি। তাঁর কাব্যের উৎসমুখ হৃদয় নয়—প্রধানতঃ মন। সেইজন্য রসের আবেদন সার্বজনীন নয়। বুদ্ধিজীবী বলেই তাঁর কাব্য-কারু-কলা উচ্চস্তরের। মননশীলতার আধার হওয়ার মত শক্তি তার আছে। ভাষার কৌলীন্য সবসময় বজায় রাখেন নি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একাসনে স্থান দিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য অপ্রাসঙ্গিক নয়—কিন্তু তথাপি রসের আবেদনের দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কাব্য হৃদয় দ্বারে আঘাত দেয় বিনা সন্দেহ। মনের মর্মদ্বারে তর্ক করে যে হৃদয়ের মণিকোঠায় তার দ্বার অবারিত নয়।

এখন যতীন্দ্রনাথের কবিকর্মের দু'একটি পরিচয় মেওয়া যাক্ :

(ক) "সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি-জগন্নাথ !
রথের চক্কায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম শিলা,—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।"

(খ) "চার হাত পাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিনহাত ঘরে
কৌতুক দেব—কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।
প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়া ভাঙা যত কোলকুঁজো আর ঘাড়গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি করপুট,—
হে রসিক তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট।"

(গ) "চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে।"

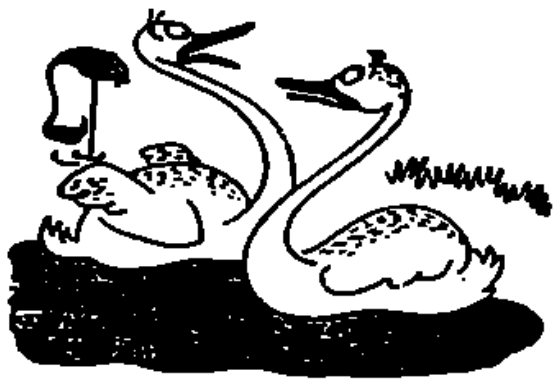

বৌদ্ধ রামায়ণ

শ্রীরন্ধদেব রায়, এম. এ.

রামায়ণের কাহিনী কি ভাবে জাতকে রূপান্তরিত হইয়া নবরূপ ধারণ করিয়াছে, 'দশরথ জাতক' তাহার নিদর্শন। রামায়ণের কাহিনীর কতগুলা বিকৃতি জাতক-রচয়িতাদের হাতে ঘটিয়াছে, তাহা কিন্তু কাহিনীরই জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। জনসাধারণের নিকটে রামায়ণের গল্প এমনভাবে প্রচলিত হইয়াছিল যে, বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন শিক্ষাদানের কালে শ্রমণদের বহু প্রচারিত কাহিনীর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

জাতকের গল্পটি এই—বারাণসীতে দশরথ নামক ন্যায়পরায়ণ এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু সহস্র রাণী ছিল, প্রধানা মহিষীর গর্ভে তাঁহার রাম ও লক্ষ্মণ নামক দুইটি পুত্র এবং সীতা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। কালক্রমে প্রধানা মহিষীর মৃত্যু হইলে এবার যিনি ঐ পদে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি রামলক্ষ্মণকে পছন্দ করিতেন না।

তাঁহার গর্ভে দশরথের ভরতকুমার নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়। কোন এক সময়ে দশরথ মহিষীকে একটি বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রাণী পরে প্রয়োজন হইলে লইবেন বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভরতের বয়ঃক্রম হইলে নবীনা মহিষী দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি যে বর দেবেন বলেছিলেন, তা আমি এখন চাইছি, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন।"

দশরথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তা কি ক'রে হয়! রামপণ্ডিতকে আমি তার পদ থেকে বঞ্চিত করি কি ক'রে?"

মহিষী মান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। দশরথ চিন্তা করিলেন: "এভাবে সংসারে অশান্তি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়; তাছাড়া রামপণ্ডিতের বিপদের আশঙ্কা আছে, তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন"।

তিনি গণৎকারদের ডাকাইয়া নিজের ভাগ্যগণনা করাইয়া জানিলেন তিনি আর মাত্র দ্বাদশ বৎসর বাঁচিবেন।

রামপণ্ডিতকে ডাকিয়া তিনি সকল কথা খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ দিলেন: "বাছা, তুমি ১২ বছর অন্য কোথাও বাস করো, তারপর আমার মৃত্যু হ'লে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করবে"।

পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া রাম তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। পুরবাসীরা যুবরাজের এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দলে দলে সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

রামপণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করিলেন: 'আমরা যদি এখন অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে বাস করি, তবে হয় তো আমাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ সেই রাজ্যও পিতৃরাজ্য আক্রমণ করতে পারে। তার চেয়ে এই কয় বছর বনে গিয়ে বাস করি'।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বনে চলিয়া গেলেন। সন্তানের বিয়োগব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া দশরথ নবম বর্ষেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ভরতকে রাজত্ব দিবার জন্য মহিষী বহু চেষ্টা করিলেও অমাত্যদের প্রতিবন্ধকতায় তাহা সফল হইল না। ভরত কিন্তু রামের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তিনি ভ্রাতাদের বিয়োগব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রাতাদের দেখিতে বনে গমন করিলেন।

রামপণ্ডিতকে তাঁহার দুই ভ্রাতাভগ্নী বনে দাসদাসীদের ন্যায় সেবা করিতেন। ভরত যখন রামচন্দ্রকে দুঃসংবাদ দিবার জন্য বনে আসিলেন, লক্ষ্মণ ও সীতা তখন ফলমূল আহরণ করিতে গিয়াছিলেন। ভরত গিয়া রামপণ্ডিতকে পিতৃবিয়োগের দুঃসংবাদ দিলেন। রামের কিন্তু মোটেই চিত্তবিকার হইল না, কিন্তু অনুজ-অনুজা ফিরিলে পাছে তাঁহারা শোকাকুল হইয়া পড়েন সেজন্য তিনি এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিলেন।

তাঁহারা যেন কঠিন অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের দণ্ড দিবার প্রয়োজন—এইরূপ ভাণ করিয়া তাহাদের নিকটস্থ সরোবরে বারবার অবগাহন করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা যখন শীতল জলে বহুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, ভাগাবেগ সহ্য করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে তখন তাহাদের ধীরে ধীরে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। তাহা সত্ত্বেও তাহারা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

ভরত দেখিলেন, একমাত্র রামপণ্ডিত এই নিদারুণ শোকের বেগ নীরবে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন: "আপনি তো এ সংবাদে কাতর হয়ে পড়েন নি"?

রাম শান্তস্বরে উত্তর দিলেন : "দেখ, উষাকালে যাদের দেখব, তাদের রাত্রিতে দেখতে পাব না—এ সত্য আমাদের কাছে যেমন স্পষ্ট, আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যথাও তেমনই সত্য। কাজেই চীৎকার ক'রে কেঁদে কি হবে"?

এই বলিয়া তিনি সহজ ভাষায় জীবনমৃত্যুর রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন।

ভরত বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও রামপণ্ডিত বারাণসী প্রত্যাগমন করিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন : "পিতা যে আদেশ করেছিলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আর তিনবছর গেলে বারো বছর পূর্ণ হবে, তখন রাজ্যে ফিরব"।

ভরত তখন তাঁহার তৃণনির্মিত পাদুকা লইয়া দেশে ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণও দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিন বৎসর ভরত রামের হইয়া রাজ্য চালাইলেন। সিংহাসনে তাঁহার পাদুকাদ্বয় থাকিত—যদি কোন অবিচার হইত, পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত।

যথাসময়ে রামপণ্ডিত বন হইতে ফিরিলে তাঁহার অভিষেক হইল। তারপর তিনি বিবাহ করিয়া সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

আমাদের হিন্দুসমাজে প্রচলিত রামায়ণে সীতা রামের ধর্মপত্নী। বৌদ্ধ রামায়ণে সীতাকে রামের ভগ্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামায়ণের মূল-কাহিনী—রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ বৌদ্ধ রামায়ণে নাই। রামায়ণের মধ্যে জাতককারদের সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে রামের পিতৃসত্য পালন ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি। তাঁহারা কেবল ঐ অংশটিকে লইয়াই এই জাতকের গল্পটি রচনা করিয়াছেন।

দসবস্সসহস্সানি সট্ঠিবস্সসতানি চ
কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রাজ্যং অকারয়ি॥

মহাবীর রামচন্দ্র তারপর বহুদিন পরাক্রমের সঙ্গেই প্রজাপালন করিয়াছিলেন।

গল্প ও শিশু-মন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম. এ.

শিশু-মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, শিশুরা কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালবাসে। তাই যে সব মানুষ এবং জিনিষের সাথে শিশুর পরিচয় আছে সে সব মানুষ এবং জিনিষকে কেন্দ্র করে রচিত কোন গল্প তার মনের উপর সহজে দাগ কাটে না। সে কল্পনার চোখে এমন একটা জগৎ দেখতে চায় যেটার সাথে তার প্রতিদিনকার পরিচিত জগতের মিল থাকবে না।

রূপকথার যে সব চরিত্রের সাথে শিশুর পরিচয় হয় সে সব চরিত্রের ভূমিকা তার মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রূপকথার নায়করা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে চলে সে সংগ্রাম তাকে উদ্দীপিত ক'রে তুলে।

গল্প শুনতে ভালবাসে না এমন শিশু নেই বল্লেই চলে। পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শিশুদের গল্প শোনার আগ্রহ এত প্রবল হ'য়ে উঠে যার ফলে এরা আহারাদির কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। কিভাবে এবং কতটা এদের মনের উপর গল্প প্রভাব বিস্তার করে সেটা শিশুরা নিজেরা ঠিক বুঝতে পারে না। রূপকথা পর্যায়ের যে-সব গল্প বলা হয়, শিশুর মনের উপর সে সব গল্পের ছাপ থেকে যায়। প্রধানতঃ তিনটি কারণবশতঃ শিশুর জীবনের দিক থেকে এই ধরণের গল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, শিশুর মন যা'তে নীচতা এবং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকে সেজন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ শিশুর চিন্তাধারার বিস্তৃতি ঘটে। তৃতীয়তঃ শিশুর কল্পনাশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

নিছক গল্প বলার কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। শিশুদের কাছে গল্প বলার পিছনে দুটো উদ্দেশ্য থাকা দরকার। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে গল্পের মাধ্যমে শিশুকে কিছু শিক্ষা

দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ এমনভাবে গল্প বলতে হবে এবং গল্পের মধ্যেও এমন কিছু থাকা চাই যার ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি বিকশিত হ'তে পারে। আজকাল আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন এবং নার্সারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। শিশুদের গল্প শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই ধরণের স্কুলে গল্প বলার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের কাছে যাঁরা গল্প বলবেন, আনন্দ বিতরণের ভিতর দিয়ে শিশুর মনকে জয় করা তাঁদের লক্ষ্য হওয়া দরকার। তাঁদের মনে রাখতে হবে, শিশুরা কখনও নীরস উপদেশ গ্রহণ করে না। কাজেই গল্পের মাধ্যমে যদি শিশুকে কোন উপদেশ দিতে হয় তাহলে গল্পটি এমনভাবে বলতে হবে যার ফলে শিশু আনন্দলাভ করতে পারে। যে জিনিষ থেকে শিশু আনন্দ পায় সে জিনিষ সহজে তার কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। কিণ্ডারগার্টেন এবং নার্সারি স্কুলগুলোতে যে সব গল্প বলা হয়, সে সব গল্প নিয়ে শিশুদের সাথে পরে আলাপ আলোচনা করলে এগুলো সহজে এদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের মাধ্যমে যা বুঝবার চেষ্টা করা হয় সেটা শিশুরা সহজে বুঝতে পারে। নিছক নীতি উপদেশ এবং শিক্ষামূলক গল্প ঠিক এক জিনিষ নয়। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অবশ্য শিক্ষামূলক গল্পের মাধ্যমে নীতি উপদেশ দেওয়া চলে। তবে এমনভাবে গল্পটিকে বলতে হবে যার ফলে শিশুরা আনন্দ লাভ করার সাথে সাথে সহজে নীতি উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া আজকাল শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বিত হচ্ছে; কিভাবে শিক্ষা দিলে শিশুর মনকে প্রভাবান্বিত করা যায় এবং শিশুর জ্ঞানের সীমানা বেড়ে যাবে সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। তবে এঁরা সবাই স্বীকার করেছেন, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে গল্প বলার গুরুত্ব অনেকখানি। গল্প শুনতে শিশু খুব ভালবাসে। তাই শিশু-শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা শিশুর গল্প শোনার আগ্রহকে কাজে লাগাতে চাইছেন।

কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমীরা মিত্র

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বৈশাখ তার রক্তনেত্র মেলে বসেছে কোন রুদ্র সাধনায়। দিকে দিকে বুঝি তাই জ্বলে' উঠেছে হোমানলের লেলিহান শিখা। তার উগ্র স্পর্শে তীব্র বাতাস চারিদিকে অগ্নি বর্ষণ ক'রে ছুটে চলেছে।

দারুণ নিদাঘে দিশাহারা সকলে। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আকুল বিপর্যস্ত। সহ্য করতে পারেন না শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ডতা। সারাদিন দরজা জানালা বন্ধ ক'রে রেখেও নিস্তার নেই তার হাত থেকে। ছট্‌ফট্‌ করতে থাকেন সর্বক্ষণ—তৃষ্ণা আর মেটে না। ভক্তরা কেউ কিছু করে বরফ আনেন, তাঁকে মাঝে মাঝে বরফ দেওয়া জল বা কোন পানীয় খেতে বলেন যাতে কতকটা তৃপ্ত হন। সত্যি বরফ দেওয়া জল সরবৎ খেলে খানিকটা তৃপ্তি পান শ্রীরামকৃষ্ণ। তৃষ্ণা কিছুটা মেটে, কতকটা ঠাণ্ডা হয়। কোন কোন দিন কুল্পীও খান। খুব ভাল লাগে তাঁর কুল্পী। শিশুর মতন খুশী হ'য়ে ওঠেন সময় সময় কুল্পী পেলে। সেদিনও একজন ভক্ত প্রচুর কুল্পী বরফ নিয়ে উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরে। খুব খুশী হ'লেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলকে ভাগ ক'রে দিলেন নিজেও পেলেন প্রচুর।

দু' একদিন পরে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে গলা দেখাচ্ছেন আর যে যা বলছে তাই করতে চাইছেন। শিশুর মতন তাঁর গলার কষ্টের কথা বলছেন। শুনলেন তাঁর গলায় ব্যথা হ'য়েছে, খেতে বা ঢোক গিলতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কুল্পী খাওয়ার পর থেকে সূত্রপাত হ'য়েছে। ক্রমশঃ বেড়ে এখন বেশ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক'দিন ধরে যে যা বলছে—ক'রেও কিছুমাত্র কমছে না। চিন্তিত হলেন কালীপ্রসাদ।

গোলাপমাও তাঁর ব্যাকুলতা দেখে বেশ উদ্বিগ্না হ'য়েছেন বোঝা গেল। তিনিই আহিরীটোলার দুর্গাচরণ ডাক্তার-এর নাম করেন—কলকাতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ব'লে। প্রস্তাব করেন তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাবার। কালীপ্রসাদও সমর্থন করেন তাঁকে। ঠিক হোল—দেরী না করে পরদিন ভোরেই তাঁকে নিয়ে কলকাতা যাওয়া হ'বে ডাক্তার দেখাতে। তিনি সুচিকিৎসক, সুতরাং তাঁর বেদনার উপশম করতে পারবেন এই বিশ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় রাজী হলেন। সে রাত তাই কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরেই কাটাবেন

স্থির করলেন। লাটুও রইলেন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আর গোলাপ মা শ্রীমার কাছে নহবতের ঘরে। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে অপেক্ষা করেন কালীপ্রসাদ সে সন্ধ্যায়। ঘনায়মান আঁধার তাঁর মনকেও সেদিন কেমন যেন আঁধারাচ্ছন্ন ক'রে তোলে। দেহস্থ বৃত্তি বা দেহজ যাতনাকে তিনি কোনদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দেখেন নি। বহুদিন মুগ্ধ হ'য়ে অনুভব করেছেন কত স্বচ্ছন্দে দেহের সকল আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যোগসিদ্ধ মনকে। কত সহজে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সকল কামনা ও রোগ-যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারেন নিজের নির্বিকার সত্তাকে। সেই মানুষ আজ এমনি কাতর, এমনি ব্যাকুল কেন? যাঁর একটী কথায়, একটু ইচ্ছায় কত লোক তাদের রোগ-যন্ত্রণা নিমেষে ভুলেছে—হিম, রৌদ্র, জল যার তপঃশুষ্ক দেহের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে নি—আজ তাঁর সে শক্তি কি সুপ্ত? আবৃত কেন সেই মহিমা! মন্দিরে আলো জ্বলে' উঠলে কালীপ্রসাদ ঘরে ঢুকে দেখলেন প্রতিদিনের মতনই অকম্পিত হ'য়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মগতভাবে। মনে বেশ শান্তি পেলেন। একবার যেন মনে হোল তবে নিশ্চয় যাতনা কমেছে। কিন্তু তবুও ঠিক করতে পারলেন না। এ আশ্চর্য গুরুর সবই আশ্চর্য। বিচারশীল মন তাঁর সব কিছুই অনুসন্ধানের চোখে দেখে। কি জানি এ কিসের সূত্রপাত। বিকালের সেই শিশুর মত অসহায় পরনির্ভরশীল স্পর্শকাতর শ্রীরামকৃষ্ণ? না, সন্ধ্যার এই আত্মসমাহিত সকল বৃত্তি-নিরুদ্ধ মহাশক্তিমান পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ? সত্য কে?

নানা চিন্তার দ্বন্দ্বে সে রাত্রি কেমন বিচ্ছিন্ন নিদ্রা ও কিছুটা জাগরণে কাটে কালী-প্রসাদের। ভোরে উঠে আবার দেখেন যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার তেমনি সমাহিতভাবে বসে আছেন তিনি—যেমন দেখতে তিনি অভ্যস্ত। কোথায় তাঁর মুখে যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীর ক্লিষ্ট ছায়া? পরিপূর্ণ প্রাণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত সেই মুখ। এই প্রাণধারার কি ক্ষয় হ'তে পারে? এর কি শেষ থাকতে পারে, না ব্যাহতি থাকতে পারে? স্বতোৎসারিত শাশ্বত প্রবাহ এ। মনে আবার জোর পান, আবার শান্তি আসে।

প্রয়োজনীয় তোড়জোড়টুকু শেষ করে একটি নৌকা ভাড়া ক'রে আনেন তিনি। গোলাপ-মা আর লাটুর সঙ্গে নিয়ে চলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতায়। নৌকা ভিড়ানো হোল কুমারটুলির ঘাটে। ডাক্তারকে দেখানো ও তাঁর নির্দেশ নেওয়া শেষ হ'লে ফেরার উদ্যোগী হ'লেন সকলে। শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্রহভরে যেতে চাইলেন বিডন্ স্কোয়ারে। সেখানে ফ্রি ম্যাসনদের প্রতীকগুলির কথা তিনি লোকমুখে দক্ষিণেশ্বরেই বহুবার শুনেছেন। আজ ইচ্ছা—ফিরতি পথে সেগুলি দেখে যান। কেউ আপত্তি করেন না। একটি ভাড়া গাড়ী ডেকে সকলে উঠে বসলেন। কালী-প্রসাদকে ডেকে নিজের পাশে বসালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহা খুশী কালীপ্রসাদ। বিডন স্কোয়ারে নেমেও তাঁরই কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন তিনি। ভারি প্রসন্ন। নানা রঙের ফুলের কেয়ারীর মধ্যে রঙীন সিমেন্টের প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা করতে থাকেন কালীপ্রসাদ।

উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্যি তারি সুসঙ্গতভাবে সাজান, তারি মনোরম দৃষ্টিসুখকর দৃশ্য। কালীপ্রসাদেরও খুবই ভাল লাগে সেই সুন্দর দৃশ্য, সুখময় পরিবেশ। বালকের মতন উচ্ছ্বসিত-শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে গেছেন। এমনি ক'রে এগিয়ে চলে দিন। সকাল শেষ হ'য়ে মধ্যাহ্নে পৌঁছায়। ক্রমে মধ্যাহ্নও উত্তীর্ণ হোল। আর দেরী করা যুক্তিসঙ্গত নয় সকলেই বুঝলেন। আবার একটি গাড়ী ভাড়া করে সকলে আহিরীটোলা ঘাটে এলেন ও নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বর। এতক্ষণ দেখার আনন্দে ভুলেছিলেন এবার শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করলেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত তিনি। আর সকলেও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন। বেলা তো বড় কম হয়নি, সকাল থেকে উদ্যোগ, ঘোরাঘুরি, পরিশ্রম হয়েছে যথেষ্ট। মাঝিকে বরানগর প্রামাণিক ঘাটে নৌকা লাগাতে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কালীপ্রসাদকে বললেন, বাজার থেকে কিছু জলখাবার কিনে আনতে। বেশ মুস্কিলে পড়লেন কালীপ্রসাদ সঙ্গে তখন আর পয়সা-কড়ি বিশেষ কারো কাছেই নেই। গোলাপমার কাছে শেষ সম্বল মাত্র এক আনা পয়সা। তাই নিয়েই নেমে পড়লেন কালীপ্রসাদ। ঠোঙ্গায় ক'রে কিছু ছানার মুড়কি নিয়ে ফিরে এলেন নৌকায়। শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে দিলেন ঠোঙ্গা শুদ্ধ মিষ্টি। সবকটি ছানার মুড়কী খেয়ে তিনি ঠোঙ্গাটি গঙ্গায় ফেলে দিলেন ও পরমতৃপ্তির সাথে গঙ্গার জল পান করলেন দু'হাতে অঞ্জলী ভরে। একটু বিস্মিত হ'লেন কালীপ্রসাদ। যদিও সামান্য মিষ্টি তবু কাউকে কিছু না দিয়ে খাওয়া যেন তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যত অল্পই থাক তিনি সকলকে কিছু না কিছু বরাবর দেন তাঁর আহার্য সামগ্রী থেকে। আর আজ বিশেষ করে যখন তারা ক্লান্ত, অভুক্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর তখন তাঁর এই নির্বিকার ভাব তাঁদের মনে বিস্ময় জাগাবে এ আর আশ্চর্য কি। কেউ কিছুমাত্র আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ না করলেও কালীপ্রসাদ তাঁর সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝলেন গোলাপমা ও লাটুও একটু বিস্মিত হ'য়েছেন। কিন্তু তাঁদের সেই বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন তাঁরা অনুভব করলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঢেঁকুর তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা এক মুহূর্তে মিটে গেল। এবার আর তাঁরা নিজেদের বিস্ময় সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন কৌতূহল ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও নির্বিকার। উল্টে শুরু করলেন হাসি ঠাট্টা। তেমনি খুসীতে ভরপুর হ'য়েই রইলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। কিছু বলার ভাবার অবকাশ দিতে চান না যেন। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে তিনি নৌকা থেকে নেমে গেলে, কালীপ্রসাদ লাটু ও গোলাপমা নামতে নামতেই শুরু করলেন আলোচনা। আর দমন করার সাধ্য নেই। সকলেই আশ্চর্য। কালীপ্রসাদ বা কারোরই বুঝতে বাকি থাকে না—এ তাঁর ঐশ্বরিক বিভূতির এক ক্ষণিক প্রকাশ। তবু কি বিস্ময়-এর পার পাওয়া যায়! নিজের মনে তার জেগে উঠে বৃন্দাবন লীলার কাহিনী। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন সেই অমর বাণী "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"-এর সারমর্ম। কোনদিন ভাবেন নি এমনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে তাকে কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন নিজের অন্তরে নিজের এই দেহ মন নিয়ে—তার মধ্য দিয়েই।

• জাগো •

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

বাঁশরীর সুর ভুলে যাও প্রভু
হাতের পাচনী রহুক পড়ি।
নরনারায়ণ আজি দুর্দিনে
এলো গো শঙ্খচক্র ধারি।
আর নহে লীলা ল'য়ে রাধিকারে,
বাঁকা বাঁশরীতে সুর সাধিবারে,
প্রলয় বীণায় তার বাঁধিবারে,
জাগো ভগবান কংস-অরি।
বাঁশরীর সুর ভুলে যাও প্রভু
হাতের পাচনী রহুক পড়ি।

ঈশান কোণায় জলদ প্রাবৃট ঘনায়
নেমে আসে ঝড় ঝঞ্ঝা আজি।
কোথা নারায়ণ, পার্থ সারথি?
পাঞ্চজন্য উঠুক বাজি।
রথের চক্র তাই লও হাতে,
জ্বালাও আগুন ও-নয়ন পাতে
এ নহে দেবতা পূর্ণিমা রাতে,
গোপিনীর লাগি সেজেছে যাবি।
ঈশান কোণায় প্রাবৃট ঘনায়
নেমে আসে ঝড়-ঝঞ্ঝা আজি।

তেপান্তরের প্রান্তে পার্থ
করিছে ধেয়ান তোমার লাগি।
সঙ্গীরা তাঁর দুঃখ-কান্নায়
দারিদ্র্যে বাঁধা রয়েছে জাগি।
দানবের যত অসুরের দল,
গৃহে গৃহে আজ জ্বালিছে অনল,
জতুগৃহে কাঁদে ভক্ত তোমার,
দানবের হাতে মুক্তি মাগি।
পার্থ তোমার ধেয়ান মগ্ন
ধ্বংসেন্দ্রিয় উঠুক জাগি।

নটরাজ, তব প্রলয় নৃত্যে
ত্রিভুবন আজি উঠুক টলি।
গদাধর, জাগো শ্রীপাদপদ্মে
পশুর পাষাণ হৃদয় দলি।
খণ্ডিত করি জননীর প্রাণ,
ভাঙা মৃদঙ্গে তোলে ওরা গান
জাগো জাগো ওগো জাগো ভগবান
ধ্বংস অনল উঠুক জ্বলি।
নটরাজ তব প্রলয় নৃত্যে
ত্রি-ভুবন আজি উঠুক টলি।

॥ সংকলন ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th. September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

The reasons why the lectures of Swami Vivekananda were heard and appreciated, have been given by Mr. Snell, President of the Scientific Section of the Parliament of Religions, Chicago, and I cannot do better than quote from his letter to the *Pioneer* what those are.

"As intense is the astonished admiration which the personal presence and bearing and language of Paramahansa Vivekananda have wrung from a public accustomed to think of Hindus—thanks to the fables and half-truths of the missionaries—as ignorant and degraded "heathen", there is no doubt that the continued interest is largely due to a genuine hunger for the spiritual truths which India through him has proffered to the American people.

America is starving for spiritual nourishment. In spite of its absorption in material things, in spite of the ignorance and provincialism of its upper classes and the savagery of its lower, there are many souls scattered everywhere throughout its great population who are thirsting for higher things. Europe has always been indebted to India for its spiritual inspirations. There is little, very little, of high thought and aspiration in Christendom which cannot be traced to one or another of the successive influxes of Hindu ideas : either to the Hinduised Hellenism of Pythagoras and Plato, to the Hinduised Mazdaism of the Agnostics, to the Hinduised Judaism of the Kabbalists,

or to the Hinduised Mahomedanism of the Moorish philosophers : to say nothing of the Hinduised Occultism of the Theosophists, the Hinduised Socinianism of the new England transcendentalists, and the many other new streams of orientalising influence which are fertilising the soil of contemporary Christendom.

The most illuminated men and women, therefore, in Europe and America, have a natural drawing towards Hinduism, the chief historic source of their light and life, as soon as they are brought into close contact with it under circumstances at all favourable to its just appreciation. In the United States, particularly, there are several widespread and influential movements which are distinctly Hindu in their character and tendencies. Not only is all the scientific and liberal thought monistic in its trend, but the so-called "Christian Science" movement most egregiously misnamed, is admittedly based upon the Vedanta philosophy.

America is well sprinkled with Advaitins, of all three schools, even though they would not always, in the absence of any direct knowledge of Hindu thought, know how to define their position.

Even the Christian mythology is not so very different from the Hindu, and the latter is gradually becoming familiar to the American people, through the medium of translations, books and articles by scientists and dilettanti, and the writings and personal labours of Theosophists and some other liberal sects.

All the Hinduising forces hitherto at work have received a notable impulse from the labors of Swami Vivekananda. Never before has so authoritative or representative of genuine Hinduism—as opposed to the emasculated and Anglicised versions of it so common in these days—been accessible to American inquirers ; and it is certain, beyond peradventure, that the American people at large will, when he is gone, look forward with eagerness to his return, or the advent of some of his *confreres* of the institute of Saukaracharya." With these remarks I heartily support the Resolution.

Babu Kally Nath Mitter was followed by the Hon'ble Babu Surendra Nath Banerji who, having just come in, was requested by the Chairman to speak a few words in support of the Resolution.

In compliance with this request Hon'ble Surendra Nath Banerjee addressed the meeting in the following terms :

Mr. President and gentlemen—When I entered this hall I had not the least idea that I should take part in the proceedings of this meeting. I may say that, so far as this matter is concerned, I had imposed upon myself a vow of silence ; but in as much as I should be wanting in my duty, if I left this meeting in listlessness, I must bow to the decision of our President and the great august gathering of my countrymen, who have called upon me to speak. It has been invariably the rule of my life not to allow personal considerations to interfere with the fulfilment of a mandate which may be laid upon me by the people. You have laid this mandate now on me and I gratefully submit, be the consequences what they may. Gentlemen, I am afraid that orthodox Hinduism will regard me as an intruder. (Cries of no, no, you are a Hindu, Cheers.)

As for myself I cherish a religion which has indeed the reverence and admiration of my countrymen. However I may fall short of the high ideals of Hinduism, I call myself a Hindu and I will call myself a Hindu to the last breath of my life.

I cherish the deepest reverence for the religious convictions of my countrymen. For that reverence I have suffered and if it should be the will of God, I am prepared to suffer again. For this reverence I have not forgotten that wonderful social system which, in the dim twilight of the past, in the midst of social disorder and barbaric, cruel, monstrous times, has been able to preserve in our midst an element of social order and tranquility—a genuine Hindu feeling at the bottom of that social system.

In those remote times the memory of which has faded away from human recollection the religious convictions of my ancestors gave consolation to millions of men and in the days yet to come it will afford unbounded consolation to millions of human beings. Is it possible not to feel the deepest reverence, the most overpowering gratitude for the eloquent exponent of this noble and majestic religion of India to the people of the far West ? I am sure, those who are assembled here on the platform of this hall, must accept the teachings of Swami Vivekananda. We may differ from him in some respects, but that matters very little. Who does not pour forth his gratitude to this illustrious man—to his noble self-abnegation, his enthusiasm, the association in his character of the splendid genius, that adorns the Swami ? We gather here to express our unanimous sense of

gratitude to this illustrious individual. We are met together to perform a national act and therefore I desire to express on my behalf my fervent sympathy with the noble object of the meeting, which has found utterance in the gathering of to-day. His life and glowing sacrifice should inspire the young men of our country. His lofty standard of morality, which is the secret of all success, should be cultivated by our countrymen, so that we may be prepared for that political redemption to which we are all anxiously looking forward.

The Resolution was further supported by Pundit Bhudeb Kabiratna who addressed the meeting in Bengali.

[The Substance of his speech is given below in English. For the original speech *vide* Appendix.]

॥ সঙ্কলন ॥

গত ৬ই জুলাই, (১৯৫৮) রবিবাসরীয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রকাশিত হ'য়েছিল, আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এখানে সংগ্রহ ক'রে দিলাম এবং সেজন্য 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'-র কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আমরা যথাযথ সেভাবেই প্রকাশ করলাম :

BOOKS ABOUT INDIA IN THE LEO TOLSTOY LIBRARY

BY

V. Bulgakov

"Leo Tolstoy was always interested in the East. He was drawn to India by monuments of Buddhist literature, Indian folk-lore, the religious life of the people, contemporary Indian thinkers like Vivekananda, Abhedananda and Baba Bharati, India's literature, her public life, so different from that of Europe, the movement of liberation, Mahatma Gandhi's first attempts to institute a campaign of passive resistance against the colonizers, and so on. Tolstoy corresponded with Mahatma Gandhi and with Taraknath Das, leader of the revolutionary movement. Contained in Tolstoy's library at Yasnaya Polyana, his estate some 200 kilometres from Moscow, are a number of works in which attempts have been made to sum up Tolstoy's views on India.

• • • •

Swami Abhedananda

Modern Indian philosophies also interested Tolstoy. The library contains a number of pamphlets by the Indian philosopher and publicist Swami Abhedananda that were put up in Leipzig in Germany

in the 1890's. They include "Religion of the Indians", "Why Does the Indian Reject the New Church although He Acknowledges Christ ?" "The Word and the Cross in the Old India", "Why are Indians Vegetarians ?", "The Divine Association", "The Way to Bliss", "The Philosophy of Good and Evil", "Who Is the Saviour ?", "Does the Soul Exist After Death".

Beside this series, the library has a pamphlet by Swami Abhedananda : "The Vedanta Philosophy, the Divine Truth of Man".

All Abhedanauda's pamphelets were brought to Tolstoy in the last few years of his life by N. O. Eingorn, a Russian student of the East. All except two, "The Word and the Cross in Old India" and "The Vedanta Philosophy" have notes made both by Eingorn and Tolstoy. On the cover of the" The Way to Bliss" Tolstoy wrote : "Excellent". At Tolstoy's request the book was translated into Russian.

Swami Vivekananda

Tolstoy attentively read the writings of a contemporary Indian philosopher, the Swami Vivekananda, whom he held in high esteem. After reading his essays "God and Man" and "Anthem of the Peoples". Tolstoy wrote in his diary on July 4, 1908 : "Read a magnificent essay by Vivekanauda on God. It should be translated. Thought of doing it myself".

Tolstoy's Dream

In the last year of his life Tolstoy dreamed of meeting Indians. He wanted through personal contact to acquire a more detailed and exact knowledge of that great country of the East. But the distance and India's geographical location (beyond the Himalayas) were insurmountable barriers for Tolstoy. But today, when flying has reduced and almost eliminated all distances, there is a constant stream of Indian visitors to Tolstoy's home and his grave".

—The Amrita Bazar Patrika
Sunday, July 6, 1958.

সংঘ-বার্তা

স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজের পরিভ্রমণ

নওগাঁ প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দের ও স্বামী কল্যাণানন্দজীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজী গত ৪ঠা শ্রাবণ কল্যাণানন্দকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে রওনা হন। শিলিগুড়ী ও চাপারমুখ ষ্টেশনে বহু ভক্ত স্বামিজীদের দর্শন লাভ করিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠেন। নওগাঁ ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে বহু ভক্ত উৎফুল্লচিত্তে তাঁহাদিগকে স্বাগত অভিবাদন জানাইলেন। পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহারা স্থানীয় বাঙালী পূজাবাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

এই পূজাবাড়ীতে ও পানিগাঁ নিবাসী শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীকিরণচন্দ্র দে, শ্রীশ্যামাপদ ব্যানার্জী ও আলুগুটী নিবাসী শ্রীরমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে বিভিন্ন দিনে ভক্তসম্মিলন হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল শ্রীমৎ সদাত্মানন্দজীর আগমন উপলক্ষেই। প্রত্যেক ভক্তসম্মিলনেই স্বামিজীর ভাষণ ও ধর্মোপদেশ শ্রোতাগণের প্রাণে বিশেষ আনন্দ ও শান্তিদান করিয়াছিল। নওগাঁ সারদা সংঘের সম্পাদিকার আমন্ত্রণক্রমে একদিন স্বামিজী সংঘের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে স্বামিজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা শ্রোতৃবর্গের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নওগাঁ সহরের স্বদেশপ্রাণ সুপণ্ডিত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীমতিলাল দত্ত একদিন স্বামিজীর দর্শনে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ স্বদেশ ও স্বধর্ম বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। রাধিকাবাবু অসমীয়া হইলেও বাংলা বেশ ভাল বলিতে পারেন। স্থানীয় অন্য একজন অসমীয়া শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বেরা মহাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাংলা তিনি ভাল বলিতে না পারিলেও চমৎকার বুঝেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীমা ও স্বামিজীদের বিষয় শুনিতে ও বলিতে তিনি খুবই আনন্দ পান। স্বামী সদাত্মানন্দজীর নওগাঁ ও পানিগাঁয় থাকাকালীন প্রত্যহ তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন ও কিছুকাল ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া স্বভবনে ফিরিতেন।

তিন বৎসর পূর্বে শ্রীমৎ স্বামিজী যখন ঐসব জায়গায় গিয়াছিলেন তখনকার তুলনায় বর্তমানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তের সংখ্যা অনেক বেশী। ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় আলুগুটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নামে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নিকটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী মন্দির নির্মাণ হইতেছে। উহা প্রায় শেষ হইয়াছে বলা যায়। মন্দিরের বারাণ্ডায় একদিন সন্ধ্যা ৭॥টায় স্বামিজীদের উপস্থিতিতে এক ভক্তসম্মিলন হয়।

এইটীই এখানে প্রথম সম্মিলন। বহুসংখ্যক নরনারী ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে শ্রীমৎ সদাত্মানন্দজী কিছুক্ষণ ধর্মালোচনা করেন। তৎপরে তাঁহার আদেশে ভক্তগণ সমবেতভাবে কীর্তনাদি করিলেন। অতঃপর মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করিয়া জানা গেল মন্দির নির্মাণে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই জাদুড়টী নিবাসী ৺পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র দে ও শ্রীকালাচাঁদ দে দান করিয়াছেন। মন্দির নির্মাণের জন্য শ্রীকালাচাঁদ দে মহোদয় প্রাণপণ পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। এই সব শুনিয়া স্বামিজী তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য যাঁহারা ঐ কার্যে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যেও স্বামিজী প্রশংসাবাদ জানাইলেন। মন্দিরে দেবতা-প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপিত হইলে, প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে যে সব ব্যবস্থা থাকার বিশেষ প্রয়োজন তাহা স্বামিজী বুঝাইয়া বলেন। তাহাতে উদ্যোক্তা ভক্তবৃন্দ কল্যাণানন্দজীর পরিচালনায় সব কিছু ব্যবস্থা কয়েক মাসের মধ্যে করিবার আশা রাখেন। ভক্তমণ্ডলী যাহাতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহাদের অবসর সময়ে এই পবিত্র নির্জন স্থানে একত্র হইয়া ধর্মালোচনাদি করেন সে বিষয়ে স্বামিজীর সারগর্ভ উপদেশ দেওয়ার পর ঐ দিনের সভার কার্য শেষ হয় রাত্রি ১০ ঘটিকায়।

স্বামী সদাত্মানন্দজীর নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে থাকাকালীন যে সব ভক্ত নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে চাহিয়াছিলেন, প্রায় সকলের আশা তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। গত ৬ই আগষ্ট স্বামিজী কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব :

৭ই অক্টোবর, ১৯২৮, মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৯০তম শুভ জন্মতিথি। তদুপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে উক্ত তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও তাঁহার বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদ বিতরণ, কীর্তন, কথকতা ও বক্তৃতাদি হইবে। উৎসবের বিস্তৃত কর্মসূচী ৭ই অক্টোবর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত থাকিবে। দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমেও স্বামিজীর জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় প্রতিপালিত হইবে।

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ : শনিবার রাত্রি ৭॥

বিষয় : **ভারতবর্ষের অধিবাসী সমস্যা** (আলোকচিত্র সহযোগে)

বক্তা : অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, এম. এ., এফ. এন. আই

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা - স্বামী অভেদানন্দ

২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৬৫

STUDENTS
COMMON-ROOM
NOOH-JOHNNY

স্বামী অভেদানন্দ রচিত গ্রন্থাবলী

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্যতম YOGO PSYCHOLOGY বাহির হইতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল !

SWAMI ABHEDANANDA IN AMERICA

By

SISTER SHIVANI (Mrs. Mary Lepage)

A unique Volume of Swami Abhedananda's activities in the West by one of his devoted and able American disciples.

Many new incidents of Swami Abhedananda's eventful life and glorious career in America for a quarter of a century are graphically described. This volume also throws much light upon the history of the Vedanta movement in the West.

With a number of original photographs.

Demy 8 vo. 330 Pages Rs. 6·50

For Subscribers of Visvavani Rs. 6·00

স্বামী অভেদানন্দ

(কালী-তপস্বী)

এই প্রামাণিক জীবনীটি নিঃশেষিত হওয়ার পর বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। কিছু বর্দ্ধিত আকারে পুনরায় শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

সারদামণি

শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমা সারদামণির পুণ্যজীবন কথা। ঐ কথা সব সময়েই সুমধুর।

মূল্য : টা. ১·২৫। বিশ্ববাণীর গ্রাহক পক্ষে এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, (পুস্তক-প্রচার-বিভাগ)
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে অভেদানন্দ	৩৩৯	স্বামী দুর্গানন্দ
২। প্রণালী সঙ্গীতে সাধনতত্ত্ব	৩৪৬	অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
৩। প্রেম বুদ্ধির গোড়ার কথা	৩৪২	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য
৪। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ	৩৪৫	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত
৫। অদ্বৈত বেদান্তে তত্ত্বানুসন্ধান	৩৫৩	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
৬। ধর্মগুরু মহাবীর	৩৬৩	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ
৭। উদ্বোধন (কবিতা)	৩৭০	শান্তশীল দাশ
৮। আগ্নেয়গিরির কথা (কবিতা)	৩৭১	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	ভারতের তীর্থদর্শনে : দিল্লী	... ৩৭২	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১০।	সংকলন	... ৩৭৫	:
১১।	গ্রন্থ-সমালোচনা	... ৩৭৯	
১২।	সংঘ-বার্তা	... ৩৮১	
১৩।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	... ৩৮২	

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১ ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :— বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

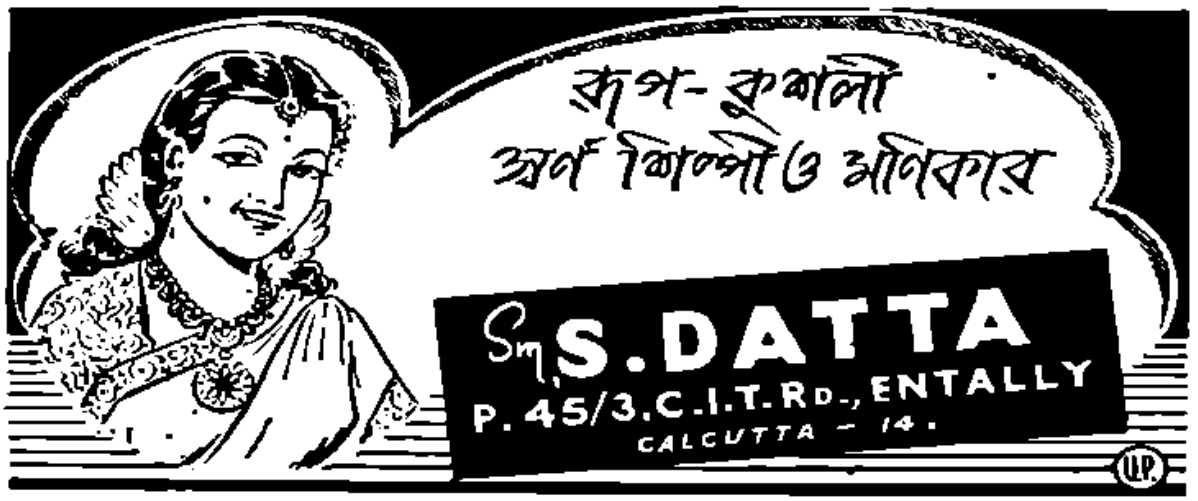

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যস্থানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীক্ষেত্রব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীপঙ্কজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

ডি. কে. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

ডেকরেটার্স

পি-৪৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

ফোন : ৪৫-১৪৩৩

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর
—কুষ্ঠ—

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পায়ে বাসাবর্ষের ঘাঁ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দুষিত কতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেতি

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুবিপুল চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : **হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর**, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২৩৫৯)

শাখা : **৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা** (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল —, বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লঙ্‌ক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সকল প্রকার ছাপার কাজের জন্য

হিন্দ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৬এ, গঙ্গানারায়ন দত্ত লেন

কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—বরানগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দমদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ., এম্. ডি., বি. এল, আবিষ্কৃত •
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪—৩৭১১

অগ্নেকবল্লুজ

যকৃতে মূত্রাতিরিক্ত কণার পরিণত বিশিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিভাজনের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্, শাড়ী
জহরলাল
পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ বেনারস, অমৃতসহর

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অবাধ রোগের সংস্পর্শে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা দূষিতের করে; তাই রক্তকে প্রবাহকের প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বাস্থ্যরক্ষাই বিষের মতন মারির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

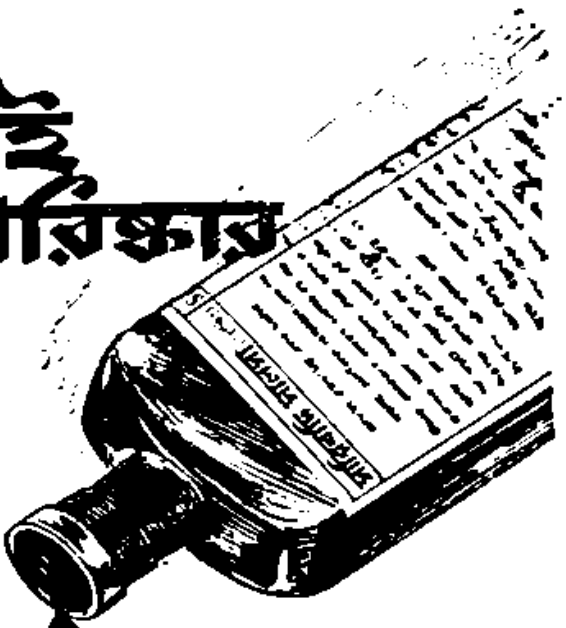

মারিবাদ্দি মালসা রক্তে সৃষ্ট সকলরকম বীজাণু ধ্বংস করে রক্তকে নির্মল করে। মারিবাদ্দি মালসা সেবনে নিয়মিত কোষ পরিষ্কার হয়, ক্ষোভ, পীড়ন দূর হয়, এতদিনে পড়ে পরিপাক ক্ষমতা, রক্ত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণের ফলে বহিঃ ক্ষোভ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিশুদের ত্বকে আকর্ষিত হয়, মুখে দূষিত দাগ এবং শরীরে নতুন বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

মারিবাদ্দি মালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.বি. (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য। ডাঃ গোপালপাড় ঘোষ, বলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

মাদা ও বোম্বাই-পুরীতে শাখা

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবন তথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে' সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্য্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

॥ এম. এ. ক্লাশের ॥

শিক্ষার্থীর উপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল রকম গ্রন্থ কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

॥ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ॥

। গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সংগীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ।

॥ বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

। ডিমাই সাইজে ছয়শত পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন অপ্রকাশিত ভাস্কর্য-চিত্র ।

প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

॥ রাগ ও রূপ ॥

(১ম ভাগ)

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রয়াল সাইজ ৫১০ পৃষ্ঠার অধিক, বহু চিত্র সম্বলিত।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (থিওরি) অংশ ও ৬ রাগ ও ৩০ রাগিনীর (হনুমন্মতে) সুবিস্তৃত পরিচয়, স্বরলিপি ও রাগ চিত্রসহ।

প্রাদেশিক সরকার অর্থ-সাহায্য করার জন্য মূল্য : ৭৫০ টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

'প্রবর্ত্তক'-এর সুনির্বাচিত গ্রন্থ

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২-৭৫

(অগ্নিযুগের নিখুঁত প্রামাণ্য চিত্র এই গ্রন্থে মিলিবে)

জীবনসঙ্গিনী—৫৲

(বাংলা সাহিত্যে অনুপম অবদান। সত্য কিন্তু উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। উপহারের সেরা বই। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা, ইম্পিরিয়াল সাইজ।)

বেদান্ত দর্শন—৭-৫০

'শনিবারের চিঠি'-র মন্তব্য : "ব্রহ্মসূত্রের এমন বিশ্লেষণমূলক সহজ ব্যাখ্যা বাংলায় আর নাই। ইহা নূতন সৃষ্টি।" ডিমাই সাইজ, প্রায় ৭০০ পৃঃ।

পরমহংস উপানন্দ মহারাজ ॥ **আত্মার আলো ১৲**

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। **প্রজ্ঞার আলো ১-২৫**

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। **গীতার আলো—১-৫০**

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর। **সাহিত্যিকী ২৲**

Prof. S. Bhattacharjee

Society & Education—Rs. 2/-

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। **শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব** (সংবর্ধিত ২য় সং)—৭·৫০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স ৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—স্বামী শ্যামানন্দ (গ্রন্থকার) ১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শারদীয়া সংখ্যা

বিশ্ববাণী

এবারে নূতন রূপ নিয়ে সাহিত্য, শিল্প, মূর্তিতত্ত্ব, সঙ্গীত, নৃত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরা এই বিশেষ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ ● স্বামী দুর্গানন্দ ● স্বামী সত্যরূপানন্দ ● অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ● শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ● শ্রীবিনয় দত্ত ● কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ● ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ● অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ● অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ● অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ● শ্রীশঙ্করীভূষণ দত্ত ● অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর ● শ্রীহাসিরাশি দেবী ● শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ● শ্রীধীরেশ্বর মিত্র ● শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য ● শ্রীসমরজিৎ কর ● শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ. ● শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ. প্রভৃতি।

॥ বাঙলার তন্ত্রকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের তন্ত্র সম্বন্ধে একটি অপ্রকাশিত রচনাও প্রকাশিত হচ্ছে ॥

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটসহ মূল্য : দেড় টাকা।

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমাদের সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট নিবেদন—বর্তমানে কাগজ ও ছাপা প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা বর্ধিত কলেবর শারদীয়া সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৬৫) "বিশ্ববাণী"-র জন্য আট আনা অধিক মূল্য ধার্য করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা জানি সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকা বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নানান বিষয়ে দুর্মূল্যের কথা অনুধাবন করিতে পারিবেন। আট আনা বা ঐ মূল্যের 'ডাক টিকিট' ডাকযোগে পাঠাইলে তাহা তাঁহাদিগের সহানুভূতিপূর্ণ দান হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিব। মাত্র শারদীয়া সংখ্যার জন্যই এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আগামী আশ্বিন মাসের ১০ বা ১৫ তারিখের মধ্যে উক্ত আট আনা অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইবেন।

বলা বাহুল্য, যাঁহারা এখন ২০শ বর্ষের নূতন গ্রাহক হইয়া ১ম সংখ্যা (ফাল্গুন, ১৩৬৪) হইতে লইবেন তাঁহারা সর্বসমেত চারি টাকা বার আনা, যাঁহারা ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৬৫) হইতে লইবেন তাঁহারা সর্বসমেত তিন টাকা এবং যাঁহারা কেবল শারদীয়া সংখ্যা লইবেন তাঁহারা দেড় টাকা অনুগ্রহপূর্বক অতি সত্বর প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

ম্যানেজার
বিশ্ববাণী পত্রিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৬
১৪ই আগস্ট, ১৯৫৮

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৬৫

শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে অভেদানন্দ

স্বামী দুর্গানন্দ

"শাস্ত্রজায় প্রশান্তায় বেদান্ত প্রতিপাদিনে।
নমোঽদ্বৈতদৃশাদায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্তয়ে॥"

কিশোর বয়স্ক কালীপ্রসাদ বিদ্যানুরাগী ছাত্র, ইস্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়াশুনা করেন। অনেক কিছু জানিতে, শিখিতে ও করিতে হইবে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল ছিল। পাঠের সময় পড়ার ঘরে বসিয়া একদিন হঠাৎ বাবার আলমারীর মধ্যে একখানি প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদসহ সুন্দর বাঁধান 'গীতা' তাঁহার নজরে পড়িল। অবিলম্বে তিনি তাহা বাহির করিয়া লইলেন এবং পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার বাবা ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন যে পুত্র তন্ময় হইয়া গীতা পাঠ করিতেছে। তাঁহার বড় ভাল লাগিল না, এই বয়সে গীতা পড়া তাঁহার মতে কর্তব্য নয়, বিশেষতঃ তাহাকে ক্লাসের পড়া আয়ত্ত করিতে হইবে, গীতায় মন দিলে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে এই ভাবিয়া পুত্রের অসাক্ষাতে তিনি গীতাখানি আলমারীর সজ্জিত পুস্তকগুলির পশ্চাৎ দিকে লুকাইয়া রাখিলেন।

কালীপ্রসাদ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা গীতা খানি লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তখন তিনিও বাবার অসাক্ষাতে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন এবং বহু চেষ্টার পর তাহা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। এখন কিরূপে পড়া হইবে? চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন,—রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত হইবে সেই সময় উহা পড়িয়া শেষ

করিতে হইবে। কার্যতঃ তাহাই হইল, সারা রাত্রি জাগিয়া গীতাপাঠ সমাপ্ত করিলেন। ফলে জন্ম-জন্মের সুপ্ত ধর্মসংস্কারগুলি জাগরণোন্মুখ হইল এবং সাধন-রহস্য আরও কিছু জানিবার আগ্রহ জন্মিল। ইতিমধ্যে (ইং ১৮৮৩) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির য়্যালবার্ট হলের বক্তৃতায় পাতঞ্জলদর্শনের যৌগিক ব্যাখ্যাও তাঁহাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, দৈনিক জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি একখানি পাতঞ্জল যোগসূত্রও কিনিয়াছিলেন। কিন্তু কিনিলে কি হইবে? সূত্রগুলি সহজবোধ্য নয়, অথচ বুঝিতে হইবে বলিয়া পড়ার আগ্রহ অত্যধিক। অগত্যা একদিন তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির বাড়ীতেই হাজির হইলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে "যোগসূত্র" সকল বুঝাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চূড়ামণি মহাশয় খুব আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "এত অল্প বয়সে তোমার যোগশিক্ষার আগ্রহ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু আমার অত্যন্ত সময়াভাব, তোমাকে নিত্য নিয়মিতভাবে পড়াতে পারব না: তুমি বরং কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, তাহলে তিনি তোমাকে যত্ন করেই পড়াবেন।" কালীপ্রসাদ তাঁহার আদেশ মত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া সবিনয়ে সকল কথা নিবেদন করিলেন। কালীপ্রসাদের আগ্রহ দেখিয়া তিনিও বেশ সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহারও পড়াইবার সময় নাই, তথাপি তিনি বালকের আগ্রহবশতঃ স্বীকৃত হইয়া পড়াইবার সময় ঠিক করিয়া দিলেন,—স্নানের পূর্বে তাঁর তেল মাখিবার কালে। অগত্যা তাহাই হইল, প্রবল অনুরাগের সহিত পাঠ আরম্ভ হইয়া গেল। নিত্য যথাসময়েই তাঁহার কাছে উপস্থিত হন এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় সকল, আসন ও প্রাণায়ামাদির প্রক্রিয়াগুলি, বেশ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার যত্ন করেন।

পাতঞ্জলের সূত্রগুলি পড়িতে পড়িতে ক্রমে যোগশাস্ত্রের প্রতি কালীপ্রসাদ বিশেষ-ভাবে অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন একখানি শিবসংহিতাও সংগ্রহ করিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে বিশেষ বিশেষ যৌগিক পন্থাগুলির পরিচয় পাইয়া সাধন-জগতে প্রবেশের আগ্রহ জন্মিল। রাজযোগ, হঠযোগ, কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ, কুম্ভক, খেচরীমুদ্রা প্রভৃতির কথা পড়িয়া যোগী হইবার অন্তর্নিহিত সুপ্ত বাসনা ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইতে লাগিল। আবার খেচরীমুদ্রা অভ্যাস সহায়ে জিহ্বাকে তালুগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া জড়-সমাধি লাভ করিবারও আগ্রহ জন্মিল। কারণ একদিন তিনি শুনিয়াছিলেন, ত্রি'কৈলাসের রাজার জমিদারী সুন্দরবনে গাছ কাটিতে গিয়া রাজার লোকেরা এক জড়-সমাধিমগ্ন হঠযোগীকে দেখিতে পায়। যোগী কতদিন ঐভাবে ওখানে অবস্থিত ছিলেন তাহা বলা যায় না তবে দীর্ঘদিন বলিয়াই মনে হয়; কারণ যোগী পদ্মাসন করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয়ের ফাঁক দিয়া গাছ জন্মিয়াছিল। গাছ বড় হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। সেই গাছ

কাটিয়া তথা হইতে তাঁহাকে আনয়ন করিলেও তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিল না, অবশেষে তাঁহাকে গঙ্গার ধারে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, জোয়ারের জলে মগ্ন হইয়া যাইতেন, তথাপি তাঁহার কোন পরিবর্তন হইত না। শুনা যায় এক সাহেব ডাক্তার নাকি তাঁহাকে হাঁ করাইয়া তালু হইতে তাঁহার জিহ্বাটী টানিয়া বাহির করেন ও তাহাতেই যোগীর চৈতন্য হয় এবং তৎসঙ্গে তিনি আক্ষেপ করিয়া "আবার আমায় এক জন্ম ঘোরালি, আমি তো বেশ ছিলাম" এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক এখন হইতে তপস্যা করিতে বা যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে কালী-প্রসাদের প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল। কিন্তু উপায় কি? সিদ্ধ গুরুর সহায়তা ভিন্ন যোগ-সাধনা অসম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কে তাঁহাকে সেই গুরুর সন্ধান দিবে? প্রাণের কথা কাহাকেই বা বলা যাইবে? সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের সহিত প্রাণে প্রাণে মিল। প্রাণের কথা তাঁহাকে বলা যাইতে পারে। অবশেষে একদিন মনের কথা তাঁহাকেই বলিলেন। উত্তরে যজ্ঞেশ্বর বলিলেন: "তার জন্য চিন্তা কি? আমি জানি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে একজন সিদ্ধযোগী আছেন। তিনি ঠিক ঠিক পরমহংস, তাই লোকে তাঁকে পরমহংসদেব বলেই জানে, তাঁর নাম রামকৃষ্ণদেব। কত বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক তাঁর কাছে যাতায়াত করেন এবং তিনিও মাঝে মাঝে ক'লকাতায় আসেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যদি তাঁকে বলতে পার, তবে আমার মনে হয় তিনি তোমায় যোগ শিক্ষা দিতে পারবেন"। কালীপ্রসাদ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন: "ভাই একদিন তাহলে তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার?" যজ্ঞেশ্বরও খুশী মুখে উত্তর দিলেন "বেশত, কবে যেতে চাও বল আমি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি আমার ঠিকানা জেনে রাখ; যেদিন তোমার ইচ্ছা হয় আমার কাছে এস, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" এই বলিয়া তিনি ঠিকানাটী বলিয়া দিলেন ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

অন্যদিনে যাইলে ভুল কামাই হইবে তাই, মনে মনে সংকল্প করিলেন রবিবারে প্রাতঃ-কালেই বাহির হইবেন। কয়দিন পরে রবিবার আসিল (১৮৮৩ খৃঃ), সংকল্প কাজে পরিণত করিবার জন্য অতি প্রত্যুষেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং যজ্ঞেশ্বরের খোঁজ লইবার জন্য রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দুঃখের বিষয় তাঁহার বাটীর নম্বরটা মনে পড়িল না এবং তাঁহার সন্ধানও মিলিল না। অবশেষে একাকীই যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বর কতদূরে জানা নাই এবং কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন মনে উদাস প্রাণে চলিয়াছেন, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, চিন্তা মাত্র—কালীবাড়ী আর রামকৃষ্ণ পরমহংস। কাশীপুর বরানগরের পথে না গিয়া, বাগবাজারের খালের পোল পার হইয়া ব্যারাকপুরের রাস্তা ধরিয়া একেবারে সাতপুকুরে গিয়া পড়িয়াছেন। এখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আপনি পথ ছেড়ে বহুদূরে এসে পড়েছেন, এদিকে নয় দক্ষিণেশ্বর

ঐ দিকে, এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পথের নির্দেশ করিয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার নির্দেশ মত ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা ১১টার সময় উত্তর দিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া কালীবাড়ীর উত্তর দিকে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে উপস্থিত হইয়া সম্মুখেই পূজারী রামলাল চট্টোপাধ্যায়কে (রামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহাশয়, পরমহংসদেব কি এখানে আছেন, দেখা হবে'? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, প্রাতে তিনি কলকাতায় গিয়েছেন, রাত্রে ফিরতে পারেন। কালীপ্রসাদ তখন হতাশ হইলেন এবং কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অধৈর্য হইয়া বারাণ্ডার সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলেন। বেলাও অনেক হইয়াছে, রৌদ্রে পথ হাঁটিয়া আসিতে ক্লান্ত হইয়াছেন, ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট হইতেছে, সঙ্গে একটিও পয়সা নাই। এখন উপায় কি? দৈবাৎ একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পরমহংসদেব আছেন কি?" তিনি বলিলেন, 'না, কলকাতায় গেছেন'। যুবককে পাইয়া কিশোর কালীপ্রসাদ আশ্বস্ত হইলেন এবং উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে কহিতে পরস্পরের মধ্যে বেশ সৌহার্দ হইল। যুবকটীর নাম শশিভূষণ চক্রবর্তী, যিনি পরে রামকৃষ্ণানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিশোর নিজের পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম কালীপ্রসাদ, তাঁর পিতার নাম রসিকলাল চন্দ্র। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'তে পিতা শিক্ষকতা করেন। আহিরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনে তাঁহাদের বাড়ী।

• • • •

এই কালীপ্রসাদই পরবর্তীকালে 'স্বামী অভেদানন্দ' নামে পরিচিত বিশ্বভ্রমণকারী পরিব্রাজক, বিখ্যাত কর্মবীর। তপস্যার কঠোরতা দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে 'কালী-তপস্বী' নাম দিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে 'কালী-বেদান্তী' বলিয়াও অভিহিত করিতেন। কালীপ্রসাদের মাতা নয়নতারা দেবী পর পর তাঁহার পাঁচটী সন্তানকে হারাইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মা কালীর নিকট একটি দীর্ঘজীবী ও ধর্মপরায়ণ সন্তান কামনা করেন এবং পরে সন্তান হইলে মা কালীর কৃপার কথা স্মরণ করিয়া নাম রাখেন 'কালীপ্রসাদ'।

বঙ্গাব্দ ১২৭৩ সাল, ১৭ই আশ্বিন (ইং ২রা অক্টোবর, ১৮৬৬) মঙ্গলবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে কালীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন জাগতিক সুখভোগের ঊর্ধ্বে চরম জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু ছিল। পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার বিদ্যা যেন বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছিল। গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'তে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িবার সময় ভট্টী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জল দর্শন ও শিবসংহিতাদি ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত প্রীতি ও মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাহা হউক শশিভূষণের সহিত আলাপ হইবার পর তাঁহাকে বলিলেন, তিনি বাপ-মাকে না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, সঙ্গে পয়সাও নাই। এখন বাড়ী ফিরিবার উপায় কি হইবে? শশী বলিলেন: "সে কি কথা, বাড়ী যাবে কেন? আমিও কি বাড়ীতে কাউকে কিছু বলে এসেছি? আর যখন এসেছি তখন পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা না ক'রে ফেরা হবে না, চলো দুজনে গঙ্গায় স্নান করে মা কালীর প্রসাদ নিয়ে বিশ্রাম করিগে"। এই বলিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শশীর কাছে গামছা ছিল, একে একে তাহা পরিয়া দুইজনে স্নান করিলেন এবং যথাসময়ে অন্নভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে নানা বিষয় আলোচনা করিয়া দিন কাটাইলেন। শশীর পূর্ব হইতেই এখানে যাওয়া-আসা থাকায় সব জানাশুনা ছিল—কাজেই সকল ব্যবস্থা তাঁহার চেষ্টাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনিই নানারূপে বুঝাইয়া কালীপ্রসাদকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়া পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন।

দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা আসিল, আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, কালীপ্রসাদ তো আরাত্রিক দেখেন নাই; শশিভূষণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মা কালীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সবকয়টী মন্দিরে আরাত্রিক আরম্ভ হইয়া গেল। মা কালীর দিকে চাহিয়া আরতি দেখিতে দেখিতে কালীপ্রসাদ তন্ময় হইলেন। আরতি শেষ হইল। উভয়ে প্রণাম করিলেন এবং পরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে প্রণাম করিয়া দুইজনে পরমহংসদেবের ঘরের পশ্চিম দিকের চাতালে আসিয়া উপবেশন করিয়া ওখানকার দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সেদিন শশিভূষণকে পাইয়া কালীপ্রসাদের যে কত সুবিধা, কত আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ক্রমে রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রাত্রি প্রায় নয়টা, ঘোড়াগাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল, অবিলম্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'লাটু'র সঙ্গে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশী ও কালী উভয়েই প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং কালীকে এই প্রথম দেখিয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য একে একে প্রশ্ন করিলেন। কালীপ্রসাদও একে একে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, "আমি যোগ শিক্ষা করতে চাই, তাই আপনার কাছে এসেছি আপনি কি আমাকে তা শেখাবেন"? শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন: "তোমার এত অল্প বয়সে যোগ শিক্ষার ইচ্ছা জেগেছে, এ অতি শুভ লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে বড় যোগী ছিলে, সিদ্ধিলাভ করবার একটু বাকী ছিল, এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমায় যোগশিক্ষা দেব। আজ রাত্রে বিশ্রাম কর গে, কাল সকালে এসো"। কালীপ্রসাদ এক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি উৎফুল্ল চিত্তে পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

রাত্রে শশিভূষণের সহিত একত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া উত্তরে একস্থানে শয়ন করিলেন, কিন্তু সুনিদ্রা হইল না, আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্বেগ কত চিন্তা মনকে অধিকার করায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিল। কতক্ষণে প্রভাত হয়, প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করিলেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, গঙ্গায় গিয়া হাতমুখ ধুইয়া মন্দিরে মঙ্গলারতি দর্শন করিলেন এবং সকল মন্দিরে প্রণাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কতক্ষণে ভিতর হইতে আহ্বান আসে। কিছুক্ষণ পরে শুনিতে পাইলেন—পরমহংসদেব মধুর কণ্ঠে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতেছেন: "কালী কালী—'নাহং নাহং,' 'তুঁহু তুঁহু' মা—আমি নয় তুমি, তুমি"। কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র) আসিয়া কালীপ্রসাদকে জানাইলেন যে, "পরমহংসদেব তোমায় ডাকিতেছেন।"

আহ্বানের কথা শুনিবামাত্র কালীপ্রসাদের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল, উৎসুকচিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তিনি অবিলম্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোট খাটটীতে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কালীপ্রসাদকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে বলিলেন 'এসো বোসো'। কালীপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আদেশমত মেজের মাদুরে উপবেশন করিলেন। সস্নেহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবার জিজ্ঞাসা করিলেন: "হ্যাগা তুমি কতদূর পড়েছ? তুমি কি সংস্কৃত জান? কি কি গ্রন্থ পড়েছ? কালীপ্রসাদ বলিলেন: আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতেছি। সংস্কৃত চর্চাও আমি করি। রঘুবংশ কুমারসম্ভব ইত্যাদি কাব্য, তা ছাড়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলদর্শন ও শিবসংহিতাও পড়েছি। উত্তর শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া উঠিলেন বেশ, বেশ! অতঃপর কালীপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া উত্তরদিকের বারাণ্ডায় গিয়া তথায় যে তক্তোপোষ পাতা ছিল তাহার উপর তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী পদ্মাসনেই উপবেশন করিলেন। এইবার তাঁহার আদেশ মত জিহ্বাটী বাহির করিলে, তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তখানি কালীপ্রসাদের বক্ষে স্থাপন করিয়া তাহা উপরদিকে সঞ্চালিত করিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পদ্ম হস্তের স্পর্শে সুপ্তোত্থিতা জ্যোতির্ময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বমুখে তড়িদ্বেগে উত্থিতা হইয়া কালীপ্রসাদের মনকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করিয়া দিল। কালীপ্রসাদ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া গেলেন। পরমহংসদেব ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, পুনরায় তাঁহার বক্ষে হস্ত স্থাপনপূর্বক নিম্নদিকে সঞ্চালন করিয়া কালীপ্রসাদের সংজ্ঞা আনয়ন করিয়া তাঁহাকে ধ্যানযোগ ও সমাধি বিষয়ে নানাবিধ গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন:

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে করে শুচি।
(ওরে) দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা-মাকে পাবি।"

যেমন তত্ত্বদর্শী গুরু, তেমনি কুশলী শিষ্য—মণি-কাঞ্চন যোগ। তত্ত্ববিশারদ গুরু কর্তৃক অনুশিষ্ট হইলেই অবিলম্বে কুশলী শিষ্যের ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া যায়।

আশ্চর্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। কঠ উঃ

এই অভেদ জ্ঞানের মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নেহভরে কালীপ্রসাদকে আবার আসিতে বলিলেন। গুরুকৃপায় পরবর্তীকালে তাঁহার "অভেদানন্দ" এই সন্ন্যাসী-নামটী সার্থক হইয়াছে।

প্রসাদী সঙ্গীতে সাধনতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
(২য় পর্যায়)

এক শক্তিই কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত হইতে পারে ; যতবার ব্যক্ত ততবার নূতন।

প্রফুল্ল কমলের উপর অধিষ্ঠাতা, লঘুকায়া, অপূর্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজগ্রাস এবং গজ-উদ্গার অথবা দেবর্ষি নারদ-দৃষ্ট ভাগবতী মায়ার সূচীছিদ্রে বারংবার হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করা নিছক কবি-কল্পনা নহে। কথিত হয়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিন জগজ্জননী মহামায়ার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া দেখিয়াছিলেন—অনুপমা সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসবে এবং লালনপালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী,—এই কথাই পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয় :

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে

চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ঋষিগণ শব-শিবার আরাধনা করিয়াছেন। অভ্রভেদী পর্বতমালা, সাগর-বাহিনী নদ-নদী, উষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠন,—সকলই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী দেবীর প্রতীকস্বরূপ হইয়া সৌম্য অপেক্ষা সৌম্যতর মূর্তি প্রকাশ করিত। অমাবস্যার সূচিভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর দৃশ্য, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতায় রুদ্র ব্যম্বকের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বসৃষ্টির উপর কালের অমোঘ ধ্বংসলীলা—সকলই সেই করাল বদনার

বিরাট দেহের অভ্যন্তরে কোমল-কঠোরের বৈপরীত্য-সমাবেশে তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ এই ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া কালীর সংহারিণী, ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া ভীত হন নাই; এই মূর্তির অন্তরালে মাতৃত্বরূপের সন্ধান পাইয়া মহানন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন:

তবে আর কিসে ভয়
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥

তাই রামপ্রসাদ নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে কালীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন:

(১) আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়
(২) আমার এ তনু দক্ষিণা-কালীর দেবোত্তরের দাগ-চিটা

এই তনু-সমর্পণ কিন্তু তন্ত্রোক্ত সাধনারই অঙ্গ। কারণ এই সাধনার প্রধান উপকরণ জীবদেহ। যে গুণত্রয়ের আবরণে জীবের সাত্ত্বিক সত্তা আচ্ছন্ন থাকে, তাহা উন্মোচনের জন্য সাধকের সাধনা। সাধক নিজ দেহে পূজার উপকরণ পাইবেন। দেহের মধ্যেই সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু, ভূমণ্ডলের পরিধি, সাগর, শৈল, পুণ্যতীর্থ, পীঠ ও পীঠদেবতা বর্তমান। এই দেহের মধ্যেই তান্ত্রিকগণ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন। যাহারা স্থূল, জৈব প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং শক্তি সাধনার গুহ্য ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ তাহারাই পশু। পশুভাবের পূজা অর্চনায় তামসিক ভাব উন্মোচিত হইয়া সাধক রাজসিক মোহান্ধ উন্মোচনের শক্তি অর্জন করেন। রামপ্রসাদ পশুভাব হইতেই সাধনা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তীর্থযাত্রা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির জন্য তাঁহার মনে আসক্তি জন্মে। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন:

(১) এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী
(২) আমি কবে কাশীবাসী হব

ইহার পর আসে বীরভাবের সাধনা। এই সাধনায় বীরের প্রচণ্ড আত্মশক্তির আঘাতে অতি প্রবল রাজসিক বৃত্তিগুলি নিয়মিত হইয়া যায় এবং সাধকের দেহ দিব্যভাবের সাধনার উপযোগী হয়। দিব্যভাবের সাধনায় সাত্ত্বিক আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং সাধক দিব্যভাব ধারণ করেন।

চতুর্ভুজা দক্ষিণা কালীর মূর্তিকে মাতৃভাবে আরাধনা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রসার হয়। তখন আর মন্দিরের পরিচ্ছিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট মূর্তিতে মনকে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না, কারণ পরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি পদার্থে বা রূপে তন্ময়তা জন্মিলেই প্রাণ অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টির দিকে ধাবিত হয়, রূপকে অতিক্রম করিয়া অরূপের পথ অবলম্বন করে। রামপ্রসাদেরও যে এইরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সঙ্গীতে পাওয়া যায়:

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি।

এই অবস্থায় ধাতু, পাষাণ বা মৃত্তিকার মূর্তির প্রতি আর মোহ থাকে না, বিশ্বময় মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে :

(১) মা বিরাজেন ঘটে ঘটে
(২) মা বিরাজেন ঘরে ঘরে
(৩) আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে
(৪) মা বিরাজেন সর্ব ঘটে

ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ইহাকেই

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ

বলা হইয়াছে। উপনিষদে ইহাকেই

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্তনে ইহাকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

ঘটে ঘটে আছে যেমন জলে সূর্যছায়া

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থেই মায়ের স্বরূপ বর্তমান, এইভাব মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মন তৃপ্ত হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা সাধন-মার্গের প্রবেশপথ মাত্র। তখন যাহার সত্তায় পদার্থ-নিচয়ের অস্তিত্ব, অবস্থিতি ও বৃদ্ধি, সেই সত্তাকে পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। মন বিষয় বাসনা বিরহিত হইয়া যায়, কিন্তু বিষয়াতীতকে অনুভব করা অথবা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করার শক্তি জন্মে না। এইরূপ অবলম্বনশূন্য অবস্থা সাধকের মনে চাঞ্চল্য ও উন্মাদভাবের সৃষ্টি করে। এই সময়ে সদ্‌গুরুর সুহায়তা লাভ করিতে না পারিলে উন্মাদভাব স্থায়ী হইয়া যায়। কাজেই, সাধন-পথে এই অবস্থাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন বলা যাইতে পারে।

সাধন-পথে গুরুনির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রসারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে :

যিনি শান্ত, দান্ত, কুলীন, বিনীত, শুদ্ধবেশসম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠিত, পবিত্রস্বভাব, কার্যদক্ষ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ধ্যাননিষ্ঠ, তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ, শিষ্যের প্রতি শাসনে ও অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই গুরুপদের যোগ্য। যিনি (মন্ত্রদানাদি দ্বারা) উদ্ধার করিতে এবং (শাপাদি দ্বারা) বিনাশ করিতে সমর্থ, তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহী, তাদৃশ ব্রাহ্মণই গুরুপদের যোগ্য।

রামপ্রসাদ যে সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রসাদী সঙ্গীতে পাওয়া যায় :

(১) এবার এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি

(২) যখন গুরুদত্ত তত্ত্বাবেজ
গুজরাইব মিছির কাজে

(৩) ওরে মিছামিছি কর্মভোগ গুরু বিনে প্রসাদ বলে

কিন্তু এই গুরু যে কে ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনাবলী হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায় না। কয়েকটি সঙ্গীতে কিছু কিছু আভাস পাই :

(১) যদি পার হবি মন ভবার্ণবে
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী

(২) শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু অকিঞ্চন দীনবন্ধু
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্পবৃক্ষে

(৩) শমন দমন শ্রীনাথ চরণ
সর্বদাই হৃদয়ে ধরি

(৪) মন যদি মোর ওষুধ খাবা
আছে শ্রীনাথ-দত্ত পটোল-সত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা

(৫) ওরে মন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর কি করিবে রবিসুত

(৬) রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রয় গাঁথা

(৭) ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সদাজীব

(৮) তারা নাম তরি তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু

(৯) যা রে যা রে গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যা রে।

এগুলি হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, রামপ্রসাদের গুরুর নাম ছিল শ্রীনাথ। বর্তমানে এ বিষয়ে ইহার অধিক কিছু বলা যায় না।

গুরুর উপদেশে রামপ্রসাদ ধাপে ধাপে সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গীতে সাধন প্রণালীর সহিত তাঁহার ভগবদনুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের যোগসাধনার ধারা অনুসরণ করিতে গেলে তন্ত্রোক্ত যোগ-প্রক্রিয়ার আলোচনা করিতে হয়। এই পদ্ধতি অতিশয় জটিল এবং দুর্বোধ্য। তন্ত্রসার, সারদাতিলক প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রসাদী সঙ্গীতের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে যাহা প্রয়োজন তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

তান্ত্রিকগণ জীবদেহে যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রধান। সুষুম্না গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই নাড়ী-মৃণালে ছয়টি চক্র বা পদ্ম গ্রথিত আছে। পদ্মগুলি কর্ণিকাকার এবং বিভিন্ন দলযুক্ত, এক-একটি পদ্মে এক-একজন মাতৃকাশক্তি অবস্থিত।

এই চক্রগুলি দেহের বিশিষ্ট শক্তিকেন্দ্র। সাধনার সময়ে ইহাদের যে-কোন কেন্দ্রে মন স্থির করিতে হয়। পদ্মগুলির নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এগুলি ছাড়া শীর্ষদেশে অধোমুখী অবস্থায় আর একটি সহস্রদল পদ্ম আছে; তাহার নাম সহস্রার।

সাধনার প্রধান অঙ্গ কুণ্ডলিনী যোগ। এই শক্তি জীবদেহের মূলাধারে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করেন। এই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দেহস্থ চক্রে চক্রে চালনা করিতে হয়। সাধক যখন কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহিত যুক্ত করেন, তখন তাঁহার কার্য্য পরমানন্দ লাভ করেন। শিব ও শক্তির সমযোগে যে সামরস্য উদ্ভূত হয়, তাহা কোটি লাক্ষা রসের অপেক্ষাও রক্তবর্ণ। ইহা দ্বারা সাধক দেহকে আপ্লাবিত করেন।

সাধক আসনে বসিয়া পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আধার-স্বরূপ জীবাত্মাকে অনাহত পদ্ম হইতে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করেন। তৎপরে 'হুং' মন্ত্র দ্বারা ধীরে ধীরে নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে হইবে; ইহাতে মূলাধার কমলে কামবহ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাহাতেই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কুণ্ডলিনীর জাগরণে প্রাণস্পন্দন দ্রুততর হয়, মেরুদণ্ড মধ্যে শিহরণ জাগে। বায়ুর সহিত বহ্নি মিলিত হইলে উহা ঊর্ধ্বগামী হয়, সেইরূপ কামবহ্নি-দ্বারা সন্ধীপিত হইয়া কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বমুখ হন। তখন 'হংস' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুম্ভক করিতে হয়।

এই সময়ে কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বদিকে আরোহণ করিতে থাকেন। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলেই আধার-কমলের চতুর্দল ফুটিয়া উঠে। তিনি এক মুখ মূলাধারে রাখিয়া অন্য মুখে স্বাধিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হন; সেই সময়ে কুণ্ডলিনী দক্ষিণাবর্তে আধার-কমলের দলে দলে তালে তালে নিম্নমুখ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন; একে একে আধার-কমলের পৃথিবীতত্ত্ব (ক্ষিতি, গন্ধ, নাসা, ঘ্রাণ) মাতৃকাশক্তি ডাকিনী ও মাতৃকাবর্ণ (ব, শ, ষ, স) কুণ্ডলিনীদেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আধার-কমলের দলগুলি অধোমুখ ও নিমীলিত হইয়া যায়। অপর দিকে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং জল-চক্রের যাবতীয় বৃত্তি ও গুণ বিকশিত হয়।

স্বাধিষ্ঠানে আসিয়াই কুণ্ডলিনী পূর্বমুখ মণিপুরের দিকে উত্তোলন করেন। অপর মুখ দিয়া পূর্ববৎ ছন্দে ছন্দে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে জলতত্ত্ব (অপ, রস, রসনা ইত্যাদি) মাতৃকা শক্তি রাকিনী. মাতৃকাবর্ণ (ব, ভ, ম, য, র, ল) গ্রাস করেন। তাহাতে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দল অধোমুখ ও ম্লান হইয়া যায়। অন্যদিকে মণিপুরের সকল দল, সকল তত্ত্ব প্রকাশমান হয়। এইভাবে কুণ্ডলিনী মণিপুর হইতে হৃদয়াম্বুজ অনাহতে আসেন। ইহাতে মণিপুরের তেজতত্ত্ব (রূপ, চক্ষু ইত্যাদি) লাকিনী দেবী. মাতৃকাবর্ণ (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ) কুণ্ডলিনীদেহে লয় প্রাপ্ত হয়। অনাহত প্রস্ফুটিত হয়, মণিপুর ম্লান হইয়া যায়।

অতঃপর কুণ্ডলিনীকে পূর্বমুখ কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মে আসিয়া পদ্মটিকে দলে দলে ঊর্ধ্বমুখ ও প্রমুদিত করিয়া তুলে। বিশুদ্ধ পদ্মের প্রকাশে তাহার যাবতীয় বৃত্তি স্ফুরিত হয়; অন্যদিকে অনাহতের দেবদেবী, বায়ুতত্ত্ব (ত্বক, স্পর্শ ইত্যাদি), মাতৃকাবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ) কুণ্ডলিনীদেহে বিলীন হয়।

কুণ্ডলিনী তখন আজ্ঞাচক্রে আসিয়া উপস্থিত হন; ভ্রূ মধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মসকল বৃত্তিসহ বিকশিত হইয়া উঠে এবং অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শে মন বিপুল ব্যাপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তখন সাধকের মানস জাগরণ এবং এক অনির্বচনীয় সুখকর অবস্থা। অপরদিকে বিশুদ্ধ পদ্মের দল, বৃত্তি (ব্যাস, শব্দ, শ্রুতি), শক্তি ও বর্ণ (১৬টি স্বরবর্ণের সকলগুলি) কুণ্ডলিনীর মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

আজ্ঞাচক্র হইতে কুণ্ডলিনী আরও ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকেন। একে একে প্রপঞ্চ সৃষ্টির সকল তত্ত্ব—পঞ্চমহাভূত হইতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, এমন কি সৃষ্টির কার্য-কারণ প্রকৃতি পর্যন্ত কুণ্ডলিনীদেহে বিলীন হইয়া যায়। সাধক তখন অমৃত পথের পথিক। ছন্দে ছন্দে তাঁহার সত্তা তখন স্পন্দিত, আবরণগুলি উন্মোচিত। তখন তিনি দীপ্তিময়, বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিকারী। এই অবস্থায় তিনি কুণ্ডলিনীকে শিবের সহিত সংযোজিত করেন। শিব নিরীহ শবরূপী। এখানে আসিয়া দেবী রূপবতী কামোল্লাস বিহারিণী পরদেবতা। কুণ্ডলিনী স্বীয় মুখারবিন্দ-গন্ধ দ্বারা শিবকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। শিব জাগ্রত হইলে দেবী শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করিয়া ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত রমণ করেন। ইহাতে

অমৃতং জায়তে দেবি! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি।
তদ্ভুঙ্কবামৃতং দেবী! লাস্যরস সমাকুলম্।

এই অমৃতধারায় সাধক নিজে আপ্লুত হন, ইহা দ্বারা দেবতা পরিতৃপ্ত হন, সাধকের নিত্যানন্দরূপ মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই অমৃতই সামরস।

ইহার পর কুণ্ডলিনীকে আবার বিপরীতক্রমে শিবপুর হইতে ক্রমে ক্রমে সকল পদ্ম অতিক্রম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়। সাধক তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন এবং দিব্য চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হন, ইহাকেই সংক্ষেপে ষট্‌চক্রভেদ বলা হয়। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা নিত্যানন্দ, নিত্যচৈতন্য, অদ্বৈত, শিবময় অবস্থা। দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমাধির অবস্থা ক্রমে ক্রমে আসে।

শ্রেয় বুদ্ধির গোড়ার কথা

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য

মানুষের সভ্যতার রহস্য সূত্রটি কোথায় এর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও নানা সমস্যাই বহুকাল ধরে উঠে আসছে এবং তার আলোচনাও বহু প্রকারে বহু দিক দিয়ে হ'চ্ছে। কিন্তু একটা সামঞ্জস্য আর হ'য়ে উঠ্‌ছে না। সেটা হচ্ছে ভিতরে ও বাহিরে সামঞ্জস্য। বাহিরে যেটা বুদ্ধির জগত সেখানে বস্তুর বা উপকরণের একটা একচেটে প্রভাব রয়েছে। এই বাহিরের বুদ্ধিতে মানুষ দেহগত ভাবে বাঁচ্‌বার চাবিকাটিটা পেয়েছে।

মানুষকে বাহিরের নানা বিপদ থেকে বাঁচায়, রোদ, ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে ব'লে শুধু দেহগত ভাবেই এর মূল্য নেই এর একটা নৈতিক মূল্যও আছে। বর্তমান বিজ্ঞান মানুষের এই উপকরণগত বুদ্ধিকে এতটা সূক্ষ্ম ক'রে তুলেছে যে এই বুদ্ধি মানুষের আন্তর জগতের উপরও খবরদারী করতে উদ্যত।

এই বুদ্ধিটা আদিকালে ধনুকবাণ, চাকা ও আগুনের আবিষ্কার ক'রে আদিম যুগের ভয়াবহ জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছিল, এই বুদ্ধিটাই কৃষি আবিষ্কার ক'রে মানুষের জীবনযাত্রাকে অধিক সুগম ক'রেছিল। মানুষের জীবনের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার পিছনে এই বুদ্ধির কাজই বেশী।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে এই বুদ্ধিরই জয়যাত্রা চলেছে। সেইজন্য এই সময়ে এই উপকরণগত ও গুণগত বুদ্ধির একটা দিগ্‌দর্শন দরকার ব'লে মনে হয়।

উপকরণগত বুদ্ধির মধ্যে মানুষের দৈহিক আত্মরক্ষা ও বস্তু সংগ্রহ, আবিষ্কার ও সঞ্চয়ের দক্ষতাকে লক্ষ্য করি। এই বুদ্ধিতেই মানুষের আত্মরক্ষা ও বস্তুসমৃদ্ধির যোগে বাইরের প্রকৃতিতে তার অস্তিত্বের ও প্রভাবের একটা নির্দিষ্ট মান খাড়া হয়ে যায়।

এই বাইরের প্রকৃতিতে তার অস্তিত্ব ও প্রভাবের ফলেই মানুষের সহজ বুদ্ধি বরাবর সেইটাকেই বেশী ক'রে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

এটা দেহস্তরে বা জৈবস্তরে আমরা যাহাই বলি না কেন, এই দেহটাই আমাদের মধ্যে একেবারে ঐকান্তিক।

এই ঐকান্তিকতার জন্যই এর প্রভাবটা মানুষের দেহের মূলে থেকে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রভাবটা যখন মানুষ কাটিয়ে উঠতে না পারে তখনই তার সভ্যতায় ছন্দপতন হয়।

এই উপকরণগত বুদ্ধির মধ্যে যে প্রমাণ প্রয়োগ, যুক্তির নিপুণতা পরীক্ষার তন্ময়তা আমরা দেখি বা বুঝি তার মধ্যে ভাববার যে পূর্বাপর শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে তাহা-ই হচ্ছে ঐ দেহগত প্রভাবের মূলে একটা নৈতিক ভাবের তথ্যশক্তি। বিজ্ঞানবলে ঐ ভাববার শৃঙ্খলাটা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কারে এবং ক্রম প্রসারণের পথে একটা অভাবিত পূর্ব গভীরতা ও শক্তি লাভ করায় তাহা আজ মানুষের চিন্তার সর্বক্ষেত্রেই নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে যাচ্ছে।

মানুষের আদিম বুদ্ধি শুধু প্রকৃতিজাত এবং খানিকটা পরিমাণ ভূয়োদর্শনজাত।

মানুষের যে বুদ্ধিটা উপকরণগত তা গ'ড়ে উঠেছে আদিম বুদ্ধিবৈরাগ্যে। এই আদিম বুদ্ধির বৈরাগ্যটা গুণগত নয়, পরিমাণগত পদ্ধতি বা প্রকারগত। কারণ এই উভয় বুদ্ধির আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ। আদিম বুদ্ধির ভোগ করার পিছনে অন্য কোন প্রকারগত চিন্তা ছিল না, শুধু ছিল তৃপ্তি। সেইজন্য যা কিছু অব্যবহিত বা আসন্ন তা ছাড়া তার আর কোন লক্ষ্য ছিল না।

উপকরণগত বুদ্ধির মধ্যে যে যুক্তি, পরীক্ষা, কার্য-কারণ ও পূর্বাপর বিভাগের সামঞ্জস্য বিধান তা অব্যবহিত ও আসন্ন ভোগতৃপ্তির লক্ষ্যে নিজের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, তা সর্বদাই যা আসন্ন ও অব্যবহিত তা-কে পিছে রেখে বস্তুর বা উপকরণ নির্মাণের নূতন পদ্ধতিগত দিগ্‌দর্শন করে। এই পদ্ধতিগত দিগ্‌দর্শনের পিছনে বস্তুকে আরও নিরাপদ ও সুন্দরভাবে ভোগ করার স্পৃহা থাকে। শুধু যেন তেন প্রকারে ভোগতৃপ্তিটা হ'চ্ছে আদিম বুদ্ধির লক্ষণ এবং ভোগকে আরও নিরাপদ, আরও সুন্দর ও আরও সহজ ক'রে ভোগ করার পিছনে যে চিন্তা ও বুদ্ধির ধৈর্য থাকে এই ধৈর্যই আসন্ন ও অব্যবহিত ভোগতৃপ্তির বিরোধী ধরণের এমন একটা বিশিষ্ট বোধকে উপকরণগত বুদ্ধির মধ্যে তুলে ধরে যা মানুষের আরও গভীর ধৈর্য সম্পদে সমৃদ্ধ মানসিকতার সূচনা করে।

এই চিন্তা ও বুদ্ধির ধৈর্য ক্রমে ক্রমে আপাত ও আসন্ন ভোগসাধনের মধ্যে এক প্রকারের অজ্ঞতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রত্যক্ষ করল তার ফলে এই আপাত ও আসন্ন ভোগ-তৃপ্তি সূচক জীবনধারার প্রতি তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মাল। এই বিতৃষ্ণাই ঐ উপকরণগত বুদ্ধিতে আদিমতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া শক্তিকে সৃষ্টি ক'রে মানুষের উচ্চাঙ্গ নৈতিক সভ্যতার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। উপকরণগত এই বুদ্ধির আদিম জীবনধারার প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও তারও সমগ্র লক্ষ্য থাকে ভোগের মধ্যে, সেইজন্য নিঃস্বার্থপরতার চর্চা বা চর্যা তার পক্ষেও সম্ভব হয় না। নিঃস্বার্থপরতার চর্চা তার দ্বারা না হ'লেও তার মধ্যে চিন্তা ও বুদ্ধির ধৈর্যে যে সুসংস্কৃত, মার্জিত ও উত্তম ভোগ আসন্ন হ'য়ে ওঠে সে ক্ষেত্রে চিন্তা ও বুদ্ধির ধৈর্যের

প্রতি তার একটা প্রবণতা জন্মে এবং এই সঙ্গে আপাত ও আসন্ন ভোগতৃপ্তির প্রতি বিতৃষ্ণা বোধের সৃষ্টি হওয়ায়, ভোগবুদ্ধির একচেটিয়া অধিকারের প্রতি তার একটা আধা অনুকূল ও আধা প্রতিকূল মনোভাব গ'ড়ে ওঠে। তার লক্ষ্যটা বেশী পড়ে আদিম বুদ্ধির বৈরাগ্যে। এই আদিম বুদ্ধির বৈরাগ্য পরিণামে সূক্ষ্ম ও উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তির বিলাসে পর্যবসিত হয়। লক্ষ্যটা আদিম বুদ্ধি বৈরাগ্যে বেশী পড়লেও এবং তার পথে বুদ্ধিবৃত্তির বিলাস ঘটতে থাকলেও তার যেটা করণীয় সেটা হ'চ্ছে ভোগবৃদ্ধি ও নানা বিচিত্র বস্তু নির্মাণ পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা। এই বস্তু-নির্মাণ বুদ্ধি ব্যষ্টি মানুষের বুদ্ধি। একক মানুষের পরিধিকে এ কেবল আবর্তন করে। এই বস্তু-নির্মাণ বুদ্ধিটা শুধু একক ব্যষ্টি মানুষের হ'য়ে সব কিছুর অনুসন্ধান করে। এখানে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। অনেকে বলতে পারেন—সভ্য মানুষ যা কিছু করে তার প্রায় সবটাই না হোক বেশীর ভাগ অংশটাই সমষ্টির জন্য ক'রে থাকে, তা না হ'লে জগতটা এতদিন আদিমতার গহ্বরে প'ড়ে থাকত। না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। উপকরণগত বুদ্ধি যেটা করে তার ফলাফলটার প্রতি তার লক্ষ্যটা একান্তভাবে থাকে, কারণ ভোগের চরিতার্থ সাধন ফলদর্শিতার পরই সম্ভব হয়। উপকরণগত বুদ্ধির মূল লক্ষ্যটা ভোগের বিকাশ সাধন ব'লেই ফলদর্শিতার ব্যাপারটা তার পক্ষে অপরিহার্য। এই ফলদর্শিতার ব্যাপারে কোন প্রকার ঔদার্য বা সমষ্টি বোধ তার কাছে একান্ত ভাবেই অর্থহীন ঠেকে। একক মানুষের পরিধিটা আর কিছুই নয় তা হ'চ্ছে সেই বুদ্ধিমানের অত্যুগ্র ফলাকাঙ্ক্ষা। এই ফলাকাঙ্ক্ষা কিসের ইঙ্গিত বহন করে তাও অস্পষ্ট নয়। এই ফলাকাঙ্ক্ষায় আর সব কিছু তার কাছে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, সেইজন্য বস্তু-নির্মাণ বুদ্ধির পক্ষে একক ব্যষ্টি মানুষের সমস্ত মনোযোগকে আকর্ষণ ক'রে রাখা বিচিত্র ব্যাপার নয়।

এইবার আমাদের আসল প্রসঙ্গে আসা যাক্। বস্তু-নির্মাণ বা ঔপাদানিক বুদ্ধির মধ্যে আপাত ও আসন্ন বুদ্ধি বৈরাগ্যে যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল সেই প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের বুদ্ধি যে কাঠিন্য ও গভীরতা লাভ ক'রেছিল সেই কাঠিন্য ও গভীরতা যখন বুদ্ধির মধ্যে গুণগত উৎকর্ষের সৃষ্টি করল তখনই উপাদানগত বুদ্ধি নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দিক দিয়ে গুণগত বুদ্ধির অধীন হ'য়ে পড়ে, কারণ আদিম বুদ্ধি বৈরাগ্যের মূলে এই গুণগত বুদ্ধিরই ধরণটি বিদ্যমান। মানুষের উচ্চস্তরের উপাদানগত বুদ্ধি প্রথমেই এই আদিম বুদ্ধি বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ মনের ধৈর্য ও স্থৈর্যকে মেনে নিয়েছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশে যখন ঐ বুদ্ধি বৈরাগ্য নানা বিচিত্র মানসিক সমৃদ্ধিতে বাহিরের উপাদানগত বুদ্ধির মতই ভিতরে গুণগত বুদ্ধির একটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন সমষ্টি মানুষের সামাজিক বুদ্ধিতে এই উপাদানগত বুদ্ধি গুণগত বুদ্ধির অধীন হ'য়ে পড়ল। মানুষের মধ্যে উপাদানগত বুদ্ধির এই অধীনতাই তাকে সভ্যতার পথে সংযমী ক'রে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব কিছুটা বিস্ময়কর বটে। কেননা একটা বড় প্রতিভার বিকাশের পক্ষে যে পরিমাণ প্রস্তুতির প্রয়োজন, আপাতদৃষ্টিতে সে সব লক্ষণ বিভূতিভূষণের সাহিত্যপূর্ব জীবনে দেখা যায় না। হঠাৎ যেন একটা পরিণত মন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি দেখা দিয়েছিলেন। কিভাবে তিনি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তার কৌতুককর বিবরণ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন রাত্রে কলকাতা বেতার ভাষণে বলেছিলেন। তার থেকে আমরা এই জানতে পারি যে, আটাশ বছর বয়সে বিভূতিভূষণ প্রথম গল্প লেখেন, যা তাঁর "মেঘমল্লার" গল্প-পুস্তকের মধ্যে উপেক্ষিতা নামে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই দীর্ঘ আটাশ বছর পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা যথোচিত বিকাশলাভ করেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে একটা সুসংগত আলোচনার প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পূজার্চনা ও কথকতা ক'রে জীবিকানির্বাহ করতেন। সে কারণ তাঁকে আশেপাশের গ্রামে এমন কি সময় সময় দূরদূরান্তরেও যেতে হোত। বালক-বয়সে বিভূতিভূষণ পিতার সঙ্গে অনেক সময় পরিভ্রমণে যেতেন, এজন্য তাঁর লেখাপড়া বেশী বয়সে হয়। কিন্তু একদিক থেকে এই ভ্রমণে তাঁর মানসিক স্বাধীনতা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। অল্প বয়স থেকে বাইরের আলোবাতাস বিভূতিভূষণের মনকে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত করেছিল অর্থাৎ সরল, স্বচ্ছ ও সুন্দর একটি মানসিক বৃত্তির উপযোগী ক'রে তুলেছিল। শুধু তাই নয়—"শৈশব হইতে

পিতার নিকট কথকতা শুনিয়া শুনিয়া পুত্রের সাহিত্যবুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছিল।...ভাল কথক হইবার কল্পনা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল, তিনি কথকতার বিষয়বস্তুর অভাবে গ্রামের আশেপাশের অরণ্য-প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া আপন মনেই গল্প বলিয়া যাইতেন। বাড়ীতে খাতাকলম লইয়া গুরুগম্ভীর ভাষায় গল্পলেখা শুরু করিতেন। পাঁচালী-প্রিয় বিভূতিভূষণ ছন্দ মিলাইয়া ছড়াও লিখিতেন। বনগ্রাম হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে বিবাহের প্রীতি-উপহার দুই একখানা লিখিয়াছিলেন। 'রিপন কলেজ ম্যাগাজিন'-এও কবিতা বাহির হইয়াছিল এবং প্রবন্ধও একটা ফাঁদিয়াছিলেন...'। [১]

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বহিঃপ্রকৃতি থেকে অবাধ আনন্দের অধিকারী হয়ে উত্তর জীবনে বিভূতিভূষণ সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে এসেছিলেন এবং আবাল্যসঞ্চিত ও বর্ধিত সেই মানসিক বৃত্তিগুলিকে সাহিত্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষের ধারাবাহিকতা না থাকলেও বালক-বয়স থেকেই তাঁর মানসক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রতিভার ক্রমবিকাশ চলতে থাকে এবং পরিণত বয়সে মনোরাজ্যের সেই পূর্বপ্রস্তুতির সম্ভার নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

বিভূতিভূষণের আবির্ভাব বাঙালী পাঠকমনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। 'বিচিত্রা'-য় যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে, তখন বাঙালী পাঠক বিস্মিত হয়েছিল এই ভেবে যে, এতখানি উচ্চ প্রতিভার হঠাৎ আবির্ভাব হ'লো কেমন ক'রে। শুধু তাই নয়, এ এমন একটি রচনা—দক্ষ শিল্পীর মত এমন মনোরম কারুকার্য যা দেখামাত্রেই মন সায় দিয়ে ওঠে—হ্যাঁ ঠিক; এই-ই তো আমি চেয়েছি! বালক-বয়সের ওই স্বপ্ন, কল্পনা, অবাধ আনন্দ—ওতো আমারই! কেমন শক্তিধর এই নবাগত শিল্পী—যিনি আমাদের শিশুমনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও রহস্যকে অমন নিপুণভাবে প্রকাশ করলেন। তাই সেই সময় থেকেই অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রসবিলাসী পাঠকসম্প্রদায় ও বিদগ্ধসমাজ তাঁর ললাটে বিজয়টীকা এঁকে দিয়েছিল।

সাহিত্য-সেবার এই সার্থক পুরস্কার বিভূতিভূষণের মনকে কোথাও অভিভূত করে নি। বরং এতখানি কৃতিত্বের পরিচয়দানে তিনি আনন্দ পেয়েছেন আর সেই আনন্দই তাঁকে নতুনতর সৃষ্টির পথে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। রসবিলাসী পাঠকসম্প্রদায়ের আন্তরিক অভিনন্দন সত্যিই যদি তাঁকে অভিভূত করতো—তাহলে তা নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অনেকখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। কেননা অভিভূত হওয়া মানেই থামা, আর থেমে যাওয়া হলো নবসৃষ্টির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। বিভূতিভূষণের লক্ষ্য ছিল 'গতিই জীবন'। অভিনন্দন আর উচ্ছ্বাসের স্রোত সেই গতি ব্যাহত করতে পারে নি বলেই 'পথের পাঁচালী'-র পরেও তিনি

১। শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, 'বিভূতিভূষণের জীবনকথা' দ্রষ্টব্য।

'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী' প্রভৃতি কতকগুলি সার্থক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটি স্বকীয় জীবন-দর্শনের দ্বারা পরিচালিত। জীবন সম্বন্ধে তাঁদের এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে; কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আপন অন্তরের ঐকান্তিকতা দিয়ে সেই জীবন-দর্শনকে স্বীকরণে পরিণত করেছেন। সে-কারণ অনেক সময় তাঁদের জীবন-দর্শনের মূল ক্ষেত্র অভিন্ন হলেও তা একটি স্বকীয় রসবোধে আপ্লুত। সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যে জীবনাদর্শের প্রতি অনুরক্ত, তার মূলে কোন অদ্বিতীয়তা নেই বটে, কিন্তু তবু তা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও অকৃত্রিমতার দ্বারা মণ্ডিত বলেই সেখানে একটি বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ পাওয়া যায়। যে সৌন্দর্যানুভূতি ও রসবোধ জীবনকে একই সঙ্গে গভীর ও বিস্তৃত করে তার উৎসস্থল আপন অন্তর। অন্তরের সেই ছাপ তার সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনার শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি এই জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে।

এবার, বিভূতিভূষণের আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যকে কতখানি লাভবান করেছিল অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণের সংযোজনা কতখানি তা আলোচনার বিষয়।

পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই কমবেশী সাহিত্যিক দেখা দেন। তাঁদের অনেকেই আবার সমসাময়িকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেও থাকেন; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে চিরন্তন অধিকার লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ সমসাময়িক সাহিত্যের আকর্ষণ এমনি তীব্র ও আপাতমধুর যে, সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক সেই মহনীয় পরিবেশ ভেদ ক'রে দৃষ্টির স্বচ্ছতালাভ করতে সক্ষম নন। কেবলমাত্র সস্তা হাততালি আর কাঞ্চনমূল্যের লোভেই অনেকের রচনা বিকিয়ে যায়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিভা ঠিক সে ধরণের নয়। সমসাময়িককালের সুলভ লোকপ্রিয়তার প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগতের মূলে যে সৌন্দর্যানুভূতি ও অসীমের প্রতি গভীর আকুতি আত্মগোপন ক'রে রয়েছে, তাকে তার স্বরূপে প্রকাশ করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিব্যক্তিতে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই—সেটাই তাঁর নতুনত্ব। "মানুষকে ও প্রকৃতিকে একটি স্থিরচিত্রে সন্নিবিষ্ট"[২] ক'রে ঠিক এই ধরণের সাহিত্য-সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে প্রথম এবং এই কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসে তা একটি নতুন সংযোজনা। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত। বহিঃপ্রকৃতি থেকে সৌন্দর্যরস আহরণ ক'রে আপন অন্তঃপ্রকৃতির মিশ্রণে যে অপরূপ চরিত্রের বিকাশ ঘটে, সাহিত্যে বিভূতিভূষণ তার শ্রেষ্ঠ রূপকার। শুধু তাই নয়, এই রূপকর্মের অন্তরালে তাঁর মানস-প্রকৃতি গভীরভাবে নিহিত।

২। 'সাহিত্য বিতান'—মোহিতলাল মজুমদার। 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেই কারণেই সেখানে অন্তরঙ্গতার সুর অত্যন্ত বেশী। জীবনের প্রগাঢ় অনুভূতি ও সৌন্দর্যানুশীলনের অসীম শক্তি তিনি আপন সাহিত্য-রচনায় নিয়োগ করেছেন। এ সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাব-গভীরতাকে বিসর্জন না দিয়া সীমাহীন ব্যাপ্তির দিকে প্রবণতা, এই অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অপরাজিত মানবাত্মার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যে ও উপন্যাসে স্থায়ী হয়, তবে ইহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই।"[৩]

সাহিত্যের মধ্যে জীবনের ব্যাপক ও গভীর রূপের প্রতিফলন, বিভূতিভূষণের দক্ষতার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, এমন গভীর আত্মোপলব্ধি ও অধ্যাত্মচেতনা নিয়ে আর কোন আধুনিক সাহিত্যিককে ঠিক এ ধরণের সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করতে দেখা যায় না। তথাপি, বিভূতিভূষণের একক দানে বাংলা সাহিত্যের এই একটি দিক বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—পৃঃ ৪৫৮।

অদ্বৈত বেদান্তে তত্ত্বানুসন্ধান *

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(দুই)

অন্তঃকরণের সত্ত্ববৃত্তি দ্বিবিধ : নিশ্চয়বৃত্তি ও সুখাকার বৃত্তি। নিশ্চয়বৃত্তিমান অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলা হয়। সুখাকারবৃত্তিমান অন্তঃকরণই ভোক্তা বা জীব। শ্রুতিতে আছে : "প্রিয় বস্তুই তাঁহার শির, মোদ তাঁহার ডান পাখা, প্রমোদ তাঁহার বাম পাখা, আত্মা আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মপুচ্ছই প্রতিষ্ঠা"। ইহাই কারণ-শরীর পর্যন্ত আনন্দময় কোষ। কেহ কেহ অজ্ঞানকে আনন্দময় কোষ বলেন।

নিম্নোক্ত সতেরো লিঙ্গযুক্ত সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। অপকীকৃত পঞ্চ-মহাভূত ও তৎকার্য সপ্তদশ লিঙ্গকে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর বলে। উক্ত উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বা সূত্রাত্মা বলা হয়। ইহা উপহিত বা উপাধিযুক্ত ও সর্বব্যাপী বলিয়া জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিমান ; অথবা পূর্বোক্ত অপকীকৃত ভূতসমূহ হইতে যে সর্বব্যাপক লিঙ্গশরীর পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হয় তাহাই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর।

যেমন গোত্ব গাভী জাতিতে পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ সর্বব্যষ্টিতে অনুস্যূত সত্তাই সমষ্টিত্ব। শ্রুতিতে আছে, সর্বাত্মক মহৎ সূত্র লিঙ্গদেহ তৎসমূহ হইতে সমুদ্ভূত হইল। কেহ কেহ বলেন, বনবৎ লিঙ্গশরীরসমুদয়ই সমষ্টি লিঙ্গশরীর। প্রত্যেক লিঙ্গশরীরকে ব্যষ্টি লিঙ্গ-শরীর বলে। ব্যক্তিবৎ ব্যাবৃত্তত্বই ব্যষ্টিত্ব নামে অভিহিত। ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত চৈতন্য তৈজস নামে উক্ত। তেজোময় অন্তঃকরণ দ্বারা তৈজস উপহিত। সামান্য ও বিশেষবৎ, অথবা জাতি ও ব্যক্তিবৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে তাদাত্ম্য বিদ্যমান। সুতরাং ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত তৈজস ও সমষ্টি উপাধিযুক্ত সূত্রাত্মার মধ্যেও তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব অবস্থিত।

* এই 'বিশ্ববাণী' মাসিকে বিগত মাঘ সংখ্যায় ইহার প্রথম অংশ প্রকাশিত।

এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম-সমন্বিত সূক্ষ্মশরীরকে অষ্টপুরীযুক্ত বলা হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণচতুষ্টয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চসূক্ষ্মভূত, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই অষ্টপুরী সমবায়ে সূক্ষ্মশরীর নির্মিত। উহাতে কার্যাবিদ্যা দ্রষ্টব্য। কার্যাবিদ্যা চতুর্বিধ : অনিত্যে নিত্যত্ব বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিত্ব বুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি ও অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মখ্যাতিই অবিদ্যা। খ্যাতি শব্দের অর্থ বোধ বা বুদ্ধি। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্রহ্মলোকাদি সংসারসুখাদি অনিত্যফলে নিত্যত্ব বুদ্ধিতে একবিধ অবিদ্যা দ্রষ্টব্য। অশুচি স্ব-শরীরে ও অশুচি পুত্র-ভার্যাদির শরীরে শুচিত্ব বুদ্ধি অপর অবিদ্যা। দুঃখে ও দুঃখ-কারণসমূহে যথাক্রমে সুখবোধ ও সুখ-কারণবোধ অন্যবিধ অবিদ্যা। অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহম্বোধ বা আত্মবুদ্ধি ইতরা অবিদ্যা। এইরূপে কার্যাবিদ্যা চতুর্বিধ হয়। কাম শব্দের অর্থ রাগ বা আসক্তি। কর্ম ত্রিবিধ : সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে স্বকৃত কর্ম ফলদান না করিয়া অদৃষ্টরূপে বিদ্যমান তাহা সঞ্চিত কর্ম। সন্ধ্যা, বন্দনা ও অগ্নিহোত্রাদি সঞ্চিত কর্ম। এই শরীরে ক্রিয়মান কর্মকে আগামী কর্ম বলে। বর্তমান শরীরের আরম্ভক কর্ম প্রারব্ধ কর্ম নামে কথিত। সঞ্চিত ও আগামী কর্ম : ফলভোগ বা বিরোধী কর্মান্তর বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। আর শুধু ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় ঘটে। কর্মতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বাহুল্য। প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে পঞ্চক্লেশ বলে। অনাদি অবিদ্যা কার্যরূপে ও কারণরূপে দ্বিবিধ নিরূপিত হয়। অহংকারের সূক্ষ্মাবস্থাই অস্মিতা। এই মহৎ তত্ত্বকে সামান্য অহংকার বলা হয়। রাগ শব্দের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বেষকে ক্রোধ বলে। স্বীকৃত বিষয়ের পুনস্ত্যাগে অসহিষ্ণুতাই অভিনিবেশ। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে এই পঞ্চক্লেশ চিরতরে নিবৃত্ত হয়। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে সর্বপাশ ও সর্বপাপ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। পঞ্চক্লেশই পঞ্চপাশ সৃষ্টি করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই পঞ্চপাশকে জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশরূপে বর্ণনা করিতেন। উক্ত প্রকারে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি বিবৃত হয়।

পঞ্চীকৃত মহাভূতকে স্থূলভূত বলে। পূর্বোক্ত আকাশাদির তামস অংশসমূহের এক একটিকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে একভাগকে পুনরায় চারিভাগে ভাগান্তে স্বীয় অংশ পরিত্যাগপূর্বক অন্য অংশের সহিত সংযোজনকে পঞ্চীকরণ বলে। তন্মধ্যে পৃথ্বী মল-মাংস-মনরূপে, জল মূত্র-লোহিত-প্রাণরূপে এবং তেজ অস্থি-মজ্জা-বাক্‌রূপে পরিণত হয়। ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ বা ত্রিবা ভাগ বলে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতিতে আছে, "ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকং করবাণি"। ত্রিবৃৎকরণে পঞ্চীকরণ উপলক্ষিত বলিয়া পঞ্চীকরণই যুক্তিসিদ্ধ, প্রামাণিক। উক্তরূপে আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়।

পঞ্চীকৃত পৃথিবী হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। চৌদ্দলোক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী। ব্রহ্মাণ্ড হইতে শতবিধ মনুষ্য ও প্রাণী জাত হয়। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তী পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ এবং ওষধিসমূহ হইতে স্থূল অন্ন উৎপন্ন হয়। পিতামাতাকর্তৃক ভুক্তান্ন পরিপাকের ফলভূত শুক্র ও শোণিত দ্বারা স্থূল দেহ জন্মে। স্থূল শরীর চতুর্বিধ : জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজাত। পক্ষী ও পন্নগাদির শরীর অণ্ডজাত। যূকা ও মশকাদির শরীর স্বেদজাত। তৃণ গুল্মাদির শরীর উদ্ভিজ্জাত।

উল্লিখিত স্থূল শরীর পুনরায় প্রকারান্তরে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও তৎকার্য, অথবা ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তী কার্যসমূহকে সমষ্টি স্থূল শরীর বলা হয়। ব্যষ্টি গাভীসমূহে গোত্বাদিবৎ সর্বব্যষ্টিতে পঞ্চীকৃত ভূতকার্য ব্রহ্মাণ্ডাত্মক ব্যাপকসমষ্টি ওতপ্রোত। যেমন বৃক্ষসমষ্টিকে বন বলে, তদ্রূপ স্থূল শরীরসমুদায়কে সমষ্টি স্থূল শরীর বলা হয়। উল্লিখিত উপাধিযুক্ত চৈতন্যই বিবিধপ্রকারে বিদ্যমান ও সর্বনরাভিমানী বলিয়া বিরাট বৈশ্বানর নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক স্থূল শরীর গবাদি ব্যক্তিবৎ ব্যাবৃত্ত হওয়ায় ব্যষ্টি নামে উক্ত হয়। এই উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে বিশ্ব বলে ; কারণ সূক্ষ্ম শরীরকে পরিত্যাগ না করিয়া ইহা স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল শরীরের তাদাত্ম্য সামান্য ও বিশেষবৎ নিশ্চিত হওয়ায় তৎতৎ উপাধিযুক্ত বিশ্ব ও বৈশ্বানরের তাদাত্ম্য সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত।

একই জীব জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবিদ্যার অভিমানী হইয়া বিশ্ব নামে উক্ত এবং স্বাপ্ন অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের কারণ-স্বরূপ অবিদ্যাভিমানী হইয়া তৈজস নামে কথিত। সেই জীব সুষুপ্ত অবস্থায় কারণাবিদ্যায় অভিমানী হইয়া প্রাজ্ঞ নাম ধারণ করেন। তিনিই ত্রিবিধ শরীরে অভিমানরহিত হইলে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমাত্মা হন। পূর্বে এই পরমাত্মা অবিদ্যাযুক্ত ছিলেন, অধুনা অবিদ্যামুক্ত হইলেন। এই দুইকালে তিনি স্বরূপতঃ অপরিবর্তিত, অবিকৃত।

অবিদ্যা অভিমানী জীব এই পঞ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা ও মরণ। জাগ্রৎ অবস্থায় দিগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কর্তৃক অনুগৃহীত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা শব্দাদি বিষয় অনুভূত হয়। স্বাপ্ন অবস্থায় জাগ্রৎ ভোগপ্রদ কর্মসমূহ উপরত হইলে ইন্দ্রিয়োপরমের ফলে জাগ্রৎ জ্ঞানজাত সংস্কারোদ্ভূত বিষয় ও তৎজ্ঞান সক্রিয় হয়। জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন উভয় অবস্থায় ভোগপ্রদ কর্মোপরম হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরাভিমান নিবৃত্ত হয়। তখন বিশেষ বিজ্ঞানের উপরমাত্মিকা বুদ্ধির কারণরূপে অবস্থিতি ঘটে। ইহাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে সুখবোধ বিরাজমান। সুপ্তিভঙ্গে এই সুখস্মৃতি অনুভূত হয়। মুদ্গরের প্রহারাদিজনিত বিষাদ বা বেদনা দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের উপরমাবস্থাকে মূর্ছা বলে। উক্ত অবস্থায় অর্ধজ্ঞান তিরোহিত ও অর্ধজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। এই শরীরে ভোগপ্রাপক কর্মোপরম দ্বারা বিবিধ দেহাভিমান নিবৃত্ত হইলে ভাবী শরীর প্রাপ্তি পর্যন্ত সঞ্চিত করণগ্রামের যে

অবস্থা তাহাই মরণাবস্থা। মৃত্যুকালে সর্বেন্দ্রিয় একীভূত হয়। কেহ কেহ মরণাবস্থাকে উল্লিখিত অবস্থাচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে প্রসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়।

একই পরমাত্মা সমষ্টি স্থূলশরীর ও সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর এবং উভয়ের কারণ মায়ারূপ ত্রয়োপাধিযুক্ত হইয়া বৈশ্বানর নামে অভিহিত হয়। আমিই বৈশ্বানর—এই উপাসনা দ্বারা বৈশ্বানরত্ব-প্রাপ্তি ফল লাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রের বৈশ্বানরাধিকরণে সূত্রকার ব্যাসদেব ও ভাষ্যকার শংকরাচার্য উভয় কর্তৃক উক্তরূপ শ্রুত্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই পরমাত্মা সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীর ও তৎকারণ মায়ারূপ ত্রয়োপাধিযুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হন। উক্তরূপ উপাসনাদ্বারা তৎপ্রাপ্তি ফললাভ হয়। উক্ত গ্রন্থের অন্তর উপপত্তি হেতু অধিকরণে সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয় কর্তৃক তাহার প্রতিপাদন উপকোশল বিদ্যায় দেখা যায়। সেই পরমাত্মা কেবল মায়ারূপ উপাধিমণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর নামে উক্ত হন। ঈশ্বরোপাসনার ফলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মসূত্রের শাণ্ডিল্যবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় সূত্রকার ও ভাষ্যকার কর্তৃক ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে, 'তং যথা যথোপাসতে তৎ তদেব ভবতি'। ইহার অর্থ, তাঁহাকে যে-যে ভাবে উপাসনা করা হয় তৎ-তৎ স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। আলোচ্য বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সরল উপদেশ ও উপমা অতিশয় উপযোগী।—'যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়'। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। ইহার অর্থ—যে, যে প্রকারে বা যে উদ্দেশ্যে আমার প্রপন্ন হয় আমি তাহাকে সেই সেই ফল দান দ্বারা অনুগৃহীত করি।

ভাবনামাহাত্ম্যহেতু ঈশ্বর-প্রাপ্তির এইরূপ তারতম্য হয়: সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য। বৈষ্ণবদর্শনে এই চারিপ্রকার মুক্তি স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সামশ্রুতিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, যতি শেষে জ্ঞানবলে সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন। পুনরায় যাঁহারা সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, বিচারে অসমর্থ ও মন্দ-প্রজ্ঞ তাঁহারা গুরুমুখ হইতে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ ব্রহ্ম আমি হই'—এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা এই শরীরেই জীবিত অবস্থায় অথবা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ও তৎফলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। শ্রুতিপ্রস্থানে ও ন্যায়প্রস্থানে এই ব্রহ্মতত্ত্ব সমভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্মগুরু মহাবীর

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ

বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডনগরে জৈন ধর্মগুরু মহাবীর আবির্ভূত হন। ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞাতৃকগণের একটি প্রসিদ্ধ স্থান বৈশালী ছিল বলিয়া মহাবীরকে বেশালী বা বৈশালিকা বলা হইত, ইহার অর্থ বৈশালীর নাগরিক। বয়সে তিনি বুদ্ধদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন, সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্ঞানে, নিষ্ঠায়, চরিত্রমাধুর্যে তিনি অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় শিক্ষাগুরু, চিন্তাজগতের একজন অবিসংবাদী নেতা, লোকপ্রিয়, জনরঞ্জন, বহু গৃহী ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির শ্রদ্ধাপাত্র।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্বে জৈন ধর্মপ্রচারক মহাবীর এ নশ্বর মর্ত্যলোক হইতে অপ্রকট হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনালেখ্যের সহিত তাঁহার জীবনচরিতের বহু স্থানে সৌসাদৃশ্য মিলিয়াছে। মহাজ্ঞানী মহাবীরকে জ্ঞাতৃপুত্র বলা হইত অর্থাৎ জ্ঞাতৃ বংশের উজ্জ্বল বংশধর। (তিনি শাসন-নায়ক নামেও অভিহিত হইতেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, শ্রেণী-নায়ক)। জৈনসাহিত্যমতে, তিনি একজন মহান্ ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ অভিভাবক, পরম শক্তিমান পুরুষ, প্রসিদ্ধ প্রচারক। সুমহান্ জন-গুরু, উপদেষ্টা, জ্ঞান-গুরু, পরিচালক (Pilot) এবং অসাধারণ ব্যক্তিরূপেও জৈনসাহিত্যে তিনি বিবৃত হইয়াছেন। বহুসংখ্যক শিষ্য পরিবৃত হইয়া তিনি ধর্মজ্ঞান প্রচার করিতেন, বহু গৃহী ভক্তকে, অসংখ্য নরনারীকে উপদেশ ও তত্ত্বজ্ঞান দিতেন। যে সম্প্রদায়ের তিনি পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্মগুরু ও নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে প্রবীন, জ্ঞানবৃদ্ধ কষ্টসহিষ্ণু সন্ন্যাসী বলিয়া পূজা

ও সন্ধান করিয়া আসিয়াছেন। সকল প্রকার পাপ হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন, সর্বপ্রকার পাপ ও অন্যায় হইতে তিনি সংযত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার পাপ বিধৌত করিয়া তিনি নির্মল জীবন কাটাইয়া এক জ্যোতির্ময় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

॥ কৃচ্ছ্রসাধন ॥

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাবীর যশোদা নাম্নী একজন ক্ষত্রিয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কৌণ্ডিন্য গোত্রসম্ভূতা, তাঁহার গর্ভে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম অনবদ্যা বা অনোজ্জা, কেহ বলেন প্রিয়দর্শনা। অনবদ্যার বিবাহ হয় যমালী নামক একজন ক্ষত্রিয়ের সহিত। ত্রয়োদশ বৎসরে মহাবীরের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রেম ও মৈত্রী প্রচারের উদ্দেশ্যে এক সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহির্গত হন। দ্বাদশ বর্ষকাল কৃচ্ছ্রসাধন ও অনুধ্যানের পর তিনি লাভ করিলেন দিব্যদৃষ্টি, হইলেন সর্বজ্ঞ, তখন তাঁহার বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর মাত্র। অনন্তর তিনি উত্তর ভারতে ত্রিশ বৎসরকাল যাবৎ তাঁহার নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগের এক বৎসর এক মাসকাল যাবৎ তিনি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার পর তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইলেন। যখন তিনি পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তখনও তিনি উহা মাত্র শীতকালে পরিধান করিতেন। চারি মাস কালের উপর তাঁহার দেহের উপরে বহু প্রাণী ঘুরিয়া বেড়াইত ও তাঁহাকে কষ্ট দিত। তিনি নারী সাহচর্য বর্জন করিয়াছিলেন, অনেক গৃহস্থকেও বর্জন করিয়া দেশমধ্যে ভ্রমণ করিলেন। সামাজিক আমোদ-প্রমোদ পরিহারপূর্বক সাংসারিক বিষয়ে চক্ষু ও মন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের উপর তিনি শীতল জল ব্যবহার করেন নাই, তিনি নির্জনতা উপলব্ধি করিতেন, আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হইয়া থাকিতেন। ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও ক্ষতি করিতেন না, অপরের পোষাক পরিতেন না বা অপরের পাত্র হইতে আহার করিতেন না। পানাহারে তাঁহার সংযম ছিল। তিনি পরিচ্ছন্ন আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। দিবারাত্র তিনি ধ্যান করিতেন। তখন কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না, তখন তিনি থাকিতেন উদ্বেগবর্জিত। কঠোর সাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন, আরাম উপভোগ বা আনন্দলাভের জন্য যে তিনি নিদ্রা যাইতেন তাহা নহে, অতি অল্প নিদ্রা তাঁহার ছিল, তাহাও চিন্তা বা আসক্তি-বিবর্জিত।

তিনি শান্তির সহিত সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেন। ভয়াবহ বিপদ ও বিবিধ মানসিক ভাব তিনি সংযমের সহিত সহ্য করিতে পারিতেন। পরিভ্রমণকালে তাঁহার প্রায় বাক্যস্ফুরণ হইত না। সম্পূর্ণ সমুন্নত-হৃদয় ছিলেন বলিয়া পল্লীবাসীর গ্রাম্যভাষা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। আহত হইলে বা না হইলে তিনি চিকিৎসা বাসনা করিতেন না। শীতকালে তিনি ছায়ানিম্নে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। গ্রীষ্ম ঋতুতে তিনি রৌদ্রে বসিতেন।

আত্মনিগ্রহ ছিল যেন ধর্মস্বরূপ। তিনি সাধারণ ও সামান্য খাদ্যের উপরে জীবিত ছিলেন। তিন প্রকার খাদ্য দ্বারা আট মাস তিনি জীবিকানির্বাহ করিতেন—ভাত, তিনি ও আটা দ্বারা প্রস্তুত লড্ডুক 'গুঁড়া'জুজুব (Jujubs)। কখন অর্ধমাস কখন বা পুরা এক মাস তিনি জলপান করিতেন না। কখন কখন তিনি বাসি খাদ্য আহারে অভ্যস্ত থাকিতেন। তিনি নিজে কোন পাপ করেন নাই, অপর কাহাকেও করিতে বলেন নাই, অপরের পাপকার্যে কোন সম্মতি দেন নাই। তিনি নিষ্ঠার সহিত ধীরভাবে ধ্যান করিতেন। ধ্যানের সময় তিনি থাকিতেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, শব্দ ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া, শব্দ ও বর্ণের বিভেদজ্ঞান তখন থাকিত না; সত্য উপলব্ধি করিয়া আত্মার নির্মলতা লাভ উদ্দেশ্যে তিনি মনোভাব দমন করিয়া, সংসারবন্ধন মোচন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কৈবল্যলাভের সময় মহাবীর গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। প্রায় আড়াই দিন অনশনের পর তিনি উপবিষ্ট হইলেন চরণযুক্ত করিয়া, সূর্যাতপ উপেক্ষা করিয়া। সেইসময়ে তিনি জল-গ্রহণও করেন নাই। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি 'জিন' হন, জিনের অর্থ বিজয়ী, তিনি অর্হৎ অর্থাৎ সাধু হইলেন, তিনি কেবলী হইলেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি জানিলেন ও দেখিলেন দেবতা, মনুষ্য ও অসুরের সর্ব অবস্থা ও সর্ব লোক।

যে ত্রিশ বৎসর ধর্মপ্রচারক হিসাবে কাটাইয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনি চারি বৎসর অতি-বাহিত করেন বৈশালী ও বণিজ গ্রামে। এই বণিজ গ্রামটি বৈশালী নগরের উপকণ্ঠে বর্তমান মজঃফরপুর জেলায় বেশার নামক স্থানে। চৌদ্দ বৎসর রাজগৃহ ও নালন্দায়, ছয় বৎসর মিথিলায় তিনি ধর্মপ্রচার করেন। আরও জানা গিয়াছে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাবীর জিন ভত্রিকা নামক স্থানে দুই বৎসর ধর্মপ্রচারকল্পে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল, বর্তমান-কালে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর জেলা ও সম্ভবতঃ মুঙ্গের জেলা লইয়া সে সময়ে অঙ্গরাজ্য মধ্যে ইহা বিস্তৃত ছিল। উত্তরপ্রদেশ মধ্যে উনাও নামক জেলার নাবল তৎকালে আলভী বা আলভিকা নামে কথিত ছিল; সে স্থানেও মহাবীর এক বৎসরকাল স্থানীয় দেশবাসীকে ধর্মকথা শ্রবণ করান। এইভাবে তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র সুপ্রচারিত হয়। অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ তাঁহার কথামৃত শ্রবণে মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইতে চাহিলে, তিনি স্থানত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন করিয়া সকলের প্রাণে জ্ঞানের আলোক জ্বালান। অনন্তর রাঢ়া বিভাগে বজ্রভূমির একটি স্থানে প্রশ্নীভাভূমি নামক জনপদে এক বৎসর যাবৎ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। ইহাতেও আত্ম-প্রসাদ লাভ না করিয়া তিনি শ্রাবস্তী গমন করেন। রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তটে সাহেৎ মাহেৎ তৎকালে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরী শ্রাবস্তী নামে পরিচিত ছিল। প্রতি বর্ষাঋতু পূর্বোক্ত স্থানগুলিতে অতিবাহিত করিয়া শেষ বর্ষাঋতু জনকল্যাণ-সাধক ধর্মাত্মা মহাবীর পাবা নগরে অতিবাহিত করেন। এই পাবা-পুরী একটি পবিত্র স্থান। বৈশালী হইতে কুশীনারা পর্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে তাহার প্রায় মধ্যপথে ইহা অবস্থিত। গোরক্ষপুর জেলায় কসিয়া গ্রামটিই

প্রাচীনকালে কুণ্ডীনারা নামে বিদিত ছিল। পূর্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথটি কুণ্ডীনারা হইয়া কপিলাবাস্তু পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—ঐ কপিলাবাস্তুতে প্রাচীন লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যমুনির জন্ম-লাভের ঐতিহ্যগর্বিত কাহিনী প্রচলিত।

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার পর বিয়াল্লিশটি বর্ষাঋতু তিনি কোন্ কোন্ স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ 'কল্পসূত্রে' দেখা যায়। এই পুণ্যভূমি পাবা-পুরীতে রাজা হস্তীপালের কার্যালয়ে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। মহাবীর জ্ঞানযোগে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

॥ শিষ্য গ্রহণ ও ধর্মপ্রচার ॥

মহাবীর তাঁহার জীবদ্দশায় বহু শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌদ্দ হাজার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন—ইন্দ্রভূতি ছিলেন তাঁহাদের প্রধান নায়ক; এবং ছত্রিশ হাজার সন্ন্যাসিনী ছিলেন যাঁহাদের প্রধানা হইয়াছিলেন চন্দনা। শঙ্খশতকপ্রমুখ বহু গৃহী শিষ্যও তাঁহার পরিদৃষ্ট হইত। বহুসংখ্যক শিষ্যার মধ্যে যাঁহারা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম সুলসা এবং রেবতী। ধর্মগুরু মহাবীরের নিকট-ভক্তগণের মধ্যে এগার জনকে বলা হইত গন্ধর্বপ্রধান শিষ্য, যাঁহাদের অগণিত ভক্ত ছিলেন, ধর্মপ্রচারবশতঃ তাঁহারা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উপদেশ দিয়া, নির্দেশ দিয়া তাঁহারা নয় প্রকার পৃথক শ্রেণীর জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞান-গুরু মহাবীর শিষ্যদের ধর্মপুস্তক (পূর্ব) পাঠ করিতে উপদেশ দিতেন যাহার ফলে বিচার-শক্তি ও তর্কপ্রবণতা বর্ধিত হইবে। তিনি গৃহীরূপে ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন, বার বৎসরের অধিক কাল অত্যুৎকর্ষলাভের পূর্বতন অপরিণত অবস্থায় ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল যাবৎ তিনি কেবলিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপরিসীম জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হন। বিয়াল্লিশ বৎসর তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীজীবন কাটাইয়া বায়াত্তর বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন।

ধর্মপ্রাণ মহাবীরের নির্বাণপ্রাপ্তি বা জ্ঞানলাভের সন জৈনগণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দ। ঐ সালেই তিনি কেবলী হন, তাহা হইলে তিনি ৫৭০ খৃঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতে হইবে এবং এতদনুসারে তাঁহার তিরোধানের সময় নির্ধারিত হইয়াছে ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ।

॥ ধর্মমত ॥

মহামতি মহাবীর ছিলেন মানবজাতির একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতা। তিনি এমনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন যাঁহার দ্বারা উন্নতিকামী মানবজাতির সম্পূর্ণতা লাভ একটি কঠিন

সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে এই সমস্যাই সর্বোচ্চ সমস্যারূপে প্রতিভাত হয়। নিজে যাহা পালন করেন নাই তাহা তিনি প্রচার করিতেন না। তাঁহার নিকট সমগ্র সত্তার পরমানন্দময় অবস্থা ছিল জীবনের লক্ষ্য। এই অবস্থা, তাঁহার মতে, প্রাপ্ত হওয়া যাইবে নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা—ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, মনুষ্যত্ব, অনুকম্পা, অপরের প্রতি বিবেচনা-বোধ। জৈনধর্ম অনুসারে, তিনি বলিতেন: দুঃখভোগ, স্বার্থত্যাগ, প্রেম ও দয়া মনুষ্যত্ব-বিকাশের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাঁহার ধর্মের মহামন্ত্র এই উপদেশের মধ্যে নিহিত আছে—জন্ম কিছু নয়, জাতি কিছু নয়, কর্মই আসল; কর্মের ক্ষয় হইলে ভবিষ্যতে শান্তি পাওয়া যাইবে।

উন্নত জীবনের প্রথম নীতি অহিংসা। এই অহিংসা-ধর্ম মহাবীর শিষ্য ও অনুরক্তবর্গের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল তিনি জীবজন্তুর মধ্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবজাতির সদাশয় প্রীতি-মধুর ব্যবহার, অহিংস আচরণ ও অনুকম্পার নিকট বিহগকুল, জন্তু, সরীসৃপ ও মৎস্যজাতি সকলেই হৃষ্টচিত্তে ধরা দিত।

জৈন ধর্মবীর বর্ধমানের (মহাবীর) ধর্মনীতির আর একটি উজ্জ্বল দিক এই ছিল যে, তিনি সর্বভূতে সমজ্ঞান করিতেন, কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেন না। নরনারী পার্থক্য তাঁহার নিকট ছিল না। পুরুষের জন্য একপ্রকার নীতি, নারীর জন্য অন্য প্রকার নীতি তিনি সৃষ্টি করেন নাই। ত্যাগী সন্ন্যাসীই হউক, গৃহী শিষ্যই হউক ধর্ম-আচরণ সকলের পক্ষে সমতুল্য ছিল। এ বিষয়ে উদারনীতি জৈনধর্মের মূলমন্ত্র বলিতে হইবে। পরিভ্রমণকালে নরনারী তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন।

জৈনধর্ম ভারতবর্ষে একটি প্রাচীন ধর্ম। এই একটি সর্বপ্রিয় ধর্ম, যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্বকাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর মধ্যে মহাবীর শেষ ধর্মপ্রচারক। তাঁহাকে বর্ধমানও বলা হইত, কারণ তাঁহার জন্মের সহিত তদ্বংশের যশঃ, অর্থ, সুনাম ও গুণাবলী বর্ধিত হইতে থাকে। তিনি যে বংশে ইহধামে আবির্ভূত হন তাহা ক্ষত্রিয় বংশ। তিনি শ্রেয়াংশ সিদ্ধার্থ তনয়। তিনি যাঁহার পুত্র তাঁহার আর একটি নাম যশাংশ। তাঁহার জননীর নাম ত্রিশলা। তিনি ক্ষত্রিয়ানী, বশিষ্ঠগোত্রসম্ভবা। তাঁহারও অপর নাম বিদেহদত্তা ও প্রিয়কারিনী। বর্ধমান-মহাবীরের জননী ছিলেন বিদেহ দেশের শেতকের ভগ্নী। মহাবীরের মাতাপিতা জ্ঞাতৃক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, পার্শ্বনাথের উপাসক এবং গৃহী হইলেও ধর্মপ্রাণ ছিলেন।

যাঁহারা ধর্মপথ প্রদর্শন করেন, জ্ঞানের মত প্রচার করেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর। ধর্ম অর্থে নৈতিক ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, আত্মার উন্নতিকামী ধর্ম। তীর্থঙ্করগণ সৎ-মার্গ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত, কেবল-জ্ঞান-প্রাপ্ত, তাঁহারা জিন নামেও অভিহিত। যে প্রচলিত ধর্ম মধ্যে মধ্যে অধোগতিপ্রাপ্ত হইত, তাহার পুনরুদ্ধার করা ছিল তীর্থঙ্করগণের মহৎ ব্রত, পরম কার্য ও চরম সাধনা। এইজন্য তাঁহারা ধর্মপ্রচারক, কর্মবীর, পূজ্যপাদ সাধক।

মহাপ্রাণ মহাবীর ব্যবহারিক ধর্ম হিসাবে কর্ম দ্বারা উৎপন্ন অপবিত্রতা বা কলুষ পরিবর্জন করিতে জৈনধর্মমধ্যে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন।

এই বিশাল ভারতভূমির বিভিন্ন স্থানে জৈন মন্দিরগুলি এখনও সগৌরবে বিদ্যমান আছে। জৈনগণের মতে পর পর চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁহারা ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তীর্থঙ্কর বলিতে ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ বুঝায়। শেষ দুইজন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। স্বনামধন্য পার্শ্বনাথ কাশীর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্যমদে অভিভূত হন নাই। ধর্মপ্রচার, নিষ্ঠা-প্রতিপালন, সচ্চিন্তা ও সৎকর্ম দ্বারা তিনি যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল অনির্বাণ থাকিবে। অশেষগুণভূষিত পার্শ্বনাথই জৈন সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল—অহিংসা, সত্য, অ-চৌর্য ও অপরিগ্রহ। এই চারিটি ধর্মবীজ চতুর্যাম নামে বিখ্যাত। এই কয়টি মোক্ষবীজ—এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই চারিটির সাধন জৈনধর্মের সার সঙ্কলন।

পার্শ্বনাথের নির্বাণলাভ হইয়াছিল বিহার প্রদেশের উচ্চতম পর্বত পরেশনাথ পাহাড়ে। ধর্মপ্রাণ পার্শ্বনাথের পরবর্তীকালে যে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয়, তিনিই শুদ্ধিপ্রবর মহাবীর। মহাবীর স্বনামধন্য পরার্থপরায়ণ ধর্মযাজক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বর্ধমান। ধর্মগতপ্রাণ মহাবীরের জন্ম হয় বৈশালীর নিকট এক ক্ষত্রিয় বংশে। খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হইয়া ক্ষত্রকুলোদ্ভব বর্ধমান আজীবন ধর্মসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক হইলেও বর্ধমান সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বর্ধমান বা মহাবীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করিয়া জিন বা বিজয়ী নামে খ্যাত হন।

॥ ধর্মবিশ্বাস ॥

মহাবীরের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিগ্রন্থ বা গ্রন্থিশূন্য। বন্ধনশূন্য বা বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় প্রথমে হয়ত পরিধেয় বস্ত্রে বন্ধনহীন হইবার প্রবৃত্তি জন্মায়। মহাবীরের জিন উপাধি হইতে তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় উত্তরকালে জৈনসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

মহাবীর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক পূর্বোক্ত ধর্মপ্রচারক পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমাবধি উক্ত চতুর্যাম অনুসরণ করিতেন। পরে ঐ চতুর্যামের সহিত ব্রহ্মচর্য বা জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ সংযুক্ত করেন। এজন্য পঞ্চ প্রকার আদর্শ পরবর্তীকালে দেখা দিল। মহাবীর জৈনদের মধ্যে নিগ্রন্থ বা দিগম্বর সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। জৈনদের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুইটি প্রধান শাখা পরিদৃষ্ট হয়।

জৈনগণ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে চরম হিতকর আদর্শ এই, তাঁহারা শ্রুতিভেদ গ্রাহ্য করেন না। বেদগ্রন্থ যে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় ইহা তাঁহাদের ধারণার অতীত। তাঁহাদের ধর্মমত অনুসারে যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, সেইসকল জিন বা সিদ্ধপুরুষ অনন্তশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ঐ সকল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়, হিন্দুমতে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অনন্ত শক্তিবিকাশের ফল—নির্বাণ বা মোক্ষ। এই প্রকার জিন বা সিদ্ধপুরুষ দেবতা-পদবাচ্য, দেবতারূপে পূজ্য। তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রবর্তকগণও এইভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, অহিংসা ও ইন্দ্রিয় জয়ই ধর্মাচরণের অপরিহার্য পন্থা।

সুদীর্ঘকাল ধর্মপ্রচার করিয়া মহাবীর পাটনা জেলার পাবা-পুরী নামক স্থানে নির্বাণ লাভ করেন।

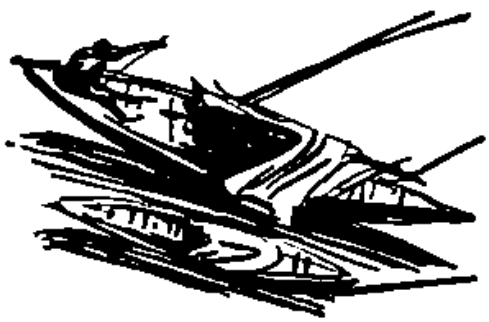

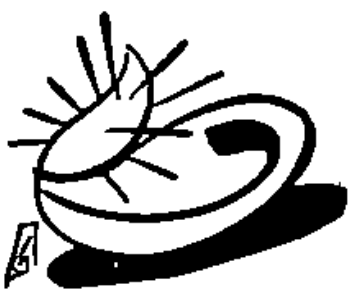

উদ্বোধন

শান্তশীল দাশ

সভ্যতার জয়রথ দ্রুতগতি চলে প্রতিদিন,
তবু ধরণীর বক্ষে জেগে ওঠে ক্ষুব্ধ হাহাকার ;
আতংকিত মানুষের ক্লান্ত রাত্রি কাটে নিদ্রাহীন,
সেদিকে তাকাই—দেখি অশ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, চারিধার।

বাহিরে অনেক আলো, দীপ্তি তার চক্ষু ঝলসায়,
সে-আলোর এক কণা পশেনাক' মনের গহনে ;
সেখানে নিবিড় বন—নগদন্ত সানন্দে শানায়
হিংস্র শ্বাপদের দল ; তাহাদের কে জিনিবে রণে !

ধ্বংসের নেশায় মত্ত ছদ্মবেশী এই বর্বরতা,
কবে তার শেষ হবে, শেষ হবে এই প্রবঞ্চনা !
কান পেতে শোন নাকি, নিপীড়িত কাঁদে মানবতা :
মারণাস্ত্র গড়ে' কভু হয়নাক' সভ্যতা রচনা।

থামাও ও রথচক্র ; ওর তলে অসংখ্য জীবন
নিয়ত নিষ্পিষ্ট হয় ; শোণিতাক্ত এই মৃত্তিকায়
ধ্বংসের বজ্রাগ্নিশিখা চিরতরে কর নির্বাপণ :
অস্ত্র নয়, প্রেমে হোক উদ্বোধন নব সভ্যতার।

আগ্নেয়গিরির কথা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ছিনু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি নেহাৎ নির্বিকার,
আমার অঙ্গে রচিয়া আলয় করিছ বাস ;
বোঝো না বেদন, ছেদিয়া শরীর করিছ অত্যাচার,
এতকাল পরে লবো প্রতিশোধ, করিব নাশ !
বক্ষ চিরিয়া দ্বিখণ্ড করি' প্রদানিলে মহাদুখ,
প্রতিফল তার পেতে হবে এবে সুনিশ্চয় ;
ক্ষোভে রোষে আজি ঘন ঘন তাই কাঁপিতেছে মোর বুক,
সর্বপ্রকারে হবে তোমাদের ক্ষতি ও ক্ষয় ।
গলিত উল্ক ধাতবদ্রব্য উগারিব দিনযামি,
জ্বলন্ত জ্বালা ভেঙে নিয়ে যাবে স্রোতের মতো ;
ঢের বাড়াবাড়ি করেছিস্ তোরা, হবি কার অনুগামী ?
অপমান করিতে করিব না আর ইতস্ততঃ ।
মেঘের মতন গর্জিব সদা ভীষণ শব্দ করি',
কাঁপাবো গগন, কাঁপাবো ভুবন একা ;
পোড়ায়ে ভস্ম করিব সকলি যাহা কিছু ছিলি গড়ি',
আপন জনেরে দেখে নে এখন শেষের দেখা ।
সব একাকার করিব এবার, গর্ব করিব চুর ;
প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করিস্ আগে !
রাগ-হিংসা ঘৃণা-বিদ্বেষ সকলি করিব দূর,
তা হ'লে যদিবা দেবতারা পুনঃ জাগে ।
অর্থের লোভ বাড়িয়াছে আজ অতি অযথা ভাবে !
নাশিছে সমাজ, বধিছে মানুষ কত !
কাড়াকাড়ি আজ করিছে সবাই, কে কার্ কাড়িয়া খাবে !
নাশিতে পাপীরে নিয়েছি পুণ্য ব্রত !
পাপীর চাইতে পাপীর সঙ্গী অধিক পাপীই বটে,
ততোধিক পাপী সহে যে অত্যাচার ; -
পাইকারী ভাবে ধ্বংসিতে সবে বুদ্ধি এসেছে ঘটে,
নূতন মানুষ আসিবে চমৎকার ।

ভারতের তীর্থদর্শনে : দিল্লী

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

●

ইন্দ্রপ্রস্থের এই হিন্দুসাম্রাজ্য দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক ইহা অধিকার করেন দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তরাও হোলকর সৈন্য সামন্ত লইয়া তদানীন্তন ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্ণেল অক্টরলোনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দিল্লী অধিকার করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মোগল বংশের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর মাধ্যমে বিদেশী ইংরাজের হাত হইতে দিল্লী উদ্ধার করিতে গিয়া পরিশেষে নিজেই তাহাদের হাতে বন্দী হইয়া নির্বাসিত হন। এখানেই মোগল সাম্রাজ্যের দীপ চিরতরে নির্বাপিত হইল। এইভাবে দিল্লীতে ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি ক্রমশঃই সুদৃঢ় হইয়াছিল। আধুনিক দিল্লী নগরীতে দেশীয় বড় বড় রাজা ও বাদশাহের নির্মিত সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদ, উচ্চ উচ্চ মীনার ও জয়স্তম্ভ বর্তমান দর্শকবৃন্দের অন্তরে যুগপৎ বিস্ময়, আনন্দ ও দুঃখের উদ্রেক করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাতেই আমরা দিল্লী-জংশন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম; তীর্থযাত্রা গাড়ী এখানেই থাকিবে। প্রকাণ্ড ষ্টেশন-ভবন ও দীর্ঘ প্ল্যাটফরমগুলি অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল করিতেছে। উৎসাহী সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকে এখনই নূতন দিল্লীর ঐ আলোর শোভা-দেখিতে বহির্গত হইল। ষ্টেশনের বাহিরে যাতায়াতের নানা রকম যানবাহনাদি থাকিলেও যাত্রীদের পক্ষে মোটর-রিক্সাতেই যাতায়াত বিশেষ সুবিধা; ভাড়াও কম। যাতায়াতের ভাড়া প্রথমে চুক্তি করিয়া লইতে হয়। পরদিন সকালে ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে যমুনায় স্নান করিলাম। দিল্লীতে যমুনায় স্নানার্থ এই একটি মাত্র বাঁধান ঘাট। কোন ধার্মিক ধনবান ব্যক্তি সম্প্রতি এই ঘাটটি নির্মাণ করাইয়াছেন। এটী বেশ প্রশস্ত। স্ত্রীলোকদিগের স্নানের পৃথক ব্যবস্থা এখানে আছে। তীরে স্নানার্থীদের বিশ্রামের

উপযুক্ত বড়-দালান ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির রহিয়াছে। উক্ত ঘাট হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'লালকিল্লা'। প্রতিদিন সকাল ৯টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত জনসাধারণকে কিল্লার ভিতরে যাইবার জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই আনার টিকিট লওয়া হয়। বড় ফটকের বাহিরেই টিকিট কিনিবার ব্যবস্থা আছে। কিল্লাটী লাল পাথরের বলিয়া ইহা লালকিল্লা নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র কিল্লাটীর আয়তন এক বর্গ মাইল। প্রাচীনকালে ইহার মধ্যে ১০।১২টী রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেগুলির অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি প্রধান প্রধান যে কয়েকটী অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। (এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় কিল্লা প্রভৃতি দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না।) কিল্লার সামনেই স্বাধীন ভারতের প্রতীক-চিহ্ন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। বহুদূর হইতে প্রথমে ইহার উপরেই দৃষ্টি পড়ে।

লালকিল্লার বাহিরে সুবিস্তীর্ণ ময়দান পার হইয়া দিল্লীর অন্যতম প্রাচীন প্রসিদ্ধ ভবন 'জুম্মা মস্‌জিদ'। ইহাও একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। বাদশাহ শাহজাহান এই মস্‌জিদের নির্মাতা। মস্‌জিদের চারিদিকে চারিটী বড় বড় ফটক আছে। পূর্ব দিকের ফটক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি সুন্দর। ১৪০০ বর্গগজ বিস্তৃত সুপ্রশস্ত উঠান সাদা ও কাল মর্মরে তৈয়ারী এবং এখানে ৫০০০ লোক একসঙ্গে বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারে। শ্বেতমর্মরের প্রধান মস্‌জিদ, অঙ্গনের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বে ১৩০ ফিট উচ্চ দুইটী শ্বেতমর্মরের মীনার রহিয়াছে। মস্‌জিদের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট জালীদার কক্ষ আছে। বাদশাহ শাহজাহান ইহার মধ্যে রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন হজরত মোহম্মদ সাহেবের ব্যবহৃত চর্মপাদুকা, তাঁহার পদচিহ্ন ও দাড়ির চুল। চর্মপাদুকা সুগন্ধিত দ্রব্যে ডুবান আছে। ৭ম শতাব্দীর হস্তলিখিত প্রাচীন কোরাণের এক 'প্রতি', ইমাম হুসেন ও হসনের লিখিত কোরাণের দুই 'প্রতি' এখানে রক্ষিত আছে। জুম্মা মস্‌জিদের নিকটেই অতি প্রাচীন জৈন মন্দির। অদূরে দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাজার চাঁদনী চৌক। লাল কিল্লার কিছুদূরে যমুনা তীরে রাজঘাট। এখানে রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থান। সমাধিবেদীর উপর লিখিত আছে "হে রাম"।

নূতন দিল্লীতে ধনকুবের বিড়লার নির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বিশেষ দর্শনীয় স্থান। সর্ববর্ণের দেব দর্শনের জন্য চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিড়লাজী মন্দিরটী নির্মাণ করান। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে প্রশস্ত বাগানের মধ্যে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম জীবজন্তুর বড় বড় মূর্তি নির্মিত রহিয়াছে। মন্দিরটী সর্বদাই দর্শকে পূর্ণ থাকে। মন্দিরের একদিকে গীতাভবন ও ধর্মশালা। অপর দিকে বুদ্ধদেবের মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অদূরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী। মন্দিরের সংলগ্ন সুন্দর বাগান এবং আগন্তুকদের বাসস্থান ও আহারাদির জন্য হোটেলের সুব্যবস্থা আছে। নূতন দিল্লীতে লাল পাথরের তৈয়ারী প্রকাণ্ড

রাষ্ট্রপতি-ভবন, সেক্রেটেরিয়েট ভবন ও সাদা পাথরের তৈয়ারী বিরাট পার্লিয়ামেন্ট হাউস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের বাসস্থানগুলিও দর্শনীয়। এখানেই রাজা বিরলার ভবন যেখানে গান্ধিজী বাস করিতেন। এই ভবনের পশ্চাদ্ভাগেই সেই স্মরণীয় ক্ষুদ্র উদ্যানটী—যেখানে মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার স্মরনার্থ একটি বেদী নির্মিত হইয়াছে। বেদীতে মহাত্মাজীর শেষবাণী "হে রাম" লিখিত রহিয়াছে।

আজমের গেটের নিকটে জয়পুরের বিদ্বান ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিশারদ রাজা সওয়াই জয়সিংহের নির্মিত স্মারক প্রসিদ্ধ বেধশালা বিশেষ দর্শনীয়। ইহা অনেক প্রাচীন হইলেও এখনও অনেক অংশ অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম 'সম্রাট যন্ত্র'। বর্তমানে 'জন্তর-মন্তর' নামে অভিহিত। গ্রহ উপগ্রহ সকলের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিবার জন্য নানারূপ যন্ত্রাদি এবং সময় নিরূপণের জন্য ছায়াযন্ত্র প্রভৃতি এখানে নির্মিত রহিয়াছে।

'ইণ্ডিয়া গেট', 'পুরাণা কিলা', 'লাল দরজা', 'প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ', 'কিলাকোণা' মস্‌জিদ, 'শের মন্জিল' 'কুতব মীনার', 'লালকোর্ট' দুর্গ, 'রায় পিথৌরা' দুর্গ, শেখ নিজামুদ্দীন ঔলিয়ার দরগাহ 'চৌষট্টি আম্বানী' ও মকবরা প্রভৃতি বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া দিল্লী জংশন ষ্টেশনে ফিরিলাম। (ভবিষ্যতে সুযোগ সুবিধা আসিলে দর্শনীয় স্থানগুলির ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।) অনেক সহ-তীর্থযাত্রী এখানে আমাদের তীর্থযাত্রা গাড়ীতে উঠিলেন। এখন সর্বসমেত আমাদের দলে ৬০ জন হইল। তীর্থযাত্রা গাড়ীতে ৭৫ জনের বসিবার মত জায়গা ছিল। যাই হউক, এখন আমরা রাত্রিকালের বিজলীবাতির শোভা দেখিতে দেখিতে মথুরা রওনা হইলাম। এখান হইতে মথুরাপুরী ৯০ মাইল।

॥ সংকলন ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th. September, 1894,
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

Pundit Bhudeb Kabiratna said :

Gentlemen—when the *Cha'tak* (skylark) is thirsty, it looks up for water at the clouds and clouds alone ; it scorns the ground and its muddy water shut up in its various reservoirs—rivers and lakes, seas and oceans. Nothing of the world is capable of satiating its thirst. Pretty much the same is the condition of India at the present day ; thirsty like the *Cha'tak* it cries out—'Let me have one drop of water to moisten my parched lips'. But alas ! nothing but the cool stream that flows from the fountain of spirituality, nothing but the living waters of Ever-lasting Life, will satiate the thirst of India. Many indeed are under the impression that India's regeneration is a question of political or economical reform, or depends on the development of its industrial or commercial resources. I may be permitted to say, gentlemen, that such a view argues a want of insight into the real nature of India's complaints. Nothing of the world is competent to heal her. It is only those, who like Swami Vivekananda soar high in the region of the clouds upon the bosom of the infinite heavens, those whose soul scorning the ground move about on the higher plane of spiritual truths, that can impart new life to our mother-country. The Swami is standing on that height where

clouds do roar and India, the *Cha'tak*, is filled with joy at the welcome sound, for the quenching of her thirst is now within a measurable distance of time. Would she have rejoiced if instead of teaching the Wisdom of Life, Vivekananda talked of politics, or discussed the commercial policy of the Government of India? If anything is a source of pride to the Hindu it is his religion, his philosophy of the Upanishads. But alas! we know not how to value this rich inheritance of our Aryan forefathers, and must wonder to find it prized by distant nations, who are entirely different from us in religion, manners, customs, institutions and national characteristics. I know no language—our vernacular is so imperfect as it seems to me—capable of expressing my sense of gratitude to such a people possessed of so large a heart, a people who has been liberal enough to place Hinduism above all other religions. Is it not a matter of national regret, and shame and mortification that we have no idea of the rich mine of priceless gems which is at our very door and need to be convinced of its existence by a people who live across deep seas and oceans in another clime, far far away.

The soil of mother India is proverbially fertile, but we know not how to profit by it; the British capitalist comes in, puts it under the plough, sows indigo or tea or coffee, and makes himself a master of untold wealth. As in the material so in the spiritual world. Our religion and philosophy lie neglected by the sons of the soil, strangers cultivate those fields and reap harvests so rich that the world stands astonished. We remain dumb driven cattle as before, behind all other nations in the race for spiritual life, and continue as ever to complain that our paternal government does not step in to help us in the race. To what a pitiable condition have we indeed been reduced? In olden times the holy sages could not go on with their religious exercises, their sacrifices, their holy meditations because the land knew no rest in consequence of the troubles caused by the *Rakshasas*; much the same was the condition of the land during the Mahomedan rule; but now that our father-land is in the enjoyment of peace under the beneficent sway of our English rulers, it is a matter of profound regret that the dead weight of national lethargy should stand in the way of spiritual culture and of national regeneration. With these remarks I am very happy to support the Resolution.

The Resolution was then put to the vote and carried unanimously.

RESOLUTION—III

The third Resolution was moved by Babu Saligram Singh. The Resolution ran as follows :

That this meeting requests the chairman to forward to Sreemat Vivekananda Swami, Dr. Barrows and Mr. Snell, copies of the foregoing Resolutions together with the following letter addressed to Swami Vivekananda.

To

SREEMAT VIVEKANANDA SWAMI

Dear Sir,

As Chairman of a large, representative and influential meeting of the Hindu inhabitants of Calcutta and the Suburbs, held in the Town Hall of Calcutta, on the 5th of September, 1894, I have the pleasure to convey to you the thanks of the local Hindu Community for your able representation of their religion at the Parliament of Religions that met at Chicago in September 1893.

The trouble and sacrifice you have incurred by your visit to America as a representative of Hindu Religion are profoundly appreciated by all whom you have done the honour to represent. But their special acknowledgements are due to you for the services you have renderded to the cause they hold so dear, their sacred Arya Dharma, by your speeches and your ready responses to the questions of inquirers. No exposition of the general principles of the Hindu Religion could, within the limits of a lecture, be more accurate and lucid than what you gave in your address to the Parliament of Religions on Tuesday, the 19th September, 1893. And your subsequent utterances on the same subject on other occasions have been equally clear and precise. It has been the misfortune of Hindus to have their religion misunderstood and misrepresented through ages, and therefore they cannot but feel specially grateful to one of them who has had the courage and the ability to speak the truth about it and dispel illusions, among the strange people, in a strange land, professing a different religion. Their thanks are due no less to the audiences and the organisers of meetings, who have received you so kindly,

given you opportunities for speaking, encouraged you in your work, and heard you in a patient and charitable spirit. Hinduism has, for the first time in its history, found a missionary, and by a rare good fortune it has found one so able and accomplished as yourself. Your fellow countrymen, fellow citizens and fellow Hindus feel that they would be wanting in an obvious duty if they did not convey to you their hearty sympathy and earnest gratitude for all your labours in spreading a true knowledge of their ancient faith. May God grant you strength and energy to carry on the good work you have began !

Yours faithfully
Sd. Peary Mohan Mookerjee
Chairman.

গ্রন্থ-সমালোচনা

গদাধর (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা কাহিনী) প্রথম খণ্ড। লেখক—অজাতশত্রু। উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদ-পট, সুন্দর বাঁধাই, ২৭০ পৃঃ মূল্য ৪'৫০ ন.প.। প্রকাশক—শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী, "কল্পতরু প্রকাশনী" ৮নং কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, সপের বাজার, বেহালা, কলিকাতা—৩৪।

বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র বাল্যজীবনের যে কিছু ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, প্রণেতা সেইগুলি পরম্পরাক্রমে বিন্যাসপূর্বক, অপূর্ব কল্পনা সহায়ে সুললিত ভাষায় কাহিনী বা গল্পের ছলে তাহাই উক্ত পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে রচনা-চাতুর্যে মনে হয় যে, ঘটনাগুলি যেন সত্য সত্যই আবার নূতন সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তক পাঠে পাঠকপাঠিকাবৃন্দ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন; সুতরাং ইহার বহুল প্রচারই আমাদের কাম্য।

—স্বামী দুর্গানন্দ

দেবতার ঠাকুরালী (সত্য ঘটনা)—শ্রীঅর্চনা পুরী। মূল্য এক টাকা। বোর্ড বাঁধাই: এক টাকা চারি আনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউরী, বীরভূম। প্রকাশিত—২৩শে মাঘ, ১৩৬৪, মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। পৃষ্ঠা—৯৯। প্রচ্ছদ পটে শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

অলক্ষ্যের দেবতা প্রতি ক্ষণে লক্ষ্যের সীমায় ধরা দিতে পারেন—যদি হৃদয়ের শুচিতা এবং আকুলতা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতা, ভক্তি এবং আন্তরিকতা থাকে—শ্রীঅর্চনাপুরীর এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে যে সত্য ঘটনাগুলি বিবৃত হয়েছে তাতে ঐ কথারই সত্যতা প্রমাণিত হয়। সাধারণ মানুষের আঙিনায় অমর্ত্যের লীলাচঞ্চল দেবতাটির এই যে ঠাকুরালী, যুক্তি, প্রমাণ,

বিজ্ঞানের অতীত লোকের এই লীলাবিলাস ঘটনাকে কল্পনার চেয়ে অলৌকিক করে তোলে, সে ঘটনাকে চাক্ষুষ করার শক্তি সকলের থাকে না; তাঁর কৃপাঙ্গৃহীত ভক্ত-প্রেমিক এর আস্বাদ পান। ভক্তদের মুখেই লেখিকা ঘটনাগুলি শুনেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন।

নানা ঘটনার কথা এখানে আছে, নানাস্থানের এবং নানা জনেরও। মধুপুর থেকে আরম্ভ করে মীরাট, মাদ্রাজ আর কোলকাতার মাণিকতলা এমন কি থাইবার পাশের কথাও আছে। দীন ভক্ত পরিবার থেকে আরম্ভ করে জমিদার শ্রী;··· অর্জ কক্স থেকে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ···কার কথা নেই? অর্থাৎ অভাজন থেকে আরম্ভ করে মহাজন অবধি কেউই ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত হন না, লেখিকা এই কথাই বলতে চেয়েছেন। ছোট বড় বহু ঘটনার মধ্যে অতি সাধারণ একটা হলো—কোলকাতার রাস্তায় মেডিকেল কলেজের ছাত্র, আনমনে চলছে, ট্যাক্সির ধাক্কায় ১০।১৫ হাত ছিটকে পড়ল ঘুরে, অশরণের শরণ নিল সে, দেখা গেল তার বিশেষ কিছু হয় নি। আর একটা—

লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক পুরোহিত, শীতের রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙতে মনে হলো, কে যেন বার বার তাঁর গায়ের লেপ টেনে নিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে দেখলেন স্বপ্ন;—শুনলেন ঠাকুরের নির্দেশ। ঠাকুর-ঘরে ছুটে এসে দেখেন সত্যিই সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণকে লেপ ঢাকা দিতে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন।

দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে "Fact is stranger than fiction" কথাটি লুকিয়ে রয়েছে। তবে যাঁরা জানেন, আর যাঁরা ঐ পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁদের কাছে গ্রন্থখানি দিগন্তপ্রসারিত করুণাপথের সন্ধান দেবে। আলোকের মধ্যে যাঁর আভাস পাই, বাতাসের মধ্যে পাই যাঁর স্পর্শ, নানাজনের জীবনে তিনিই নেমে এসেছেন কোন অতর্কিত মুহূর্তে—গ্রন্থ-পাঠান্তে এর একটা দিব্য আবাস পাঠকের মনকে ভরে তোলে।

সাহিত্যের দিক দিয়ে গ্রন্থখানির রচনাশৈলী রীতি-প্রকর্ষের ধারধার, সেদিকে লেখিকার খুব বেশী দৃষ্টি বা অভিপ্রায়ও ছিল না, তাই স্থানে স্থানে রসাভাসের সাক্ষাৎ মেলে।

৩৩ পৃঃ—"অবিশ্বাসের আঁধারে আজো মাণিক জ্বলে, ধরার ধূলিতে আজো দেখা যায় মাধবের শ্রীপদপঙ্কজ চিহ্ন"—আঁধারটা অবিশ্বাসের, ঠিক আছে; কিন্তু মাণিকটা কিসের? ঠিক অব্যবহিত পরেই ধরার ধূলি', ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়।

৬৩ পৃঃ—'ভক্তের ব্যথার ছবিই তাঁর টেলিভিশনে ধরা পড়ে'—ভগবান টেলিভিশনের কারবার করেন শুনলে মনটা ছোট হয়ে যায়।

৬৮ পৃঃ—"ছায়া ছাড়া রাত ছায়ালী স্বপ্নের রহস্যমেদুর কলকাতায়"—কথাগুলো বাজছে ভালই, কিন্তু 'ছায়া ছায়া রাত' কি রকম?

কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধিও চোখে পড়ল, কতগুলি মুদ্রাকরের নির্ঘাৎ, কিন্তু আর কয়েকটি বোধগম্য নয়। যথা—

২৯ পৃঃ 'স্তুতুরে'; অর্থাৎ 'র' ও 'ড়'

৪১ পৃঃ নিঙরে—চণ্ডীদাস লিখেছেন,—

'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি'—।

৬৪ পৃঃ সাতসায়র 'সেচা',—কথাটি 'সিঞ্চন' শব্দজ।

পরবর্তী সংস্করণে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি সংশোধিত হলে গ্রন্থের সৌন্দর্য বহুগুণে বর্ধিত হবে, এবং গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং রসমুগ্ধ পাঠক উভয়েরই মনোহরণ করবে নিঃসন্দেহে।

অ. ক. হ.

॥ সংঘ-বার্তা ॥

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা :

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকামতে আগামী ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৮ রবিবার হইতে ২১শে অক্টোবর মঙ্গলবার (সপ্তমী হইতে নবমী) এই তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী-প্রতিমায় যথাবিধানে পূজার্চনাদি ও ২২শে অক্টোবর বুধবার দশমী-বিহিত পূজাদি হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা :

২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৮ সোমবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতিমা যথাবিধানে পূজার্চনাদি হইবে।

স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব :

৭ই অক্টোবর ১৯৫৮, মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৯৩তম শুভ জন্মতিথি। তদুপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে উক্ত তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও তাঁহার বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, কীর্তন, কথকতা ও বক্তৃতাদি হইবে। উৎসবের বিস্তৃত কর্মসূচী ৭ই অক্টোবর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত থাকিবে। দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমেও স্বামিজীর জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় প্রতিপালিত হইবে।

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, গ্রন্থাগার, কলিকাতা

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(শনিবার, সন্ধ্যা ৭।০)

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ :

বিষয় : **ভারতবর্ষের অধিবাসী সমস্যা** (আলোকচিত্র সহযোগে)

বক্তা : অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, এম-এ., এফ. এন. আই.

২৭শে সেপ্টেম্বর :

বিষয় : **গিরীশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য**

বক্তা : ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১১ই অক্টোবর :

বিষয় : **ধর্ম ও সমাজ-জীবনে চিত্রকলা**

বক্তা : শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার :

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

বক্তা : পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,

সাংখ্য-বেদান্ত-ভক্তিতীর্থ।

প্রতি বুধবার :

কঠ-উপনিষদ (শঙ্করভাষ্যসহ)

বক্তা : পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ,

অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

প্রতি রবিবার :

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা :

সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি শনিবার, বৈকাল ৩টায় :

রামনাম-কীর্তন :

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা - স্বামী অভেদানন্দ

শারদীয়া সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৬৮

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী — কলিকাতা ॥

বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ কামনায়

আপনাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হউক !!!

ওঁ তৎ সৎ ওঁ !!! ওঁ শান্তি !!!

শ্রীশ্রী৺করুণাময়ী আশ্রম কর্তৃক প্রচারিত

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন

গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

উৎসব ও উপহার

জন্মদিনে, বিয়েতে, কিংবা যে-কোন পালা-পার্বণেই প্রিয়জনের হাতে শ্রেষ্ঠ উপহারটি তুলে দিতে আপনার ইচ্ছে করে। এসব দিনে ডানলপিলোর তৈরী কোন জিনিসের চেয়ে ভালো উপহার আর কি হ'তে পারে? আপনার যে বন্ধুটি প্রবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁকে একটি গদি আর বালিশ সম্বলিত ডানলপিলো ট্র্যাভেলিং কিট্ দিন; জন্মদিনে ডানলপিলোর সুন্দর একটি কুশন অথবা তাকিয়া দিতে পারেন। আর বিশেষ কোন উপলক্ষে যখন অভিনব এবং সুরুচিসম্মত কিছু দিতে চান তখন

ডানলপিলো তোশক ও বালিশই

সবচেয়ে চমৎকার উপহার।

DPC-90 BEN

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৬৫০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। দেবীদুর্গা	... ৩৮৩	
২। মাতৃসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৩৮৫	স্বামী দুর্গানন্দ
৩। শুদ্ধাভক্তি ও মুক্তি	... ৩৯১	স্বামী কল্যাণানন্দ
৪। তন্ত্রশাস্ত্র কি আধুনিক	... ৩৯৩	তন্ত্রকুলচূড়ামণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৫।	বৈদিক যুগে দেবতার মূর্তি	... ৩৯৭	অধ্যাপক অরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৬।	রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব	... ৪০১	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর, এম. এ.
৭।	জীবন্মুক্তি	... ৪১৭	স্বামী সুরূপানন্দ
৮।	ভারতীয় সঙ্গীতে নবযুগপ্রবর্তনে তানসেন	... ৪১৭	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শারদোৎসবে—

—আপনার মনের মত গিনি সোনার অলঙ্কার—

উত্তর কলিকাতার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

ঢাকার বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী

মহাপ্রভু স্বর্ণ শিল্পালয়

৭৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বে)

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	নব্যভারতের শিল্পচর্চা ও ই. বি. হ্যাভেল	৪২০	শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য
১০।	কৈলাসবাসিনীর আবির্ভাব	৪২৭	ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
১১।	বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও নাটক	৪৩১	অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১২।	আণবিক শক্তির গোড়ার কথা	৪৩৫	শ্রীসমরজিৎ কর

This is Bush at its best

PHONE - 55-4104

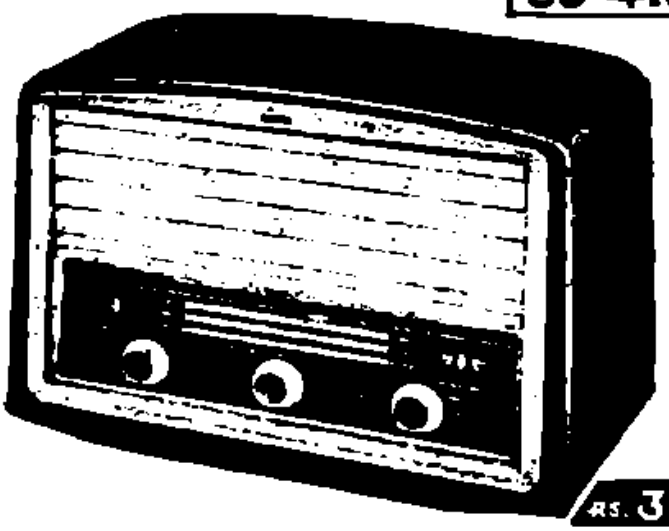

THE SYMBOL OF RELIABILITY

RS. 310/ NET

BE-50. & EU-50 AC/DC. 5 VALVE SUPERHET RECEIVER

UTILITY RADIO CO.

BUSH • SIEMENS • ELECTRIC GUITER & MUSICAL-INS.

82-3B, CORNWALLIS ST., CAL.-4

BIDHU BHUSAN DUTT & Co., (Private) LTD.

20, Maharsi Debandra Road

Calcutta-7. PHONE NO. 33-1626

Government Controlled Stockists—

Agents to : **TATA & IISCO**

All kinds of Galvanised Sheets and Black plain Sheets are always available from ready stock against authorisation and Permits.

Prompt and Special attentions are given to our Customers.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১৩। একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি	৪৩৯	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৪। বাঙ্গালীর জাতীয়তা-বোধ ও ভূদেব	৪৪১	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৫। দুর্গোৎসব (কবিতা)	৪৫৫	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী
১৬। কান্নার দাম (কবিতা)	৪৪৬	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্যালকেমিকোর

ক্যাম্বারাইডিন

হেয়ার অয়েল

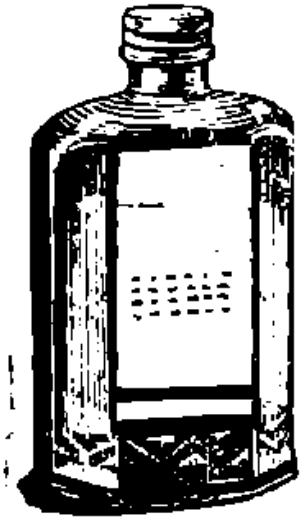

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল সংমিশ্রণে এবং ক্যাম্বারাইডিন্ সহযোগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুমধুর গন্ধে সুরভিত।

কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও মস্তিষ্কের নিবারক।

এজেন্ট সর্বত্র আবশ্যক পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোঃ লিঃ

কলিকাতা-১৪

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪-৩৭১১

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
১৭।	পঞ্চপথ (কবিতা)	... ৪৪৭	শ্রীকালিদাস রায়
১৮।	একটি উপদেশ (কবিতা)	... ৪৪৭	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত
১৯।	মায়া (কবিতা)	... ৪৪৭	শ্রীহর্ষিতকুমার সেন
২০।	পূজা (কবিতা)	... ৪৪৮	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
২১।	মায়ের বাণী : কবিতা)	... ৪৫০	শ্রীনবগোপাল সিংহ
২২।	নাটক-কথা	... ৪৫১	শ্রীবিনয় মন্ত্র
২৩।	বাংলার মেয়েদের দেওয়া আলপনা	... ৪৫৫	শ্রীহাসিরাশি দেবী
২৪।	নৃত্যনাট্য ও কথাকলি	... ৪৫৭	শ্রীমীরা মিত্র

জামসেদপুর—ব্রাঞ্চ

সূচীপত্র

২৫।	দেবীমাহাত্ম্যে অদ্বৈত তত্ত্ব	... ৪৬১	শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তীর্থ
২৬।	চলচ্চিত্রে সামাজিক দায়িত্ব	... ৪৬৭	শ্রীশঙ্করভূষণ দত্ত
২৭।	বৈষ্ণব সহজিয়া মত	... ৪৭৩	শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.
২৮।	বাংলা উপন্যাসের জন্মকথা	... ৪৭৭	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ.

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

৩২এ ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

পোঃ বক্স ঃ ৯৯৫ ফোন ঃ ব্যা ২২-১৫৩২ গ্রাম ঃ বিদ্যাসেবা

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, ছাপার কালী এবং বোর্ড ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ব্রাঞ্চ ঃ ৬৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।

ফোন ঃ ৩৪-৪৯৮৯

১৩৪।১৩৬ ও ১৬৭ নং ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মফঃস্বল ব্রাঞ্চ ঃ এলাহাবাদ, কটক, পাটনা, রাঁচি।

ইহাই আদি ও অকৃত্রিম

ASCHARYA MALAM CHEMICAL WORKS PRIVATE LTD
KADMTALA HOWRAH

বিশেষ ঔষধাবলী :—"আশ্চর্য্যমহাঘৃত"
নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সালসা অদ্বিতীয়
"লিভাভেমস্"
শিশুদিগের যকৃত ঘটিত পীড়ায় অব্যর্থ ফলপ্রদ।

অগস্ত্যকরধ্বজ

অল্পমূল্যে হৃদ্রোগিদের কথায় পরিণত সিদ্ধিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিভাজনের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সমধিক নির্ভরযোগ্য

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (১ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

মনের মতন
সুন্দর ও মজবুত
বই বাঁধান পেতে হলে
ভারত সরকার কর্তৃক
উচ্চপ্রশংসিত একমাত্র
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

খলিলুর রহমান এণ্ড কোং
১৬, পাটুয়ার বাগান লেন,
কলিকাতা—৯

উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
ডি. কে. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং
ডেকরেটার্স
পি-৪৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪
ফোন : ৫৫-১৪৩৩

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রম
কলিকাতা অফিস ও আউটডোর : ২৯এ, বিবেকানন্দ রোড : ফোন : ৩৩-৫২২০
টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" : হাসপাতাল—দত্তনগর, কলিকাতা-৩০ : ফোন : দমদম ১০৫
প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট : কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন।

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

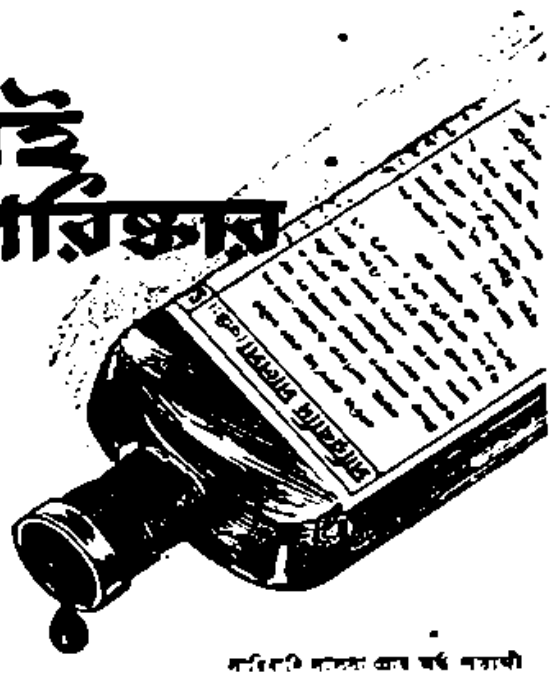

যে অবস্থা রোগের বিরুদ্ধে শরীর ও ক্ষতির পরিণতি হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তার পুষ্টিসাধন করে; তাই রক্তকে প্রথমেই প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন জটিল ব্যাধি আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা রক্তের দুষ্ট পরাশক্তি ধ্বংস করে সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠই রক্ত থেকে মারাত্মক বিষ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত ফোঁড় পরিষ্কার হয়, ঘোচে, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাত ও রক্তে অম্লীয় সাংঘাতিক সমস্ত বিষ ঘোচে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিরোরোগ চিরতরে আরোগ্য হয়, মুখ ও দৃষ্টি পরে এবং শরীরে প্রকৃত বিশুদ্ধ সুস্থ রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

স্বনামধন্য ডাক্তার ও কবিরাজ কর্তৃক প্রশংসিত

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

সকল ঔষধালয়ে ও এজেন্সী-সুবিধার জন্য

কলিকাতা অফিস—৩৫ নয়নচন্দ্র ঘোষ, ষ্ট্রীট (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-ভবনে। অথবা রোহিনীবাড়ী রোড, কলিকাতা-৩৭

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সবদিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোনো ত্রুটি থাকে তা হ'লে দয়া করে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

পি রায় এণ্ড ব্রাদার্স

সকল প্রকার রং
ও ইমারতি দ্রব্যের
নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬।৫ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর
—কুষ্ঠ—

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গায়ে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেতি

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় হতাশ্বাস হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২৩৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — কুষ্ঠিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল — বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ই ণ্ডি য়া ন

বুক বাইণ্ডিং এজেন্সী ..

৭২, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯

গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমরা সর্বপ্রকার বাঁধাই-এর
কাজ করিয়া আসিতেছি

নিয়মিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বিশ্বভারতী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড,
নতুন সাহিত্য ভবন, এম. সি. সরকার
অ্যাণ্ড সন্স লিঃ প্রভৃতি প্রকাশকগণের
বই এখানে বাঁধা হয়।

শর্ম্মা এণ্ড কোং

৬৬ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আধুনিক রুচিসম্মত ও সস্তায় জুতা
সরবরাহ করা হয়।

বোম্বাইয়ের
মেসার্স জে, জে, এণ্ড সন্স-এর
চশমা সকল সময়েই পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর. গরদ. মটকা
সিল্ক. টিস্ শাড়ী
জহরলাল
পান্নালাল
৯ লেডি ষ্টীট মার্কেট কলিকাতা
৩ গোধুলিয়া বেনারস অমৃতসহর

সকল প্রকার ছাপার কাজের জন্য

হিন্দ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩এ, গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

ডাক্তার **ইন্দুমাধব মল্লিক,** এম এ., এম্. ডি., বি. এল. আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন্ জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—**ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড,** ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

॥ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ॥

॥ গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সংগীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ॥

॥ বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

॥ ডিমাই সাইজে ছয়শত পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন অপ্রকাশিত ভাস্কর্য-চিত্র ॥

প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

॥ রাগ ও রূপ ॥

(১ম ভাগ)

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রয়াল সাইজ ৫৫০ পৃষ্ঠার অধিক, বহু চিত্র সম্বলিত।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (থিওরি) অংশ ও ৬ রাগ ও ৩০ রাগিনীর (হনুমন্মতে) সুবিস্তৃত পরিচয়, স্বরলিপি ও রাগ চিত্রসহ।

প্রাদেশিক সরকার অর্থ-সাহায্য করায় অল্প মূল্য : ৭।০ টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই।

মূল্য ৫৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷০

প্রাপ্তিস্থান—স্বামী শ্যামানন্দ (গ্রন্থকার)

১৯নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিরাট জীবনী অবলম্বনে রসসাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি

মুক্ত পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

কথাশিল্পের সুনিপুন তুলিকায় রূপায়িত করেছেন—

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

স্বামিজীর সমগ্র জীবনের সরল মধুর সুন্দর প্রকাশ।

এ'ধরণের পুস্তক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

সর্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকার সমান প্রিয় ও সমান চিত্তাকর্ষক।

মূল্য : টাকা ৫'০০

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

কথাপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)

সরলাবালা মিত্র

মূল্য : টাকা ৩'৫০

প্রাচ্য ভারতী

৩৮, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৪

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধিক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবন তথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে' সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

স্বনামধন্য মনীষী ও আচার্য্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

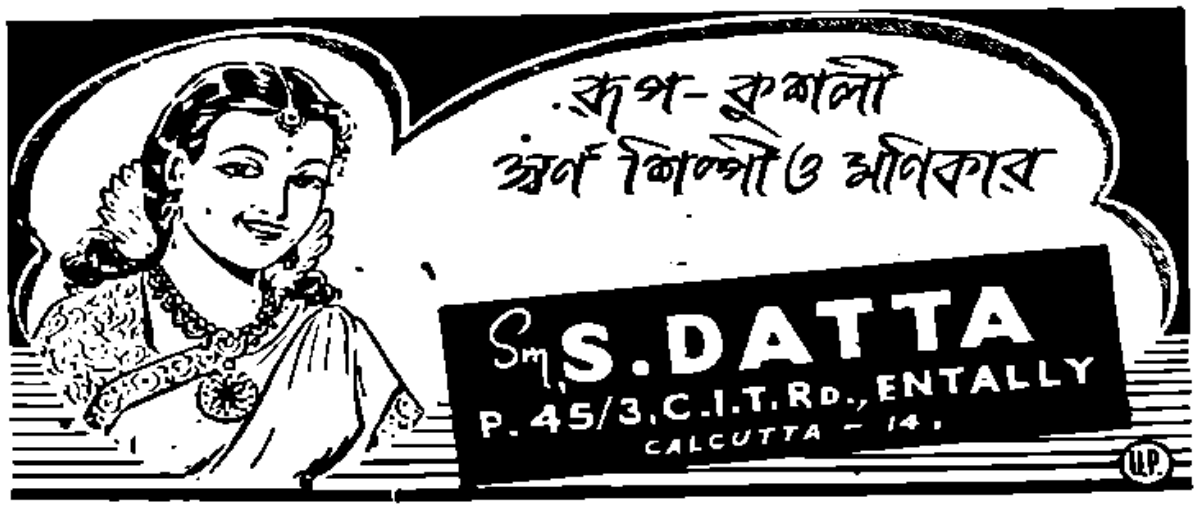

• মরণের পর মানুষের কি হয়, কোথায় যায়, কি অবস্থায় থাকে, মানুষের আত্মা থাকে কি থাকে না—এই সব জিজ্ঞাসা মানুষকে কোন্ আদিমকাল হতে যুগ যুগ ধরে ভাবিয়ে এসেছে। মানুষ-মনাজে যুক্তিশীল ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি জেগে উঠবার পরও নিবৃত্তি হয় নি সে কৌতূহলের। তাই মানুষ এখনও সেই অজানা কথা জানতে চায়, শুনতে চায়, বুঝতে চায়। **"মরণের পারে"** বইখানিতে পরলোক ও বিদেহী আত্মারই নিখুঁৎ চিত্র এঁকেছেন স্বামিজী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

• মরণের পারের প্রেতাত্মাদের অসংখ্য নানান রকমের চিত্র-সম্বলিত।
• অটোমেটিক স্লেট লিখন।
• স্বামিজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ বিবরণ।
• মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে মেলামেশা ও পরলোকের সম্বন্ধে অনেক কিছু বিস্ময়কর সংবাদ এই গ্রন্থে আছে।

• পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শক্তি-আরাধনা

—•—

"মা তোমার কৃপাদৃষ্টি সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করো গো,
সমভাবে ধনী-দীনে, রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, হ'য়ে তব কৃপা ঝরে গো।

—*স্বামী বিবেকানন্দ*

বি, কে, সাহা এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ
টি মার্চেণ্টস্

৫, পোলক ষ্ট্রীট, **২, লালবাজার ষ্ট্রীট**

কলিকাতা

ফোন : ২২-৪৯২০

আমাদের আর কোন শাখা নাই।

।। পূজায় প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই ।।

অজাতশত্রু রচিত

গ দা ধ র

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন লীলার বাল্য অধ্যায়। কাহিনীর মতনই সুখপাঠ্য, সুন্দর ও সাবলীল।

অমৃতবাজার বলেন : This Charming book has been written with extra-ordinary skill by an inspired writer. The volume brings the prophet of the age to warm life.

হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড : The author's attempt at applying the technique of fiction to biography has been a remarkable success and it word be no exaggeration to say that every reader of the present volume will eagerly look forward to the appearance of the second volume.

যুগান্তর : বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা কঠিন হইয়া ওঠে। জীবনী-সাহিত্যকে এমন সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

• **বিশ্ববাণী :** রচনা চাতুর্যে মনে হয় যে, ঘটনাগুলি যেন সত্যসত্যই আবার নূতন সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

• **প্রবর্ত্তক :** রচনার ভঙ্গী সাবলীল এবং নাট্য ও কাব্যধর্মী। কতকগুলি ঘটনায় নূতনত্ব আছে। তবে লেখকের সব চাইতে কৃতিত্ব ঘটনা পরিবেশনের টেক্‌নিকে।

কল্পতরু প্রকাশনী

৮নং কে. কে. রায় চৌধুরী রোড, কলিকাতা—৮

ইউরোপের ইতিহাস

(১৪৫৩-১৮১৫)

অধ্যাপক *শ্রীকুমার আচার্য্য*

বি. এ. ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তকে ইউরোপের জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী বিশদরূপে সহজ ও সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

● কয়েকটী অভিমত :

"অধ্যাপক শ্রীআচার্য্য ইউরোপের সমস্ত জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ; ভাষা স্পষ্ট, কোথাও জড়তা নাই। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। অধ্যাপকের অধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে। ছাত্রদের উত্তর সিদ্ধ হইবে।"

স্বাক্ষর—শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম. এ., পি. আর. এস্., এল. এল. বি. ডি. লিট. শাস্ত্রী।

"শ্রীকুমার আচার্য্য লিখিত ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বইখানি সহজভাষায় লেখা হইয়াছে। বইখানি ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসিবে।"

স্বাক্ষর—ডক্টর বিমলকান্তি মজুমদার, আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী (হারিসন) রোড,

কলিকাতা ৯

শা র দী য় প্র কা শ

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ● ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য—মূল্য : টাকা ৬·৫০
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্গভাষায় এ-পুস্তকেই সর্বপ্রথম প্রকাশের দাবী রাখে।
সাহিত্যের সমালোচনাও এ-গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত।

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ● খগেন্দ্রনাথ মিত্র—মূল্য : টাকা ৭·০০
১৮১৮ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত একশতকের ইতিহাস। শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বর্তমান গ্রন্থকারের দীর্ঘকালীন অধ্যবসায় ও সাধনার অবদান।

মধুমিতা ● সরোজকুমার রায়চৌধুরী—মূল্য : টাকা ৪·০০
'মধুরাক্ষী' ও 'ধূসরকপোতী'র স্রষ্টার বিচিত্র চরিত্র চিত্রণ ও বাক-সংলাপের নতুন শৈলীর স্বাক্ষর বর্তমান উপন্যাসে বিধৃত।

পরিভাষা কোষ ● সুপ্রকাশ রায়—মূল্য : টাকা ১৫·০০
বঙ্গভাষায় প্রথম পারিভাষিক অভিধান। পত্র-পত্রিকা কর্তৃক সুপ্রশংসিত।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড
কলিকাতা ৯

নূতন পুস্তক নূতন পুস্তক

পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেদশাস্ত্রীর

শ্রীশ্রীচণ্ডী স্তবমালা
চণ্ডীর প্রসিদ্ধ স্তবচতুষ্টয় এবং অর্গল, কীলক, কবচ, সূক্ত, দুর্গাস্তবরাজ, ক্ষমা-ভিক্ষা প্রভৃতির সানুবাদ সংকলন। চণ্ডী পরিচিতি সম্বলিত।
মূল্য—।৶০ আনা।

ত্রয়ী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজীর অভিনব জীবনালোক, শ্রীশ্রীমায়ের 'আত্মকথা' সম্বলিত। স্বল্প পরিসরে অভিনব ভঙ্গিমায় লিখিত। বিভিন্ন পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য—১৲

প্রাপ্তিস্থান : লেখক—২৬বি, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

॥ এম. এ. ক্লাশের ॥

শিক্ষার্থীর উপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল রকম গ্রন্থ কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

নবভারতের নূতন বই

॥ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ॥

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজীর জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলী ও চিত্র সম্বলিত

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

●

বাঙ্গালার ইতিহাস

হিন্দুযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিক ইতিহাস সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা।

●

॥ শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার ঊনবিংশ শতাব্দী

মূল্য : টাকা ৪৲

●

শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালার স্বদেশী যুগ

মূল্য : টাকা ১২·৫০ ন.প.

●

॥ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত ॥

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

মূল্য : ২৲

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড, কলিকাতা-৯

বাঙ্গলার প্রত্নতাত্ত্বিক সকল ঐতিহাসিক গবেষণার

শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের
শ্রীমা সারদামণি
দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল—মূল্য : ৩.০
পত্রিকা ও সর্বসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত, লাইনো অক্ষরে ঝকঝকে ছাপা
শ্রীমা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, মায়ের নবাদ্রি মন্দির
ও জয়রামবাটী মন্দিরের আকর্ষণীয় ছবিসহ।
৺গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
অপূর্ব জীবনী গ্রন্থ
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ
বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের এইরূপ জীবনীগ্রন্থ এই প্রথম উচ্চ প্রশংসিত
লাইনো অক্ষরে ছাপা—মূল্য ৬৲, রেক্সিন বাঁধাই ৭৲

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	—রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল	১।০
	চক্র ও চক্রান্ত	৩৸০
ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	—চীন থেকে ভারত	৩৸০
শিবরাম চক্রবর্তী	—ফার্ষ্ট বয়	১।০
বার্ট্রাণ্ড রাসেল	—শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৩৸০
নারায়ণচন্দ্র চন্দ	—বনের বাসিন্দা	৩।০

কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৩ নং, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

"ভাবমুখে"
ধর্ম্মীয় মাসিক পত্রিকা। এতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা ও তদীয় লীলাপার্ষদদের
জীবনবেদ বিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধাদি যথেষ্ট থাকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা—৩৮ হইতে প্রকাশিত।
বার্ষিক চাঁদা ৪।০ মাত্র।

ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় আভিজাত্য-মণ্ডিত পোষাকে আর বইয়ের সৌন্দর্য বাড়ে রুচিসম্মত মুদ্রণে
শ্রীকালী প্রেস
৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-১০৩৪

স্বামী অভেদানন্দ
(কালী-তপস্বী)

বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

প্রমাণযোগ্য এই জীবনীটি আমরা প্রতিটি ভক্ত ও জ্ঞানলিপ্সুকে কেনার জন্য অনুরোধ জানাই।

মূল্য : দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২০.৭.৪৭

চিত্রকর : শিল্পাচার্য
অবনীন্দ্রনাথ বসু

বুদ্ধ ও সুজাতা।

STUDENTS
D/G
COMMON-ROOM

মহিষমর্দ্দিনী

শিল্পী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি এই মহাশক্তি মহিষমর্দ্দিনীর মধ্যে আবির্ভূত। অতিভীষণা অথচ পরমকল্যাণময়ী সেই রূপই চিত্রে পরিস্ফুট। অবয়বগত সামঞ্জস্য এখানে নগণ্য।

বিশ্ববাণী

শারদীয়া
বিংশতি বর্ষ : ৯ম সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৬৫

দেবীদুর্গা

দেবী দুর্গার বিধিমত পূজার আগে কল্পারম্ভ ও বোধনের অনুষ্ঠান হয়। কৃষ্ণানবমী, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং কেবল মহাষ্টমী ও মহানবমী—এই সাত রকমের কল্পারম্ভের বিধি আছে। যাঁদের যেদিনে কল্পারম্ভ করবার নিয়ম তাঁরা সেদিনেই কল্পারম্ভ করেন। ষষ্ঠীর বোধনে 'শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করাম্যহম্' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করার পর সন্ধ্যাবেলা বিল্ববৃক্ষের কাছে পূজার বিধি আছে। নবমীতিথিতেও বোধনের নিয়ম আছে। আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বোধন অনুষ্ঠান করতে হয়। ষষ্ঠীর পর সপ্তমীতিথি থেকে আরম্ভ করে অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে পূর্বাহ্নে পূজা শেষ ক'রে অপরাজিতার পূজা করা হয়। অষ্টমী অথবা মহাষ্টমীতে সন্ধি পূজারও বিধি আছে। অষ্টমী ও নবমীতিথির সন্ধি অর্থাৎ সংযোগমুহূর্তকে সন্ধিমুহূর্ত বা সন্ধিক্ষণ বলা হয়। এই সন্ধিক্ষণে দেবীদুর্গাকে চামুণ্ডারূপে ধ্যান ক'রে পূজা করতে হয়। চামুণ্ডার ধ্যানে দেবী দুর্গাকে 'ওঁ কালী করালবদনা···নরমালাবিভূষণা' প্রভৃতি বলা হয়েছে। চামুণ্ডা কালী বা কালিকাদেবীই দেবী দুর্গা। চামুণ্ডার পূজার পর চতুঃষষ্টী যোগিনীকেও অর্চনা করতে হয়।

দেবী দুর্গার দশহাত ; তাই তিনি দশভুজা নামে পরিচিতা। বৌদ্ধ মারীচিও দশভুজা। অবশ্য ধ্যান ও রূপভেদে মারীচির আবার দুই, চার ও বার হাতের উল্লেখ আছে। দুর্গাদেবীরও তাই। তিব্বতের লামারা বৌদ্ধ মারীচিকে আবার উষা অর্থাৎ সূর্যরূপে আবাহন করেন। মারীচি আসলে সৌরদেবতা অথবা সূর্যই, কেননা সূর্যদেবতার সপ্তাশ্বরথের মতো মারীচিদেবীর রথও সাতটি শূকরে বহন করে। দুর্গাদেবীর হাত দশটি দশদিকেরই পরিচায়ক। মোটকথা, দিক্ থেকেই দেবীর হাতের কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে দিকের আবার ভিন্ন ভিন্ন

সংখ্যা বলা হয়েছে। যেমন, 'পঞ্চবৈ দিশঃ' (শত' ব্রা' ৫।৪।৪।৩), 'সপ্ত দিশঃ' (শত' ব্রা. ৬।৪।২৮), 'নব দিশঃ' (শত' ব্রা' ৬।৩।১।২২) দশ দিশঃ' (শত' ব্রা. ৬।৩।১।২১) প্রভৃতি। অনেকের মতে ঋতু, অয়ন, সূর্য-কিরণ, অগ্নিশিখা এবং যজ্ঞবেদীর বিভিন্ন আকার থেকে দেবী অথবা দেবতাদের হাতের ধারণা এসেছে। দশ দিক্ দিয়েই বিশাল ও অনন্ত আকাশের সীমা নির্দেশ করা হয়। দেবীর দশ হাতও তাই তাঁর সর্বব্যাপিত্বের পরিচায়ক এবং তিনি সর্বপ্রকাশক।

• • • •

শ্রীদুর্গার বিজয়াদশমীর পর দেবীর অভিন্ন মূর্তি অপরাজিতার পূজার বিধি আছে। এই অপরাজিতাদেবীকে দুর্গার চৌষট্টি যোগিনীদের অন্যতমা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে অপরাজিতার পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুরোহিতদর্পণ (১০শ সং, পৃ ৩৩২), চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড, অপরাজিতা-দশমীপ্রকরণে অপরাজিতাদেবীর পূজাবিধি দেওয়া আছে। বিজয়ার অভিধানে হেমাদ্রি বলেছেন : 'উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ সংপূর্ণৈকাদশী যদি।' শ্রাবণার্ক্ষং যা কালে সা তিথির্বিজয়াভিধঃ। নির্ণয়সিন্ধু এই 'কাল'-এর অর্থ করেছেন 'অপরাহ্ণ', অর্থাৎ বিজয়াদশমীর অপরাহ্ণে দেবী অপরাজিতার পূজা বিধেয়।

দেবী অপরাজিতার পূজায় অপরাজিতা মন্ত্র, নারদ বা বেদব্যাস ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রীঅপরাজিতা দেবতা, লক্ষ্মী বীজ, ভুবনেশ্বরী শক্তি ও সমস্ত অভীষ্টের পরিপূরণের জন্যে বিনিয়োগ। দেবী অপরাজিতার ধ্যান :

'ওঁ চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাম্। উপর্যধোহস্তয়োঃ খড়্গবর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাম্। ঈষৎ-প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্'।

এ ছাড়া অপরাজিতাদেবীর আরো পাঁচ রকমের ধ্যানমন্ত্র আছে। ধ্যানগুলিতে দেবীকে কোথাও পীতবস্ত্র, কোথাও শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা দেখা যায়। অস্ত্রাদি বর্ণনারও রূপভেদ আছে। হিন্দুতন্ত্রমতে অপরাজিতার পূজা ছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রেও দেবীর ধ্যান দেওয়া হয়েছে :

'অপরাজিতা পীতা দ্বিভুজৈকমুখী নানারত্নোপশোভিতা গণপতিসমাক্রান্তা চপেটদানাভিনয়দক্ষিণকরা গৃহীতপাশতর্জনিকস্তনরম্বিতবামভূজা অতিভয়ঙ্করকরালরৌদ্রমুখী অশেষমারনির্দলনী ব্রহ্মাদিদুষ্টরৌদ্রদেবতাপরিকরোজ্জ্বিতচ্ছত্রা চেতি'।

বৌদ্ধতন্ত্রে অষ্টভুজা কুরুকুল্লাসাধনে এবং ধ্যানে এই অপরাজিতাদেবীর উল্লেখ আছে। যেমন 'কুরুকুল্লাং ভগবতীঃ···দক্ষিণদ্বারে অপরাজিতাং পীতবর্ণাং রক্তসম্ভবমুকুটাং দক্ষিণ-হস্তাভ্যাং ঘণ্টাপাশধরাং···'। বৌদ্ধতান্ত্রিকসংগ্রহ ভেতুরেও (ডাঃ পি. কার্দিয়ে-সং পৃ. ৩৯০ ; ৩৯২) অভয়পণ্ডিতকৃত দুটি অপরাজিতা-সাধনের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ সং) পুস্তকেও অপরাজিতার নাম আছে। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ থেকেও অপরাজিতার ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গেছে। অপরাজিতার একটি অভগ্ন মূর্তি কলিকাতা মিউজিয়ামেও রক্ষিত আছে।

মাতৃসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

মাতৃসাধনার একমাত্র উপকরণ তীব্র ব্যাকুলতা। শিশু জন্মাবধি মাকেই দেখে, মাকেই চেনে, তাই সে মাকেই বিশেষভাবে ভালবাসে ও মার প্রতিই একান্ত অনুরক্ত হয়। এই ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত; কেহই তাহাকে ইহা শিক্ষা দেয় না। জীবের অন্তর্নিহিত অনুরাগই তাহাকে প্রেরণা দান করে। ঐ প্রেরণাবশেই মা সন্তানকে ভালবাসিতে বাধ্য হয় এবং সন্তানও মাকে ভাল না বাসিয়া পারে না। এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসাই স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি ও স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভালবাসার বন্ধনই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়াছে, পরকে আপন এবং আপনকে পর করিতেছে। সুকৃত সন্তানের এই ঐকান্তিক ভালবাসাই বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহাকে মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া থাকে। এই ভালবাসাই ক্রমে বিস্তৃত আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহার ফলে জীবমাত্রকেই ভালবাসিয়া সে আনন্দ পায়। এই ভালবাসা আবার যখন জাগতিক সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মাত্র ভগবানকেই ভালবাসিতে চায়, তখনই ইহাকে 'ভক্তি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভগবান ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর প্রতি যে প্রীতি তাহাকে ভালবাসা, ও ঈশ্বরে প্রীতির নামই 'ভক্তি'। তাই নারদ ঋষি, ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন: "ও সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমই 'ভক্তি'। শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন: 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম 'ভক্তি'। সমস্ত বিষয়-প্রপঞ্চ হইতে চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিলে, অনুরাগের প্রবাহ বহিতে বহিতে যখন প্রবলবেগে ভগবানে গিয়া পর্যবসিত হয়, সেই ঐকান্তিকভাবের নামই প্রকৃতপক্ষে 'ভক্তি'। সুতরাং এবম্বিধ ভক্তিই ভগবান লাভের একমাত্র উপায়। ইহারই নাম, পরাভক্তি, প্রেমাভক্তি বা রাগানুগা ভক্তি।

সে ব্যাকুলতা লইয়া বাল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে সেই সরল ও স্বাভাবিক ব্যাকুলতা লইয়াই জগজ্জননীকেও তিনি আরাধনা করিতেন। এখানে মন্ত্রতন্ত্রের আড়ম্বর

ছিল না, উপচারাদির আতিশয্যও ছিল না, আর শাস্ত্রবিধিরও বন্ধন ছিল না। এখানে ছিল কেবল মাতৃসাক্ষাৎকারের আকুতি, তীব্র ব্যাকুলতা, আবেদন-নিবেদন, মান-অভিমান-শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভক্তি বা রাগানুগাভক্তি।

ভক্তি অবশ্য দ্বিবিধ, রাগাত্মিকাভক্তি বা পরাভক্তি এবং গৌণী বা বৈধীভক্তি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তির অনুশীলন করাকেই বৈধীভক্তি বলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বৈধী ভক্তির যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন : "এত জপ কর্তে হবে, এত উপচারে পূজা কর্তে হবে, পূজার সময় এই মন্ত্র পাঠ কর্তে হবে, এত বলিদান দিতে হবে, এত ধ্যান কর্তে হবে, উপোস কর্তে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এসব বৈধী ভক্তি। এ সব অনেক কর্তে কর্তে তবে ক্রমে রাগভক্তি আসে। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি,—যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে, তাই জপতপ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, তাহলে পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। যদি ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি আসে, তাহলে জপতপ কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধীকর্ম কে করবে" ?

বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তের মালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে সেই নির্মল চিত্তে প্রেমাভক্তির উদয় হয় ও ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : 'চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে। মনে ময়লা পড়েছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। তখন ঈশ্বর-দর্শন হয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর আর কাঁদ চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাঁকে 'আমি'রূপ আর্শিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম দর্শন করবে। কিন্তু আর্শি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না"।

জগন্মাতাকে দেখিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তখন ধূলায় গড়াগড়ী দিয়া কাঁদিতেন। এমন কান্না কাঁদিতেন যে লোক দাঁড়াইয়া যাইত এবং লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত, অথবা মনে করিত কোন ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সে কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও বলিতেন : "যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতাম,—আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম : মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, আমায় জানিয়ে দাও আমায় দেখিয়ে দাও। মা আমাকে একে একে সব জানিয়ে দিয়েছেন। আরও কত কি, তা কি বলবো। আহা! কি অবস্থাই গেছে—ঘুম গেছে। "ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগেধাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোমায় দিয়ে মা ঘুমের ঘুম পাড়ায়েছি" !

জপ-ধ্যানের সময় কিরূপ অনুভূতি হইত বা কিরূপ দর্শন করিতেন তাহাও তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন : "জপ করা কিনা—নির্জনে, নিঃশব্দে তাঁর নাম করা, একমনে নাম কর্তে কর্তে, জপ কর্তে কর্তে, তাঁর রূপ দর্শন হয়। তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। যেমন গঙ্গার গর্ভে ডুবান বাহাদুর কাঠ আছে—শিকল দিয়ে বাঁধা। ডুব মেরে সেই শিকলের এক এক পাব ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরি-কাঠকে স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ, জপ কর্তে কর্তে মগ্ন হয়ে গেলে, ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ** গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান-

শূন্য হয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল সামনে আসে। গভীর ধ্যানে আর সে সকল আসে না, বাহিরে পড়ে থাকে। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বারবাড়ীতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহিরে পড়ে থাকবে। ধ্যান কর্তে কর্তে আমার কত কি দর্শন হতো"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া কতভাবে কত সাধনা করিয়াছেন তাহা আমরা কথামৃত হইতে অনেক কিছু জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন: "মা আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম পুরাণ মতের, তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের"। পুরাণ মতে ভগবানের সহিত কোন একটি সম্বন্ধ পাতাইয়া, ভগবানকে আপন করিয়া লইতে হয়। তাই ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব আশ্রয় করিয়া সাধনা করেন। তন্ত্র মতেও ঐরূপ অনেক ভাব স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু মাতৃভাবে সাধনাই নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট। বেদ মতে অদ্বৈততত্ত্ব চিন্তা—'সোঽহং' ভাবে ব্রহ্মানুভূতি। ফল কথা, যেভাবেই ভগবানের উপাসনা করা হউক, চাই শুদ্ধচিত্ত, চাই প্রবল অনুরাগ ও তীব্রব্যাকুলতা। ইহার নামই রাগানুগা ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: "বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়"।...."এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকা ভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তাহ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়"।...."ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, নিষ্কাম হয়ে জপ, তপ, অনেক কর্তে কর্তে ক্রমে ভগবানের প্রতি অনুরাগ হয়। এই অনুরাগ বা রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে। যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি, কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। ভক্তির দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্বের উপর যে মায়ার টান থাকে না—দয়া থাকে। আমার জিনিষ আমার জিনিষ বলে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। এ ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়—একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কল্‌কাতায় কর্মভূমি—বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য! ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো কোন প্রকারেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠী লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই"।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিষ্কাম ভক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মন যখন বৈধীভক্তির গণ্ডি ছাড়াইয়া রাগভক্তিতে পরিণত হইল, তখন তিনি বিধি নিয়ম রক্ষা করিয়া নিত্য পূজাদি করিতে অসমর্থ হইলেন। এই অবস্থায় তিনি ভাবনেত্রে কত অভিনব রূপ দর্শন করিতেন এবং আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন এমন কি রাগভক্তিপ্রভাবে তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: "যখন এই অবস্থা হলো, দিন রাত কোথা দিয়ে যেত বলতে পারি না। সকলে বলতো পাগল হলো। কেবল মা, মা, বলে ডাকতাম কাঁদতাম। আমি মা, মা, বলে এমন কাঁদতাম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেত। কুলকিশোর আমায়

বলেছিল : 'পৈতেটা ফেল্‌লে কেন' ? আমার যখন এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল,—আগেকার কিছুই রইল না। হুঁস নাই, কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে"।

কখন বা মন্দিরে আসিয়া কালীপ্রতিমার সম্মুখে করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন : "মা আমায় দয়া কর, মা রামপ্রসাদকে দয়া করেছিলে, আমার উপর কি মা, দয়া হবে না ? মা, আমি কিছু জানিনা, কি করে তোমায় পাব আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। মা আমি কিছুই চাই না ! মা আমি লোকমান্যি চাইনা মা ; ওমা শতসিদ্ধি চাইনা মা ; দেহসুখ চাইনা মা ; কেবল এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়"। মাতৃভাবে শক্তিসাধনা, মার কাছে সরলভাবে প্রার্থনা ইহাই তিনি বেশী পছন্দ করিতেন। দাসীভাব ও সখীভাবেও সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরভাব পছন্দ করিতেন না। বলিতেন উহা বড় কঠিন পথ, পতনের আশঙ্কা বেশী।

পঞ্চবটী ছিল তাঁহার সাধনালয় এবং এখানেই ছিল মত দর্শনের আড্ডা। সন্ধ্যা হইলে মন্দিরে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে পঞ্চবটীতে কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতেন, : "মা আনন্দময়ী। দেখা দিতে হবে।" আবার কখন বলিতেন : "ওহে দীননাথ, জগন্নাথ ! আমিত জগৎ ছাড়া নই নাথ ! আমি জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,—আমি কিছুই জানিনা, দয়া করে দেখা দিতে হবে"। সূর্যকে পাটে বসিতে দেখিয়া বলিতেন : তুমি তো চল্লে—আমার কি করে গেলে ? আমিতো যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম" !

এইভাবে যখনই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তখনই জগন্মাতার—বরাভয়দায়িনী সৌম্যমূর্তি দেখিয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। কোথা দিয়া দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না। বৈধীভক্তির যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন প্রবল ঈশ্বরানুরাগ উপস্থিত হয়, তখনই ভক্ত ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; ভাবচক্ষে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইভাবে একবার বাল্যকালে একাদশ বর্ষ বয়সে সর্বৈশ্বর্যময়ী ঈশ্বরীমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে থাকিয়া পঞ্চবটীতে সাধন করিবারকালেও জপধ্যানে নিমগ্ন হইয়া মার বরাভয়দায়িনী শান্তমূর্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তদবধি জগন্মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মাতৃপ্রেমের প্রভাবে ভয় ও বিঘ্ন তাঁহার হৃদয় হইতে চিরদিনের মত তিরোহিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, এই সময় হইতে মাতৃভক্তির আবেশ ও আতিশয্যে সমুদয় বিধিবিহিত অনুষ্ঠানিক কর্মও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং এখন হইতে তিনি বৈধীভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া রাগভক্তি বা প্রেমাভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। জগন্মাতাকে এখন তিনি আপনার-মা বলিয়াই বুঝিয়াছেন এবং সেই বিশ্বাসে হাতে ফুল লইয়া মাকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন : "মা, এই লও তোমার পাপ এই লও তোমার পুণ্য ; আমি কিছুই চাই না। তুমি আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল এই লও তোমার মন্দ আমি ভালমন্দ কিছুই চাইনা ; তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম এই লও তোমার অধর্ম ; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান ; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি এই লও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। মা, আমি কিছুই চাই না কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে।" ইহাই প্রেমাভক্তির লক্ষণ। স্বার্থপরতা বা বিষয়াসক্তির লেশমাত্র থাকিতে হৃদয়ে নির্মলা

অহেতুকী ভক্তির উদয় হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন: "প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা। প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটী লক্ষণ। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়, জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়। দেহের উপরও মমতা থাকবে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে"।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা হইতে বুঝিতে পারি—যখন তিনি দেবদেবীর পূজা করিতেন, তখন দেবভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। একবার শিবের পূজা করিতে করিতে এমনভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, করুণ কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিবার সময় লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং এই সময়ে মথুর বাবুও উপস্থিত হইয়া তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পাছে কেহ তাঁহার তন্ময়তা ভঙ্গ করে সেজন্য সকলকে সাবধানে স্থির থাকতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত লোক সমাবেশ হইলেও তিনি কিছুই টের পান নাই। পূজার সময় তিনি দেবদেবীকে সত্যই জীবন্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন: "একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বল্ব দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে, —এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, সম্মুখে বিরাট, পূজা হয়ে গেছে! সেই বিরাট মূর্তির উপর ফুলের তোড়া শোভা কচ্ছে। সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। তাকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলাম, পূজা উঠে গেল। এই বেল গাছ—বেল পাতা তুলতে আসতাম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল;— দেখলাম, গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হলো। দুর্বা তুলতে গিয়ে দেখি,—আর সেরকম করে তুলতে পারলাম না। তখন রোক করে তুলতে গেলাম"। আরও বলিয়াছেন: "কালীঘরে পূজা কর্তাম, হঠাৎ মা একদিন কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মা ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন, সব চিন্ময়! প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়। কোশাকুশী চিন্ময়! ঘরের চৌকাট চিন্ময়। মার্বেল পাথর চিন্ময়! মানুষ জীবজন্তু সব চিন্ময়! ঘরের ভিতর দেখি যেন সব রসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দ রসে! কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম; কিন্তু তারও ভিতরে শক্তি জল্ জল্ কচ্ছে দেখলাম! তখন উন্মত্তের ন্যায় পুষ্প বর্ষণ কর্তে লাগলাম! যা দেখি তাই পূজা করি।" গীতায় আছে:

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ গীতা ৬।৩০

অর্থাৎ "যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতে ভূতমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা; তিনিও আমার অদৃশ্য হন না"। সমদর্শী যোগীর ইহাই লক্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মার কৃপায় সেই সমদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বেদাধ্যয়ন উগ্র তপস্যা, দান বা যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবানের এই বিশ্বরূপ কেহই দেখিতে সমর্থ নহেন; একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই এই বিশ্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন সম্বন্ধে অর্জুনকে সেই কথাই বলিয়াছেন:

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা ১১।৫৩-৫৪

STUDENTS COMMON-ROOM

সর্বভূতে জগন্মাতাকে দর্শন এবং অদ্বৈতভাবে মহাশক্তির পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করাই তন্ত্রে মাতৃসাধনার চরমাদর্শ। তিনি বলিয়াছেন: "এই অবস্থায় বোধ হচ্ছে, ঠিক দেখ্‌ছি, তিনিই সব হয়েছেন। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য থাকে না। যখন এই অবস্থা হলো তখন মা কালীকে পূজা কর্‌তে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না"।

ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' নামক পুস্তকে তাঁহার ঈশ্বর দর্শনের যে ব্যাকুলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন: আমরা দেখিয়াছি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে (তাঁহার মতে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের শেষদিকে তিনি ৺কালিকামাতার পূজার ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহার তিন বৎসর পূর্বে) ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার কিরূপ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। কি উপায়ে ভগবান লাভ হইতে পারে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহাকে সাধন-পথ দেখাইয়া দিবার কেহই ছিল না। তাঁহার সরল হৃদয়ে যাহা উদয় হইত তিনি তাহাই করিতেন। তিনি একান্তে দিবারাত্রি বৎসহারা-গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া মাকে কেবল ডাকিয়াছিলেন। মার দর্শন পাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কিরূপ অস্থির হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতে কিরূপ আর্তনাদ উঠিত আমরা দেখিয়াছি। একমাত্র প্রাণের ব্যাকুলতায় অবশেষে মার প্রত্যক্ষ দর্শন তিনি লাভ করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে নানাবিধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনা করিতে করিতে বিবিধ ঈশ্বরীয় রূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু এতদিন মাকে তিনি দূর হইতেই দর্শন করিতেছিলেন। এতদিন দেখিতেছিলেন যে, মা আর তিনি ভিন্ন। তাঁহার মা,—তিনি ছেলে। এত দিন মাকে নানারূপে দেখিলেন,—কখন রাম কখন শিব কখন কৃষ্ণ কখন বা সীতা সৌরী রাধারূপে, আবার কখন তাঁহাকে সর্বত্র অন্তর্যামীরূপে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এবার মা, তাঁহাকে স্বয়ং দেখাইলেন যে সর্বশক্তিরূপিনী অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বাহিরে জড় জীব রূপে বর্তমান। মা, তাঁহাকে দেখাইলেন যে, জীব-জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তিনিই হইয়াছেন। সবই তাঁরই এক একটি রূপ। সমস্ত বস্তুই তাঁহার চিন্ময়ী মা। এবার সেই সর্বশক্তিময়ী তাঁহাকে বিশ্বরূপে দেখা দিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে মা, নিজ শক্তিতে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি দেখিলেন,—জগৎ শক্তিময়, সকলেরই ভিতর মার শক্তি 'জল্ জল্ কচ্ছে।' এইরূপ সর্বভূতে মহাশক্তির অধিষ্ঠান অদ্বৈতভাবে প্রত্যক্ষ করাই, তন্ত্রের শক্তি পূজার চরম ফল।

শুদ্ধাভক্তি ও মুক্তি

স্বামী সদাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : কলিতে নারদীয়া ভক্তি। নারদীয়া ভক্তি বলতে জ্ঞানমিশ্রা অর্থাৎ বিচারযুক্ত ভক্তি। এখন ভক্তিকে যদি বিচারযুক্ত বলি তবে অনেকের হয়তো আপত্তি হ'তে পারে যে, ভক্তি চিরকালই অনন্যা ও প্রপত্তিযুক্ত হয়। তবে কাকে ভজনা করা উচিৎ বা ভক্তির পাত্র যথার্থ কে—এসব বিচারের স্থান কেন থাকবে? কিন্তু কথা এই যে, যাকেই আমরা ভক্তি বা ভজনা করি না কেন তার প্রতি আমাদের অসাধারণ অনুরক্তি ও নিষ্ঠা থাকার জন্যই আমরা তাকে ভক্তি করি। আসলে আসক্তি আসে একমাত্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত বা জানা ব্যক্তি বা দেবতার ওপরে। যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, যাকে কোনদিন চোখে দেখিনা বা যার নাম কোনদিন কানে শুনি না, তার প্রতি অনুরাগ আসা তো স্বাভাবিক নয়। তাই ভক্তির পাত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই রাখতে হবে। আর জ্ঞান রাখা মানেই মনের অনুসন্ধানী বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা—যাকে বিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। তাই ভগবানে ভক্তি বলতে বুঝতে হবে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে চোখে না দেখলেও দিব্যভাবযুক্ত মহাপুরুষ বা ভক্তের মুখে অথবা শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবৎমহিমা ও মাধুর্যের কথা জেনে ও শুনে তাঁর প্রতি আমার মনের একান্ত টান বা অন্তরের অনুরাগ। জগৎকারণ ঈশ্বরের অসীম মাধুর্য ও অপার করুণার কথা ভক্ত বা সাধক-মুখে বা শাস্ত্রের সাহায্যে জানি বা শুনি বলেই তো তাঁকে আমার জীবনের সম্বল করি শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য। তিনি চির-অজ্ঞাত বা অপরিচিত থাকলে তাঁকে চাইবারই-বা আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হবে কেন? তাই জানার বা জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে; আর এই জ্ঞানকে যদি 'বিচার' অর্থাৎ মনের অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণী বৃত্তি বলা যায়, তাতে কি কোন ক্ষতি হয়?

তারপর শুধু ভক্তি থাকলেই ভগবান বা আরাধ্য দেবতাকে অতি আপনার বলে পাওয়া যায় না। তাই শুদ্ধাভক্তির প্রয়োজন। এখন ভক্তি যদি শুদ্ধা হয়, তবে জিজ্ঞাসা হ'তে

পারে—তাহ'লে অশুদ্ধা ভক্তিরও কি স্থান আছে? শাস্ত্রের কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়—মুক্তির জন্য যে-ভক্তিকে মানুষ সহায় করে, সে-ভক্তিতে যদি ভগবান ভিন্ন অন্য কোন ভোগের বাসনা থাকে তবে তাকে অশুদ্ধা ভক্তি বলা যায়। কামনাশূন্য অর্থাৎ ফলকামনারহিত অহৈতুকী ভক্তিই শুদ্ধা। কিন্তু শুদ্ধাভক্তিতে ভগবানকে আপনার হতেও আপনার বলে পাবার যে বাসনা থাকবে, তাতে শুদ্ধাভক্তির কোন হানি হবে না। কেন না, ঐ পাবার বাসনা পার্থিব ভোগ বাসনার মধ্যে গণ্য করা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'হিংচে শাকের মধ্যে নয় ও মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়'। হিংচে শাক হলেও পিত্ত নষ্ট করে, মিছরি মিষ্টি হলেও সর্দি দূর করে। তাই, ঐ দু'টী রোগীর পক্ষে মহৌষধি ও পরম উপকারী। কাজেই শাক ও মিষ্টি হলেও হিংচে ও মিছরী মানুষের পরমবন্ধু। সে-রকম যে ভক্তিতে বিষয়-ভোগের বিন্দুমাত্র কামনা-বাসনা থাকে না, একমাত্র ভগবানকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে, তাকেই 'শুদ্ধাভক্তি' বলে। এই শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এক—একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বলেছেন। অধ্যাত্ম সাধনা ও অনুভূতির উচ্চস্তরে শুদ্ধাভক্তি বা ভগবৎপ্রেম ও শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানে কোন পার্থক্য নেই।

শুদ্ধাভক্তির সাহায্যে যে সাধক মুক্তিলাভ করে সেই মুক্তি কি? সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকাররা বলেন: মুক্তি, মোক্ষ, ব্রহ্মানুভূতি, নির্বাণ, আত্মজ্ঞান—এসব মূলতঃ একই। মনের বাসনা-কামনা যখন চিরদিনের জন্য শান্ত হয়, মন যখন তার সমস্ত বৃত্তিকে গুটিয়ে নিয়ে তার স্বরূপে স্থিত হয়, তখনই মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ অনুভূত হয়। মুক্তি মানে তাই সংসার-শৃঙ্খল বা কামনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বোঝায়। মুক্তির পরও যদি কামনা থাকে তবে তা একমাত্র লোককল্যাণের জন্য, সে-কামনা মুক্তমানুষকে আর অজ্ঞান-শৃঙ্খলে বাঁধতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ সেই কথা—'হিংচে শাকের মধ্যে নয়'। যে-বাসনা নিজের জন্য নয়, বিশ্বচরাচরের কল্যাণের জন্য, সে-কামনা মুক্তির সহায়ক, মুক্তির বিরোধী নয়।

ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মানুষ তার ঐকান্তিক চেষ্টা বা সাধনার ফলে এই জন্মেই এই শুদ্ধাভক্তি বা মুক্তির অধিকারী হ'য়ে পরমশান্তি লাভ করতে পারে, জন্মান্তরের জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না।

তন্ত্রশাস্ত্র কি আধুনিক

তন্ত্রকুলচূড়ামণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ ও সাধনসিদ্ধ মনীষী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই অপ্রকাশিত রচনাটি ইহার পূর্বে আর কোন পত্রিকায় ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তন্ত্রকুলচূড়ামণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের নিকটেই উদ্বোধক সাধক (প্রায় সব উদ্বোধক), স্বর্গীয় অটলবিহারী ঘোষ প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তান্ত্রিক সাধনার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।—সম্পাদক

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই ত্রিকালের অধীশ্বর স্বয়ং মহাকাল মহেশ্বর তন্ত্রশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা। সুতরাং অতীত হইলেও তাহা তাঁহারই, আধুনিক হইলেও তাহা তাঁহারই। তিনি নিত্য শাশ্বত-সনাতন, পুরাতনই হউক আর নূতনই হউক, সকলই তাঁহার, সে বিচারে ভাই তোমার লাভটা কি? দশাবতার গণনায়, মৎস্যাবতার হইতে আরম্ভ করিলে রামাবতার কত আধুনিক, আবার রামাবতার হইতে কল্কি-অবতার ততোঽধিক আধুনিক, এই অপরাধে মৎস্যাবতার ভগবানের, রামাবতার তাঁহার নহে, অথবা রামাবতার তাঁহার, কল্কি অবতার তাঁহার নহে, ইহা বলিব কোন্ প্রমাণে? ভগবান ভূতভাবন নিজেই বলিয়াছেন: 'মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম-মহোদধিং',—আমি জ্ঞান-দণ্ড দ্বারা বেদশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তন্ত্ররূপ অমৃতের উদ্ধার করিয়াছি।

বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত যদি তন্ত্রের পূর্বে না থাকিবে তবে বেদশাস্ত্র-সমুদ্রের মন্থন সম্ভবে কিরূপে? এতাবতা যিনি তন্ত্রের প্রচারকর্তা, তিনিই তো নিজমুখে বলিয়াছেন: বেদের পর তন্ত্রের প্রচার। তবে আর তন্ত্র আধুনিক বলিয়া নূতন কথাটা কি শুনাইলে ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না ৪০ হইতে ৭০ বৎসর যাহাদের পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা তাহাদের পক্ষেও আধুনিক। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের ফল, তন্ত্রের এ আধুনিকতা, তাঁহার চক্ষেই শোভা পায়, ত্রিনেত্রের উপর যাঁহার ত্রিনেত্র উদ্ভাসিত, তন্ত্রের স্বরূপ তাঁহার দৃষ্টিতেই প্রতিবিম্বিত, ভগবানের আজ্ঞা 'শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম সমোভে শাশ্বতী তনুঃ',—শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েই আমার নিত্য দেহ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আর শব্দব্রহ্ম-রূপ শাস্ত্রকে তাঁহারই নিত্যমূর্তি বলিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি জ্যোতিষ—ইহাদের সকলকেই ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রসকল

যে এক কেন্দ্রবন্ধনে আবদ্ধ, তাহার একটির বন্ধন ছিন্ন করিলেই, সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাহারও সাধ্য নাই ইহার কোন একটির বিপর্যয় ঘটাইতে। বেদমূলকর্তা না থাকিলে যেমন কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলেও তদ্রূপ বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র; মন্ত্রই বেদের জীবনীশক্তি বা পরমাত্মা, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের অভাব হইলে, বেদ তো তখন চেতনাহীন। বেদেও লোকের যেমন অধিকার, তন্ত্রেও তেমনি। আসলে বৈদিক হইয়া যেমন বেদ বুঝিতে হয়, তান্ত্রিক হইয়া তেমনি তন্ত্র বুঝিতে হয়। সেরূপ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যেমন ব্রাহ্মণ হইতে হয়, সাধনা করিয়া তেমনি সিদ্ধ হইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র যদি বেদের আত্মা হয়, তবে আর বেদের পরে তন্ত্রের সৃষ্টি, ইহা সঙ্গত হয় কিরূপে—এ' আপত্তি উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে, এজন্য আরও একটা কথা বলিতে হইতেছে। বিশ্বাস করিয়া রাখ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তাকেও শাস্ত্রের অনুসারেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে হয় এবং শাস্ত্রের অনুসারেই আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে হয়। কল্পান্তরে—মন্বন্তরে—যুগযুগান্তে যখন যাহা ঘটিবে, শাস্ত্রের চক্রগতিতেই তাহা নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি মূর্তিতে সময়ে সময়ে যেমন তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব, বেদ তন্ত্র পুরাণাদি মূর্তিতেও সময়ে সময়ে তাঁহার তেমনই আবির্ভাব ও তিরোভাব। যখন তাঁহার যে মূর্তি ধারণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তিনি সেই মূর্তিতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন যে শাস্ত্রের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সেই শাস্ত্রেরই অনুসরণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। এইজন্যই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে :

'কৃতেতু শ্রৌতিকো ধর্মস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥

সত্যযুগে বেদবিহিত, ত্রেতাযুগে স্মৃতিশাস্ত্রের অভিহিত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কালনির্ণয় যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের প্রক্রিয়া বিধিপদ্ধতি যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সমুরাসুর চরাচর জগতের সৃষ্টি ব্রহ্মাকে তদনুসারেই নির্বাহ করিতে হয়, সে পক্ষে তাঁহারও কোন স্বাধীনতা নাই। সৃষ্টির প্রাক্কালে মন্ত্রশক্তির স্বরূপ বেদ ব্রহ্মার তপঃ প্রভাবেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাস-বাক্শক্তি স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তখনই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারতত্ত্ব অবগত হইলেন এবং ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। তবেই এখন বুঝিবার কথা—ব্রহ্মাই বেদের উৎপত্তি কর্তা, অথবা ব্রহ্মারও আবির্ভাব-তিরোভাবের বিধানকর্তা স্বয়ং বেদ। সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিবার কথা যে, ব্রহ্মা হইতে বেদ আধুনিক—কি বেদ অপেক্ষা ব্রহ্মা আধুনিক? ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণু আধুনিক—কি বিষ্ণু অপেক্ষা মহাদেব আধুনিক? আবির্ভাবের ব্যাপার তো এই। আবার পক্ষান্তরে তিরোভাবের ব্যাপার অনুসারে ধরিতে গেলে ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর বয়ঃক্রম অধিক এবং বিষ্ণু অপেক্ষা মহাদেবের বয়ঃক্রম অধিক। কারণ সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টিকর্তা নাই ও সংহার-কর্তারও সংহারকর্তা নাই। যে প্রাকৃতিক চক্রের আবর্তনে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, মাস, তিথি, বার, দিবা, রাত্রি বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই চক্রেরই আবর্তনে পরতঃপর শাস্ত্রসকলও আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। এই জন্যই তন্ত্রে শিবের আজ্ঞা :

'বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনী।
স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদঃ তৎকর্তা নাস্তি সুন্দরি॥'

নগনন্দিনি। বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জান, বেদ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রণয়নকর্তা কেহ নাই।

শিবাদ্যা ঋষি পর্য্যন্তা স্মর্তারোঽস্য নকারকাঃ।
প্রকাশকা ভবন্ত্যেবং কৃষ্ণাদ্যা স্ত্রিদিবৌকসঃ॥

স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই বেদের অনুসরণ-কর্তা ভিন্ন কর্তা কেহ নহেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার এবং অন্যান্য দেবগণ যুগযুগান্তে সময়ে সময়ে বেদের প্রকাশক হইয়াছেন এইমাত্র। শাস্ত্র-প্রচারের সময় সকলও ঋতু, মাস, বৎসরাদির ন্যায় স্ব স্ব চক্রবর্তেই ঘুরিয়া আসিতেছে, তাই বেদেও তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্ত্রেও বেদমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

বেদে তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ শুনিয়া হয়ত অনেকেই চমকিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তন্ত্রকে একমাত্র মন্ত্রশক্তিরই লীলাখেলা—সাধন-সিদ্ধির আকর ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। সেই মন্ত্রশক্তিই বেদের সঞ্জীবনী। অন্যান্য শাস্ত্র বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলেও মন্ত্রশক্তি বেদের পরমাত্মা। জগৎপিতা ও জগজ্জননীর প্রশ্নোত্তরে তাহাই আগম ও নিগম মূর্তিতে পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে মাত্র। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের যথাশাস্ত্র অধিকারী যিনি, তিনি একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে কথায় কথায় "প্রক্ষিপ্ত" বলা ইহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের কথায় আমরা সকলই যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা-বিজড়িত মানব মস্তিষ্ক প্রক্ষিপ্ত হইবে, ইহাও আমরা বড় একটা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার অভাবে মন্ত্রশক্তির প্রভাব রুদ্ধ হইলে মহেশ্বর-মহেশ্বরী, ব্রহ্মার মুখ নির্গত—সেই অবসন্ন মন্ত্রশক্তিকে পুনরুচ্চারণে জাগরিত করিয়াছেন। এইজন্যই বেদ অপেক্ষা তন্ত্র আধুনিক। প্রপিতামহ অপেক্ষা পিতামহ আধুনিক, পিতামহ অপেক্ষা পিতা আধুনিক, পিতা অপেক্ষা সন্তান আধুনিক। এই আধুনিক পরম্পরা প্রবাহেই যখন সংসার চলিয়া আসিতেছে, তখন আধুনিকের এত বিরুদ্ধবাদী হইয়াই বা লাভ কি?

পরিশেষে একটিমাত্র কথা বলিবার আছে এই যে, গত ১৯ কার্তিক শনিবারের প্রকাশিত বঙ্গবাসীতে দেখিলাম তন্ত্রতত্ত্বের[১] সমালোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি কলিকাতার সাহিত্যসভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তন্ত্রের আধুনিকতা প্রমাণে পশ্চাৎপদ হন নাই। তন্ত্রতত্ত্বের সমালোচনায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় আস্তিক আনুষ্ঠানিক বহুশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত নিত্যশাশ্বত শাস্ত্রকে আধুনিক বলিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। তবে বেদের পরে তন্ত্রের প্রচার, হয়ত এই কথা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অথবা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রমাণ পরম্পরার লাঘব-গৌরব বিচার করিতে গিয়া হয়ত তাহার প্রতিপক্ষ সমর্থনের ভাষায় এইরূপ ঘটিয়াছে। বিচারক্ষেত্রে উহা দোষাবহ নহে। যাহা হউক তন্ত্রতত্ত্বের সমালোচনায় তন্ত্র সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজের মন্তব্য যে পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর,

সবিনয় নিবেদন, মহাশয়ের 'তন্ত্রতত্ত্ব' পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। তন্ত্রের

১। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত 'তন্ত্রতত্ত্ব' ১ম ও ২য় ভাগ তন্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।—সম্পাদক

সহিত বেদ, দর্শন, স্মৃতি ও পুরাণের কোন বিরোধ নাই ইহা প্রতিপন্ন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তন্ত্র, বৈষ্ণব-বৈদান্তিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা-শাস্ত্র—এই উদার মত প্রচারিত করিয়া মহাশয় হিন্দুধর্মের সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম চারিখণ্ডে প্রামাণ্য এবং মহাশক্তির উপাস্যত্ব সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপাসনার প্রণালী ও বিভাগ বোধহয় অবশিষ্ট ছয়খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। তন্ত্রশাস্ত্র অতি বিপুল ও দুর্বোধ্য,'পঞ্চমুখ নিঃসৃত এই শাস্ত্রের' কেহ বাচ্যার্থ, কেহ লক্ষ্যার্থ, কেহ বা আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাণ্ডিত্য ও সাধনায় মহাশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অতএব কোন প্রকার অর্থই মহাশয়ের অবিদিত নাই। সাধনমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে যে-অর্থ অতি সহজ সাধারণ লোকের পক্ষে উহা সহজ নহে। অথচ তন্ত্রে সকল শ্রেণীর লোকেরই তুল্য অধিকার আছে। এই হেতু যদি মহাশয় বর্তমান যুগের লোকের রুচি ও সংস্কার একেবারে উপেক্ষা না করিয়া বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের মতের সাধারণের উপযোগী করিয়া সাধন-মার্গের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সমাজের অনির্বচনীয় মঙ্গল সংসাধিত হইবে। মহাশয় প্রথম চারিখণ্ডে যেরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইতেছে যে 'তন্ত্রতত্ত্ব' পরিসমাপ্ত হইলে উহা বাংলা ভাষার এক উপাদেয় ধর্মগ্রন্থ হইবে। মহাশয়ের লিখনপ্রণালী পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধ।

নিবেদক

বারাণসী
৩০ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক
প্রেসিডেন্সী কলেজ

"পঞ্চমুখনিসৃত এই শাস্ত্রের" ইহা যাহার নিজমুখে নির্গত ভাষা তিনি তন্ত্রশাস্ত্রকে 'আধুনিক' বলিবেন ইহাই বা আমরা স্বীকার করি কোন্ মুখে?

বৈদিক যুগে দেবতার মূর্তি

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৈদিক যুগে দেবতার মূর্তি নির্মিত কিম্বা লিখিত হইত কিনা—এই সমস্যার নানা আলোচনা পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। কেহ কেহ সমস্যাটি 'মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল কি না'—এইরূপে উত্থাপিত করিয়াছেন। সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে—বৈদিক কালের দেবতা-আরাধনার পদ্ধতি পরের যুগে প্রচলিত পৌরাণিক পদ্ধতিতে "পূজা" নহে—অগ্নির মাধ্যমে নানা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞভূমিতে হবিঃ দান। এই পদ্ধতির আরাধনা—পুষ্প, ফল ও বারি দ্বারা—হিন্দু পৌরাণিক যুগের পূজা-পদ্ধতি নহে। ঘৃত দ্বারা দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য কোনও মূর্তির আবশ্যক হয় না। কেবল মন্ত্র দ্বারা ধ্যান বা স্তুতি করিয়া দেবতাকে অগ্নির সম্মুখে আহ্বান জানাইলেই বৈদিক আচারের দেবতার আরাধনা সুসম্পন্ন হইত। সুতরাং এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হয় বৈদিক পদ্ধতি "মূর্তি-বিরোধী"—অর্থাৎ মূর্তি ব্যতিরেকে আরাধনা হইতে পারে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে মূর্তি রচনা করিবে না, এইরূপ কোনওরূপ নিষেধ বাক্য নাই। আদিকালের খ্রীষ্টানী বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রতিমা-রচনার বিরুদ্ধে নিষেধবাচক নির্দেশ আছে। কিন্তু ঠিক ইহার অনুরূপ কোনও নিষেধ-বাক্য বেদে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম যিনি সর্বব্যাপী ঈশ—তাঁহার কোনও ক্ষুদ্রাকারে প্রতীক কল্পনা করার কোনও সার্থকতা বৈদিক সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র এবং মহৎ হইতেও মহত্তর, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—তাঁহার মূর্তি কল্পনা করা মন্দবুদ্ধি মানুষের বিফল চেষ্টা। অনেক সাধু সন্ন্যাসী সাধক মনীষীরা (যেমন রামপ্রসাদ, দাদূদয়াল, কবীর সন্ত ইত্যাদি) মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়াছেন। "সারা জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যিনি দিয়ে কত খাদ্য নানা। তাঁকে তুষ্ট করতে চাও দিয়ে দুটো আলো-চাল আর বুটের দানা॥" (রামপ্রসাদ)। বিরাট পুরুষ ব্রহ্মকে এইরূপ ক্ষুদ্ররূপে কল্পনা করা যে বাতুলের বিকলতা, তাহার সমর্থনে নানা শ্লোক ও আপ্তবাক্য পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্লোক হইল :

"রূপম্ রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্যয়া কল্পিতম্
স্তুত্যা নির্বচনীয়তাঽখিলগুরো-দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং নিরাকৃতং যৎ তীর্থ-যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যম্ জগদীশ। বিকলতা দোষত্রয়ম্ মৎকৃতম্।"

এই শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে বাক্যের দ্বারা স্তুতি রচনা করা (যাহা বেদের কবিরা করেছেন) তাহাও বিকলতা-দোষদুষ্ট। বাক্যের দ্বারাই করি, কিম্বা রূপ-রেখা অবলম্বনেই করি, ব্রহ্মের রূপ কল্পনা নিছক্ ভ্রান্তিমূলক। পক্ষান্তরে মূর্তি কল্পনার পক্ষে কেহ কেহ যুক্তি দেন যে মূর্তির দ্বারা আমরা ব্রহ্মের মূর্তি বা প্রতীক রচনা করি না—সেই বিরাট পুরুষের—কোনও একটি বিশেষ বিভাব, শক্তি বা গুণের প্রতীক রচনা করি। এই প্রচেষ্টায় মূল ব্রহ্মের বিরাটত্বের হানি হয় না। শাস্ত্র এক স্থানে বলেছেন: "উপাসকানাং কার্য্যার্থম্ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" অল্পবুদ্ধি মানুষের উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্ম স্বয়ং রূপ-কল্পনা বা ক্ষুদ্রাকারে মূর্তি গ্রহণ করেন। তুই এক শ্রুতিও মূর্তিকে ইঙ্গিত করিয়া সাবধান করিয়াছেন: "নেদং যদুপাসতে"; তুমি যে মৃৎনির্মিত প্রতিমার পূজা করিতেছ—তিনি ব্রহ্ম নহেন। এই মূর্তি বা প্রতীক—চিন্তার অবলম্বন স্বরূপ উপায়, বা "ধী-আলম্বন"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—এই দুই মতের পক্ষে কিছু কিছু যুক্তি আছে।

সাধারণতঃ বৈদিক উপাসনা মূর্তিপূজা না হইলেও বৈদিক কালে যে মূর্তি রচনা অসম্ভব ছিল—একথা বলা যায় না। বৈদিক যুগেও এমন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যাঁহারা, প্রতিমার অবলম্বন না করিয়া—ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাহাদের উপাসনার সুবিধার জন্য মূর্তি রচনার আবশ্যক হইত।

ঋক্‌বেদে নানাস্থানে এমন সব বিবরণ, উক্তি ও নির্দেশ আছে—যেগুলির সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ বেদ নিছক প্রতিমা-বিরোধী, এই কুসংস্কার বর্জন করিয়া বিচার করিলে নিরপেক্ষ বিচারে বলিতে হয় যে, এই সব উক্তি প্রতিমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় পরিপোষক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

ঋক্‌বেদের প্রত্যেক মণ্ডলে নানা দেবতাদের একাধিক স্তুতি বা ধ্যানমন্ত্র রচিত হইয়াছে, যে সব স্তুতিতে একএকটি দেবতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও অঙ্গাদিযুক্ত-এমন প্রতিকৃতি ফুটিয়া আছে—যাহার বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, যে এই সব বর্ণনাগুলি কেবল কবিকল্পিত কথা-চিত্র (verbograph) নহে, পরন্তু—বিশিষ্ট অবয়বযুক্ত চাক্ষুষ প্রতিমা-কল্পনা (iconograph)। কয়েকটি দেবতার এমন চাক্ষুষ চিত্র সূচিত হইয়াছে—যাহারা বিচার করিলে বলিতে হয় যে বেদের স্তুতির রচয়িতা কবিরা তাঁহাদের বর্ণনা চাক্ষুষ প্রতিমারূপের উপর নির্ভর করিয়া এইসব স্তব ও স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই স্তব-স্তুতি রচনা কেবল কবি-কল্পনার বাচনিক উক্তিমাত্র বলিতে চাহিয়াছেন—যাহার পশ্চাতে কোনও বাস্তবিক চাক্ষুষ প্রতিমার কোনও অবলম্বন নাই। যে সকল দেবতাদের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রধান দেবতা হইতেছেন—সবিতা, পূষণ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, রুদ্র, অশ্বিনী কুমার, উষা, পর্জন্য এবং মরুৎ দেবতা। একএকটী স্তুতিতে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত বিশিষ্ট অবয়বযুক্ত প্রতিকৃতি বা আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়ত এগুলি কবির কাল্পনিক বর্ণনামাত্র—কোনও চাক্ষুষ প্রতিমার উপর নির্ভর করিয়া রচিত নহে। কিন্তু এক একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় যে, এই সকল কল্পনার পশ্চাতে চাক্ষুষ রূপকল্পনার ভিত্তি ছিল অর্থাৎ এইসব দেবতার প্রতিমা রচিত হইত।

তাহা ছাড়া, প্রতিমা, অর্চা, তনু, প্রতীক, প্রভৃতি শব্দে চাক্ষুষ প্রতিকৃতির স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। "নূ মনবানাঃ এষাম্ দেবান্ অর্চা" (ঋঃ বেঃ ৫, ৫২, ১৩)। "যয়া তন্বা তনূম্ ঐরয়ত" (অথর্ববেদ, তৈঃ সঃ ১, ৭, ১২ ; অঃ বেঃ ৭, ৩১)।

নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিতে ইন্দ্রদেবতার রূপ-কারকের (রূপকর্তা) স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই : (১) "অশরীরম্ চিৎ তনূভ সুপ্রতীকম্" (ঋঃ বেঃ ৬মঃ, ৫), (২) ইন্দ্রস্য কর্তা স্বপস্তমো ভূৎ" (ঋঃ বেঃ, ৪, ১৭, ৪), (৩) ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ" (ঋঃ বেঃ ১, ১৫৬, ৫)।

স্থানে স্থানে লৌহ ধাতু গলাইয়া ঢাঁপা মূর্তির আধারে (mould) নিক্ষেপ করিয়া মূর্তি-নির্মাণের নির্দেশ পাওয়া যায়। শিল্পশাস্ত্রে ইহার নাম "মধুচ্ছিষ্ট-বিধানম্", "সূর্যম্ সুশিরম্ ইব" (ঋঃ বেঃ ৮, ৬৯, ১২ ; অঃ বেঃ ২০, ৯২, ৯)। ব্যাল্যানটাইন "মহাভাষ্যে" (৩৪) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন : 'সুন্দর ছিদ্রযুক্ত লৌহ প্রতিমা'। তৈত্তিরীয় সংহিতার টীকাকার ভট্ট, ভাস্কর ইহাকে 'ছিদ্র-যুক্ত লৌহ প্রতিমা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ "লোহময়ী মূর্তা অন্তঃসুশিরবতী"। ঋক্‌বেদে বিশেষজ্ঞ প্রতিমাকারক শিল্পী হইলেন স্বষ্টা দেবতা, ইনি তক্ষন্ বিদ্যায় (sculpture) বিশেষ পারদর্শী। নানা মণ্ডলে নানা মন্ত্রে স্বষ্টা দেবতার রূপ-নির্মাণ-কৌশলের পরিচয় পাই। নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলি তাহার প্রমাণ : (১) "স্বষ্টা রূপেণ তক্ষ্যা" (ঋঃ বেঃ ৮, ১০, ২, ৮); (২) স্বষ্টা রূপাণি পিংশতু (ঋঃ বেঃ ১০, ১৮৪, ১); (৩) স্বষ্টাস্মৈ বজ্রম্ স্বর্যং ততক্ষ" (ঋঃ বেঃ ১, ৩২, ২); (৪) স্বষ্টা যদ্ বজ্রম্ সুকৃতম্ হিরণ্যয়ম্" (ঋঃ বেঃ ১, ৮৫, ৯); (৫) "স্বষ্টা যেষাম্ রূপধেয়ানি বেদ" (অঃ বেঃ, ২, ২৬)। ঋক্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলে পাই : "তষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমম্ ইন্দ্রঃ"। পণ্ডিত বেঙ্কটেশ্বর ইহার যুক্তিপূর্ণ অর্থ করিয়াছেন যে স্বষ্টার শিল্পশালায় ইন্দ্রের প্রতিমা রচিত হইবার পর প্রতিমাকে সোমরসে অভিষিক্ত করা হইল।

ইহার পর ঋক্‌বেদের (৪. ২৪, ১০) সেই অতিপরিচিত বচন উদ্ধৃত করিতে হয়। একজন প্রতিমা-বিক্রেতা বাজারে দাঁড়াইয়া খরিদ্দারদের হাঁক দিয়া ডাকিতেছেন : "ক ইমম্ দশভির্ মম ইন্দ্রম্ ক্রীণাতি ধেনুভিঃ, যদা বৃত্রাণি জংঘনৎ অথৈনম্ মে পুনর্ দদৎ"। সম্মুখে রক্ষিত ইন্দ্রের প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বিক্রেতা বলিতেছেন : 'কে আমার এই ইন্দ্রটী দশটী গাভীস্বরূপ মূল্য দিয়া খরিদ করিবেন ? 'বৃত্রবধ' অনুষ্ঠান শেষ হইলে প্রতিমাটি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন'। যাঁহারা বেদে প্রতিমা-রচনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী তাঁহারা কেহ কেহ বলিয়াছেন : হয়ত ইহা ঠিক 'প্রতিমা' নহে, ইন্দ্রের অন্য কোনও প্রতীক বা চিহ্ন-রূপী বস্তু। এই যুক্তি নিতান্ত শিশুসুলভ অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত। উৎকৃষ্ট প্রমাণের সমক্ষেও স্বীকার করিব না যে বৈদিকযুগে প্রতিমা রচিত হইত।

তাহার পর আর এক শ্রেণীর প্রমাণ হইতেছে—দেবতাদের বর্ণনায় ব্যবহৃত একটী অত্যন্ত সার্থক বাক্য "সন্দৃশ্"। বেঙ্কটেশ্বর শব্দটীকে 'সুপরিণত রূপে রচিত প্রতিমা' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। সুন্দর 'দেখিতে' কোনও বস্তু বা রূপকে বেদে বলা হয়—সন্দৃশ্। এই অর্থে শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে। "সন্দৃষ্টিরস্ত হিরানস্ত দক্ষোঃ" (ঋঃ বেঃ ২, ৪, ৪)। "তব স্পার্হে বর্ণে আ সন্দৃশি শ্রিয়ঃ (ঋঃ বেঃ ২, ১, ১২)। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্" (তৈঃ অঃ, ১০, ১, ৩)।

ঋক্‌বেদের 'পুরুষসূক্তে' (১০ মণ্ডল) বিশ্বের চাক্ষুষ প্রতীকের পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে দশ আঙ্গুল-প্রমাণ :

"স ভূমিন্ বিশ্বতো বৃত্ব অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"। এখানে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, একটী চাক্ষুষ প্রতীক রচনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রতীক কোনও প্রকার পুত্তলিকার রূপ বা আকৃতি।

তাহার পর আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নানা দেবতার বর্ণনায় বিশিষ্ট লক্ষণের নির্দেশ। ঋক্‌বেদের নানা স্থানে (১,১৭,৩, ৬,২৯,৬) ইন্দ্রের মূর্তিকে "সু-শিপ্র" ও "হরি-শিপ্র" বলা হইয়াছে। ইহা চাক্ষুষ লক্ষণ এবং অতি অবশ্য ইন্দ্রের চাক্ষুষ প্রতিমাকে নির্দেশ করিতেছে। সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন : 'শোভনে হনৌ শোভন নাসিকে বা'। অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি কয়েকটী দেবতাকে "নাসত্য" এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। যাস্ক এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন : "নাসিকা-প্রভবৌ" সুন্দর নাসিকাযুক্ত মূর্তি। বরুণদেবের বর্ণনায় পাই : "বিভ্রৎ ব্রাপ্তীম্ হিরণ্যয়ম্",—বরুণ সুবর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করিয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন (ঋঃ বেঃ ১,২৫,১৩)। রুদ্রদেবতার চারটী বিভিন্ন বিশিষ্ট চাক্ষুষ লক্ষণ পাই 'কপর্দিন', 'ত্র্যম্বক', 'কৃত্তিবাসম্', "পিণাকিন্" (ঋঃ বেঃ ৬,৫৫,২, ; ৭,৫৯,২)। এই সব লক্ষণ যে চাক্ষুষ প্রতিমার উপর নির্ভর করিয়া রচিত সে বিষয়ে কোনও তর্কের অবসর নাই। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রমাণ হইল—বাসুদেবতার বর্ণনা। আকৃতিহীন বাসুদেবতার স্তুতিতে বলা হইয়াছে যে তিনি দেখিতে সুন্দর—"দর্শত"। সুতরাং বাসুদেবতার প্রতিমা না থাকিলে "দর্শত" এই শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না

এই সমস্ত প্রমাণের বলে আমরা নিশ্চয় দাবী করিতে পারি যে বৈদিকযুগে প্রতিমা রচনার প্রথা প্রচলিত ছিল।

উপসংহারে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মহা-ঋষি অগস্ত্যের রচনা উদ্ধৃত করিয়া আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম :

সকল-নিষ্কলমীশ বিভাগতঃ
ত্রিবিধমেববপুঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
(আগস্ত্যীয়ম্ সকলাধিকারম্)।

ব্রহ্মের মূর্ত্তি রচনা সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিয়া তাঁহার "সকলাধিকার" নামক গ্রন্থের পুঁথিতে তিনি বলিয়াছেন :

পরমেশ্বরের রূপ বা বপু তিন ভাগে বিভক্ত—

'সকল' = মূর্তিযুক্ত রূপ, 'নিষ্কল' = নিরাকার রূপ, এবং 'ঈশাকার' = সর্বব্যাপী রূপ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব

অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর, এম-এ

সৃষ্টি ও জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি একদেশ-দর্শী নয়; সর্বদেশদর্শী তাকে না বলা গেলেও, বহুদেশদর্শী বলা চলে। সৃষ্টি ও জীবনের মোটামুটি দুটো দিক: এক বাইরের দিক, আর, ভিতরের দিক। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্প-সাধনায় এই দুই দিকেরই স্বীকৃতির পরিচয় মেলে।

বোধ করি, দৃষ্টির এই উভয়কোটিক ঔদার্য এবং সার্বত্রিক বিস্তার-প্রয়াসের কল্যাণেই তাঁর জীবন-দর্শন হতে পেরেছে এমন সামঞ্জস্যবাদী, এমন আশাবাদী, আনন্দবাদী। তাই, দেখা-অদেখায়, জানা-অজানায়, সীমা-অসীমায় মিলিয়ে জীবনকে দেখেছেন শাশ্বত রূপে। এ-জীবনকে মৃত্যুতেও মলিন বা ক্ষীণ হয়ে যেতে দেখেন নি তিনি। বরং দেখেছেন, মরণের সাময়িক ভয়ালতা ও দুঃখদায়িতার ছদ্মবেশের আড়ালে আছে নবীনতর জীবন-যৌবন-দাতার বরদ রূপ। তাই ক্ষয়-ক্ষতি দুঃখ-ভয় জীবনের ওপর, সৃষ্টির ওপর বিশ্বাস হারাতে দেয় নি তাঁকে। জীবনকে বারে-বারে নতুন-হতে-দেখার সীমাতিরেকী দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন যৌবনের ফিরে-ফিরে আবির্ভূত হওয়ার রূপকে। কবি জেনেছেন:

> বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
> বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
> বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন-নাশন
> বারে বারে দেখা দিবে;

জেনেছেন, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ওসব ছলনা; আসল লক্ষ্য হল সৌন্দর্যের জয়-প্রতিষ্ঠা, 'সুন্দরের হাতে আনন্দে একান্ত পরাভব' চাওয়া। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই অকুণ্ঠ সৌন্দর্যের মহিমা গান করা হয়েছে সহজ। তাঁর অনুভূত ও উপলব্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে কোন-কিছুরই বিরোধ দেখা যায় নি। এই উপলব্ধির যুক্তি অনুসারে বুঝলে বোঝা যায় যে যে-বিরোধ প্রতীয়মান হয় তা আপাত, তা ভ্রান্তিমূলক; প্রত্যক্ষের অন্তঃস্থায়ী সত্তাকে উপলব্ধি করলে সে-বিরোধ

গোচর হয় না। বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্র-ভাবসাধনার মৌল চিন্তনায় যে-উপনিষদি দার্শনিকতা তাঁর স্বভাব-সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে তার অনুপস্থিতি নেই এখানেও, অর্থাৎ, তাঁর সৌন্দর্য-চেতনাতেও।

মানবসমাজে সাধারণত চার জাতের সৌন্দর্য-সেবক দেখা যায়: (১) যাঁরা শুধু সৌন্দর্য ভোগ করেন, (২) যাঁরা সৌন্দর্য ভোগ করেন আবার সে-ভোগের কথা মোটামুটি প্রকাশ করেন, (৩) যাঁরা সৌন্দর্যস্বাদের কথা গুছিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করেন আপন-আপন মেজাজ-মর্জির মাধ্যমে, (৪) যাঁরা সৌন্দর্যসৃষ্টির আলোচনা ও বিচার করে সৌন্দর্যের স্বরূপ, নিদান, প্রকার, সার্থকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন, অর্থাৎ, যাঁরা সৌন্দর্য-তাত্ত্বিক। সৌন্দর্যসেবীদের ভেতর এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয় যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন আবার সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা-বিচারের সাহায্যে কতকগুলি মৌল সিদ্ধান্তে বা তত্ত্বে উপনীত হন; এমনি অল্পসংখ্যক সৌন্দর্য-সাধকদের একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-স্রষ্টা, দ্রষ্টা তো নিশ্চয়ই। সৌন্দর্যের বিবিধ রূপের শিল্পী-কারিকর তিনি। তিনি কবি, তিনি গাইয়ে, অভিনেতা, ছবি-আঁকিয়ে। তা ছাড়া জীবনশিল্পীও তিনি। মানুষ-জীবনের বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ নিয়ে ভাবে-কর্মে, চিন্তায়-কল্পনায়, জ্ঞানে-অনুভবে সামঞ্জস্য করবার সাধনা করে আপন জীবনকে দিয়েছেন শিল্পিত রূপের ছন্দ-সুষমা। কিন্তু, কারুকৃৎ হলেই কিছু কারুকৃতির সমালোচক ও তত্ত্বপ্রতিপাদক হওয়া যায় না। চাই কি, অনেকসময় একটা হলে আর-একটা হওয়া শক্ত হয়। কেননা, কারুকৃৎ-এর রূপভাবনিবিষ্টি সমালোচকি মেধার নিবোধন হতে দেয় না, তেমনি আবার, সমালোচকের বৈচারিক বুদ্ধি অনেক সময় বিনষ্টি ঘটায় কারুকৃতিনিবেশের। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কিন্তু শিল্পী ও সমালোচকের, সৌন্দর্যস্রষ্টা ও সৌন্দর্য-তাত্ত্বিকের সত্তার সমন্বয় ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সৃষ্টির আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। এখানে তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের মুখ্য কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

যাঁরা সৃষ্টির এই বাইরের দিক দেখেই তুষ্ট থাকেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দলের নন। তাঁর জিজ্ঞাসা প্রত্যক্ষের সীমানাতে বসে পড়ে না, পরোক্ষ লোকের দিকেও যাত্রা করে। যা আছে তার পূর্বপর পরিচয় নিতে-চাওয়া স্বভাবধর্ম তাঁর। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন তত্ত্বদর্শী। এই হিসেবেই তিনি যেমন সৌন্দর্যদৃক তেমনি সৌন্দর্যতত্ত্বদৃক, যেমন সৌন্দর্যস্রষ্টা তেমনি সৌন্দর্যতত্ত্ব-প্রকাশকও।

চেতনা ও জড়শক্তি এই দুইকে নিয়ে সৃষ্টি—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় ও ধারণা। নিগূঢ় নিহিত এক-শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্যের সূচনা এই দ্বৈততায়। এই দুই আপাত-বিরোধী রূপের অবস্থিতি রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের কোন-কোন রচনায় বেশ ফুটে উঠেছিল; যেমন:

পাশাপাশি এক ঠাঁই ঘৃণা আছে দয়া নাই
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক সাথে রয়।

* * *

জড়দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।

— সিন্ধুতরঙ্গ : মানসী

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই,
নিঠুরা প্রকৃতি !
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরিতি ! •

—প্রকৃতির প্রতি ঃমানসী

নির্ব্যূঢ়, নির্জন একে তো লীলা হয় না। কাজেই একের দুই হওয়ার দরকার হল। আর দুই হওয়া মানে একই ভাব ও রূপের দু-আধখানা হওয়া নয়, ভিন্নধর্মী ভাব ও রূপ নিয়ে ব্যক্ত হওয়াতেই যথার্থ দ্বৈততা. কেননা, তাতেই দুইএর লীলার পরিস্ফূর্তি। সৃষ্টির প্রকাশে এ লীলাবিলাসের কল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। '—বিশ্বের মধ্যে এই ছাড় দেওয়া এবং টান রাখার নিত্য লীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছেন'।—(সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য) কিন্তু, দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিচ্ছিন্ন রূপেও তো লীলা হবার সুবিধা হয় না; তার জন্য যে যুগল-মিলন চাই। চেতন আর জড়ের মিলন-সাধনে দূতীপনা করছে কে? রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন সেই দূতীকে। সৌন্দর্যই সেই দূতী। দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন তিনি : 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানের সেতু'। (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ : পঞ্চভূত) সৌন্দর্যের মোহিনী মায়ায় বিভেদের বিরোধ চুকে গেল, দুইএর ভেতর হৃদয়-বিনিময় হল :

'সে (আত্মা) যখন জড়কে বলিল সুন্দর, তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেদিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতু-নির্মাণ-কার্য এখনো চলিতেছে'। —সৌন্দর্যের সম্বন্ধ : পঞ্চভূত

এ-তত্ত্বের ফলার্থ হচ্ছে এই যে সৌন্দর্য মিলন-ধর্মী, সৌন্দর্য বিভেদ-বিরোধের অবসায়ক। এই চিন্তার অনুরূপ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় অন্যত্রও দেখা যায়, যেমন : 'অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে, সুসংগতি—আঘাত নহে, আকর্ষণ—আধিপত্য নহে, সামঞ্জস্য আমাদিগকে আনন্দ দান করে'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য 'এই সৌন্দর্যের মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে'। —সৌন্দর্য : শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সৌন্দর্য যে জড় ও চেতনের মধ্যে ঘটকালি করেই ক্ষান্ত তা নয়। এর শক্তি পশুশক্তি নয়, তা হচ্ছে আনন্দের শক্তি, প্রেমের শক্তি। তাই, তারই রয়েছে সর্বজয়ী হবার সম্ভাবনা। এখনও যদি-বা অপ্রেম-অশ্রীর অধিকার আছে কিছু কিছু, এমন একদিন আসবে যখন তা থাকবে না। তখন সবাই মানুষে সৌন্দর্যের বশ, প্রেমের, আনন্দের বশ। রবীন্দ্রনাথের কথাই তুলে ধরা যাক : 'পৃথিবীতে সৌন্দর্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছুই নাই—সে বলের দ্বারা কোন কাজ করিতে চায় না—এক সময় পৃথিবী তাহারই হইবে'। —পল্লীগ্রাম : পঞ্চভূত

এ তত্ত্ব থেকে বোধ করি এই নির্গলিতার্থ পাওয়া যায় যে সৌন্দর্য দুর্বল নয়। তা শক্তিশালী ; কিন্তু তার শক্তি আনন্দ ও প্রেমের শক্তি, ভাব ও মাধুরীর শক্তি, ভদ্রতা ও বিনয়ের শক্তি। নির্দয় পশুশক্তি তা নয়। এই ভাবের পোষকতা রবীন্দ্রনাথের অন্যত্রও পাওয়া যায়, যেমন : 'সৌন্দর্য-সৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

সৌন্দর্য শক্তিমান বলেই সে সহজে দৌর্বল্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম প্রভৃতিকে দমন করে। 'সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

P 3004 09

সৌন্দর্য শক্তিময় ও শক্তি-সঞ্চারক সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি বা ভোগ করতে হলেও দরকার সৎ শক্তির। 'সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন·····'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

যে-সৌন্দর্য শক্তি-সমন্বিত নয় তা অপূর্ণ, যে-শক্তি সৌন্দর্যরিক্ত, সেও পূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি : '···বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা'।

—পল্লীগ্রামে : পঞ্চভূত

মনে হতে পারে, সৌন্দর্য, সে শুধু প্রকৃতির শোভা। মানুষের জীবনে তার তেমন-কোন জরুরি দরকার নেই ; সে একটি বিলাস। কিন্তু সে-ধারণা ভুল। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষকে যদি যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়, মানে যদি তাকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ফলাতে হয় তো সৌন্দর্য-সাধনা তার অবশ্য কর্তব্য, একান্ত অবর্জনীয়। তাঁর নিজের কথা হচ্ছে : 'মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্য-চর্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না'। (সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য) সৌন্দর্যকে রস ধ'রে এই ভাবের কথাই তিনি অন্যত্র বলেছেন ভাষান্তরে, যেমন : 'মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড'। —সৌন্দর্য : শান্তিনিকেতন

মানুষের জীবন-সাধনায় সৌন্দর্য-চর্চা অপরিহার্য, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু, নিরন্ন, ভাবসর্বস্ব, বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের সাধনা তিনি স্বাভাবিক ও সংগত বলে ভাবেন না। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'ক্ষিতি'-চরিত্রের জবানিতে তাঁর কথা প্রকাশ পেয়েছে বলে ধরে-নেয়া-যেতে-পারে। সে-কথাটি : 'সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই, এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়'।

—সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ : পঞ্চভূত

কিন্তু, এখানেও রবীন্দ্রনাথ একান্তবাদী নন, অর্থাৎ, এখানেও তিনি সামঞ্জস্যবাদী। সৌন্দর্যচর্চা যেমন হবে না অতিসূক্ষ্ম, নিরুপ, নির্বস্তুক, তেমনি হবে না অতিস্থূল। শুধুমাত্র স্থূল প্রয়োজনের তৃপ্তির সীমানায় তাকে নজরবন্দী করে রাখবার জিনিস সে নয়। তাঁরই কথার উদ্ধৃতি দেয়া যাক : 'জগতে সৌন্দর্য রহিয়া এই যে আমাদের একটা উপরি-পাওনা ইহা আমাদের মনকে কোন্ দিকে চালাইতেছে ? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না উঠে, যাহাতে মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

এ-কথার তাৎপর্য এই যে কেবলমাত্র প্রয়োজন আমাদের জীবনকে করে সীমিত ; সৌন্দর্য তাকে মুক্তি দিয়ে করে অনন্ত। প্রয়োজনের বন্ধন জীবনকে নিরস করে, করে নিরানন্দ। সৌন্দর্য প্রয়োজনের উর্ধ্বে—এমনি একটা বাঁধা ধারণা প্রায় বরাবর কাজ করেছে রবীন্দ্রচৈতন্যে। এমনি একটি কথা হচ্ছে : 'সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইতেছে'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

তাছাড়া, 'যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর ; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের উর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে'। —সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

কিন্তু, এ-তর্ক কি উঠতে পারে না যে প্রয়োজনমাত্রই সীমিত না হতে পারে : জীবনের সীমাদায়ী, বন্ধনকারীও না হতে পারে। প্রয়োজনও কি সুন্দর হতে পারে না? সৌন্দর্য হতে হলেই যে প্রয়োজনের ওপরে উঠতে হবে, এমন কী কথা? সৌন্দর্যও কি প্রয়োজনের জিনিস নয়? এই যুক্তি পরে গ্রহণ করেই বোধ হয় প্রায় বিপরীত কথাটি বলতে হয়েছিল তাঁকে : 'আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে'।

—দ্বিধা : সাহিত্য

জীবনে সৌন্দর্যের মূল্য কোথাও-কোথাও স্বীকৃত হলেও ধর্মজীবনে অর্থাৎ ধর্মসাধনায় তার প্রয়োজনীয়তা অনেকসময়ই মানা হয় না, চাইকি, তাকে বিঘ্ন বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ সে-মতের সমর্থক নন। তিনি বরং আনন্দবাদী ধর্মরসিকদের মতের পক্ষ নিয়ে বলেন :

> 'ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্যচলনশীল প্রাণের লীলা'।　　—রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন (১১)

উপনিষদের মতে এবং তার অনুসরণে ও স্বীকরণে রবীন্দ্রনাথের মতেও ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান তো রসস্বরূপ। ধর্ম যদি তাঁকে বাদ না দিয়ে হয় তো তা রসহীন বা সৌন্দর্যবিরুদ্ধ হবে কেন? সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করতে হবে প্রাণ দিয়ে জ্ঞান দিয়ে এবং আনন্দ দিয়েও। অতএব ধর্মও সাধ্য হবে প্রাণ, জ্ঞান ও আনন্দ দিয়ে। ঈশ্বর সৌন্দর্যে যে শুধু আবির্ভূয়মান তাই নয়, এতে তিনি শান্ত-বিনীত রূপে প্রকাশমান। অন্যত্র তাঁর প্রকাশ ঐশ্বর্যে, শক্তিতে, রুদ্রতায়, এখানে শান্তিতে, স্নিগ্ধতায়, মাধুর্যে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা তুলে ধরলে এই ব্যাখ্যানার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে : 'বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর ;...'। জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে'।

—রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন (১১)

সৌন্দর্য কী জিনিস? কী এর সংজ্ঞা? কোনও স্পষ্ট-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে তাঁর এ-বিষয়ের আলোচনা থেকে তাঁর মতানুযায়ী সংজ্ঞা একটা নির্ধারণ করে-নেয়া যায়। যে-বস্তু সব-কিছুর ভিতর মিলন সাধন করে, সব-কিছুর সঙ্গেই মিলতে কোন বাধা হয় না যার, তাই সৌন্দর্য। যা মেলে এবং মেলায় তা আনন্দ দেয়। অতএব, যা সুন্দর তা আনন্দ দেয়, অথবা, যা আনন্দ দেয় তা সুন্দর।

> '—বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে'।　　—সৌন্দর্য : শান্তিনিকেতন

সত্যও যে সৌন্দর্য তা বুঝতে পারা যায় যখন তাতে আনন্দ পাওয়া যায়। '...সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য'।　　—সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

বহির্বিশ্বের যেমন দুটো দিক আছে, বা'র ও ভিতর, মানুষের তেমনি দুটো দিক আছে : একটা বাহ্য ইন্দ্রিয় বা বাইরের দিক, অপরটা মন বা ভিতরের দিক। এ দুইএর মধ্যে অবশ্য সম্বন্ধ বিরোধ বা প্রতীপতার নয়, বরং পারস্পরিক প্রভাবের ও পরিপূরকতার। এই দুইএর যোগাযোগেই মানবীয় সত্তার পূর্ণতা বা তার সম্ভাবনা। বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মিলিয়ে যে-বোধ তা সমঞ্জস। শুধু বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো দিয়েও এক রকমের সৌন্দর্যবোধ হতে পারে,

আবার, শুধু আন্তর ইন্দ্রিয় দিয়েও আর এক-রকমের সৌন্দর্যবোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু, এর যে-কোন রকমটাই খণ্ডিত বা অপূর্ণ। এই আংশিক সৌন্দর্যবোধ যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখনই তার একরকম সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আর-একরকমের মিল খায় না। রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অনুসারে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে এই আংশিক সৌন্দর্যবোধ যথার্থ সৌন্দর্য-বোধ নয়, কেননা, তা বিরোধভাবী : যা মিলনধর্মী নয় তা সুন্দরও নয়, সৌন্দর্যবোধও নয়। এখানে তাঁর সেই কথাটি মনে করা যাক : 'সৌন্দর্য মিলবে ব'লেই ধরা দেবে ব'লেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে'।

—রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন (১১)

অথবা,—'...সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য

বাইরের জগতে সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুকে মিলিয়ে দেখা আর দ্রষ্টার সত্তার সব অংশ দিয়ে দেখাতেই যথার্থ সৌন্দর্যবোধ জাগাবার উপায় হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য'।

—সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য

এই যে সমগ্র দৃষ্টি এ তো শুধু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হবার উপায় নেই। বাহ্যদৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা সৌন্দর্যবোধ বা উপলব্ধির যে অংশত জাগায় তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু, সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মননের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে না দেখা অবধি তো শুধুমাত্র বাইরে-পাওয়া সৌন্দর্যকে যথার্থ সৌন্দর্য বলে পাওয়া দুষ্কর। সৌন্দর্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 'রঙচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন।.....শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না'।

—সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সহজলভ্য সৌন্দর্যে সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব বা গভীরতা নেই। শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় সৌন্দর্য মনের সমাদর পায় না। 'এক প্রকারের মিষ্টতা আছে তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া। এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে ; বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়'।

—কেকাধ্বনি : বিচিত্র প্রবন্ধ

কিন্তু মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উপলভ্য সৌন্দর্য হতে লভ্য যে-আনন্দ তা কি পূর্ণ, সমগ্র? রবীন্দ্রনাথের উত্তর হবে, হাঁ ; কেননা, মন দিয়ে ভোগ্য সৌন্দর্য এবং তা থেকে পাবার আনন্দের ভেতর থাকে সামঞ্জস্য। তাঁর উক্তি ও যুক্তি হচ্ছে : 'একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর'। (কে. : বি. প্রবন্ধ) অর্থাৎ, তাঁর মত এই দাঁড়াচ্ছে যে যদি কবি যে বাহ্যইন্দ্রিয়লব্ধ সৌন্দর্যে থাকবে ঐ 'সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ'

—তাই শেষ অবধি যথার্থ সৌন্দর্য ব'লে ধর্তব্য হবে। মানে, ইন্দ্রিয় দিয়ে হঠাৎ-পাওয়া সৌন্দর্যকে মন দিয়ে পাওয়া অবধি অপেক্ষায় থাকতে হবে, যদি কিনা তাকে যথার্থ সৌন্দর্যের অভিধা পেতে হয়। এখানে অবশ্য এই তর্কের অবকাশ আছে যে বাহ্য-ইন্দ্রিয়-দিয়ে-পাওয়া সৌন্দর্যকে কি তবে সৌন্দর্য বলাই যাবে না? তখন, রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে বোধ করি এই জবাব হবে যে তাকে সৌন্দর্য হয়তো বলা যেতে পারবে, কিন্তু তাকে 'যথার্থ' এই বিশেষণে বিশেষিত করতে বাধা থাকবে। ইন্দ্রিয়ানুভূত সৌন্দর্য মোটে সৌন্দর্যই নয়—এমন কথা রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অনুসারে বললে তাঁর উক্তিতে স্ব-বিরোধ ঘটানো হবে। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে সবই সুন্দর: 'সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী'।

—সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য

তবে, প্রশ্নটা হবে, সবই সমান সুন্দর কি না। সবই সুন্দর—একথা ধরে নিলেই সবই সমান সুন্দর, একথা না ধরেও পারা যায়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অনুসরণ করে এই কথাটা বলা চলে যে শুধুমাত্র বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয়কে যা আনন্দ দেয় তাই যে সৌন্দর্য তা নয়, তা ছাড়াও অন্যবিধ সৌন্দর্য আছে; তা হচ্ছে মন দিয়ে, অর্থাৎ, বুদ্ধি ও বোধ দিয়ে যে-সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হয়।

বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে উপভোগ্য সৌন্দর্য—এই দুই জাতের সৌন্দর্যের কথা—সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মূল কথা।

তা হলে একটা জিনিস স্পষ্ট করে পাওয়া যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে সৌন্দর্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতাবোধ। অর্থাৎ, সৌন্দর্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সাকল্যদর্শী, নানা অংশকলা মিলিয়ে যে সাকল্য তাঁর দর্শক তিনি। তাঁর এই পূর্ণতা-বোধ প্রায় আর-সব চিন্তাধারাতেই অল্পবিস্তর অনুস্যূত হয়ে থাকতে দেখা যায়। একথা বহুলাংশে ঠিক যে তাঁর এই বোধের প্রেরণার প্রধান উৎস ঔপনিষদিক প্রজ্ঞা। কিন্তু পূর্ণসত্তার এই যে বিচিত্র উপলব্ধি, অর্থাৎ, এখানে যেমন সৌন্দর্যকে পূর্ণতার আলোকে দেখার রীতি রয়েছে,—তা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় অনুভূতি ও বিবেচনার বিশিষ্ট। এ-বোধ রাবীন্দ্রিক ভাবসত্তার অন্যতম মৌল উপাদান বলে গণ্য হতে পারে।

এই পূর্ণতা-বোধের কল্যাণেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে শেষ পর্যন্ত সত্য ও শিবের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। তাঁর কাছে শুধু 'বিউটিই ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি' নয়। সত্য শিব ও সুন্দর মূলে অভিন্ন ও এক, অর্থাৎ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর; শিবই সত্য, শিবই সুন্দর, আর সুন্দরই শিব, সুন্দরই সত্য। সবই আসলে সেই অদ্বয়-তত্ত্ব। এদের ভেতর যে-ভেদ তা বাহ্য। তার মানে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব চরমে গিয়া পরাতত্ত্বে বা পরাৎপরতত্ত্বে মিশে গিয়েছে। এ-সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে তাঁর কতকগুলো উক্তির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। যেমন: 'যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের উর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে'।

—সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

ভাবটা এই যে মঙ্গল শুধুমাত্র মঙ্গল হয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেনা, তার সুন্দরও না হলেই নয়। এর সমর্থনে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক: 'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ'। —সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

এ-কথা থেকে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের মৌল ঐক্যের সম্পর্কের বিষয়ই কি প্রতিপাদিত হয় না

STUDENT

অন্তত, এ-অর্থটুকু নিশ্চিত যে সৌন্দর্য পূর্ণ হয় না মঙ্গলময় না হলে, মঙ্গলও অপূর্ণ থাকে সুন্দর না-হওয়া অবধি।

এ যেমন শিবের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্কের কথা হল তেমনি রয়েছে সত্যের সঙ্গে শিবের ও সুন্দরের সম্পর্কের কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্য ও শিবের মধ্যে সৌন্দর্যকে দেখতে পাওয়া যায় তখনই যখন এদের বাহ্য পার্থক্য ভেদ করে দেখা যায় তাদের মধ্যেকার মিল বা সংগতিকে। তাঁর কথায়: 'সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না'। —সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যেরও বিরোধ তো নেই-ই, বরং আছে সেই মূলগত মিল। তাই:

'...সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য'।

—সৌন্দর্যবোধ: সাহিত্য

অর্থাৎ, সত্য ছাড়া সৌন্দর্য হতে পারে না, আর সৌন্দর্য ছাড়া সত্যও।

এই কথাগুলোকে জড়ো করলে এই দাঁড়ায়: সত্য ছাড়া শিব হতে পারে না, শিব ছাড়া সত্য; সত্য ছাড়া সুন্দর হতে পারে না, সুন্দর ছাড়া সত্য; সুন্দর ছাড়া শিব হতে পারে না, শিব ছাড়া সুন্দর।

কিন্তু, একথা মনে না হয়ে পারে না যে এ হয়েছে ছাঁচে-ফেলা সিদ্ধান্তের অতি সরলীকরণ। যদি বলা যায়: 'সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য

তবে মিথ্যা ব'লে, অ-সুন্দর ব'লে কিছু থাকে কি? বাইরের জগতে সব পার্থক্য-বোধ লুপ্ত হলে বা হতে দিলে সৌন্দর্য-বোধ, সত্যবোধ বা কোন বোধের অস্তিত্বের কথা ওঠবার সুযোগ থাকে কি? থাকে না ঠিকই। তবে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ভাবনায় সত্য, শিব, সুন্দর—এই ভাবত্রিতয়ের শুধু ঐক্যেরই স্বীকৃতি নেই, তাদের বাহ্য বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যেরও স্বীকৃতি আছে। তবে, সৌন্দর্যতত্ত্বের চরম বিচারে যে সৌন্দর্যের এই সমগ্র রূপের কথাও ভাব্য—সেই কথাই বোধ হয় তাঁর বক্তব্য। সেই লক্ষ্যেই বোধ করি বলছেন: 'জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য

বৈচিত্র্য এবং ঐক্য, অর্থাৎ বিচ্ছেদ ও মিলন—এই দুইএর যোগাযোগেই যে সৌন্দর্যের স্ফুরণ, সে-উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাতে রয়েছে: '...বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্যের প্রধান কারণ'। —পল্লীগ্রামে: পঞ্চভূত

অথবা,—'এইরূপে সৌন্দর্যকে প্রথমে চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্যকে চিনিবার চর্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারিদিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য

অতএব প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তায় স্ববিরোধ আছে বলে মনে হলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনে সে-ধারণার নিরসন হবে। তাঁর চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী, ঐক্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের অথবা বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, আর, বাহ্য-ইন্দ্রিয়-লব্ধির সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়-লব্ধির, অথবা অন্তরিন্দ্রিয়লব্ধির সঙ্গে বাহ্য-ইন্দ্রিয়-লব্ধির মিলিয়ে-দেখা দিয়েই যথার্থ সৌন্দর্যের উপলব্ধি নিরূপণ ও বিচার হতে পারে। যে-কোন একটা দিক দিয়ে দেখা সৌন্দর্য খণ্ডিত সৌন্দর্য, মানে যথার্থ সৌন্দর্য নয়। সৌন্দর্যের স্বরূপ হচ্ছে তার সমগ্রতায়, সাকল্যে অর্থাৎ সাংশ পূর্ণতায়।

সৌন্দর্যের এই সার্বভৌম সত্তা, এই অসঙ্কোচ সর্বাশ্রয়িতা, এই সর্বমিলনসংগতির জন্যেই

তার এমন সর্ববিমোহকতা। সব-কিছুর সঙ্গে সে মিলে থাকতে পারে বলেই তার পরিচয় সবার সঙ্গে। তাই, সব-কিছুর পরিচয় করিয়ে দিতে সে যেমন পারে তেমন আর কিছু নয়। দুর্জ্ঞেয়, নিগূঢ়, রহস্যকে জানতে চাওয়ার প্রেরণা জোগাতে পারে সে-ই। সৌন্দর্যই সুগম করে দুর্গমকে, সহজ করে দেয় কঠিনকে। সৌন্দর্যের পথ দিয়েই জ্ঞানের, প্রেমের মন্দিরের পানে অভিসার। সৌন্দর্যেই মুক্তি—মুক্তি ভয় থেকে, দুঃখ থেকে। এক কথায় সৌন্দর্যেই যথার্থ জীবন, জীবনের সম্ভাব্যতম বিকাশ। এই ভাবব্যাখ্যানার উৎস হচ্ছে এই ছত্রগুলি :

> 'সৌন্দর্য আত মানিয়া চলে না, সে সকলের সঙ্গে মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরচিন্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল সুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই।.....সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর-সমস্তকেই দেখি ; মধুর গান সমস্ত জলস্থল আকাশকে অস্তিত্বমাত্রকেই মর্যাদা দান করে'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য

এক হিসেবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে সৌন্দর্যব্রহ্মবাদ ; অর্থাৎ সৌন্দর্যই ব্রহ্ম, সৌন্দর্যই সব। এই নিগূঢ়-দর্শিতা লাভ করেই বোধ করি তিনি বলতে পেরেছেন একথা : 'সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই'। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য

এই রকম দৃষ্টি লাভ হলেই সৌন্দর্যবোধের চরম স্ফূর্তি হয়েছে বলা যাবে : 'জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য'।

—সৌন্দর্য ও সাহিত্য : সাহিত্য

সৌন্দর্যের এই ব্রহ্মতা, বহির্ভূতার যে অসীমতা আছে তাতে অনেক-কিছুকে, মায় নিজেকেও, নতুন-ক'রে, দুর্লভ-ক'রে পাওয়ার সুযোগ আছে। দূরতার মধ্যেও আছে সেই নতুন-ক'রে, দুর্লভ-ক'রে পাওয়ার সুযোগ। তাই : 'দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর'।

—১৫ : শেষ সপ্তক

কিন্তু, এর উল্টোটাও তেমনি সত্যি, মানে সৌন্দর্যেও আছে দূরতা, কেননা, তাতেও আছে সেই নতুন ক'রে, দুর্লভ ক'রে পাওয়ার সুযোগ। তাই, কবি রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর'। —১৫ : শেষ সপ্তক

এ-কথার মানে শুধু এই নয় যে 'দূরতা সৌন্দর্যের ওপর মায়া বুলিয়ে দেয়' ; সৌন্দর্যের স্বকীয় গুণ বা ধর্ম হচ্ছে তার দূরতা। এ তার বাইরে-থেকে-পাওয়া সামগ্রী নয়। যা পাওয়া হয়ে গেছে, যা পাওয়ার তৃপ্তি মিলেছে তার সৌন্দর্যও গেছে ফুরিয়ে। যথার্থ সৌন্দর্য সদা-অফুরন্ত :

> A thing of beauty is joy for ever
>
> —কিট্‌স্

কেননা,

> It's loveliness increases it will never
> Dwindle unto nothingness.
>
> —ঐ

এই 'লাভ্‌লিনেস্', অর্থাৎ, এই যে মনোহারিতা—এর অশেষতাই সৌন্দর্যের লক্ষণ। এর মনোহারিতা ফুরোয় না বলেই এর ধ্রুবতা, দুর্লভতা। এর এক দিকে প্রাপ্তির সুখ, অন্যদিকে অপ্রাপ্তির বেদনা; তাই তৃপ্তি-অতৃপ্তি-মেশানো এই সৌন্দর্যনামক বস্তুটি, যেমন প্রেম। সেইজন্যেই সুন্দর রূপের পূজারিকে বলতে হয়:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
... ...
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

প্রেমের সৌন্দর্য-দ্রষ্টাকেও তেমনি বলতে হয়:

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেবা করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥

—চৈতন্য চরিতামৃত

সৌন্দর্যের স্বভাব হল কিছুটা ধরা দেয়া, কিছুটা পালিয়ে-বেড়ানো। তার সবটাই যে ধ্রুব বা দুর্লভ তা নয়। কেননা, নিশ্চিত প্রাপ্তিতে যেমন তেমনি পরিপূর্ণ অপ্রাপ্তি বা দুর্লভতাতেও আনে ঔদাসীন্য। সৌন্দর্যের লীলা তাই প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সীমা-অসীমা, জানা-অজানা মিলিয়ে। এখানেও সৌন্দর্যের সেই মিলনধর্মিতার কথা ফিরে এল। কবির কথায় সুন্দরের পরিচয় হচ্ছে:

পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

—১৫ : শেষ সপ্তক

সুতরাং, রবীন্দ্র-চেতনায় সুন্দরের যে-উপলব্ধি তাতে ঘুরেফিরে তার সর্বময়তা, সর্বরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, সৌন্দর্য এমন বস্তুরূপে প্রতীত হয়েছে যে তা আছে স্থান-কাল-পাত্রের সব রূপ সব অবস্থা জুড়ে। তাই, রবীন্দ্র চেতনায় শুধু জীবনে নয়, মরণেও সুন্দরের সত্তা হয়েছে অনুভূত। এই অনুভূতির প্রসাদেই কবি বলতে পেরেছেন:

এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, শুভ্র, নিঃশব্দ, সুদূর—
জীবনের চার দিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

—১৫ : শেষ সপ্তক

সুন্দরের মধ্যে আছে মৃত্যু, যেমন জীবনও। কী নেই সুন্দরের মধ্যে? কেননা, সুন্দর যে সর্বত্রবিরাজী। তাই, সৌন্দর্য বাঁচে, সৌন্দর্য মরেও। এই বাঁচা-মরা আর মরা-বাঁচার ভিতর দিয়েই তার বিচিত্র-কিন্তু-অনন্ত প্রবাহ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চিন্তনাসমূহকে সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে নিলে এই ক'টি কথা দাঁড়ায়: সৌন্দর্য বহু বিচিত্র ও স্বতন্ত্র পদার্থের ভিতর মিলন সাধন করে। সৌন্দর্য স্থান-কাল-পাত্রের সব রূপ ও অবস্থায় বিরাজমান। যা দেহ মনের বিবিধ বৃত্তির নন্দক তাই সুন্দর। সৌন্দর্যের উপলব্ধির সহায়ক শুধু বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি নয়, অন্তরিন্দ্রিয়ও।

সৌন্দর্য-সাধনা জীবনের বিকাশের জন্য একান্ত দরকার। এমন-কি ধর্মসাধনার জন্যেও তার আবশ্যকতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যতত্ত্বকে এককথায় সৌন্দর্যব্রহ্মবাদ বা সর্বসৌন্দর্যবাদ বলা যায়।

একটা প্রশ্ন ওঠা সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের এই যে সৌন্দর্য-বিষয়ক মতবাদ—এতো দার্শনিক ব্যাপার, ভাব ও ভাবনা-লোকের বিষয়, শিল্পসাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টি বা আস্বাদনের ক্ষেত্রে এ-সব চিন্তার প্রয়োগ্যতা কিছু আছে কি? হঠাৎ এ জিজ্ঞাসার জবাব জোগানো কঠিন। কিন্তু, একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে যে সেখানেও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ভাবনার সূত্রগুলি যথাপ্রয়োজনে প্রযোক্তব্য বিবেচিত হবে। সৌন্দর্যতত্ত্বের অনেক উক্তি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-আলোচনাপ্রসঙ্গেই করেছেন। শিল্প-সৃষ্টি ও তার ভোগের বেলাতেও মনে করে নিলে সুবিধাই হবে যে সব-কিছুই সুন্দর, সুন্দর স্ব-স্ব রূপে, থাক তাদের রূপের তথা সৌন্দর্যের পার্থক্য। তবে সে-সব সৌন্দর্য দেখতে পারা চাই, দেখে আবার সৃষ্টি করতে পারা চাই, স্রষ্টারা তা যদি পারলেন তো স্বাদগ্রহিতাদের সে-সব তারিফ করবার মতো বোধি, বুদ্ধি ও বোধ থাকা চাই। মোটকথা, শিল্পসৃষ্টির বেলাতেও কি প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপের আত্ম-সংগতিপূর্ণ স্ফুটনাতেই নয় তার সৌন্দর্য?

জীবন্মুক্তি

স্বামী সত্যরূপানন্দ

যে ভাগ্যবান্ পুরুষ অপর সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান করিয়াই অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভে কৃতার্থ হন তাঁহাকেই বলা হয় জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মবিদ্। তাঁহার জন্মে কুল হয় পবিত্র আর জননী হন ধন্যা। মুমুক্ষু পান তাঁহার মধ্যে আশার বাণী।

এই মুক্তি দেহে অবস্থান কালে আসে বলিয়া ইহাকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। দেহপাতান্তে যে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা বিদেহ মুক্তি। আমরা এই প্রবন্ধে জীবন্মুক্ত ও তাঁহার অবস্থাভেদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী বেদান্তসার গ্রন্থে জীবন্মুক্তের লক্ষণ করিয়াছেন—

জীবন্মুক্তঃ নাম স্বস্বরূপাখণ্ডৈকব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞানতৎকার্যসঞ্চিতকর্মসংশয়বিপর্যয়াদীনামপি বাধিত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।

—অর্থাৎ স্বস্বরূপ অখণ্ডৈক ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নাশপূর্বক নিজস্বরূপ অখণ্ড-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তজ্জন্য অজ্ঞান ও তাহার কার্য যে সঞ্চিত কর্ম, সংশয় ও বিপর্যয়াদি বাধিত হওয়ায় অখিলবন্ধরহিত ব্রহ্মনিষ্ঠকে জীবন্মুক্ত বলা হয়।

এই লক্ষণে তিনি—'যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি জীবন্মুক্ত'—এইরূপ উক্তি করেন নাই। কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে বদ্ধজীবও ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মে স্থিত। লক্ষণের এই অতিব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠের একটি বিশেষণ দিয়াছেন—'অখিলবন্ধরহিত'—অর্থাৎ যাহার সকল কর্মবন্ধন রহিত হইয়াছে—তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ বা জীবন্মুক্ত। নিজস্বরূপ অখণ্ডৈকব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে, এই কর্মবন্ধন রহিত হয় তাহাও তিনি লক্ষণে উল্লেখ করিয়াছেন। বদ্ধজীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার কর্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া তিনি জীবন্মুক্ত পদবাচ্য নহেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান ও তাহার কার্য সঞ্চিত কর্মাদির নাশের কথা শ্রীসদানন্দ সরস্বতী উক্ত লক্ষণে বলিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্মের নাশের কথার উল্লেখ না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্মের সংস্কার জীবের আশয়ে বীজরূপে সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত কর্মবীজের মধ্যে যে সকল বীজ অদৃষ্টবশে ফলপ্রসবের যোগ্যতালাভ করিয়া জীবের নূতন দেহ ধারণের হেতু হয় সেই সকল ফলপ্রসবোন্মুখ কর্মবীজসন্তানকেই সেই দেহের প্রারব্ধ কর্ম; আর যে সকল কর্মবীজ ফলপ্রসবের যোগ্যতা লাভ করে নাই—যাহারা অনাগত জীবনে ফলপ্রসবের আশাতে সেই জীবের আশয়ে সুপ্ত বা অনুদ্বুদ্ধ অবস্থাতে থাকে সেই কর্মবীজ-সন্তানকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়। জীবের আশয়ে যেরূপ পূর্ব-পূর্ব জন্মকৃত কর্মের বীজ অনুদ্বুদ্ধ অবস্থাতে বর্তমান থাকে সেইরূপ বর্তমান জীবনে কৃত যে সকল কর্ম এই জীবনে ফলপ্রদান করিবার সুযোগ লাভ করিল না তাহারাও সেই আশয়ে সঞ্চিত কর্মের গোষ্ঠীতে সমাহিত থাকে। সুতরাং ইহারাও সঞ্চিত কর্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানোত্তর প্রারব্ধকর্মের অস্তিত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রস্থানত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। ভোগ ব্যতীত ইহার ক্ষয় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬।১৪ খণ্ডে উল্লেখ আছে :—তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্য ইতি। অর্থাৎ তাঁহার (জীবন্মুক্তের) সেই পর্যন্তই (বিদেহমুক্তিলাভের) বিলম্ব যাবৎ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হয়। তাহার পর (অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্মের ক্ষয়ের পর) দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি ৪।৪।৭—অর্থাৎ যে সমস্ত কামনা এই পুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে সে সমুদয় কামনা যখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায় তখন সেই পুরুষ মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করে এবং এই দেহে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করে।

এই দেহেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করে—এই কথা বলাতে ইহাই স্বীকার করা হইল যে, এই দেহের আরম্ভকহেতু প্রারব্ধকর্ম তখনও বর্তমানে আছে—ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা ধ্বংস হয় নাই।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনেও উক্ত হইয়াছে—অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ। ৪।১।১৫—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বকালীন জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত এবং ইহ জন্মকৃত কর্ম যাহা ফলভোগরূপকার্য আরম্ভ করে নাই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও বলিয়াছেন—'জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে'*—অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকেই ভস্মসাৎ করে, তথাপি শ্রুতি ও ন্যায় বাক্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আচার্য শঙ্কর এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—সামর্থ্যাদ্ যেন কর্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। আচার্য শঙ্কর স্পষ্টতঃ বলিয়া দিলেন যে, প্রারব্ধকর্ম একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার কর্ম সবীজ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ধ্বংস হয়। উপনিষদের বচন গীতার বচনের অপেক্ষা বলবত্তর। সেইজন্য উহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আচার্য গীতাবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রস্থানত্রয় হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া আমরা দেখিলাম যে, অজ্ঞানের সহিত সকলপ্রকার সঞ্চিত কর্মের ধ্বংস ব্রহ্মানুভূতির দ্বারা হইলেও জীবন্মুক্ত প্রারব্ধ কর্মের অধীন থাকেন। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্তির যোগ্যতা লাভ করেন নাই তাঁহাকে কিন্তু—

---

*যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীতা ৪।৩৭

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটীশতৈরপি॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীমদ্বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মবিদ্ বা জীবন্মুক্তের অবস্থাভেদে সাতটি ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহার মধ্যে প্রথম তিন ভূমিকাতে জীবন্মুক্তের প্রস্তুতি চলে। চতুর্থ ভূমিকাতে আরূঢ় পুরুষই জীবন্মুক্ত পদবাচ্য। ইঁহারই অবস্থান্তর ভেদ করা হইয়াছে অবশিষ্ট তিন ভূমিকাতে। সপ্তম বা অন্তিম ভূমিকাতে অবস্থান কালে জীবন্মুক্তের হয় বিদেহ মুক্তি।

প্রারব্ধচালিত কোন পুরুষ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখে জর্জরিত হইয়া যখন জাগতিক কোন বস্তুতেই স্থায়ী আনন্দ পান না—যখন জগতের সমস্ত কিছুই তাঁহার নিকট অনিত্য বলিয়া মনে হয়—যখন সদা চঞ্চল ও অস্থির এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের পশ্চাতে চির অচঞ্চল, স্থির, নিত্য বস্তুর জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে এবং সেই চির শান্ত ও নিত্য বস্তুর সন্ধান পাইবার জন্য যখন তিনি নির্মম হইয়া প্রিয়তম বস্তুকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন, তখন তিনি শুভেচ্ছাখ্যা নামিকা প্রথমা ভূমিকাতে আরূঢ় বুঝিতে হইবে। ভাবী জীবন্মুক্তের জয়যাত্রার পথে এই হইল প্রথম শুভ পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হইল তাঁহার গুরুপসদন। কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া তিনি যখন অদ্বৈত তত্ত্বের প্রথম শ্রবণ ও পরে মনন অর্থাৎ শ্রুত উপদেশের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিচারে রত থাকেন তখন তিনি বিচারণাখ্যা দ্বিতীয়া ভূমিকাতে অবস্থান করিতেছেন। ইহার পর যত্নপূর্বক সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবনা বিচারের দ্বারা পরিহার করিয়া মননলব্ধ সত্য বস্তু বা তত্ত্বে ক্রমাগত নিদিধ্যাসনের ফলে মনের যখন সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণের যোগ্যতা হয় তখন তিনি তনুমানসা নামিকা তৃতীয়া ভূমিকাতে উন্নীত হইয়াছেন। উপরি উক্ত ভূমিকাত্রয় হইতেছে জীবন্মুক্তির প্রস্তুতিভূমিকা। তৃতীয়া ভূমিকারূঢ় সাধকের নিকট এই জগৎপ্রপঞ্চ অপর ইতর সাধারণের মতই বাস্তব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহার উপর তাঁহার আসক্তি বা মমত্ব বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়।

তৃতীয় ভূমিকাতে অবস্থানকালে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশীর্বাদপূত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল বৃত্তিশূন্য চিত্তের নিরন্তর নিদিধ্যাসনের ফলে সাধকের যখন ব্রহ্মাত্মিকারূপে স্বস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হয় তখন তিনি সত্ত্বাপত্তি নামিকা চতুর্থী ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই ভূমিকাতে অবস্থানকালে জীবন্মুক্তের চলন-বলন-আহার-নিদ্রা ইতর জনসাধারণের মত বাস্তবতঃ দৃষ্ট হইলেও তাঁহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়। এই হেতু জীবন্মুক্তের এই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলা হয়। স্বপ্নাবস্থা হইতে পুরুষ যেমন অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে জাগ্রত হন, জীবন্মুক্তও সেইরূপ এই অবস্থাতে অপরের সাহায্য ভিন্ন সমাধি হইতে উত্থিত হন। ইহার পর আসে তাঁহার অসংসক্তিনামিকা পঞ্চমী ভূমিকা বা সুষুপ্তি অবস্থা। এই ভূমিকাতেও তিনি অপরের প্রযত্নভিন্ন সমাধি হইতে জাগ্রত হন, তবে এখন সমাধি হয় পূর্বাপেক্ষা গভীর ও দীর্ঘকালস্থায়ী। পঞ্চমী ভূমিকার সেব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত করিবার ফলে সাধকের ধ্যান ক্রমশঃ গভীরতর হইতে গভীরতম রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পদার্থাভাবনী নামিকা ষষ্ঠী ভূমিকাতে উন্নীত করে। চিত্তের মধ্যে তাঁহার কোনরূপ বিক্ষেপের বীজ না থাকায় অপরের

---

*জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাদতোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা॥

প্রচেষ্টা ভিন্ন তিনি এখন সমাধি হইতে উত্থিত হইতে এবং উত্থানের পর শরীর ধারণের অনুকূল কার্যাদি করিতে সক্ষম হন না। গাঢ় সুষুপ্তির সহিত এই অবস্থাকে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার পর সপ্তমী ভূমিকাই হইতেছে জীবন্মুক্তের চরম বা তুরীয় অবস্থা। এখন আর তাঁহার স্বস্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমাধি ভঙ্গ করিতে অপরের কোন প্রযত্নই সক্ষম হয় না। জীবন্মুক্তী মীন কারণ সলিলে নিমগ্ন হইয়া এখন আত্মানন্দে বিভোর—তাই জগতের সঙ্গে তাহার সর্বসম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। প্রারব্ধ কর্মের লেশটুকু ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য যে কয়েকদিন এই দেহে বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হয় সেই কয়েকদিন ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে বা ইচ্ছায় তাঁহার দেহে প্রাণের কার্য চলিতে থাকে। প্রারব্ধকর্মের শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন্মুক্তের বিদেহ মুক্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই তুরীয় অবস্থার জীবন্মুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—এই অবস্থাতে শরীর তাহার মাত্র একুশ দিন থাকে।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম যে, জীবন্মুক্ত অবস্থাতে আসিতে হইলে তাহার প্রস্তুতি হিসাবে যে তিনটি ভূমি বা অবস্থা অবশ্যই অতিক্রম করিতে হয় তাহাতে সাধকের দ্বৈতজ্ঞানজন্য অশাস্ত্রীয় ও ইতরজনসুলভ প্রারব্ধকর্মনিচয়ের মূল অবশ্যই শিথিল হইয়া যায়। এই অবস্থাতে ইহাদের আত্যন্তিক অভাব না হইলেও ভৃষ্টবীজের ন্যায় ইহারা জীবন্মুক্তের আশ্রয়ে দেহাবসান পর্যন্ত লীন হইয়া থাকে। ভর্জিতবীজ সদৃশ এই কর্মবীজসন্তান ফলপ্রসবে সমর্থ হয় না বলিয়া জীবন্মুক্তের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিকাতে অবস্থানকালে তাঁহার দ্বারা অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয় কোন কার্য করা আর সম্ভব হয় না।

প্রস্থানত্রয় সুস্পষ্টভাবে জীবন্মুক্তের কথা উল্লেখ করিলেও বেদান্তদর্শনের আচার্যগণ ইহার বাস্তব অস্তিত্ব বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। আচার্য শঙ্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সর্বজ্ঞাত্মমুনি এবং প্রকাশানন্দ প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই অবস্থা স্বীকার করেন নাই। প্রারব্ধকর্মের সহিত অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতির সহ অস্তিত্ব এক পুরুষের নিকট এই সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। ইঁহারা সরল কথায় বলিতে চান যে, পঞ্চভূতের খাঁচায় বাস করিয়া পঞ্চভূতাতীতের অঙ্কে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া চলিতে পারে না। অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মূলাবিদ্যার আত্যন্তিক উচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাহার কার্য জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম, দেহ এবং দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চের অবশ্যই উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। কারণ নাশে কার্যের নাশ সকলেই স্বীকার করেন। সূতা দগ্ধ হইবার পর সেই সূতাজাত পট বা বস্ত্রের অস্তিত্ব কোন সুস্থ ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। সুতরাং জীবন্মুক্তি কাল্পনিক কিন্তু বিদেহমুক্তি বাস্তব। জীবন্মুক্তির শ্রুতিকে ইহারা অর্থবাদ বলেন।

অপর পক্ষে পদ্মপাদাচার্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ শ্রুতির এই মহাশাস্ত্রদ ও উদার বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎকারণ মূলাবিদ্যার নাশ হইলেও জীবন্মুক্তের দেহ বা জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব থাকিতে কোন বাধা নাই। বিরোধী পক্ষের উদাহরণকেই স্বপক্ষের উদাহরণরূপে উপন্যাস করিয়া ইঁহারা বলেন—সূত্রের নাশে পটের নাশ হইলেও পটের আকার কিন্তু নষ্ট হয় না। পটের আকার পটদগ্ধোত্তর সেই দগ্ধসূত্রের শরীরেই যেমন বর্তমান থাকে;—অথবা রজ্জুনরসিক্ত পাত্রকে

পরিষ্কার জলে ধৌত করিবার পরেও ঐ পাত্রে রসুনের গন্ধ যেমন বর্তমান থাকে * সেইরূপ এই সম্প্রদায়ের আচার্যগণ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎপ্রপঞ্চের মূল কারণ অবিদ্যার নাশ হইলেও পটের আকার ও রসুনের গন্ধের ন্যায় মূলাবিদ্যার কার্য এই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব জীবন্মুক্তের নিকটে বর্তমান থাকিতে কোন বাধা হয় না। জীবন্মুক্তের দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎপ্রপঞ্চের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মূলাবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ —এই দুই শক্তিরই নাশ কল্পনা করেন।

জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন এমন অপর এক দার্শনিক সম্প্রদায় উপরি উক্ত যুক্তি হইতে পৃথক অপর যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোত্তর জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্বে হেতু প্রদর্শন করেন। ইহারা বলেন, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান মূলাবিদ্যার আবরণশক্তির প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ শক্তিরই নাশক হয়; কিন্তু বিক্ষেপশক্তি বর্তমান থাকে। এবং ইহার ফলেই জীবন্মুক্তের নিকট জগৎপ্রপঞ্চের প্রতিভাত হয়। †

উপরিউক্ত উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই জীবন্মুক্তি স্বীকার করিতেছেন। এক সম্প্রদায় পট নাশে পটের আকার অথবা রসুনরসের অবর্তমানে সেই পাত্রে উহার গন্ধের অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মূলাবিদ্যার নাশে তাহার কার্যের এই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবং অপর পক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে মূলাবিদ্যার আবরণ শক্তির নাশ স্বীকার করিয়া তাহার বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে জীবন্মুক্তের সম্মুখে প্রতিভাত জগৎপ্রপঞ্চের উপপত্তি করেন। উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তির মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। এই বিষয়ে উৎসুক পাঠক পাঠিকা পঞ্চপাদিকা, বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থপাঠ করিতে পারেন।

মাতৃসদৃশা মহোপকারিণী উপনিষদ্ জীবন্মুক্তির সন্ধান দিয়া মুমুক্ষুর বড়ই একটী আশার বাণী শুনাইয়াছেন। এই দেহে অবস্থান করিয়া পূর্ণব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব—স্ব স্বরূপের সন্ধান পাইব !!—ইহা কল্পনা করিতেও শিহরণ হয়। জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'—উপনিষদের এই উক্তি সার্থক হয়। এই সকল ভাগ্যবান্ পুরুষই আর্ষশাস্ত্রের চরম ও পরম সত্য নিজ জীবনে সাক্ষাৎ করিয়া নিজ বাণী ও জীবনের মাধ্যমে জগদ্বাসীর কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। প্রারব্ধ ভোগান্তে শেষের দিনে একমাত্র ইহারাই মৃত্যুকে যেন অঙ্গুলি দেখাইয়া ঘোষণা করিয়া যাইতে সমর্থ—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥

এই অবস্থা কাহারই না কাম্য। কিন্তু ইহার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত কতজন ?

●

---

* আলিতেষিব হিঙ্গ্বাদিপাত্রেষ্বক্তে তু বাসনা।
সাদ্যনুবৃত্তিমাত্রেণ তত্ত্বদৃষ্টে যথা॥ —সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ

সম্যগ্‌জ্ঞানাদিমিথ্যাত্ব ধর্মাধীনাবকাশপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবচ্ছাস্ত্রমপি কৃতনাশম্॥ ৬৭ সাংখ্যকারিকা।

—শ্রীযুক্ত কৃত সাংখ্যদর্শনের উপরি উক্ত কারিকাও এইস্থলে দ্রষ্টব্য।

† অবিদ্যাবরণে যত্নে বিক্ষেপাংশোঽনুবর্ততে।
প্রারব্ধপ্রতিবন্ধেন স লেশ স্তেন জীবনম্॥—সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ।

ভারতীয় সঙ্গীতে নবযুগপ্রবর্তনে তানসেন

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

আমাদের মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকদের রচনা যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীতে মুখর। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান করবার অবকাশ যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে আজকের যুগে সংস্কৃতির মূল্যায়ণ আমরা যেভাবে করি সে যুগে তাঁরা ঠিক এইভাবে করেন নি। হয়তো কিছু বর্ণনা দিয়ে গেছেন কিন্তু তার পিছনে ঐতিহাসিক সমর্থন কতখানি আছে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা তাঁরা করেন নি। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশের ইতিহাসেই দেখা গেছে সঙ্গীত যেন গৌণ ব্যাপার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র উপভোগ্য বস্তু বলেই সঙ্গীতের উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের ইতিহাসেও সঙ্গীতশিল্পীদের নামের উল্লেখ আছে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কদাচিৎ অতি সাধারণ বিবরণও মেলে কিন্তু তার বেশি কিছু নেই। এই কারণেই তানসেনের সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টার খবর সে যুগের ইতিহাস থেকে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া শক্ত, কিন্তু গানের জন্য তানসেন কত লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পেয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে। তথাপি একেবারে হতাশ আমাদের হ'তে হয় নি, কেননা ঐতিহাসিকদের রচনা ছাড়াও আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। যদিও এসব শাস্ত্র ইতিহাসের অভাবকে মেটাতে পারে নি তথাপি বিভিন্ন সঙ্গীতের বর্ণনা থেকে কোন্ যুগে সঙ্গীতের কিরকম অবস্থা ছিল সেটা আমরা অনুমান করতে পারি এবং তানসেনের যুগে সাঙ্গীতিক পরিস্থিতি কি রকম ছিল সেটা নির্ণয় করবার জন্য আমাদের এইসব সঙ্গীত-গ্রন্থের বিবৃতিকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করতে হয়েছে।

রাগসঙ্গীতে তানসেনের নৈপুণ্য ছিল। প্রচলিত রাগে নানা মিশ্রণ এনে তিনি নতুন সুর তৈরি করেছেন। আজও সে সব সুর তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব নয়—সে তো গায়কসুলভ কুশলতার পরিচয়। তাঁর আসল কৃতিত্ব এইখানে যে অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি ধ্রুবপদকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ধ্রুবপদের অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করেছিল।

তানসেনের যুগ হ'চ্ছে ধ্রুবপদের উঠ্‌তি যুগ এবং এই ধ্রুবপদেই আমাদের সঙ্গীতের মূল রূপটি যথাসম্ভব বজায় আছে। তানসেন এমন একটি যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সময়ে আমাদের সঙ্গীতে অনেক বিকৃতি এসে গিয়েছিল এবং তাকে সংশোধন করবার জন্য যোগ্য ব্যক্তিরা একটি সুসংস্কৃত রূপ প্রদান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নানা পরীক্ষা এবং আলোচনার ফলে একটি রীতির প্রবর্তন করা হ'ল যাতে পুরাতন রীতির বাহুল্য এবং কাঠিন্য বর্জিত হ'ল অথচ মূল কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রইল। এই নব্যসঙ্গীতটিই ধ্রুবপদ বলে পরিচিত।

এখন প্রশ্ন উঠবে এই সঙ্গীতের নাম ধ্রুবপদ হ'ল কেন? 'পদ' বলতে আমরা বুঝি গান। যে কোনও গানকেই পদ বলতে পারা যায়। আসলে মূল সঙ্গীতটির নাম হ'ল 'ধ্রুব'। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে এই ধ্রুবজাতীয় সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং এর বহু প্রকারভেদও ছিল। পরে যখন সংস্কার-সাধন করে সঙ্গীতকে সুসঙ্গত রূপ দেওয়া হ'ল তখনও ধ্রুব নামটি অক্ষুণ্ণ রইল, কেননা ধ্রুবজাতীয় গানের বৈশিষ্টই এতে প্রধানভাবে বর্তমান ছিল। কিভাবে আমাদের সঙ্গীতের এই বিবর্তন ঘটেছে সেটি দু'এক কথায় বলছি।

বৈদিক যুগের কথা ছেড়ে দিই। পরবর্তীকালে বরাবরই সঙ্গীতের শুদ্ধত্ব রক্ষার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট ছিলেন—এদিও এই শুদ্ধরীতিতেও মিশ্রণ ঘটে যুগে যুগে তার রূপ পাল্টে গেছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, তাঁদের ধারণা অনুসারে শুদ্ধগীত বলতে আদিতে বোঝাতো জাতি, কপাল, কম্বল প্রভৃতি গান। এইসব গীতের উল্লেখ এবং পরিচয় শাস্ত্রাদিতে মেলে। বস্তুত গীতই হ'চ্ছে আমাদের সঙ্গীতের মূল্য বস্তু। রাগসঙ্গীতের পরিকল্পনাও প্রচলিত কয়েক প্রকার গীতরূপ থেকে হয়েছে। এইসব গীতকে ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা নামক রাগসঙ্গীত। এই রাগগীতিও শুদ্ধ-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে নানা প্রবন্ধসঙ্গীত জনপ্রিয়তা অর্জন করে সঙ্গীতের পুরোভাগে এসে পড়ল।

'প্রবন্ধ' বলতে সাধারণভাবে একটি গীতরূপ বোঝায়। রাগ-সহযোগেই এসব গান গাওয়া হ'ত এবং গানগুলি কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ ছিল। এই সব কলির আদর্শেই পরবর্তী যুগে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগের পরিকল্পনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তরা আর আভোগ তো ইতিপূর্বেই প্রবন্ধসঙ্গীতেও বর্তমান ছিল।

মোগল যুগের প্রারম্ভে আমাদের বহুবিস্তৃত প্রবন্ধ-সঙ্গীত নানা বিপর্যয়ের ফলে সঙ্কুচিত হ'তে আরম্ভ করেছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিদের দখল থেকে বিচ্যুত হ'য়ে সঙ্গীত তখন ধীরে ধীরে অজ্ঞতর শিল্পীদের হাতে এসে পড়েছে। ফলে অবাধ গতিতে মিশ্রণ চলতে থাকল এবং বহু প্রবন্ধের প্রাক্তন রূপের বিলুপ্তি ঘটল। এই সময়ে যে সঙ্গীত শুদ্ধগীতের পর্যায়ে ছিল তার নাম ছিল সূড়প্রবন্ধ। এই শুদ্ধসূড়ের ছায়া নিয়ে অর্থাৎ এই সঙ্গীতের প্রভাবে আরও কয়েক শ্রেণীর গীত প্রবর্তিত হ'ল। এই শ্রেণীর নাম ছায়ালগ বা সালগ সঙ্গীত। যতদূর সম্ভব বর্তমান ধ্রুবপদের উদ্ভব এই সালগশ্রেণীর সঙ্গীত থেকে অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সঙ্গীত সাক্ষাৎভাবে এই সালগশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

এই সালগশ্রেণীর একটি প্রধান গীত হ'চ্ছে ধ্রুব। সঙ্গীতশাস্ত্রে ধ্রুব নামক সঙ্গীতের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে এইটিই যে বর্তমান ধ্রুবপদের প্রাক্তন রূপ এই ধারণাই প্রবল হয়। সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে ধ্রুব-প্রবন্ধের বর্ণনা এবং মহারাজ সিংহভূপালের টীকা অনুসরণ করলে বোঝা যায় এই সঙ্গীতের বিন্যাস ঠিক বর্তমান ধ্রুবপদের মত ছিল। ধ্রুবগীতির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, এর প্রথম অংশটি আমাদের বর্তমান স্থায়ীর অনুরূপ। দ্বিতীয় অংশটি

কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে গাইবার নিয়ম ছিল অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের অন্তরা। টীকাকার সিংহ-ভূপাল এটিকে অন্তরা বলেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে "কিঞ্চিদুচ্চং খণ্ডম্ অন্তরাখ্যং কর্তব্যম্", অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে গাওয়া এই অংশটির আখ্যা অন্তরা। এর পরে আভোগের দুটি অংশ—একটি প্রথম অংশের অর্থাৎ স্থায়ীর অনুরূপ। এটিই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সঞ্চারী। অপরটি আবার উচ্চস্বরে গীত হবে। এটি সে যুগেও আভোগ ছিল এবং বর্তমান যুগেও তাই আছে। এই ধ্রুব-সঙ্গীতের বহু প্রকারভেদ ছিল এবং ছন্দ সম্পর্কে নানা নিয়ম নির্দেশও ছিল। সালগশ্রেণীর মধ্যে শুধু ধ্রুবই নয় তালবৈচিত্রে বিভক্ত আরও কয়েকপ্রকার সঙ্গীত ছিল এবং তাদেরও নানা প্রকারভেদ ছিল।

এইসব সঙ্গীতেও আবার মিশ্রণ চলতে লাগল এবং গীতরূপগুলি ক্রমেই পরিবর্তিত হ'তে লাগল। নানা গোলমালে অবস্থা শেষে এমনি দাঁড়ালো যে, আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন পণ্ডিতব্যক্তিদের সহায়তায় আমাদের সঙ্গীতের মূল সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রেখে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ একটি পদ্ধতি নির্ণয় করা হল। শোনা যায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল গোয়ালীয়রে এবং এ সম্বন্ধে নানা কাহিনীও প্রচলিত আছে। যাই হোক, পরম গৌরবের বিষয় হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীতজ্ঞগণ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার জন্য একটি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই কেননা আমাদের সঙ্গীতের সংগঠন কি রকম ছিল তার পরিচয় পাওয়া এঁদের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে।

তানসেন যখন সঙ্গীত-জগতে উদিত হয়েছেন তখন ভারতীয় সঙ্গীতে নবযুগের প্রবর্তন হ'ল এই নবগঠিত ধ্রুবপদের প্রতিষ্ঠায়। তিনি যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করলেন তখন ধ্রুবপদও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দরবারের প্রভাবে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর মত এত বড় প্রতিভা ঠিক এইসময় দেখা না দিলে ধ্রুবপদের প্রতিষ্ঠা এমনভাবে হ'ত কি না সন্দেহ। পরবর্তীকালেও তানসেনের ঘর থেকেই সবাই ধ্রুবপদ সংগ্রহ করেছেন।

তবে সে যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিরা হয়তো ধ্রুবপদের সংগঠনে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কেননা প্রবন্ধ-সঙ্গীতের বিচিত্র এবং ব্যাপক রূপবন্ধ তাঁদের চোখের সামনেই সংকুচিত হয়ে গেল এবং প্রবন্ধ-সঙ্গীতের মূল অবয়বটুকু নিয়েই ধ্রুবপদ সংগঠিত হ'ল। সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরাই জানেন যে, আমাদের সঙ্গীতের বিরাট স্থাপত্যশিল্প যেমনভাবে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অবশেষে ধ্রুবপদের প্রতিষ্ঠায় মূলরূপটি বজায় থাকলেও তার বহু বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়েছে। তথাপি ধ্রুবপদের প্রতিষ্ঠাতেও কম কৃতিত্ব নেই এবং তানসেনের গৌরব এইখানেই যে তিনি এই ইমারৎকে বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে অতি দুর্দশার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে গেছেন।

নব্যভারতের শিল্পচর্চা ও ই. বি. হ্যাভেল

অশোক ভট্টাচার্য

ভারতের আধুনিক চিত্রকলার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সব থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে যে নাম দুটি জড়িত তা হলো ই. বি. হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পধারাকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করার জন্ত আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এঁদের নাম। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাজাত চিত্র ও সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা এবং বহু কৃতী শিল্পের শিল্পারাধনা ও কর্মজীবনের মাধ্যমে আজ

শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু মনীষী হ্যাভেল আজ ক্রমশঃই বিস্মৃতির অতলে লীন হতে চলেছেন। এমন কী যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁদের অনেকেই আর তাঁর অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। অথচ হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে অনুধাবন না ক'রে এ কালের নবজাগ্রত ভারতীয় চিত্রকলার মূল প্রকৃতিকে বুঝে ওঠা অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধ ভারতের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে হ্যাভেলের দান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ভৌগোলিক সীমান্ত অতিক্রম ক'রে বহুবার বহু বিজাতীয় অভিযান ভারতবর্ষের মাটিকে চিহ্নিত ক'রে গেছে। কিন্তু কোনো আক্রমণই তার সাংস্কৃতিক সত্তাকে ততোটা বিপন্ন করে নি, যতোটা করেছিল ইংরেজ। এমন কী ইউরোপীয় সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় প্রাচীন গ্রীকদের আক্রমণ পরবর্তী কালে এ দেশে তাদের যে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটে তাও নিছক গ্রীক শিল্প বা স্থাপত্যরূপে আপন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। সে দিনের ভারত তার সে শিল্পকে আত্মসাৎ ক'রে স্বকীয় ভাবধারার রূপায়ণে সক্ষম হয়েছিল। সেদিন বরং ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় মুগ্ধ সুশিক্ষিত গ্রীককেও দেখা গেছে বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করতে। কিন্তু ইংরেজ যে কালে এদেশে তার মানদণ্ড নিয়ে হাজির হলো তখন ভারত এক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়ের পথে ধাবমান। কয়েক শতাব্দী প্রসারিত মুসলমান শাসন হিন্দু সংস্কৃতির মূলকে করেছে শুষ্কপ্রায়, আবার সেই মুসলমান যুগের গৌরব, ভারত ও পারস্য সভ্যতার মিশ্রণজাত মুঘল সংস্কৃতিও রাজকীয় ক্ষমতার অবনতিতে ক্ষয়িষ্ণু। তাই বিজয়ী ইংরেজকে অভিভূত করতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভারতীয় শিল্পধারা সজীব ছিল না।

অবশ্য ভারতের সংস্কৃতির প্রতি সে দিনের ইংরেজের বিমুখ মনোভাবের কারণ ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের অস্তিত্বহীনতাই নয়। বরং সে ছিল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; এবং স্বতন্ত্র একটি সভ্যতার ধারায় পালিত তার মন এ দেশের সভ্যতাকে করতো ঘৃণা ও অবজ্ঞা। তাই সম্ভব হয়েছিল মেকলের পক্ষে সেই কুখ্যাত উক্তি উচ্চারণ করা যে, সমগ্র ভারতীয় ও আরবী সাহিত্য ইউরোপের কোনো পাঠাগারের একটা তাকে স্থান পেতে পারে। এ শুধু অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ নয়; এ হলো বিদেশী শাসকের আত্মম্ভরী মদমত্ততার প্রকট অভিব্যক্তি।

তবু এ কথা ঠিক যে, সেই দুরন্ত দুর্দিনে কোনো পশ্চাৎপদবর্তী এশীয় শক্তির কাছে পরাভূত না হয়ে ইংরেজের অধীনে এসে ভারত পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। অপর একটি শক্তিশালী সংস্কৃতির ধাক্কায় আত্মবিস্মৃত এই দেশ আপন সংস্কৃতির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে বহুদিনের জড়তাকে কাটিয়ে উঠে তার ঐতিহ্যের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এই আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনেও যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের শিক্ষা কার্যকরী হয়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। ভারতের আত্মসচেতনতা লাভের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের এই অনিচ্ছাকৃত পরোক্ষদানটুকু অবশ্যই স্বীকার্য।

কিন্তু ইংরেজ শাসন এদেশের শিল্পের ওপর যে কী দারুণ প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছিল তা হ্যাভেল স্বয়ং লিখে গেছেন। মুঘল আমলের শিল্পীরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অনেকেই ছিলেন মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের অধিকারী। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাজমহল স্রষ্টা শিল্পীদের মধ্যে তিনজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি পেতেন এক হাজার মুদ্রার মাসোহারা আর একজন পেতেন ন'শো টাকা, আরও ন' জনকে দেওয়া হতো দু'শো থেকে চার শো মুদ্রা। বিজয়ী ইংরেজ এদেশের শাসন ব্যবস্থাকে অনেকাংশে উন্নত করলেও, ভারতীয়

শিল্পীদের প্রতি তার কোনো মমতাই ছিল না। এর ফলে ইংরেজ আমলে তাজমহলের দক্ষ শিল্পী ও স্থপতিদের বংশধরেরা পেয়েছে তিরিশ চল্লিশ অথবা ষাট টাকা বেতনের চাকরী।

অন্য সরকারী আমলাদের কথা বাদ দিলেও, যে দু'জন ইংরেজ রাজনৈতিক পুরুষ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে সব থেকে বড় উদ্যোগী ছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তখনকার শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব স্পষ্ট হবে। এঁদের একজন ছিলেন স্বয়ং ঐতিহাসিক মেকলে। আর দ্বিতীয় জন বেন্টিঙ্ক তো শাহজাহানের তাজমহলকেই, তার মূল্যবান পাথর-গুলির জন্য বেচে ফেলতে মনস্থ করেছিলেন, কেবলমাত্র আগ্রা প্রাসাদের দ্রব্যসমূহের নীলাম নিষ্ফল হওয়ার দরুণই মুঘল আমলের এই শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শনটি বিদেশী শাসকের সর্বগ্রাসী লোভ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। তাই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের দিনে যখন জাতীয় শিল্প হলো অবহেলিত, তখন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী শিল্পকলার প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র 'দি স্টেট্‌স-ম্যান' পত্রিকার এই মন্তব্যটুকু তাদের চিন্তাধারার প্রতিভূ: "Until Indian art has mastered the cardinal secret of simplicity; until the Indian artists have began to understand the meaning of large effects; until abandoning mere amplification they prove capable of a conception of an organic whole, the products of native art are bound to remain in the state of arrested growth they have been all these thousands of years." উদ্ধৃতির শেষ অংশের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করলেও, এ মনোভাবকে ক্ষমা করতে পারেন নি ছাত্রেরা।

এ তো গেল বিদেশী শাসকবর্গের মনোভাবের কথা। কিন্তু সেদিনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ছোঁয়ায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বাঙালী সমাজের কাছেও এ দেশের শিল্প ঐতিহ্যের মূল্য ছিল কতটুকু, তাও বিচার্য। আসলে ভারতীয় শিল্পকলার কোনো প্রাণবন্ত ধারা তখন বাঙালীর নাগালের মধ্যে ছিল না। তখন মুঘল চিত্রকলা লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন, আর রাজপুত শৈলী পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায় সজীব থাকলেও ভৌগোলিক কারণে তা ছিল সুদূর। অন্যদিকে ইংরেজ-অনুকারী ধনী বাঙালী গৃহসজ্জায় চলতি ফ্যাশনের তাগিদে দেয়াল জুড়ে টাঙাতে শুরু করেছে বড় বড় তৈলচিত্র। এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে এদেশে যে নতুন শিল্পোপকরণগুলি চালু হয় তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল এই তেলরঙ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সে দিনের সব থেকে অগ্রগামী বাঙালী চিত্ররসিকের পক্ষেও দশম শ্রেণীর পশ্চিমী শৈলীর ছবির চেয়ে উন্নততর কিছুকে আশ্রয় করা সম্ভব হয় নি। অথচ একথা সকলেই জানেন যে, ইতিমধ্যেই বাঙলা সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর শিল্প সৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আর সে-সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় রচিত হলেও তার মধ্যে বাঙালীর স্বকীয়তা ছিল সর্বাঙ্গীন। কিন্তু এহেন সৃষ্টিশীল বাঙালা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র সংস্কৃতিবান ও সুরুচিসম্পন্ন নায়ক নগেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যে চিত্রগুলি সাজিয়েছেন তাতে ভারতীয় বিষয় বস্তু রূপায়িত হলেও, সেগুলি রচিত হয়েছিল জনৈক ভারতীয় চিত্রকরের দ্বারা, যিনি ছিলেন এক ইংরেজ শিল্পীর শিষ্য। সুতরাং বলা যেতে পারে তখনকার চিত্রকলায় সব থেকে আধুনিক ছিলেন রাজা রবি বর্মণ (১৮৪৮—১৯০৩), যাঁর ছবির বিষয় হলো পৌরাণিক ভারত, আর আঙ্গিক সম্পূর্ণ ইউরোপীয়। তবু বাঙালী রসিকজন যে ভারতীয়

ভাবধারায় ভাবিত হতে ছিল উৎসুক তার প্রমাণও রবি বর্মার অপূর্ব জনপ্রিয়তা। তাঁর এ অসাধারণ সফলতার কারণ আর কিছুই নয়, হিন্দুসংস্কার ও ধর্মমানসের উপজীব্য চিত্রপ্রণয়ন।

রাজা রবিবর্মা জীবিত থাকতেই, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, এ দেশের শিল্পরুচি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হ্যাভেল মাদ্রাজ থেকে কলকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে এসে পৌঁছবার আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মতো বৈষ্ণব কবিতা পড়ে কৃষ্ণলীলার ছবি এঁকে তাতে দেশী আলঙ্কারিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন (১৮৯৫ খৃঃ)। আর ঠিক এর দু' বছর পরই হ্যাভেল কলকাতায় পৌঁছে শুরু করেন সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর পশ্চিমীঘেঁষা রুচির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম। কিন্তু তাঁর এ-সংগ্রামে সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীর কাছ থেকে তিনি সহযোগিতা অপেক্ষা বিরুদ্ধতাই পেয়েছিলেন বেশী। এই বিরুদ্ধতার মূল কারণ ছিল দুটি। প্রথমতঃ দেশী বা বিদেশী রূপকলা সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা এবং ভারতের শিল্প ঐশ্বর্যের সঙ্গে অপরিচয়। আর দ্বিতীয়তঃ, তখন দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ইংরেজের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে দেখা দিয়েছে সংশয়; যার ফলে তিনি ইংরেজ বলেই সমসাময়িক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীর রুচির বিরুদ্ধে, স্বাতন্ত্র্যবোধের বিরুদ্ধে, তাঁর এ আঘাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সন্দেহজনক। হ্যাভেল যে বিখ্যাত পত্রে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছিলেন তাতে রবি বর্মা প্রমুখ তৈলচিত্র-শিল্পীদের প্রতি বিরুদ্ধতা ছিল দ্বিধাহীন। তারপর যখন তিনি কলকাতা গভর্নমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের সংগৃহীত বিলেতি ছবিগুলি নিলামে চড়িয়ে সেখানে মুঘল ও রাজপুত শৈলীর চিত্রাবলী স্থাপন করে দেশীয় চিত্রকলা শেখাবার আয়োজন করলেন, তখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনেই উদ্বেগ সঞ্চার হয়েছিল। 'ইহাতে আমাদের লাভ হইবে, কি ক্ষতি হইবে' এই প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রে (১৩১২) সব থেকে নিঃশঙ্কচিত্তে হ্যাভেলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "যাহা ধরা দিবার নয়, তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় কাজ কি? এখন আমাদিগকে এই বুঝিতে হইবে যে, দেবতার গাছকে মাটিতে পুতিয়া মাটি করিবার চেষ্টা না করিয়া, মর্ত্যলোকের মানস-সরোবরে স্বর্ণশতদল বিকশিত করিবার যত্নে শতগুণ সার্থকতা আছে; আমাদের ভারতের ভারতী যখন তাহার উপরে প্রসন্ন পদক্ষেপ করিবেন, তখনই মানাইবে ভাল। পারিজাত ফুলে আমাদের কাজ কি—আমাদের বিল্বদল-তুলসী মঞ্জরীও তো দেবতার পূজায় দেওয়া চলে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন ই. বি. হ্যাভেল। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মানসলোকে ভারতশিল্পের বিশিষ্ট আবেদন স্বল্প দিনের মধ্যেই কার্যকরী হয়েছিল—তিনি ভারতশিল্পের নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় শিল্প-ধারার স্বকীয় দর্শন এবং তার গুরুত্বই তাঁকে এ-দেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নতুন শিল্পমূল্য-সৃষ্টিতে অনুপ্রেরিত করলো। আর তিনি একাধারে তাত্ত্বিক ও-কর্মী হিসাবে ভারতশিল্পের লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে অগ্রসর হলেন। নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে তিনি যে কটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার অন্যতম ছিল পশ্চিমের শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের সামনে ভারতশিল্পের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও আদর্শকে উপস্থিত করা।

হ্যাভেল তাঁর রচনায় স্পষ্ট ক'রে দেখালেন যে ভারতশিল্প গ্রীকের রোমানশিল্পের অক্ষম অনুকরণ কিংবা এক ধরণের নৈতিক নির্বোধ-বিকলাঙ্গতা নয়, বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে

STUDENTS

এ এক নতুন সৌন্দর্য-চিন্তার আধার : "an opening into a new world of aesthetic thought, full of deepest interest, and worthy of the study of all western artists."

ভারতীয় শিল্প যে এক স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষার অধিকারী সে কথাও তিনি পরিস্ফুট করলেন। ভারতশিল্পে শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি, তার কথাপ্রসঙ্গেই তিনি ভারতীয় শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি ও বোধশক্তির পরিচয় দিলেন। হ্যাভেল বললেন :

"Now Buddha as we know, attained to his Buddhahood at the close of a long fast ; and according to the canons of European art he should have been represented in a state of extreme emaciation... but Indian sculptors never descended to such vulgarity. With their fine artistic insight they would not take the hidiousness of the starvation as the symbol of their worship ; they thought not of the feeble wasted human body but only of the spiritual strength and beauty the Master had gained through his enlightment. They gave him a new spiritualised body, broad shouldered, deep chested, golden coloured, smooth skinned, supple and lithe as a young lion."

এর থেকে বোঝা যায় যে, ভারতশিল্পের ভিত্তিস্বরূপ যে বিরাট দর্শন ও চিন্তারাজ্য বর্তমান ছিল তার চাবিকাঠি হস্তগত করতে পেরেছিলেন হ্যাভেল। তিনি তাই অতি সহজে নিজের কয়েকটি কথার মাধ্যমেই পাশ্চাত্যশিল্প ও ভারতশিল্পের মধ্যকার মূলগত প্রভেদকে নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন : European art has, as it were, its wings clipped ; it knows only the beauty of earthly things. Indian art soaring into the highest emphyrean, is ever trying to bring down to earth some thing of the beauty of the things above...Physical beauty was to the Greeks a divine characteristic, the perfect human animal received divine honours from them both before and after death.

The Hindu artist has an entirely different starting point. He believes that the highest type of beauty must be sought after not in imitation or selection of human or natural forms but in the endeavours to suggest ordinary physical beauty...Indian art is essentially idealistic, mystic, symbolic and transcendental. The artist is both priest and poet."

তাত্ত্বিক হিসাবে হ্যাভেল শুধুমাত্র ভারতশিল্পের চরিত্র নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, দীর্ঘ সাধনার দ্বারা তিনি এযুগে ভারতশিল্পের প্রথম ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের আলোকে তিনি ভারতের শিল্পকলার যথার্থ স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত ও তার বহু শতাব্দী প্রসারিত ধারাবাহিকতার গতিপথটিকে চিহ্নিত করেন। তাঁর অভাবনীয় কল্পনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বৃহত্তর ভারতের শিল্প-স্থাপত্যের মৌলিক ব্যাখ্যায়। ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক হিসাবে

হ্যাভেলের অবদান সম্পর্কিত আলোচনা উপযুক্ত পরিসরের দাবি রাখে, এখানে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পরবর্তী শিল্পালোচকেরা তথ্যে ও তত্ত্বে যতদূরই অগ্রসর হোন না কেন, হ্যাভেলই তাঁদের পথপ্রদর্শক, এবং তাঁর রচনাবলী ক্লাসিক মর্যাদার অধিকারী।

প্রাচীন ভারতের শিল্পনিদর্শনগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারেও হ্যাভেল ছিলেন দেশী ও বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্যতম। অথচ তিনি এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্যের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণাতেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার গৌরবময় ঐতিহ্যের জয়গান করার চেয়ে তিনি অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রের ক্ষয়িষ্ণু ধারাটিকে উজ্জীবিত করা। তাঁর মতে: "The dying up of the living spring of craftsmanship is a more grievous loss to India than the ruin of all her ancient monuments."

কর্মী হ্যাভেল কলকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসার পূর্বে ছিলেন মাদ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে। সেখানে থাকাকালেই কারুশিল্পের প্রতি তাঁর যে বিশেষ ঝোঁক তা দেখা দিয়েছিল, কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়েও তিনি দেশী কারুশিল্প শিক্ষাতেই ছাত্রদের অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত রাখতেন। জেনোর কাজ, ভিত্তি চিত্রের জন্যে কাগজের টেম্‌সিল কাটা, দরজা জানলার জন্যে কাচ কেটে স্টেনগ্লাসের কাজ, জয়পুর ক্লেজো—এমন কী তাঁত চালানো ইত্যাদি হাতের কাজ তখন শিল্পবিদ্যালয়ে শেখানো হতো বলে লিখেছেন নন্দলাল বসু।

ইতিপূর্বেই ক্লাসের দেয়াল থেকে দশম শ্রেণীর পাশ্চাত্য নিদর্শনগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তার জায়গায় টাঙানো হলো মুঘল, পারস্য, রাজপুত ও তিব্বতি ছবি, যা এখন কলকাতার মিউজিয়মে সংরক্ষিত। এসব ছবি ক্লাসে টাঙিয়ে হ্যাভেল ছাত্রদের ভারতীয় তথা প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি অনুরক্ত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া শিক্ষক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী অধ্যক্ষের পদে আসীন ক'রে এবং পাটনার বিখ্যাত শিল্পী ঈশ্বরী প্রসাদকে এনে তিনি ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রশিক্ষা দানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি গভীরভাবেই বুঝেছিলেন গ্রীক ও রোমান মূর্তি এবং ইতালীয় ছবির অনুশীলনে কিংবা নিষিদ্ধপল্লী থেকে মডেল আনিয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রকলার চর্চা চালালে ভারতের মাটিতে তা কোনোদিনই জাতীয় শিল্পের অভাব মেটাতে পারবে না। তাই তিনি বরং ছাত্রদের ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রের অনুশীলনে এবং ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে অনুপ্রেরিত করতেন; দিতেন মৌলিক চিত্রকলার উৎসাহ।

মিউজিয়মের আর্ট গেলারিতে তিনি ১৯০৪ খৃঃ নাগাদ সর্বপ্রথম আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শস্থানীয় কিছু ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রেছিলেন। এতে মুঘল, পারসিক ও তিব্বতি ছবির পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলী, যথা, রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার যাবতীয় ছবি, বুদ্ধ ও সুজাতা, বজ্রমুকুট, অভিসারিকা ও ঋতু সংহারের কিছু ছবি, এবং যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা শূদ্রক রাজার প্রভায় ছবিটি স্থান পেয়েছিল। সে দিনের এই ক্ষুদ্র প্রদর্শনীটির গুরুত্ব বোঝা যাবে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখেই। এ প্রদর্শনী আচার্য নন্দলালকে শিল্পকলা সম্পর্কে নতুনভাবে ভারতে অনুপ্রাণিত করে।

কয়েক বছর পর, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের সৃষ্টিতে নব্যভারতীয় চিত্রকলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠলে তার প্রসার, প্রচার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হ্যাভেল উড়ফ, রামসে, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে একযোগে ১৯০৭ Indian society of oriental Art প্রতিষ্ঠা

করেন। নতুন চিত্রকরদের জন্ত কতগুলি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্ত হলেও, স্বদেশী যুগে জাতীয় সংস্কৃতিকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই সমিতির দান ছিল বিভিন্নমুখী।

বাস্তবিক, ভারতীয় জাতীয়তার ভূমি তৈরী করার পেছনে নিবেদিতা, এ্যানি বেসাণ্ট, এণ্ড্রুজ প্রমুখ যে সব ইউরোপীয় হিতৈষীরা ছিলেন তাঁদের পূর্বসূরী হিসাবে নাম করা যায় হ্যাভেলের। নয়া দিল্লীর স্থাপত্য কর্মে ভারতীয় স্থপতিদের এবং তাঁদের পরিকল্পনাকে ব্যবহার না করায় তাঁর যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল, তা থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আর যদি রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি স্মরণ করি, "যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়," তা হলে সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে হ্যাভেল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা আমাদের জাতির দৃষ্টিদান করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত সফলতা হলো এই যে, তিনি তাঁর গভীর বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন : "Mother India may be in many ways inefficient and behind the times, but in the up bringing of her own children as artists she has nothing to learn from modern Europe."

এই প্রত্যয়ের তাৎপর্য ঠিক আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, ভারতীয় চিত্রকলার নব উন্মেষের পটভূমিকায় অনুধাবনীয়।

কৈলাসবাসিনীর আবির্ভাব

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শরতের আকাশ। আবোল-তাবোল ঘুরে-বেড়ানো কুঞ্চিত সাদা মেঘের পেছনে আকাশ-জোড়া সে কি স্বচ্ছ ঘন নীল! সে নীল চোখে না পড়বার আর উপায় নেই!

বিংশ শতকের সংশয়ী হাড়েও লেগে রয়েছে কত দিনের সংস্কার—ঐ নীল আকাশের হাল্‌কা সাদা মেঘের উপরে আলতো দু'খানি পা রেখে কেউ আসবে—এসে আসন পাতবে নিচের মাটির জলে ধোওয়া সবুজের আস্তরণের উপরে।

ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ক'রে বেজে উঠল ঢাকের বাদ্য শহর-প্রান্তের কোন্‌ পূজা-মণ্ডপে, ক্যান্‌ক্যান্‌-করা কাঁসিটা আজ ওর সঙ্গে সুর মিলিয়েছে অদ্ভুত সঙ্গতে। শুনলাম, ও পূজামণ্ডপে মহাষ্টমীর স্নানের বাজনা।

ঢুকে পড়লুম ভিড়ে—এগিয়ে গেলুম দেবীস্থানে; না,—এ ত বড়লোকের জাঁকজমকের পূজা নয়—এ তো লাখো টাকার সাজ পরিয়ে ঝল্‌মল্‌-করা প্রতিমার পূজো নয়; কোন্‌ দেশ থেকে এসেছেন এক পাগলা ক্ষেপা সাধক,—তিনি বলেছেন তাঁর ভক্তদের,—চাইনে বড় মন্দির, চাই নে মন্দির-জোড়া ঝল্‌মল্‌-করা প্রতিমা,—দেবীর আসনে রক্ত-মাংসের 'কুমারী' বসিয়ে তার ভিতরেই জাগ্রত ক'রে তুলব কৈলাসবাসিনীকে।

আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা—দৃপ্ত তেজ! শ্রদ্ধা এল মনে। রক্ত-মাংসের 'কুমারী'—তার মধ্যে নেমে আসবেন কৈলাসের দেবী!

ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ি পূজা-মণ্ডপের এক কোণে—মনভরা কৌতূহল, উল্লাস, শ্রদ্ধা। মা যদি সত্যি আজ নেমে আসেন কৈলাস থেকে বাঙলায়—তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা থেকে শ্যামল সমতল ভূমিতে। জয় মা,—ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌! আবিরাবীর্ম এধি!

মহাষ্টমীর মহাস্নান সাঙ্গ হ'ল—ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢাকের বাদ্যে—আর সমবেত ভক্তকণ্ঠের সঘন 'মা-মা' ধ্বনিতে। কত স্নানের উপকরণ—গন্ধ তেল বিলেপন, নদীর বারি, সমুদ্র-বারি!

তারপরে রক্তাম্বরে সজ্জিতা হয়ে, গন্ধমাল্যে ভূষিতা হয়ে আসনে বসলেন 'কুমারী'-মা।

তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ধেঁধে যায়। সত্যই ত সেই মা! অতসীপুষ্পবর্ণাভা, স্খলিত-অলকা কুঞ্চিতকুন্তলা—ছলোছলো অপরাজিতাক্ষি—ঢলো ঢলো লাবণ্য—জ্যোতিষ্কভাসিত মুখমণ্ডল —কোথায় ছিল কাদামাটির পৃথিবীতে এই চিন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী আনন্দময়ী মা! অলক্তক-মাখা ছোট্ট দু'খানি পা.—ও পা ত সত্যি মাটিতে রাখবার নয়—ওর নিচে দু'টি রক্তকমল যে আমারও আজ রেখে দিয়ে আসতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বদ্ধ পদ্মাসনে পূজারী গভীর ধ্যানে সমাহিত; থেমে গেছে ঢাক-ঢোল ঘণ্টা-কাঁসরের ধ্বনি, নিশ্চল হ'য়ে উঠেছে চঞ্চল নর-নারী—স্তব্ধ হয়ে উঠল কল-মুখরিত পূজামণ্ডপ। নিরুদ্ধ-শ্বাসে বসে আছি—মা কি তবে সত্যি নেমে এসেছেন?

সকল স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে পূজারী 'কুমারী' দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—'মা, তুমি এসেছ?'

কুমারী নীরবে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে পূজারীর মুখের দিকে।

পূজারী আবার বলে,—'আমার পূজা কি সফল হবে না মা? মা তুমি কি এসেছ?'

কুমারী দেবী তবুও নিরুত্তর—কিন্তু কেমন অলৌকিক হ'য়ে উঠল তার দৃষ্টি।

পূজারী আবার সিক্ত জলদগম্ভীর স্বরে বললেন,—'মাটির ধরায় নেমে এসো মা, নেমে এসো এই কুমারীর দেহে মনে; একবার সাড়া দাও ভক্তের ডাকে—তুমি কি এসেছ?'

মণ্ডপস্থ লোকের রোমহর্ষণ বিস্ময়ের মধ্যে উত্তর জাগে কুমারীর অলৌকিক কণ্ঠে—'আমি এসেছি'—

গলদশ্রু পূজারী কম্পিত কণ্ঠে বলেন,—'তুমি কে?'

অলৌকিক দৃঢ়কণ্ঠে সাড়া দেয় কুমারী—'আমি কৈলাসবাসিনী।'

আর্ত 'মা মা' রবের ঐকতান আগে পূজা-মণ্ডপে—কেউ ডাকছে দু'হাত জোড় ক'রে, কেউ ডাকছে মাটিতে মাথা কুটে কুটে—কেউ সাষ্টাঙ্গে প'ড়ে আছে—যেন মায়ের রাঙা চরণ দু'টি ছোঁবার জন্তে হাত বাড়িয়ে।

... ...

বাড়িতে ফিরে একা ব'সে আছি খোলা ছাতে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে; মনে পড়ছে মহাষ্টমীর সেই দৃশ্য—মানুষের মধ্যে আবির্ভূতা কৈলাসবাসিনী দেবী।

আশেপাশে ছোট ছোট কয়েকটা টবে কিছু ফুলের গাছ; তারই মধ্যে কখন কি ক'রে ঠাঁই ক'রে নিয়েছে কয়েকটা নাম-না-জানা পোকা; সন্ধ্যার অন্ধকারের আড়ালে সূক্ষ্ম সুরে তারা তোলে ঐকতান—মনকে অনেকখানি একতান ক'রে নিতে পারলে কানে এসে পৌঁছয় সেই তান। নিবিষ্ট মনে তাই শুনছিলুম আর ভাবছিলুম—শুধু মানুষের মধ্যে কেন—ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে—ঐ নাম-না-জানা কীট-পতঙ্গগুলির সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত শুধু এক দেবী—তিনি আছেন শক্তিরূপে ভক্তিরূপে—কান্তিরূপে শান্তিরূপে—বলরূপে বুদ্ধি-রূপে। সর্বভূতে তাঁকে জানাই নমস্কার—সর্বভূতে প্রকাশিতা এক কৈলাসবাসিনী!

... ...

বাড়ির কি মেনকা, দূরের বস্তিতে বাড়ি; আট বছরের মেয়ে তার—গরিবের আবার কত শখ—আদর করে নাম রেখেছে দুলালী।

অঘনগরের দিকে বাড়ি; স্বামী ছিল গায়ে পায়ে বেশ জোয়ান-জায়ান; হোগল বন থেকে হোগল কেটে হোগলা বুনত—আর হাটে হাটে তাই করত বিক্রী।

গতবারে হোগল কাটতে গিয়ে বাধা দিয়েছে কোন্ কালকূট সাপকে; রাত্রিবেলা

এসে ছোবল মেরেছে ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে। দৌড়ে গেল মেনকা ওঝার বাড়ি,—ওঝা এসে সুযোগ পেল না কোনও ঝাড়-ফুঁকের—এর মধ্যে সমস্ত শরীর গেছে বিষের জ্বালায় নীল হ'য়ে।

মেনকার খুড়ী ঝি-গিরি ক'রে কলকাতায় বহুদিন—বাস তার দক্ষিণ কলকাতার রেল লাইনের পাশে—গোলার বস্তিতে। তারই ভিতরে তিন টাকার একটা ঘরে মেয়ে দুলালীর হাত ধ'রে উঠল এসে মেনকা। আমার বাড়িতে তাকে কি ঠিক ক'রে দিয়েছে তার খুড়ী—বহুদিনের আমাদের চেনা।

কলকাতার শহরে ঝিয়ের কাজে এই প্রথম হাতে খড়ি; ফাঁকি দিয়ে সেয়ানা হ'য়ে উঠতে এখনও কিছু দেরী আছে; তাই এক বাড়ির বেশি দু' বাড়ি কাজ করতে পারে না—পয়সা-কড়ি তাতে যা জোটে তিন টাকা ঘর-ভাড়া দিয়ে মা-মেয়েরই তাতে চলছে না।

কাজ করতে আসে মেনকা—সঙ্গে সঙ্গে এসে জোটে দুলালী—মা না নিয়ে এলেও এক-পা দু'পা ক'রে আস্তে আস্তে সে এসে পৌঁছে যায়। পাতে পড়ে থাকা মাছি ভাতগুলো আর পচা ডালগুলো লুকিয়ে নিয়ে সিঁড়ির তলে ব'সে যায় আর পেট ভরায়।

কেন যেন বরদাস্ত করতে পারি না এই ছাংলা মেয়েটাকে। কেমন ঝুলো-কালো রঙ্—মাথায় তেলজল পড়ে নি সাতজন্মে—খুশকুরিতে জটা পড়ে গেছে মাথার লালচে চুলে—কোত্থেকে যোগাড় করেছে সাতছেঁড়া ময়লা একটা ফ্রক, গায়ে চল্ চল্ করছে—যেন ঝুলো গায়ের ময়লা গোলপ। এ-কাজটা সে-কাজটা একটু করে—আর ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে।

কতদিন বারণ করে দিয়েছে গৃহিণী মেনকাকে—সঙ্গে নিয়ে আসবি নে এই মেয়েটাকে, বলে দিচ্ছি, গা ঘিন্ ঘিন্ করে দেখতে।

নিয়ে আসে নি মেনকা দুলালীকে—কিন্তু ও এসে আস্তে আস্তে জুটেছে। কতদিন মেনকা আক্রোশে ধমক দিয়েছে—ঘরঝাঁট-দেওয়া ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে গেছে—চুলের মুঠি ধ'রে টানতে টানতে ঠেলে দিয়ে এসেছে সদরদরজার বাইরে। আবার কখন ভীরুপদক্ষেপে খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়েছে—মহা-অপরাধিনীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিচের বারান্দার একটা থামের আড়ালে।

কতদিন ওকে একা একা রাস্তায় দেখেছি ভাঙা চুপড়ি কাঁখে করে ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে কয়লার টুকরো সংগ্রহ করতে, এখান থেকে সেখান থেকে গোবর কুড়িয়ে নিতে দেখেছি সেই একই ভাঙা চুপড়িতে—তারপরে দেখেছি ফুটপাতের এক গাছতলায় বসে ইঁটের কুঁচি কুড়িয়ে একা একা ফুল-ফুল কদম-কদম খেলতে।

কিন্তু ঐটুকু মেয়ে একা একা কতক্ষণ আর পারে! মা ছাড়া আর ত কেউ নেই তার এই কলকাতার শহরে। আশপাশে ঘুরে-ঘুরে যেন প্রদক্ষিণ করে মাকেই—তারপরে কখন গুটি গুটি ঢুকে পড়ে নিষিদ্ধ এলাকায়—আমার বাড়িতে।

একদিন স্নানঘরে মাথার তেলের শিশিটা কেমন ক'রে প'ড়ে ভেঙে গিয়েছে, অল্পই ছিল তেল—তা ছড়িয়ে পড়েছে খানিকটা ভেজা চায়ের পাতা আর কমলানেবুর খোসার মধ্যে। মেনকার উপরে আদেশ হ'ল সেটা পরিষ্কার করবার।

পড়ার ঘরের জানলার ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি, মেনকা স্নান-ঘরে ঢুকে জানলা দিয়ে নিচের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। একতলার কোন্ কোণে-আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুলালী—মা মেনকা এদিক তাকিয়ে ওদিক তাকিয়ে ডাকল দুলালীকে হাত-ইশারায়—তারপরে স্নানঘরের

দরজাটা বন্ধ ক'রে সেই ভিজে চা-পাতা আর কমলার খোসার ভিতর থেকেই হাত চেপে চেপে তুলতে লাগল তেল—মাখাতে লাগল তার দুলালীর মাথায়। গন্ধওয়ালা তেল—তেল চুপ্ চুপ্ করছে দুলালীর মাথায়—দুলালীর ডাগর চোখে আনন্দের সে কি বিস্ফার।

দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি, মনটায় কেমন বেদনার আঁচড় লাগছে। আজ আমার ঘরে ব'সে 'মেনকা-দুলালী'র একি অপমান। কুমারী ত দেবী—কৈলাস-বাসিনীকে ত সেদিন প্রত্যক্ষ ক'রে এলুম মর্ত্যবাসিনী কুমারীর মধ্যে। সেই অষ্টম বর্ষের গৌরীই ত মেনকার দুলালী; মাকে কি কখনও দুলালীর মধ্যে দেখা যায়?

মাথাটা তেল চুপ্ চুপে ক'রে স্নানঘরের কল খুলে দুলালীকে নাইয়ে দিচ্ছে মেনকা—দুলালী খিল্ খিল্ হেসে হাততালি দিয়ে নাচতে চায়—এদিক ওদিক তাকিয়ে কুক্ কুঁচকে ফিস্ ফিস্ ক'রে ধমক দেয় মেনকা।

আনমনা ব'সে ভাবি, সেদিন পূজামণ্ডপে 'কুমারী'কে মহাষ্টমীর স্নান করাতে যে বোতলে বোতলে গন্ধতেল এসেছিল—তার একটা বোতল যদি কোনও ক্রমে এই দুলালী পেত! আমার বাড়ির পাতে প'ড়ে থাকা ভাত মুঠি মুঠি কুড়িয়েই ত কুমারী দুলালীর ভোগের আয়োজন হয়—সেদিন কুমারী পূজায় যে ষোড়শোপচারে ভোগ-প্রাচুর্য, তার এককণা যদি কোনও রকমে এই দুলালীর কপালে জুটে যেত—

কৈলাসবাসিনী মা কি দুলালীর মুখ দিয়ে প্রসন্নমনে তা গ্রহণ করতে পারতেন? অতসীকুসুমবর্ণাভা রূপে না হোক, দিবসনা অন্ধকারময়ী কালিকা রূপেও কি তা সম্ভব হয় না?

কৈলাসবাসিনী তা পারতেন কি না জানি না, কিন্তু আমি এই ঝি, মেনকার হাংলা মেয়ে দুলালীকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না।

সেই নীল-আকাশের দিকে আনমনা তাকিয়ে থাকি—দেখি সেই অকারণ ঘুরে-বেড়ানো সাদা মেঘগুলি—আর ভাবি রক্তমাংসের মানুষে কৈলাসবাসিনীর আবির্ভাব আমার জীবনে কি মহাষ্টমীর বিলাসের একটা মহা-ফাঁকিই র'য়ে গেল!

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও নাটক

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস এবং নাটক উভয়েরই একই সময়ে জন্ম হয়; কিন্তু উপন্যাস বা কথা-সাহিত্য আজ যে মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে নাট্য-সাহিত্য যে সে মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্পর্কে গভীর ভাবে কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না; কিন্তু কয়েকটি বিষয় এই সম্পর্কে সাধারণ ভাবেও ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ উপন্যাস যে বিষয়-বস্তু লইয়া প্রায় প্রথম হইতেই রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, নাটক সেই বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত হইতে আরম্ভ করে নাই। প্রথম যুগের কয়েকটি বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের যে স্পন্দন দেখা গিয়াছিল, পরবর্তী যুগে অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের যুগে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়—তখন পৌরাণিক বিষয়-বস্তুই নাটকের উপজীব্য হইয়া দাঁড়ায়। পৌরাণিক নাটক যেমন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা, 'পৌরাণিক উপন্যাস' বলিয়া তেমন কোনও বস্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। পৌরাণিক শব্দের অর্থই হইতেছে জীবন-বিমুখী অলৌকিকতা। বলাই বাহুল্য যে, অলৌকিকতার স্থান সাহিত্যে নিতান্ত পরিমিত। ইহাকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কল্পনা-ধর্মী কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বস্তুধর্মী নাটক কিংবা উপন্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। বাঙ্গালী যতই ধর্মপ্রাণ হউক, তথাপি বাঙ্গালীর উপন্যাস ধর্মাশ্রিত অলৌকিকতার প্রেরণা হইতে প্রথম হইতেই মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাংলা নাটক অন্ততঃ প্রথম যুগে না হউক, ইহার পরবর্তী যুগে অতি সহজেই এই প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলার সর্বপ্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইবার চারি বৎসর পূর্বে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশিত হয়। 'ভদ্রার্জুনে'র কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও ইহা যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। কারণ, ইহার মধ্যে যেমন কোনও অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই, তেমনই ইহাতে ভক্তিরও কোন ভাব প্রকাশ পায় নাই। রচনার যে ত্রুটিই ইহাতে থাকুক, ইহার চরিত্রগুলি অবাস্তব ও একান্ত কল্পনাশ্রয়ী নহে। ইহার পর দীনবন্ধু মিত্রের সময় পর্যন্ত যে কয়খানি বাংলা নাটক রচিত হয়, তাহাদের কয়েকখানি সেক্সপীয়রের অনুবাদ, কয়েকখানি মৌলিক বাংলা রচনা। মৌলিক বাংলা রচনাগুলির একখানিও পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত ছিল

না—অধিকাংশই সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা ছিল। প্রত্যক্ষ সমাজ ইহাদের লক্ষ্য ছিল বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের বাস্তব মূল্য প্রকাশ পাইলেও একটি আদর্শ সমাজ জীবন ইহাদের লক্ষ্য থাকিত বলিয়াও অনেক সময় ইহাদের মধ্যে কল্পনারও প্রভাব থাকিত। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে গিরীশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বাংলা দেশের ধূলি মাটির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নাই—বাংলাদেশের সমাজ, ইহার সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন ইহাদের লক্ষ্য ছিল, তেমনই কোন কোনও ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনই ইহাদের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র পার্শ্বে দীনবন্ধুর নাটকগুলির কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তখনও বাংলা নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গত কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় নাই। কেবলমাত্র মাইকেল মধুসূদন তাঁহার প্রহসন ব্যতীত তিনখানি নাটক রচনায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন দিক দিয়াই ইহারা অলৌকিকতা ভারাক্রান্ত হইয়া নাট্য রসাস্বাদনের অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে মধুসূদন তাঁহার এই তিনখানি নাটকের ভিতর দিয়া বাঙালীর বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ যে উপকরণ পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী নাট্যকারগণ বাংলা নাটক রচনার একটি আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া বাংলা নাটককে বাঙালীর জীবন-বিমুখী করিয়া তুলিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কারণ আমরা দেখিতে পাইব যে পরবর্তী নাট্যকারগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাটক-গুলিকে নানাভাবে অনুকরণ করিয়াছেন।

একান্ত বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দীনবন্ধু যখন তাহার নাটক ও প্রহসনগুলি রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় বাংলা কথাসাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনারও সূত্র-পাত। দীনবন্ধুর নাটক রচনার প্রায় সমসাময়িক কালেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও প্রকাশিত হইতে থাকে। দীনবন্ধুর প্রতিভা ছিল মৌলিক, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। বিশেষতঃ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও পার্থক্য ছিল। একজন মর্ত্যের ধূলিমাটির উপর বিচরণশীল, আর একজন মর্ত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও নভোমণ্ডল-বিহারী। সুতরাং সমসাময়িক লেখক হওয়া সত্ত্বেও দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের মধ্যে বিষয় ও আদর্শগত পার্থক্য সৃষ্টি হইল—অর্থাৎ বাংলার নাটক ও কথাসাহিত্য সেদিন বিষয় ও জীবন-দৃষ্টির দিক হইতে অভিন্নতা রক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল অল্পদিনের মধ্যেই তাহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইল। কারণ, দীনবন্ধুর যুগে নাটকই বস্তুধর্মী ছিল, উপন্যাসের ভিতর কল্পনা-বিলাসিতা স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুকাল পরই অর্থাৎ নাটকের ক্ষেত্রে গিরীশচন্দ্র এবং কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকে কল্পনা-বিলাসিতা এবং উপন্যাসে বস্তুধর্মিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই ধারাই আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে বিষয় ও ভাবগত এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। এমনকি দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই লেখক যখন নাটক রচনা করিতেছেন, তখন তিনি রোমান্টিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু যখন তিনিই আবার কথাসাহিত্য রচনা করিতেছেন, তখন বস্তুধর্মিতার আশ্রয় লইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব বস্তুধর্মী কথাসাহিত্য 'গল্পগুচ্ছ', 'চোখের বালি' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, সেই যুগেই তিনি 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী' প্রভৃতি রোমান্টিক ধর্মী নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রম-

বিকাশের ধারার কোনও যোগ নাই ; কিন্তু বাংলা নাটক রচনায় যে আদর্শবাদিতার প্রভাব সে যুগে যথার্থ নাটক রচনার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

গিরীশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের একটি স্থূল পার্থক্য অনুভব করা যায়। গিরীশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ভক্তি কিংবা অলৌকিকতার ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতেরও বাহুল্য ছিল না। সুতরাং সে যুগের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের কেবলমাত্র রূপগত পার্থক্য ছিল, ভাবগত কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু গিরীশচন্দ্রের সময় হইতে পৌরাণিক নাটকগুলি উপন্যাসের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ রচনা করিল—প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই বাংলা সাহিত্যে নাটক ও উপন্যাস বিষয়ের দিক দিয়া দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কথাসাহিত্য ক্রমাগতই বস্তুমুখীন হইতে লাগিল, নাটক তাহার পরিবর্তে ক্রমাগতই কল্পনাপ্রধী বা রোমান্সধর্মী হইয়া উঠিতে লাগিল।

বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদেই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাংলার কথাসাহিত্য যখন নূতন বস্তুধর্মী বিষয়-বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল, তখন বাংলা নাটক এই পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় অতীত-ইতিহাসের মধ্যে বিষয়-বস্তুর সন্ধান করিতে লাগিল। সেই যুগেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' প্রভৃতি রচিত হয়। তারপর ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বস্তুধর্মিতার পথ অবলম্বন করিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাংলার স্বদেশী আন্দোলনই বাংলার গৃহ ও পরিবারকে একান্ত পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু সেই যুগে বাংলার নাট্যসাহিত্য এ দেশের প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন হইতে দূরবর্তী থাকিয়া কেবলমাত্র প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় নিজেদের উপকরণ সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার ইহাদের মধ্যে যতই সার্থকতা লাভ কিংবা এই সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়া সেদিনের বাঙালী যতই উন্মাদনা অনুভব করুক না কেন, ইহাদের মধ্যে বাঙালীর বাস্তব জীবনের রূপায়ণ যে সার্থক হয় নাই, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। যে নাটকে জাতির বাস্তব জীবনের রূপায়ণ সার্থক হয় নাই, তাহার সমসাময়িক অন্য যে কোন মূল্যই থাকুক না কেন, সাহিত্যিক মূল্য যে নাই তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা তাঁহার অনুসরণকারী নাট্যকারগণ সে যুগে যে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতেছিলেন, তাহা জাতির প্রত্যক্ষ জীবন হইতে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া স্থায়ী সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইল। কিন্তু সেই যুগে বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন-বোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া কথাসাহিত্যের আকাশে শরৎচন্দ্রের উদয় হইল। যখন কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ-জীবন-অভিজ্ঞতাজাত উপন্যাসের কাহিনীগুলি রচনা করিয়া বাংলার গৃহ ও পরিবারের প্রতি বাঙালীর হৃদয় মমতায় ভরিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ই ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক রোমান্সকে ভিত্তি করিয়া নাটক রচনা করিতেছিলেন। এই সকল নাটকের ভিতর দিয়া বাঙালীর প্রত্যক্ষ

জীবনের প্রতি যে বিমুখীনতার ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহাতেই সে যুগের নাট্যসাহিত্য কথা-সাহিত্যের তুলনায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

বাংলা নাটক প্রথম হইতেই দুইটি উদ্দেশ্য পালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; প্রথমটি সমাজ-সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ দেশাত্মবোধের জাগরণ। কথাসাহিত্য যে এই দায়িত্ব একেবারেই অস্বীকার করিয়াছে, তাহা নহে—কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্যকে ইহা নাটকের মত একেবারে একান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তবে এ কথাও সত্য, দেশাত্মবোধক কিংবা সমাজসংস্কারমূলক উপন্যাস যিনিই রচনা করুন না কেন, বাংলা সাহিত্যে তিনি কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই স্থায়ী কীর্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কথাসাহিত্যেই হউক, কিংবা নাটকেই হউক, উদ্দেশ্যমূলক রচনা যে স্থায়ী শিল্পগুণের অধিকারী হইতে পারে না, তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাট্যকারই ঐ কথাটি সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য প্রায় একটা না একটা কিছু উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন—কিন্তু সাহিত্য অকারণ আনন্দ সৃষ্টি—ইহার কোন উদ্দেশ্য থাকিলেই ইহার স্বভাব-ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিয়াই হউক কিংবা স্বাধীনভাবেই হউক আরও শক্তিশালী বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিকের যখন আবির্ভাব হইতে লাগিল, তখনও নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদের পুরাণ, ইতিহাস ও রোমান্সভিত্তিক রচনার প্রথা নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন তারাশঙ্করের আবির্ভাব দেখা দিল, নাট্যসাহিত্য তখনও ইহার পুরাতন ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া নানা ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করিতে লাগিল। জাতির জীবনের সঙ্গে কথাসাহিত্যের যোগ যখন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল, 'পথের পাঁচালী' 'পঞ্চগ্রাম', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রমুখ রচনার ভিতর দিয়া বাংলার পল্লী যখন জীবন্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখনও বাংলা নাটক, 'সিরাজুদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'নাদির শাহ' ইত্যাদির স্বপ্ন বিলাসিতায় নিমগ্ন।

এইভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যের ব্যবধান ক্রমাগতই যখন বাড়িয়া চলিতে লাগিল, তখন অকস্মাৎ বাংলার সামাজিক জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দিল—তাহা ভারত-বিভাগ এবং তৎসঙ্গে বঙ্গবিচ্ছেদ। ইহার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি এতকাল তথ্য এবং অতথ্যে পূর্ণ হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জয়গান গাহিতেছিল, তাহাদের সুর সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কারণ, তাহাদের আবশ্যকতা দূর হইল। কঠিন হইতে কঠিনতর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এ' জাতির কল্পনাবিলাসিতা পূর্বেই ক্ষীণতর এবং ভক্তি বা ধর্মভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল; সেইজন্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে গিয়া তাহা আর কোন নূতন আশ্রয় রচনা করিতে পারিল না। অথচ নূতন এক জীবন বোধের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার প্রেরণা ক্রমেই এ' জাতির মনে শক্তিশালী হইতে লাগিল। সেইজন্য আজ একশত বৎসরেরও অধিক কাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া বাংলা নাটক বাংলার গৃহ ও পরিবারকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বিভাগোত্তর (post-partition) বাংলা নাটকে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে।

STUDENTS COMMON-ROOM

আণবিক শক্তির গোড়ার কথা

শ্রীসমরজিৎ কর

বিংশ শতাব্দী আণবিক যুগ। সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ তার অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা এবং প্রচেষ্টার দ্বারা যুগে যুগে যে সাফল্য অর্জন করেছে তারই অচিন্তানীয় প্রকাশ বিজ্ঞান জগতে তুলে ধরেছে এক সর্বব্যাপক, সর্বার্থক এবং সূক্ষ্মতম অধ্যায়—সে হোল আণবিক অধ্যায়।

বিভিন্ন পদার্থবিদ্ এবং বিশেষ করে Dalton প্রমাণ করলেন, একটি পদার্থকে যদি আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করি, অবশেষে আমরা এমন একটি পর্যায়ে উপস্থিত হব, যার পর স্বাভাবিক অবস্থায় তার পুনর্বিভক্তিকরণ অসম্ভব। পদার্থের এই সূক্ষ্মতম অবস্থার নামই 'অণু' বা Molecule. রাসায়নিক শক্তি বা অপর কোন শক্তির প্রভাবে অণুকেও বিভক্ত করা যেতে পারে। এই বিভক্তিকৃত অংশের নাম দেওয়া হয়েছে পরমাণু বা atom. Atom বৈদ্যুতিক তেজসম্পন্ন—তাই এর স্বাভাবিক স্থিতি নেই। অবশ্য এই পরমাণুকে চূর্ণ করার স্বপ্ন Dalton-এর যুগে সৃষ্ট হয় নি বললেই চলে।

উত্তরকালে বিভিন্ন পদার্থবিদ্ তাঁদের মৌলিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুকে সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহ উপগ্রহগুলি আবর্তিত হচ্ছে, সেই রকম অণুর কেন্দ্রস্থিত একটি অপেক্ষাকৃত ভারী অংশকে (যার নাম দেওয়া হয়েছে Nucleus) কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন কতকগুলি কণিকা। এদের নাম দেওয়া হয়েছে electron। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে electron বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন এবং এর পরিধি 10^{-13} সেন্টিমিটার। পরমাণুর পরিধি 10^{-8} সেন্টিমিটার। ইলেকট্রনের ওজন $9{\cdot}105 \times 10^{-28}$ গ্রাম। Nucleusএর পরিধি 10^{-12} সেন্টিমিটার। এই Nucleus-এর মধ্যে আছে Proton এবং Neutron. এদের প্রথমটি পজিটিভ বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন, দ্বিতীয়টিতে কোন বিদ্যুৎশক্তি নেই। সমস্ত পদার্থই এই তিনটি উপাদানে গঠিত। এদের সংখ্যা, অবস্থান, আবর্তনের ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে পদার্থের প্রকারভেদ।

বিখ্যাত ক্রিস্‌চার্চ টিউব টেষ্ট করে Crook প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক electronকে বাস্তব ক্ষেত্রে টেনে আনলেন। আর জার্মান বৈজ্ঞানিক Wilhelm Rontgen ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই electron কণিকাগুলিকে বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সাইনাইডের ওপর ফেলে আবিষ্কার করলেন

সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে X-ray। যার স্বরূপ তখনও আবিষ্কর্তার কাছে ছিল অজানা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল, এই রশ্মি পাতলা ধাতব পদার্থ, মাংসপেশী প্রভৃতিকে ভেদ করার ক্ষমতা রাখে এবং ফটোগ্রাফিক প্লেটের সুগ্রাহী (sensitive)। এর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। ফরাসী পদার্থবিদ্ Becquerel দেখলেন ইউরেনিয়াম ঘটিত পিচ্-ব্লেনেড্ও স্বাভাবিক অবস্থায় আপনা থেকে X'rays-এর মত এক রকম রশ্মি বিকীরিত করে যা ফটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রমণ করে। এই পরীক্ষাটি চালানোর জন্যে Becquerel একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কয়েক ভাঁজ কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেললেন। অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা কার্য চলতে লাগল। একদিকে কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেট আর তার সম্মুখে রাখা হোল এক টুকরো পিচ্ ব্লেনেড। উভয়ের মাঝখানে রইল একটি মুদ্রা। পরীক্ষান্তে দেখা গেল এই প্লেটের ওপর মুদ্রার একটি কালো ছবি উঠেছে। বোঝা গেল এই অজানিত রশ্মিও X-রশ্মির মত অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করতে পারে। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই রশ্মির নাম হোল Becquerel রশ্মি। আর কোন পদার্থ থেকে কোন রশ্মির স্বতস্ফূর্ত বিকীরণের নামকরণ হোল Radio-activity.

এর কিছুদিন পর পিয়ারী কুরী এবং ম্যাডাম কুরী আবিষ্কার করলেন Thorium ধাতুও Becquerel রশ্মি বিকীরিত করে। কিন্তু আরও আশ্চর্যের কথা, পিচ্-ব্লেণ্ডস্থিত এমন একটি পদার্থ অবশেষে তাঁদের চোখে পড়ল, যার এই বিকীরণ করার শক্তি অনেক বেশী। এই হোল Radium।

Radium বিজ্ঞান জগতে তুলে ধরল এক নতুন অধ্যায়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিয়ে এল আমূল পরিবর্তন। ইংরেজ পদার্থবিদ্ Rutherford এই Becquerel রশ্মি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করলেন, এই বিকীরিত রশ্মি তিনটি তেজস্ক্রিয় কণিকার সমন্বয়ে সৃষ্ট। এরা হোল (১) α-Particle, (২) β-Particle এবং (৩) γ-Particle.

Rutherfordএর পরীক্ষাটি এই রকম : সামান্য একটু Radium অথবা পিচ্-ব্লেন্ড একটি সীসার গহ্বরের মধ্যে রাখা হোল। গহ্বরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল Radio-active রশ্মি। রশ্মির গতিপথের সমান্তরাল করে, রশ্মির উভয় পাশে একটি পজিটিভ চার্জড্ এবং আর একটী নেগেটিভ চার্জড্ প্লেট রাখা হোল। দেখা গেল বিকীরিত রশ্মির কিছু অংশ পজিটিভ প্লেটের দিকে, কিছু অংশ নেগেটিভ প্লেটের দিকে এগিয়ে গেল। আর কিছু অংশের গতিপথ পরিবর্তিত হোল না। পজিটিভ নেগেটিভে আকর্ষণ হয়। অতএব যে কণাগুলি পজিটিভ প্লেটের দিকে গেল, তারা নিশ্চয় নেগেটিভ বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন। এদের নাম দেওয়া হোল β-rays ; যারা নেগেটিভের দিকে গেল, তাদের নাম হোল α-rays এবং তারা পজিটিভ বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন। যে রশ্মি কোন দিকেই বাঁকল না, তার নাম দেওয়া হোল γ-রশ্মি। γ-রশ্মি বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন নয়। β-রশ্মি সাধারণ electron এবং ইহা এক atom হাইড্রোজেনএর $\frac{1}{1840}$ গুণ ভারী।

এই রশ্মিগুলি যখন কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়, তখন এদের গতি হ্রাস পায় এবং সম্মুখের অণু-পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অবশেষে থেমে পড়ে। এর ফলে পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রণ বেরিয়ে আসে এবং যা আয়নিত (ionized) হয়। অতএব এই রশ্মিগুলিকে আয়নকারী রশ্মি বলা চলে। পদার্থের পরমাণুর

---

(১) α—আলফা। (২) β—বিটা। (৩) γ—গামা।

সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এরা এদের শক্তির কিছু অংশ হারিয়ে ফেলে। এদের মধ্যে γ-রশ্মির পদার্থকে ভেদ করার ক্ষমতা বেশী কিন্তু আয়নিত করার ক্ষমতা কম।

Rutherford-এর উপদেশে ১৯৩২ খৃঃ অব্দে Cock-croft অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রোটনকণা নিক্ষেপ করলেন লিথিয়ামের ওপর এবং লক্ষ্য করলেন লিথিয়ামের ওপর থেকে খুব উচ্চশক্তি সম্পন্ন α-কণা বেরিয়ে আসতে লাগল। এতে করে এই প্রমাণিত হোল যে, Nucleusকে ভাঙতে সুরু করলে পদার্থের যে রূপান্তরই শুধু ঘটে তা নয়, প্রচণ্ড আণবিক শক্তিও বেরিয়ে আসে সেই পদার্থ থেকে। কিন্তু এই আণবিক কেন্দ্র Nucleusকে চূর্ণ করাও কঠিন এবং প্রচুর শক্তির দরকার।

রকেট যন্ত্র

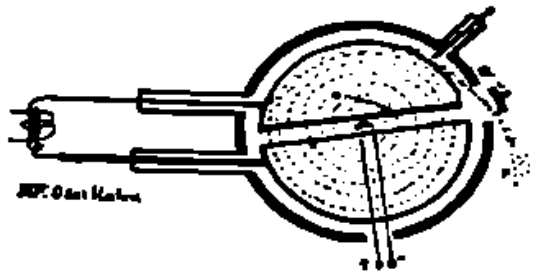

সাইক্রোট্রণ যন্ত্র

১৯১৯ খৃঃ অব্দে রাদারফোর্ড কোন Radio-active পদার্থ থেকে α-কণা নিক্ষেপ করলেন নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর উপর। দেখলেন নাইট্রোজেনের অণু ভেঙ্গে গিয়ে তা থেকে Proton বের হয়ে আসছে।

পরমাণুকে চূর্ণ করার চেষ্টা চলতে লাগল এর পর। বৈজ্ঞানিকরা বুঝলেন α, β এবং γ প্রভৃতি কণাকে এর জন্যে উচ্চতম গতিসম্পন্ন করতে হবে যাতে করে সংঘর্ষ-শক্তি বেশী পাওয়া যেতে পারে। যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে এদেরকে উচ্চগতি দেওয়া যেতে পারে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে—Cyclotron, Synchro Cyclotron, Bevatron, Betatron, Electron-Cyclotron প্রভৃতি।

Cyclotron যন্ত্রটির কাজ এই রকম: এই যন্ত্রে দুইটি অর্ধবৃত্তাকার নল একটি শূন্য কক্ষের মধ্যে রাখা হয়। এই কক্ষটি সন্নিবেশিত থাকে একটি উচ্চতম বৈদ্যুতিক চুম্বকের আবেষ্টনীর মধ্যে। অর্ধ বৃত্ত দুইটির পরিধিস্থ অংশ 50,000 volts. A. C. জেনারেটারের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। যাতে করে প্রত্যেক অর্ধাংশই পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ পেল। একটি সূক্ষ্ম ধাতব অংশ বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তপ্ত অবস্থায় দুইটি অর্ধ বৃত্তের মধ্যস্থিত শূন্যস্থানে রাখা হয়। যখন সামান্য একটু হাইড্রোজেন গ্যাস এই শূন্য কক্ষে রাখা হয়, গরম ফিলামেন্টের electron হাইড্রোজেন অণুকে আয়নিত করে এবং তা থেকে Proton বেরিয়ে আসে। এই Protonকেই আণবিক বুলেট রূপে ব্যবহার করা হবে। Protonকে একটি প্লেট আকর্ষণ করবে, অপরটি বিকর্ষণ করবে। এই অবস্থায় উচ্চতর চুম্বক শক্তির মধ্যে থাকায় Protons বৃত্তাকার কক্ষে আবর্তন করতে থাকবে। প্রতি অর্ধবৃত্ত ঘোরার পর যদি উভয় প্লেটের পোটেনসিয়েল উল্টো (Reverse) করে দেওয়া হয়, Proton-কণিকার বৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাস ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং কণিকা উচ্চ গতিবেগ পায়। অবশেষে

একটি ক্ষুদ্র জানালাপথে কণিকাগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে। এই জানালার সম্মুখে থাকে একটি নেগেটিভ-প্লেট। এর সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় Proton-কণার গতি-পথ সরল-রেখায় পরিবর্তিত হয়। এই Proton কণার সম্মুখে কোন পদার্থ রাখলে তার পরমাণু চূর্ণ হয়ে গিয়ে তেজস্ক্রিয় শক্তি বেরিয়ে আসবে।

১৯৩৯ খৃঃ অব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক Hann ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রণকে ইউরেনিয়ামের ওপর নিক্ষেপ করেন এবং দেখেন একটি U_{235}-এর nucleus একটি neutron-এর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে দুইটি পৃথক পৃথক Nucleus পরিণত হয়েছে। একটি Antimony (Atomic no. 51) অপরটি columbium (Atomic no. 41)। অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের মত মৌলিক পদার্থকে ভেঙ্গে দুইটি পৃথক মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির চেষ্টা। একটি Neutron কণা গ্রহণ করার পর Nucleus অস্থায়ী (unstable) হয়ে পড়ে এবং প্রায় সমান দুই অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন একটি বড় জলবিন্দু ভেঙ্গে গিয়ে দুইটি খণ্ডে পরিণত হয়। শুধু যে Antimony এবং columbiumই এতে তৈরী হয় তা নয়, কখনও কখনও Barium এবং Krypton ও হয়। এই বিভক্তিকরণের সময় প্রচণ্ড আণবিক শক্তি বেরিয়ে আসে, এবং এই বিভক্তিকরণকে বলে Nuclear fission। প্রচণ্ড আণবিক শক্তির প্রভাবে দুইটি Nucleus পরস্পর থেকে ভীষণ গতিতে দূরে সরে যায় এবং নিজেদের ভেতর থেকে দুই চারটি বা বেশী Neutron বের করে দেয়।

এই Nuclear fission আবিষ্কার হওয়ার পর বোঝা গেল U_{235}কে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় এবং বিস্ফোরক শক্তিরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি ইউরেনিয়াম U_{235} Nucleus একটি Neutron নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে এবং দুই বা ততোধিক Neutron বের করে দেবে। এদেরকে গ্রহণ করবে পাশের Nucleusগুলি; তারা চূর্ণ হবে, বের করে দেবে কয়েকটি Neutron এবং এইভাবে চলবে একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Reaction)। ফলে প্রচণ্ড আণবিক শক্তি পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক কিউবিক সেন্টিমিটার ইউরেনিয়াম কয়েক সহস্র টন T. N. T র. শক্তির সমান।

আণবিক বোমার প্রস্তুতপ্রণালী যদিও সাধারণ বিশ্ববাসীর কাছে অজানা, তবুও এটা সত্য যে, তার শক্তির উৎস U_{235}-এর Nucleus-এর উপর Chain Reaction-এরই ফল। আণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে উত্তাপ বের হয় তাতে করে কয়েক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষা হয় আমেরিকার মেক্সিকো মরুভূমিতে। বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল দুশো ফুট উঁচু একটি ষ্টীলের টাওয়ারের ওপর—যা সম্পূর্ণভাবে বাষ্পে পরিণত হয়। আর বিস্ফোরণের সময় যে আলো বের হয়, রাত্রির অন্ধকারেও দূরের পাহাড়কে মধ্যাহ্নদীপ্ত পাহাড়ের মত মনে হয়েছিল।

আণবিক শক্তি নিয়ে মানুষের গবেষণার অন্ত নেই। নতুন আবিষ্কারে সার্থক হয়ে উঠছে তার গবেষণা, তার অধ্যবসায়। কিন্তু তবুও থাকে একটি প্রশ্ন। একটি কাতর শ্বাস। মানুষের কর্মের এই সাফল্যে, মানুষ আজ আনন্দিত নয় কেন? সে প্রশ্নের উত্তর পড়ে আছে নাগাসাকিতে, আছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, হিরোশিমার মাটিতে বাতাসে। শুধু খেয়ে মৃত্যু পেলে, সে শুধু বিষ। জীবন পেলে, তা অমৃত। বিশ্ববাসী আজ আণবিক শক্তির কাছ থেকে সেই অমৃতই চায়।

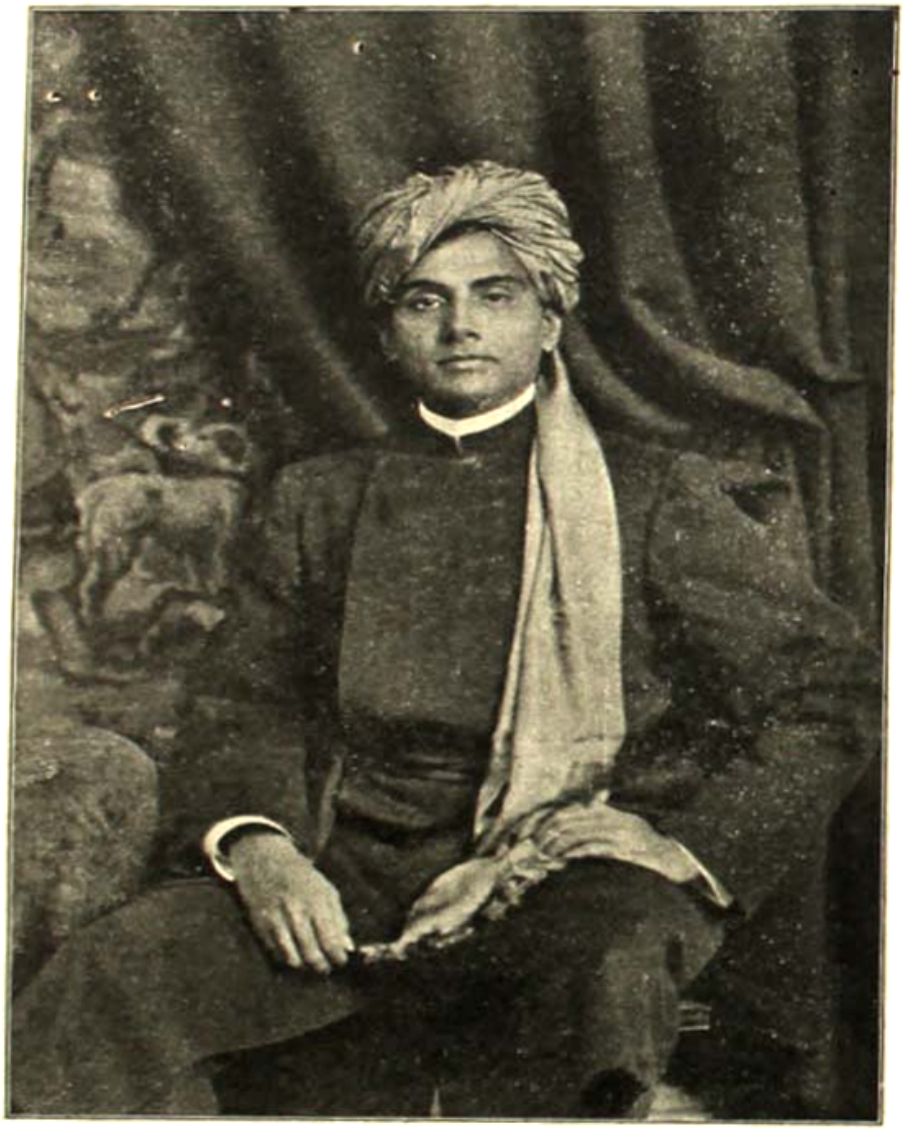

স্বামী অভেদানন্দ

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

একদিনের একটি ছোট ঘটনা। ইংরাজী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী—কি ফেব্রুয়ারী মাস হবে। বেলা সাড়ে এগার কিম্বা পৌণে বারোটা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁর আফিস-ঘরে একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমরা সম্ভবতঃ তিন চারজন ছিলাম। ঘর বেশ নিস্তব্ধ। দু'একটি সামান্য কথার পর তিনি বল্লেন: 'দেখ, এখন সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এই তো সেদিনের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কত লীলাখেলা করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে মিশেছি, তাঁকে স্পর্শ করেছি, তাঁর সেবা করেছি। কি অফুরন্তই না ছিল তাঁর ভালবাসা। আজ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ছে সে সব দিনের কথা। যা ছিল জাগ্রত একদিন, আজ মনে হচ্ছে স্বপ্ন। সে'দিনের কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিন—কত শতাব্দী যেন কেটে গেছে'।

আমরা নির্বাক হ'য়ে শুনছি। স্বামিজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত। তিনি বল্লেন: 'তাঁর মতো অলোকসামান্য লোকনায়কের কৃপা পেলে জীবন কৃতার্থ হয়ে যায়। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানও তুচ্ছ মনে হয়'।

আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞান পাবার জন্যই তো মানুষের জন্ম ও সাধনা, সুতরাং তাকে তুচ্ছ মনে হবে কেন'?

স্বামিজী মহারাজ ঈষৎ হেসে বল্লেন: 'ঠিক বলেছ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্যই তো মানুষের জীবন। তা' আর সত্যি সত্যি ক'জন ভাবে বলো। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুটি কিরকম বল দেখি। লাভই বা তাঁকে ক্যামন ক'রে করবে'?

আমরা পূর্বের মতো নির্বাক হ'য়ে শুনছি। তিনি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'ব্রহ্ম কি আর তুমি আমি ছাড়া? তিনিই তো সব হয়েছেন—জীবজন্তু বিশ্বসংসার সব-কিছু। এই যে চেয়ারটা দেখছ, তোমরা মনে করছ এটা জড়, কিন্তু এই জড়ের

মধ্যেই চৈতন্য আছে। এর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে চৈতন্যশক্তি অনুস্যূত আছে। জড়বস্তুও resist করে—বাধা দেয়। দেওয়ালে জোরে একটা ঘুঁষি মার, দেখবে দেয়ালটা তার return (ফেরৎ) দেবে। এই return (ফিরিয়ে) দেওয়ার নাম resist করা। দেওয়াল resist করলে, ফলে তুমি হাতে ব্যথা পেলে। Resist করার শক্তি জড়ের মধ্যে আছে। এই শক্তিই energy অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি। সে' চৈতন্য জড়ের ভেতর অব্যক্ত আকারে থাকে। অব্যক্ত অবস্থার নামই জড়বস্তু। যে চৈতন্য জড়ে আছে, সেই চৈতন্যই আকাশে বাতাসের ও পৃথিবীর সর্বত্র—অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছে। চিনিকে জলে ফেলে দিলে সে যেমন জলের প্রতিটি কণায় বা পরমাণুতে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মচৈতন্যও তেমনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। ব্রহ্মের ব্যাপক সত্তাকে উপলব্ধি করার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। নইলে ব্রহ্মজ্ঞান কি আর গাছে ফলে? এই উপলব্ধি মন বা বুদ্ধি দিয়ে হয় না, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের অনুভূতি—বোধে বোধ। বোধ কিনা শুদ্ধচৈতন্য। শুদ্ধ-চৈতন্যের অনুভূতি তখনই আসে যখন ভাববে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে তুমি আলাদা নও, তোমার সত্তাই বিশ্বসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা। এটা অনুমানের জিনিস নয়, প্রাণে প্রাণে অনুভব করার জিনিস। এই অনুভূতি হয়েছিল বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) একদিন কালী-মন্দিরের পূজার কোশাকুশি, থালা-বাসন ও এমন কি দরজা-জানালা, চৌকাঠ সমস্ত দেখলেন চৈতন্যময়। এ রকমই হয়। এই অনুভূতি এখুনি—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে'!

স্বামিজী মহারাজ 'এখুনি—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে' কথাগুলি এমনই দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন যেন আমাদের মনে হ'ল—ব্রহ্মজ্ঞান বুঝি মানুষমাত্রের অনায়াস-লভ্য, দুর্লভ বিন্দুমাত্র নয়। তারপর তিনি ও আমরা নির্বাক হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। আফিস-ঘরের পরিবেশ যেন এক অমাট ভাবে আচ্ছন্ন, নীরব নিস্তব্ধ চারদিক। সর্ব-শরীরে এক অব্যক্ত আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। কতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো ছিলাম মনে নাই, তবে স্বামিজী মহারাজ যখন চেয়ারটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন আমাদের হুঁস এল। ঘড়িতে তখন বেজেছে বেলা একটা। তাঁকে প্রণাম ক'রে বাইরে এলাম। সত্য বলতে কি—ভাবের আচ্ছন্নতা তখনো আমাদের কাটেনি।

সামান্য ক্ষণের এই ঘটনা, কিন্তু আজও সেই স্মৃতি অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে।

STUDENTS COMMON-ROOM

বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ ও ভূদেব

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিহাসের বিচারে রাজা রামমোহন রায়কে বাঙলার নবযুগের প্রথম মানুষ বলা হইয়াছে। তিনি একাধারে নবযুগের ধারক ও বাহক ছিলেন। রামমোহন ছিলেন দ্রষ্টা ; তাঁহার সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি জাতিকে নূতন পথে চলিবার প্রেরণা দান করিতে পারিয়াছিলেন। মুমূর্ষু জাতি সকল দিকেই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রামমোহনের কর্মজীবনও বহুমুখী হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার যুক্তি-নিষ্ঠা ও বস্তুপ্রীতি বাঙালীর জড়ত্বপ্রাপ্ত জীবনে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল। ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যে দীন-হীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাঙালী এই আঘাতে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সচেতন ভাব বাঙালীর জীবনকে নানাদিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের কোন্‌গুলি জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে, আর কোন্‌গুলি অবনতির পথে নামাইয়া লইয়া যাইবে, তাহা উপলব্ধি করিতে যে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা সে যুগে একমাত্র রামমোহনেরই ছিল। তাই তিনি উন্নতিকর প্রভাবগুলিকে সমর্থন এবং অবনতিকরগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

রামমোহনের কর্মজীবনের কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারা স্থূলভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন, বাঙালীর সমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করা, হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা, সম্ভব হইলে একটি উদার, সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মমত প্রচার করা,—এই ধারাগুলি রামমোহনের কর্মবহুল জীবনে প্রধান ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন বাঙালীকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিবে বুঝিয়া রামমোহন ইহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর এবং ইংরাজ শাসকদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তদানীন্তন ভারতের বড়লাট ও ইংলণ্ডে ভারত-সম্পর্কিত কার্য পরিচালনার জন্য স্থাপিত সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যদের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন।

তাঁহার অকাট্য যুক্তিতে নিরুত্তর শাসকসম্প্রদায় অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। রামমোহনের এই প্রচেষ্টা যে দেশবাসীকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও দেশীয় ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য সমিতি গঠনে।

বাঙালীর সমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করার চেষ্টায়ই রামমোহন সর্বাধিক বাধা পাইয়াছিলেন। মসীযুদ্ধে বাঙালী সমাজের অচলায়তন সচল হইবে না বুঝিয়া রামমোহন শাসকদের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। ইহারই ফলে সর্বপ্রথম সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। রামমোহনের এই কর্মধারাও পরবর্তীকালের বাঙালীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন এবং আইন দ্বারা বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ করার প্রচেষ্টায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও রামমোহনের ন্যায় মসীযুদ্ধের পর শাসকদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

রামমোহন যে একটি উদার, সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মরূপে পরিণত হয়। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকেরা সমাজ-সংস্কারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু ইউরোপীয় ভাবধারা ও পূজাপদ্ধতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা গভীরতর ছিল বলিয়া বাঙালীর জীবনযাত্রায় ইউরোপীয় প্রভাব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তাই, জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হইবার পর হইতেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব লোপ পাইয়াছে।

রামমোহনের মহত্তম কার্য হইতেছে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা। তিনি সংস্কৃত বেদান্তগ্রন্থের বাঙলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহা বাঙলা গদ্যের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাঙালীরা যে ইহার সহায়তায় হিন্দুধর্মের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হইতেই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার উদ্ভব হয়, বাঙলা দেশে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

রামমোহনের এই ধারাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বাঙালীর জীবনযাত্রার সকল দিকেই যখন বিজাতীয় ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যখন সকল প্রকার দেশীয় আচার-আচরণ বর্জন এবং বিদেশীয় আচার-আচরণ গ্রহণ যুগধর্ম হইয়া উঠিয়াছে, যখন প্রকাশ্যে মদ্যপান প্রগতি-নিদর্শনরূপে পরিচয় লাভ করিয়াছে, উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত পানাহার বাঙালীর সামাজিকতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভূদেব জাতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দৃঢ়চরিত্র মহাপুরুষ কঠোর একনিষ্ঠ সাধনাদ্বারা বাঙালীর চিত্তে জাতীয়তা-বোধ জাগাইয়া জাতীয় ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রামমোহনের বেদান্তচন্দ্রিকা বেদান্তদর্শনে-আগ্রহশীল পাঠকের জন্যই লিখিত হইয়াছিল ; ইহা সর্বসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই ভূদেব তাঁহার মাধ্যম করিয়াছিলেন সাহিত্যকে ; গল্প বা কাহিনীর অন্তরালে জাতীয়ভাবের উদ্দীপক বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া ভূদেব পাঠকের চিত্তজয়ের প্রয়াস করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব এডুকেশন গেজেট নামক পত্রিকা পরিচালনার ভার পাইয়াছিলেন। ইহারই মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর মনে জাতীয়ভাব সঞ্চারের আয়োজন আরম্ভ করেন। ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী Romance of History নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। ইহাই বাঙলা ভাষায় ঐরূপ কাহিনী রচনার প্রথম প্রয়াস। ইতিহাসের পটভূমিতে দেশপ্রেম

জাগাইয়া তোলা সহজ হইবে বলিয়াই ভূদেব ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভারতীয় কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, নিছক কাহিনী রচনার উদ্দেশ্যে নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্গত "অঙ্গুরীয় বিনিময়" নামক কাহিনীতে দেশের কথা বলিতে গিয়া নায়কের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি ভূদেবের মতবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছে :

"জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে"।

বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে কাজ করিতে করিতে শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহাতে শিশুচিত্তে জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, ভূদেব তাহার চেষ্টাও করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাদর্পণ নামে এক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ইহাতে ভূদেবের রচনার মধ্যে পাই :

"জননী যদি পীড়িতা না হয়েন তবে তাঁহার স্তন্যই শিশুর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনোপায়। বাঙালীর পক্ষে বঙ্গভূমিও সেইরূপ। • • • আমরা চেষ্টা করিলেই স্বাপনাদিগের অবস্থা দিন দিন ভাল করিয়া লইতে পারি"।

ভূদেব যে অখিলভারতীয় প্রণাম-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশমাতৃকাকে তিনি এইভাবে প্রণাম করিতেছেন :

মাতর্নমামি ভবতীং হি সতীদেহ রূপাং।
মাতর্নমামি বসুধাতল পুণ্য তীর্থং॥
মাতর্নমামি পয়ঃফেনসিতা রাশিং ;
মাতর্নমামি হিমগৌর কিরীটভূষাং॥

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "পুষ্পাঞ্জলী" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটির নামকরণের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"অর্থাৎ কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন"। ইহা হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থের আভাসে ভূদেব লিখিয়াছেন :

"প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী আখ্যায়িকা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব ; কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে ; অতিশয়োক্তি এবং রূপকালঙ্কারেরও আধিক্য হয়। • • • পুরাণশাস্ত্রে লিখিত নায়ক-নায়িকা এবং দেবাসুরগণ বহু স্থলেই রূপকালঙ্কারবিভূষিত। তাহারা বস্তুগত্যা আভ্যন্তরিক মনোভাবস্বরূপ অথবা বাহ্য প্রকৃতির শক্তিবিশেষ ; সুতরাং রক্তমাংসসম্ভূত প্রকৃত জীবশরীরের ন্যায় তাহারা দেশকাল সম্বন্ধে নহে।

এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, দেবী প্রভৃতি কেহবা বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, কেহবা অলক্ষিতভাবে বিচরণ করেন, কেহবা অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া স্বমূর্তি প্রকাশিত করেন বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ-স্বরূপ বর্ণন করা গিয়াছে ; তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না। • • • অপিচ বিনাশমাত্রে

সংসারের পর্যবসান এই প্রতীতি-সমুদ্ভূত নাস্তিকতার প্রভাবে যে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া চেষ্টাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়, একথাও সহজবোধ হইবে। অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা ও প্রজার সুসংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির উদারতা অনুভূত হওয়া-সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হইবে"।

ভূদেব স্পষ্টভাবেই তাঁহার গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা যে জাতীয়তা বোধের বিকাশ এবং স্বজাতির প্রতি বাৎসল্য, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ এখানে নাই; একটি মাত্র উদ্ধৃতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উজ্জ্বল করিয়া প্রতিফলিত করিবে :

"ভারতবর্ষের শিরোদেশে হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর। ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রসদৃশ শুভ্র-সলিলা স্রোতস্বিনী। ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহুপ্রসৃত বারিধারাদ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস-নিবন্ধন হিন্দুজাতীয়দের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়"।

স্বদেশকে এইরূপ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার পূর্বে অন্ততঃ বাঙলা ভাষায় আর কেহ ব্যক্ত করেন নাই।

এই ভাব ও আদর্শ ভূদেব তাঁহার "স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস," "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেও প্রচার করিয়াছেন। দীর্ঘদিন একাকী, প্রতিকূল পরিবেশে ভূদেব যে বাঙালীর হৃদয়ে জাতীয় ভাব এবং স্বদেশীয়ের প্রতি বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিতে সফল হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালের অনেক সাহিত্যিক তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" রচনার কথা বলা যায়। হেমচন্দ্র যে ঐ সঙ্গীতের মধ্যে ভূদেবের আদর্শকেই রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের সহিত গভীর সখ্যে আবদ্ধ ছিলেন। এই সখ্যের ফলেই বঙ্কিমের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় এবং তিনি ভূদেবের আরব্ধ কার্য সফল করিয়া তুলিতে যত্নবান হন। ভূদেবের প্রতি বঙ্কিমের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি রেভারেণ্ড হেস্টির সহিত মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে একটি প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন : হিন্দু-বিশ্বাসের উপর যে সকল উপাখ্যান আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির গ্রন্থকারের (ইনিও বাঙালী—বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়) সভক্তিক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন কিছু হইতে হীন নহে"। (মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদ)

বঙ্কিম ভূদেবের চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন বাঙালীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তার ভাব জাগাইয়া। তাঁহার "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব" এবং আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' গান ভূদেবের ভাবাদর্শের কাব্যময় রূপ। তাই বলিতে পারা যায় যে, নব্য বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বাদেশিকতার প্রাথমিক রামমোহন হইতে ভূদেব, ভূদেব হইতে বঙ্কিম এবং বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথে প্রসারিত হইয়া বাঙালীর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

দুর্গোৎসব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

উৎসবের সমারোহে উঠিতেছে কল-কোলাহল,
মণ্ডপে মণ্ডপে হেরি বেদী 'পরে মৃন্ময়ী-প্রতিমা!
দীপালির দীপ্তাভায় চতুর্দিক হয়েছে উজ্জ্বল,
নব-সাজ-সজ্জা মাঝে পূজা-স্থলে ভ'রেছে গরিমা।
দেখিতেছি—মা এসেছে, রূপে তাঁর মুগ্ধ হয় মন!
দশ হস্তে দশায়ুধ—পরিস্থিতা কেশরী-বাহনে।
পদ-তলে নিপীড়িত মহাসুর ভীষণ-দর্শন।
মহাশক্তি বিশ্বমাতা অবতীর্ণা অরাতি-দলনে।
পূজারী করিছে পূজা, উচ্চ-কণ্ঠে উঠে মন্ত্র-রব,
সম্মুখে নৈবেদ্য-পুষ্প-ধূপ-দীপ রাখা থরে থরে।
হৃদয় আকৃষ্ট হয় হেরি সেই সজ্জার বৈভব!
আনন্দের মহাধ্বনি ছেয়ে যায় দিকে দিগন্তরে।
বাঙালীর মহাপূজা, কত ঘটা, কত আয়োজন।
ব্যথা-ক্লিষ্ট-জীবনের মাঝে যেন মধুর-আশ্বাস।
ঘরে ঘরে অন্ন নাই, অভাবের সুতীব্র তাড়ন,
উৎসবের মাঝে তবু জেগে উঠে আনন্দ-বিলাস!
দেশ যেন মরুভূমি, শ্মশানের দৃশ্য চারিভিতে,
প্রাণহীন জড়তায় ভ'রে গেছে বাহির অন্তর।
তবু দেশ মন্ত্রপারা! তবু জাতি অবসন্ন-চিতে—
এনেছে পূজার অর্ঘ্য দিতে মা'র চরণের 'পর!
শ্রী ও ঐশ্বর্য কবে চ'লে গেছে ছাড়ি' এই দেশ,
দুর্ভিক্ষ-করাল-গ্রাসে নিপতিত সাধ্য অধিবাসী!
মৃত্যুগ্রস্ত জীবনের মাঝে নাই চঞ্চলতা-লেশ,
তবুও উৎসব জাগে! শ্মশানের বুকে জাগে হাসি।
একদিন ছিল প্রাণ—প্রাণহীন এই দেশ ভরি,
বাঙালী ক'রেছে পূজা প্রাচুর্যের সমারোহ মাঝে।
আজো তার জের চলে—অতীতের সেই সূত্র ধরি,
উদাত্ত-আরাবে শংখ সেই সুরে আজো শুনি বাজে!

কোন্ দূর-গ্রাম-প্রান্তে জেগে উঠে আগমনী-গান,
ভেসে আসে মাঠে বাটে "প্রসাদের" গীতি সুমধুর!
সেই সুরে ভ'রে উঠে আজো ক্ষুব্ধ বাঙালীর প্রাণ,
চণ্ডীর স্তবির রোলে ভোলে দুঃখ আজো ব্যথাতুর।
দুঃখে কষ্টে জর্জরিত এ দেশের উপবাসী চাষী,
আজিও আনন্দে নাচে হেরি' মা'র স্মিত-মুখখানি!
ভাবে তারা—মা এসেছে, অভাবের তীব্রজ্বালা নাশি,
শস্যহীন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হেরে মা'র বরাভয়-পাণি!
তাই ত' মায়ের রূপ ভ'রে উঠে আকাশে বাতাসে,
ভ'রে উঠে ভাঙা ঘাটে, মন্দিরে ও মজা-নদী-তটে।
মায়ের স্নেহের ধারা ঝ'রে পড়ে স্নিগ্ধ-ফুল-বাসে,
শরতে সোনার রোদ মা'র ছবি আঁকে চিত্ত-পটে।

কান্নার দাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ডেকে ডেকে ক্লান্ত যখন
চেষ্টা কর কান্নাতে,
ডাকের চেয়ে কান্না দামী
মাকে কাছে আনতে।
ডাক শুনে মা আনন্দেতে
কাজের মাঝে কানটি পেতে,
কান্নাতে মা সুতের বেদন
ত্বরিত পারেন জানতে।

ব্যাকুল কাতর কাঁদলে ছেলে
কাঁদার মত কান্না,
কি দিয়ে যে ভুলাইবেন
মা যে খুঁজে পান না।
কোনো জিনিষ অদেয় তাঁর,
তখন তাঁহার থাকে না আর,
দশটি হাতই ব্যস্ত মাতার
তনয় কোলে টানতে।

বিশ্বনাথের আইন কানুন
পলকে হয় ভঙ্গ,
নিয়তি যায় ভয়েই সরে
যম যে দেখে রঙ্গ।
কান্নাতে হয় এমনি করি,
ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী
কান্না পারে মহামায়ায়
মায়ার ডোরে বাঁধতে।

সে কান্না যে নিত্য করে
সকল বাধা চূর্ণ,
চতুর্মুখের কমণ্ডলু
কানায় কানায় পূর্ণ।
সে কান্নার যে মেঘের জলে
কল্পতরুর ফসল ফলে,
সে কান্না দিগ্‌গজের শিরে
কুলিশ পারে হান্‌তে।

পঞ্চপথ

শ্রীকালিদাস রায়

যেই বন পথ দিয়া প্রত্যহ কৈশোরে
যাতায়াত করিতাম
বিদ্যালয়ে বই হাতে ক'রে
যে পথে দিয়াছি-আমি বার্ষীরূপখানি,
সে পথেরে ভালবাসি
স্বপ্নপথ বলি তারে জানি।

বিবাহান্তে নববধূ সহ নিজগ্রাম
বার ক্রোশ দীর্ঘ যেই পথে ফিরিলাম।
পাল্কী চড়ি, মনে পড়ে
বারবারই সেই পথখানি,
সে পথেরে ভালবাসি
প্রেমপথ বলি তারে মানি।

যাতায়াতে দশ ক্রোশ
যেই পথে না করি বিশ্রাম
মায়ের শবের সাথে
গঙ্গাতীরে হাঁটিয়া গেলাম,
জানিতে দিল না মোরে
পথক্লেশ যেই পথখানি
তারে আমি ভালবাসি
শোকপথ বলি তারে জানি।

ভিন্তাপারে হস্তীপৃষ্ঠে চড়ি
যৌবনে অর্জন তরে যেই পথ ধরি
গেলাম প্রবাস-তীর্থে
স্মরি নিত্য সেই পথখানি,
সে পথেরে ভালবাসি
আশাপথ বলি তারে মানি।

আর এক পথ বাকি
শেষ তাহা সুরধুনীনীরে
সে পথের যাত্রী আর কভু নাহি ফিরে।
নিত্য দেখা তার সাথে
সেই পথ দেয় হাতছানি
ভালবাসি তাহারেও
শান্তিপথ বলি তারে মানি।

একটি উপদেশ

(ফ্রেনিক কবি লাউজের বাণী হইতে)

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মানুষেরে বেশী করিওনা খ্যাতি
তাহলে মানুষ বিরোধ শূন্য হবে,
দুর্লভ ধনে করো না আদর
চৌর্য হইতে মানুষ বিরত রবে।
ইঙ্গিত যাহা প্রকাশ করো না
চঞ্চল ভাব উদয় হবে না মনে,
সেই হেতু শোন সুধীর সুজন
আত্মাকে করি শান্ত প্রতিটি ক্ষণে,
সকল বাসনা বর্জন করি
পৃথিবীর পথে লভিতে পরম জ্ঞান
বুদ্ধি করিতে অতি দৃঢ়তর
সকল মানুষে করেন শিক্ষা দান।

মায়া

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

কে কাকে যে ধ'রে রাখে,
কেউ জানে না পৃথিবীতে,
তবু এসে ভিড় করে যে
কেবল দিতে কেবল নিতে।
এম্‌নি ক'রে হাজার হাজার
বছর কাটে ইতিহাসের,
এম্‌নি করেই হয় রচনা
গানখানি যে মধুমাসের।
গ্রহ থেকে কুড়িয়ে ছুটি
সবাই চলে গ্রহান্তরে,
তবু যে এই গ্রহের মায়া
প্রেমের ফাঁসে বন্দী করে।
মেয়াদ যে তার অল্পদিনের,
কেউ বোঝে না পৃথিবীতে ;
সবাই তারা ভিড় ক'রে চায়
কেবল দিতে কেবল নিতে।

পূজা

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

শরৎ এসেছে দ্বারে বার্তালিপি নিয়ে পুনরায়,
পুরাতন স্বর্ণরথে দেবী নাকি এলেন ধরায়।
হবে'ও বা। নহে, কেন নবসাজ শিউলীর গাছে?
আকাশের চাঁদোয়ায় সাফাইএর ধুম লাগিয়াছে;
কেন তবে অত খুশী শতদল, শালুকের ফুল;
মধুর প্রসাদ লোভে কেন উড়ে' ফিরে অলিকুল।
সবুজের মায়াজাল মাঠে মাঠে ধানের চারায়,
দুরুদুরু অন্নাভাব মিটাবার ভরসা বাড়ায়;
পাখিদের গলাসাধা শোনা যায় বরষার পরে;
কর্দম বিহীন পথ—ফিটফাট্, তকতক্ করে;
জীবকুল বাদলের হাত থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।
চারিদিক অপরূপ বিমোহন জাদুর ছোঁয়াচে?

এ' পাড়ায় সে' পাড়ায় ছেলেদের ঘুম কমে আসে,
হেবোদা'র ডাক পেয়ে অনেকেই জোটে তার পাশে।
প্যালা, মন্ত, বটা, রাম্ আছে কিন্তু নন্ত আসে নাই,
গতবার প্রোগ্রামএ ও'র নাম ছাপে নাই,—তাই।
ওরা বলে, 'রাম-শ্যাম-যদু-মধু সকলেরে চাই;
পূজার পুণ্যের ফল একা খাবে—সেদিন যে নাই।'
পড়শীর ব'কে বসে' বিরোধীর কিলা করে ফতে;
সার্বজনীন পূজা,—মাফ কারো নাই চাঁদা হ'তে।
এ'পাড়া জ্বালাতে হবে জোর-গলা স্পীকারের রবে,
আলোকের জৌলুসে ও'পাড়াকে হারাইতে হবে।

বিরাট প্যাণ্ডেল চাই, আট্-সাট্ তিনদিকে ঘের,
ঠাকুরটি হ'তে হ'বে পুরাপুরি হাল ফ্যাসানের।
ভোগ-রাগ—তাও আছে, হয়ত বা কাঙালী ভোজন;
তা' না হ'লে আগামীতে কমে যদি চাঁদার ওজন!
পূজার অঙ্গন ঘিরে তিনদিকে প্রদর্শনী খুলে'
সমাজের দুর্দশা গণ-চোখে ধরা চাই তুলে।
খাটে-তোলা দেবী আগে থাকিবেন পর্দার আড়ালে,
সবার দর্শন হবে মন্ত্রী এসে পর্দাটি সরা'লে।
ট্যাক্-ভারী সভাপতি খুঁজে-পেতে নিতান্ত না পেলে
প্রধান অতিথি চাই—'এডিটর' অথবা এম-এল-এ।

পূজার বাজার ভাই, টাকাকড়ি হাতে খুব চাই ;
উঠে' পড়ে' লেগে গেছে যে-যাহার সীমায় সবাই।
মালিকেরা হুসিয়ার, বোনাসের দাবী আগে মেনো,
ব্যবসার শেষ, নহে, একদিনে ঘটে' যাবে জেনো।
দোকানে-দোকানে বাড়ে নিত্যকার জিনিষের দাম,—
চাল-ডাল, মাছ-শাক, দুধ, আলু, কবি কত নাম!
তৈলেতে ভেজাল আছে, গুড়ে বালি, ঘৃতে বনস্পতি,—
টাকার আসার পথ পরিচিত সুগম এ' অতি।
খাদ্য ও অখাদ্য ছবি এনভার আয়োজনে রত—
সিনেমা-কর্তারা জানে অর্থাভাব নাই দেশে তত।

জামা জুতা কিতা শাড়ী যথাতথা গাদায়-গাদায়,
রংএর বাহারে যেন অন্ধেরও নয়ন ধাঁধায়।
দোকানীরা পাইয়াছে প্রতীক্ষিত পূজা মরশুম,
ধনীদের কেনাকাটা বাজারের লাগিয়াছে ধুম।
অর্থহীন অভাগারা শূন্য ট্যাঁকে হাত দিয়ে হায়—
নিষ্ফল লালসা চেপে' ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে দেখে যায়।
পকেটমারেরা ফিরে শিকারের খোঁজে খোঁজে ভীড়ে,
পড়িবেনা ধরা কিম্বা হারাবে না এ' সুযোগটিরে।

পূজার সূচনা ঘোষে ঢাক আর লাউড-স্পীকার :
'দুর্গামায়ী কী জয়' ভক্তকণ্ঠে বিষম হুঙ্কার।
চলে দীন, জীর্ণবাস এ'পূজার সে' পূজার স্থানে,
কি যে চায়, কি যে পায়—যার পূজা সেই বুঝি জানে।

মানুষের সৃষ্টিকরা অভিশপ্ত নব যাযাবর,
দিকে দিকে বহি' ফিরে হাতে মাথে গোটা বাড়ীঘর।
কারো সাথে মাতা, পিসি, ভাই, বোন, খুকী আধমরা,
বউ, ছেলে, ছেঁড়াকাঁথা, ফুটা ঘটি, মগে জলভরা।
কাজ করে', ভিখ মেগে', চুরি করে' চাল কিনে আনে,
কোন কোন ভাগ্যবান বেঁচে আছে সরকারী দানে।
পথ-পাশে রেঁধেবেড়ে অনায়াসে পোড়া পেটে পুরে,
তারপরে সুখ-নিদ্রা—ছেঁড়া চটে পথ-ঘাট জুড়ে।
দেশে আর ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই এঁ পঙ্গপালের—
দণ্ডক অরণ্যে হবে সুব্যবস্থা চুলা ও চালের।
আর আছে আন্দামান, পুণ্যস্থান স্বর্গের পরেই,
যাযাবর যেতে পারে বিনামূল্যে জাহাজে চড়েই।
'চলমান শ্মশানের' মত ওরা—নাই কিছু নাই— ;
দেবী কী ওদেরো মাতা ? পূজকেরা উহাদের ভাই ?

STUDENTS P G. COMMON-ROOM

তবু ভাল, ধনী এক মহাপ্রাণ পূজা বন্ধ রাখি'
নববস্ত্র দেন বহু অর্থব্যয় 'নারায়ণে' ডাকি।
ধনাঢ্য বণিক কোন, সোপচার অন্ন করি দান—
পূজাদিনে বুভুক্ষুর মুখে হাসি ফুটাইতে চান।

তোমার পূজার কি মা, এটুকুই শেষ কথা হ'ল ?
পূজার যা' মর্মবাণী, সে' কি মোরা ভুলি নাই, বল।
তুমি কি জাননা মাতঃ, আমাদের রক্তে রক্তে কত
দুর্নীতি যে পুঞ্জীকৃত মারাত্মক জীবাণুর মত ?
জননি, এসেছ যদি, সন্তানের চিত্ত পানে চাও,—
দুর্লোভ, দুর্মতি হ'তে কৃপা করি মোদেরে বাঁচাও।
পূজার বিলাস এই—অবোধের মূঢ়তার খেলা,
ভেঙ্গে দিয়ে যাবে না'কি এইবার বিজয়ার বেলা ?

●

মায়ের বাণী

শ্রীনবগোপাল সিংহ

আধুনিকতম কল্পনা দিয়ে
গড়েছো আমার মূরতিখানি
পাহাড় বর্ণা আলোকসজ্জা
সবই সুন্দর করেছো জানি।
গীতি ও বাদ্যে হাসি আনন্দে
মুখর করেছো পূজার বেদী
সন্ধ্যারতির ঘন্টা কাঁসর
'যন্ত্রে' উঠিছে গগন ভেদি'।
কিন্তু হে মোর পূজারীর দল
পূজাবিধি মোর নয়কো হেন

বছরে দিলেক পুষ্পাঞ্জলি
স্তব পাঠে পূজা হয়না জেনো।
মায়ের সাধনা, সে-যে শাশ্বত
শক্তির পথে অগ্রগতি
ভক্তি কুসুমে অর্চনা, আর
জ্ঞানের প্রদীপে সন্ধ্যারতি।
মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী এ যে
শক্তিরূপিনী মা দশভুজা
দশপ্রহরণ ধারিণী মায়ের
শক্তি সাধনই সত্য পূজা।

নাটক-কথা

বিনয় দত্ত

বাঙালী নাটক-প্রিয়। প্রতি বাংলা সহরে, এমনকি বর্ধিষ্ণু গাঁয়েও রঙ্গমঞ্চ তৈরী ক'রে উৎসবের সময় নাটক হতো, বোধহয় এখনও হয়। বোধহয় বলছি, কারণ নাটকের চেয়ে এখন সিনেমার চলন বেশী; ফুটবল ক্রিকেট এ'সব খেলা দেখতে লোক বাড়ছে। চালু রঙ্গমঞ্চের অবস্থা দেখে মনে হয়, মনোরঞ্জনের দিক থেকে নাটকের উপযোগিতা যেন কমেছে। কেবল পুরাতন সংস্কার মোহেই যেন নাটক চলছে।

এই মোহের কথা বলি। এ' মোহ রূপ বা প্রকাশভঙ্গীর মোহ। কবিতার চলন বহুকাল থেকে। আজকাল কবিরা প্রচলিত পথে না হেঁটে অন্য পথ বেছে নিচ্ছেন প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তা ও নিজেদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু সম্পাদক মাত্রেই দেখেছেন "পাখি সব করে রব···" ধরণের কবিতা দামী কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে লেখার আমদানী কমে নি। এ' কবিতা লেখার মোহ। লোকের বাড়িতে গেলে ছেলের আঁকা, মেয়ের আঁকা, স্ত্রীর আঁকা ছবি দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ অনেককেই করতে হয়েছে তেমনি গানও শুনতে হয়েছে কত না! এও মোহ।

এই মোহ সমানে প্রচলিত প্রকাশভঙ্গী নিয়ে। সভ্যতা এক এক কালে এক এক ভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়। তার সমগ্র-মানস প্রকাশের পথ হয় সেই রূপ। যেমন মহাকাব্য প্রকাশ করেছিল উদীয়মান গ্রীক মন আর স্থিরত্বকামী সর্বভারতীয় মনকে, হোমারের ইলিয়ড ও বেদব্যাসের মহাভারতে; যেমন উচ্ছৃঙ্খল ধর্মবিদ্বেষী তারুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল বোকাচিও-র 'ডেকামেরন'-এ। যেমন সেক্সপীয়র প্রকাশ করেন উদ্দাম, জীবনযুদ্ধে জয়শ্রীমণ্ডিত আকাশচারী এলিজাবেথান তথা ইংলণ্ডের মনকে; যেমন রবীন্দ্রনাথ করেন ইংরেজ সম্পর্কে এসে নব প্রস্ফুটিত রোমান্টিক বাঙালী মানসকে তাঁর অজস্র কবিতা-গানে।

মোহ যদি বলি ত' মোহমুক্তির কথা আসে। নিশ্চয়, এ' মুক্তি আসে রূপের অন্তর-নিহিত অরূপের উপলব্ধিতে। রূপ বা প্রকাশভঙ্গী ইঙ্গিত মাত্র, সে ইঙ্গিতে ধরা দেয় সেই মন যার 'বিদ্ধি'-র জন্য সর্বকালের তপস্যা। যে রূপের উপলব্ধিতে মানুষ নিজেকে জানতে পারে, স্বচ্ছ আয়নার মত নিজেকে দেখতে পায়, সেই হ'ল সার্থক প্রকাশ, রূপসৃষ্টি। হোমারের কাব্যে গ্রীক সমগ্র-মানস প্রকাশ পেয়েছে কিনা বাঙ্গালীর পক্ষে বলা কঠিন, কিন্তু মহাভারতে যে সমগ্র-হিন্দু মানস উদ্ভাসিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ পরিব্যাপ্ত করে ইংরেজ-সম্পর্ক-সঞ্জাত বাঙালী-মনের আপন মানসের রঙীন ইন্দ্রধনু প্রতিচ্ছবি রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানে কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন এ' বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। নগণ্য মানুষ মুক্তিলাভ করে, দেহসীমা অতিক্রম ক'রে মানসলোকের অধিবাসী হয় এই রূপ-সঞ্জাত আত্মপ্রত্যয়ে। তারপর আসে নবীন জীবন, নতুন পথে হাঁটার অধিকার, আবার রূপসৃষ্টি। এমনি চলে, এক মোহ ঘুচে আসে অন্য মোহ, ক্রমান্বয়ে যেন মুদিত কমলের পত্র উন্মোচিত হয় অন্তর ভ্রমরের পূর্ণ প্রকাশের আয়োজনে।

রূপের এই সার্থক প্রকাশের কথার ইঙ্গিত পাই এদেশী সমালোচনা গ্রন্থে—রসকে বলা হয়েছে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"। কাব্যও যে অনির্বচনীয়কে প্রত্যক্ষ করতে চাইছে একথা স্পষ্ট ক'রে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় পাই না। কারণ মনের গঠন।

অর্ধসত্য হ'লেও কথাটা বলা দরকার, পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদী। বস্তুর সত্তায় তার প্রিয়, প্রেয় ও শ্রেয়; তার ঊর্ধ্বে যে মন তা তার সত্তাকে নাড়া দিলেও তার বস্তুনিষ্ঠ একাগ্রতাকে কক্ষচ্যুত করে নি। ধর্ম যা তার মনের আশ্রয় তা প্রাচ্য দেশ থেকে এসেছিল, অনেকটা মস্‌লীন জাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রের আমদানীর মত। এই পরধর্ম মনকে যেমন' ঘিরে রেখেছিল তেমনি হিংস্র বস্তুগত জীবনের প্রকৃতিকে দৃষ্টিপথ থেকে নিবারণ করে নি। তাই বিজ্ঞান এসে যখন একুইনাসের সাজানো বাগানে যুক্তির ঝড় তুলে দিল তখন বস্তুতান্ত্রিক মন সেই বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদকে গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করলে না। Cogito, ergo sum একথা, যার অন্তর লোক অ-বস্তু আলোকে উদ্ভাসিত, সে বলে না, চিন্তাও তার এইরূপ নাসাগ্র বিলোকিনী হয় না। এ' বস্তুতান্ত্রিকের কথা। এই বস্তুতান্ত্রিক মন পাশ্চাত্ত্যের বিশেষত্ব। এ' মনে সাহিত্য-বিচারে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর একথা ওঠে না। রূপ হয় বস্তুতান্ত্রিক, সমাজধর্মী। অর্থাৎ স্রষ্টাকার যে সৃষ্টি করেন তার মূল্য নিরূপণ হয় সামাজিকতার মানদণ্ডে। কে কতটা বর্তমান সমাজকে তার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দিয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে তাই হয় রূপের বিচারের কষ্টিপাথর। এমন কি যাঁরা রূপের বিচার শুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বের দ্বারস্থ হবে বলে ঘোষণা করেন তাঁরাও সৌন্দর্যতত্ত্বকে বস্তুনিষ্ঠ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বস্তুর বাহিরে যে মন, যে মন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তার অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাঁরা তাকে তাঁদের বস্তুগত গণ্ডীর মধ্যে ফেলার প্রয়াস পেয়েছেন।

মেনে নেওয়া হোক, পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন বস্তুগত। বস্তুগত হলে এই বস্তু হবে সেই রমণীয় বস্তু-সম্ভার বা অতি ক্রূর প্রকৃতি—যা মানুষের চারপাশ ঘিরে আছে। মানুষ যখন প্রাচীন সভ্যতায় বাস করে তখন তার পরিবেশ অক্ষয় না হলেও নিত্য পরিবর্তনশীল নয়—তার কাঠামো প্রায় অপরিবর্তনীয় আকারে থাকে বহু দিন-যামিনী। সে বস্তুগত জীবন তাই সন্ধান দেয়, ইঙ্গিত দেয় বস্তুর অন্তরালের জীবনের—নিরবচ্ছিন্ন নীল আকাশে যেমন এক টুকরা সাদা মেঘ নজরে আসে, তেমনি একই বস্তুসম্ভার ভারাক্রান্ত জীবনে সামান্য অ-বস্তুর চিহ্ন মহার্ঘ হয়ে ওঠে; সেইই রূপের লাবণ্যধর্মী প্রকাশ—'অবয়ব হইতে পৃথক লাবণ্য'—সাহিত্যের

প্রাণ, চিত্রকরের মর্মদৃষ্টি, সঙ্গীতস্রষ্টার অনির্বচনীয়। কিন্তু এই বস্তুসম্ভার বেড়ে ওঠে, দ্রুত পরিবর্তন করে, জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে মানুষ যখন সহরে বাস সুরু করে। বিরামহীন নানা বস্তুর বিচিত্র মহার্ঘ সমাবেশ, নিত্য নতুন ঘটনার আলোড়নের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রতিফলিত বস্তুরাশির উজ্জ্বল প্রকাশ মনকে আটকে রাখে এই বস্তুগত জগতে। মন ছাড়া পায়, বস্তুর স্বরূপ ধরা পড়ে যখন-বিপ্লব এসে এই বস্তুতান্ত্রিক প্রত্যক্ষসঞ্জাত জড়তাকে খণ্ড খণ্ড করে—তখন দেখা যায় ক্ষণ বিজলীর উজ্জ্বল আলোকের মত বস্তুসম্ভারের ছিদ্রহীন অন্ধকার ভেদ করে আত্মোপলব্ধির চেতনা। হতে পারে তা ক্ষণস্থায়ী, হতে পারে তা হস্তিদর্শনের মত অসম্পূর্ণ, কিন্তু সে আকৃতি, সে আনন্দ অবিস্মরণীয়। কোন এক মানস বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণেই এটিকে ট্রাজডিকাররা tyche, ভাগ্য কি ভাবে মানুষের সাজান বাগান শুকিয়ে দেয় তারই মহান উপলব্ধি করে যে নাটকের সৃষ্টি করে যান তা এখনও বস্তুসংঘাতের ঊর্ধ্বে তার মানবতার বার্তা প্রচার করছে। এমনি জীবন-সন্ধিক্ষণেই মাত্র আচরণগত ধর্মজীবনও সামান্য দ্বীপবাসীর কূপমণ্ডূকের জীবন পরিত্যাগ করে আর এক মহার্ঘ বস্তুসম্ভার সঞ্চয়ের মুখে সেক্সপীয়র তাঁর নাটকে জড়িয়ে দিলেন দিগন্ত উদ্ভাসিত বিদ্যুৎচমক, যা সেই মুখরিত মর্মরে প্রতিফলিত করে ক্লেদাক্ত জীবনেরও উজ্জ্বল গৌরবময় পরিণতি। আর এক জীবন সন্ধিক্ষণে, যখন দাসত্ব শৃঙ্খল সাধারণ নরনারীর শরীর, মন ও পরিবেশ বিষায়িত করে তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন ঊর্ধ্বলোকের বাণী, যে বাণী ক্ষরিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে প্রাচীন আশ্রমে, আর যেন তা সহজবোধ্য করার জন্যে, বস্তুসংঘাতে—বিজিত-মানসের বোধগম্য করার জন্যেই তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বিজাতীয় রোমান্টিক্স্-এর বাণী—যা এই বস্তুমুগ্ধ মানসের কাছে ছিল পরম প্রেয়।

এই দু'ল সংঘাত—গভীর আলোড়ন—যা থেকে জন্ম নেয় নাটকীয় ভাবধারা, যার প্রতিফলনে প্রকাশ পায় বস্তুগত ক্লেদাক্ত জীবনের পরিচিতি; যাকে উদ্ভাসিত করে আত্মস্বরূপ দর্শনজনিত আনন্দ-বেদনা। বস্তুগত হয়েও বস্তুর বেষ্টনীর বাইরে, সে সংঘাত প্রকাশ করে অপরূপ ইন্দ্রধনু বর্ণচ্ছটা—সেই রূপ যা একপক্ষে দেয় ব্রহ্মস্বাদ সহোদর অন্যপক্ষে দেয় ক্ষণদীপ্ত অনির্বচনীয়তা।

রূপের এই মোহ—বস্তুগত জগতে এই অনির্বচনীয়তার মোহ—সেই আলোকের মোহ যা এই মাটি, এই পৃথিবী, এই জল, এই সমুদ্র কোথাও লুকিয়ে ছিল না সেই ঘনচ্ছায়া অপসরণের মোহ—যা বহু জগতে চিন্তা আর কাজের অন্তরালে চিরবিরাজমান। জড় মানুষ আস্বাদ পায় অন্য জীবনের এই রূপের উপলব্ধিতে। ক্ষণোপলব্ধি রঙীন বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়, থাকে স্মৃতি। ক্রমে এই স্মৃতিও অপসৃয়মান। তখন রূপের থাকে কাঠামো পড়ে, আর অপরিণত বুদ্ধি, অ-রূপদক্ষ আসে রূপ প্রতিষ্ঠায়। রূপ যায়, রূপহীনতা প্রকাশ পায়। রূপের এই অপপ্রয়োগ বস্তুগত জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বস্তুগত জীবনে ক্রমশঃ অবয়বই লাবণ্যের স্থান অধিকার করে। অবয়ব পায় লাবণ্য-গত সত্তার বদলে প্রয়োজনগত জীবন। হয় যেন বস্তুসঞ্জাত নবতর বস্তু, যা জীবন যাপনের অপরিহার্য এক বস্তু বলে গৃহীত হয়। তখন এই বস্তুরূপ সিনেমা ও ক্রিকেট খেলার মতই নিত্যজীবন ধারণের—বস্তুনিষ্ঠ জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে প্রকাশ পায়।

রূপ-পরিবর্তনে বাঙলা দেশে নাটকের এই বস্তুরূপ দেখা দিয়েছে। নাটকের জন্ম এদেশে হয়েছে বস্তুসঞ্জাত সভ্যতার অঙ্গরূপে। যাঁরা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন ও যাঁরা নাট্যকার রূপে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হন সকলেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন বস্তুগত সভ্যতার

প্রয়োজনীয় অঙ্গ, কবিতা, উপন্যাসের মত আর একটি রূপ-নাটক। দেশের লোক সেই নাটকে সন্তুষ্ট হয়, ইহা কারণে। প্রথম হ'ল বস্তুগত সভ্যতার ক্রমবর্ধমান সর্বগ্রাসী প্রভাব। দ্বিতীয় নাটকীয় অবয়ব সাধারণ পক্ষে আমোদজনক—বিশেষ যখন তা প্রযোজকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ও নট-নটীর অভিনয়ে সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যবর্ধক। সেখানে মাত্র জীবন্ত, অভিনয়-নিপুণ নট, বাকী সব গুরুভার পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতের চাপে প্রাণহীন ও নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। রঙ্গমঞ্চ ভরে গেছে অপ্রয়োজনীয় বস্তুভারে—বাস্তবতা প্রকাশের উপকরণে; নাট্যকার বাঁধা পড়েছেন আমোদপ্রিয় দর্শকের মন জোগাতে কার্য-কারণের শৃঙ্খলতা ও দ্বন্দ্বের নিয়মসঙ্গত পরিণতি প্রকাশে; প্রযোজকের লক্ষ্য কেবল এই বস্তুগত জীবন, চঞ্চল দর্শককে কয়েক ঘণ্টা কি ভাবে আটকে রাখেন; একমাত্র নটেরই এখনও স্বাধীনতা আছে বস্তুসভার সমাকীর্ণ বাস্তব জীবন চিত্রাঙ্কনে অ-বস্তু সাবল্যের সংযোজনায়।

তাই এখনও নট আছে, নাটক নেই, রঙ্গমঞ্চ নেই, প্রযোজকও দেখা যাচ্ছে না—যিনি দুর্জয় সাহস ভরে নতুন পথে যেতে পারেন। সে পথ হবে প্রাচীন 'যাত্রা'-র পথ, বস্তুভারাক্রান্ত রঙ্গমঞ্চের অপসারণ তার প্রথম পাদ, রূপসৃষ্টি—যা লাবণ্যধর্মী, অবস্তুনিষ্ঠ সেই হবে নাট্যকারের কাজ, দ্বিতীয় পাদ, অ-বস্তু জীবনের সঙ্গে পরিচয়, সার্থক আত্মানুদর্শন সেই হবে নাট্য-প্রযোজনার উদ্দেশ্য। সহৃদয় দর্শক যেখানে আত্মোপলব্ধি করে কমলদল-আচ্ছাদিত মন-ভ্রমরকে মুক্তির বার্তা এনে দেবে, সেই হবে এই পথের তৃতীয় ও শেষ পাদ।

STUDENTS
P. G.
COMMON-ROOM

বাংলার মেয়েদের দেওয়া আলপনা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বাংলার লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আলপনা বা আলিম্পনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ; এমন কি অচ্ছেদ্যও বলা চলে।

বাঙালীর প্রাণগঙ্গায় বহুকাল থেকে যে শিল্পরুচি, যে রসবোধ, বিশ্ব-সংস্কৃতির মধ্যেও স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে, তার ইতিহাস জড়ানো আছে বাঙালীর নাড়ী নক্ষত্রের সঙ্গে,—তার ধর্মপ্রবণ মনোভাবের মধ্যে। লোক-সাহিত্য তার একটি বড় প্রমাণ।

বাঙালীর পাঁচালী, পদাবলী, বাউল আর ভাটিয়ালী গানের সুরে সুরে যে মনোভাব আজও ব'য়ে চ'লেছে, অন্দরমহল থেকে চণ্ডীমণ্ডপে, কুলুঙ্গীর কোণ থেকে টেবিলের ওপোরে এসেও যে, সে ধারা একেবারে শুকিয়ে যায় নি, তা বেশ বোঝা যায়।

এবার, সেযুগের কথাপ্রসঙ্গে ব'লছি। তখনকার সাধারণ সংসারের অল্প শিক্ষিতা এমন কি অশিক্ষিতা মেয়েরাও তাঁদের মনের সুকুমার রুচিবোধ ও শিল্প-চেতনাকে যে কি ভাবে রূপায়িত ক'রতেন, তার কিছু কিছু কাহিনী শোনা যায় বড় জোর লোকমুখে ; কিন্তু সে সব কাজের দর্শনীয় প্রমাণ আজ আর কিছুই পাওয়া যায় না ; সুতরাং ধ'রে নিতে হবে—যে অধিকাংশই আনুমানিক। এর কারণও অবশ্য আছে। কারণ—আলপনা যে সব কাজের উদ্দেশ্যে দেয়া হ'তো, সেগুলির বেশীর ভাগই হয় ধর্মানুষ্ঠানে না হয় গৃহজীবনের কল্যাণ কামনায়।

কাজেই ওগুলি অশুচি হওয়ার আশঙ্কা এবং ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি অবহেলা ও অকল্যাণের দুর্ভাবনায় ওগুলিকে ঢেকে ফেলাই উচিত ব'লে মনে করতেন তাঁরা, এবং তা দিতেনও। এমন যে সময়কার কোনও মহিলা শিল্পীর নামও আমরা জানি না। কিন্তু, তাঁদেরই দেওয়া শিক্ষা পেয়ে যে সব মেয়েরা ঐ সব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে আলপনা দিতেন, এবং এখনও দেন—তাঁদের অঙ্কনরীতি দেখে ভেবে নেওয়া সহজ হয়—যে বিভিন্ন [illegible] ও অনুষ্ঠান হিসাবে আঁকাও ভিন্ন ধরণের ছিল।

যেমন : বিবাহোৎসবের জন্য 'বরসত্র' একটি ফুটন্ত পদ্মকে বা পদ্মের প্রতীককে যে কত রকমে বিস্তৃত ও রূপায়িত করা যায়, কত সূক্ষ্ম ও নানা ধরণের রেখাঙ্কনে শিল্প-সৌন্দর্যকে

লোকচক্ষুর সামনে এনে ধরা যায়, তা লক্ষ্যণীয়। তেমনি, পিঁড়ি আলপনা এবং পিঁড়ির চারদিকের পাড় হিসাবে—গুণ্ডলতা, কলমীলতা ও শঙ্খলতার অনুকরণে—লতাশিল্পের নয়নীয়তা দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে।

আলপনার মধ্যে বাঙালী মেয়েরা অন্য কোনও বর্ণ প্রায় ব্যবহার করতেন না, কেবল, আলোচাল ভিজিয়ে পিসে মিহি ক'রে বেটে সেই পিটুলী গোলার রেখা দিতেন গ্রাম-বাংলার মাটিতে মাটিতে।

লক্ষ্মীর চরণ, ধানের শীষ, হাঁসের সারি আর ধানের মরাই পল্লীবাসিনী মেয়েদের উঠোনে, বারান্দায়, দরোজায় আর ঘরে নতুন ফসল তোলার উৎসবকে রূপদান ক'রতো বছরে বছরে।

যে দেশে ঘরের পর ঘর, পাড়ার পর পাড়া আর গ্রামের পর গ্রামের অধিবাসিরা একই আবহাওয়ার আচার ব্যবহারের আদান প্রদানের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখতেন, তাকেই তাঁরা ব'লতেন সমাজ এবং সামাজিকতা।

সামাজিকতার এই আবহাওয়ায় পরস্পর মেলামেশা করার জন্যও অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা ছিল, এবং সেগুলির অধিকাংশই সংঘটিত হতো লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠির পালুনী, নাগপঞ্চমী অরন্ধন ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে।

যে অনুষ্ঠান আর আয়োজনই তাঁরা করুন, তার প্রেরণা যোগাত সেই চিরকালের মানবী-মন।

সংসারে সব কয়টি প্রাণীর জন্য সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও তাদের জন্য সম্ভবমত নিজের স্বার্থত্যাগ—এই সব মিশিয়ে মিশিয়ে চিন্তা ছিল তখনকার বাংলার নারী-সমাজের; হয়তো এখনও তাই আছে, কিন্তু সমাজ এখন আর শুধুমাত্র পাড়া, গ্রাম বা দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, বিস্তৃত; তাই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মেরও চাই বিস্তৃতি এবং মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে তা খুব দরকার হয়ে উঠবে মেয়েদের জীবনে।

নৃত্যনাট্য ও কথাকলি

শ্রীমীরা মিত্র

চির-আনন্দ-পিয়াসী মানব মন। আনন্দের রস আকণ্ঠ পান করেও সে তৃপ্ত নয়; নব নব রূপে, নব নব বিকাশের মধ্য দিয়ে, নব নব রসের স্ফুরণে তাকে আবার নূতন করে পেতে চায়। ফিরে ফিরে পান করতে চায়—তার অমৃত-স্বরূপ।

এই আনন্দানুসন্ধানের সিদ্ধি একদিন আত্মপ্রকাশ করে "কলা"-রূপ নিয়ে। সঙ্গীত সেই রূপের সূক্ষ্মতম বিকাশ। নাট্য তারই অঙ্গ। একদিকে যেমন সে সঙ্গীতের ধারক, অন্যদিকে তেমনই সে সঙ্গীত দ্বারা পুষ্ট। বৃত্তিহীন নির্মল মন ছাড়া শুদ্ধ-আনন্দের বিমল জ্যোতির পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভবপর নয়। অনুকূল বৃত্তি এই নির্মলতার সহায়ক, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, দুঃখ প্রভৃতি বৈকল্যতার বৈরী। এই দুঃখের গ্লানি হতে মনকে মুক্ত ক'রে, আনন্দ ও প্রশান্তির সাহায্যে মনের অনুকূল বৃত্তি ও তার শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে একদিন বেদের নির্দেশ মেনে সৃষ্টি করা হ'য়েছিল 'অভিনয়' তথা 'নৃত্যে'-র। শাস্ত্র বলেছে,

ঋগ্ যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ।
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পঞ্চমঃ।
ব্যরীরজ্জাত্মিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।
কীর্তি-প্রাগল্‌ভ্য-সৌভাগ্য-বৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্ধনম্।
ঔদার্য্যস্থৈর্য্যানাং বিলাসস্তঁচ কারণম্।
দুঃখার্তি-শোক-নির্বেদ-খেদ-বিচ্ছেদ-কারণম্॥

কীর্তি প্রাগল্‌ভ্য, সৌভাগ্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রবর্ধন, দুঃখ, আর্তি, শোক, নির্বেদ ও খেদ নিবারণ—ঔদার্য স্থৈর্য ও বিলাস এর কারণে পঞ্চযোনি, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ থেকে পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস সংগ্রহ ক'রে, ধর্মকামার্থমোক্ষপ্রদ এই শাস্ত্র সৃষ্টি করেন।

শুধু তাই নয়। ক্ষণিক আনন্দের জন্য বা চিত্তের সাময়িক বিলাস-সাধনের জন্য তার সৃষ্টি নয়। পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপেরই তা এক অভিব্যক্তি। শাস্ত্র তাকে সেই মহিমোজ্জ্বল-রূপেই বর্ণনা করেছে। যথা—"অপি ব্রহ্ম পরানন্দাদিদমভ্যধিকং মতম্"। নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত ভেদে নটন তিন প্রকার। ভাবসমৃদ্ধ রসব্যঞ্জনাদিযুক্ত অঙ্গাভিনয়কে নৃত্য এবং ভাব অভিনয়-হীন অঙ্গবিন্যাসকে 'নৃত্ত' বলা হ'য়েছে। নৃত্য বিশেষ করে দর্শনীয় কোন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষ্যে। 'নৃত্ত' সকল মাঙ্গলিক উৎসবের অঙ্গ। বিশেষ আখ্যান অর্থাৎ পুরা কাহিনী বা কাব্যের উপর পরিকল্পিত নটনই নাট্য। নৃত্তের স্থান উৎসব-প্রাঙ্গণ বা শোভাযাত্রা, নৃত্যের রাজসভা। নাট্য সর্বদা অনুষ্ঠেয় রঙ্গস্থলে। নৃত্য, গীত ও অভিনয় ভাব ও তালযুক্ত হওয়া চাই। গীতের অর্থ প্রকাশিত হবে হস্তমুদ্রার প্রয়োগে, নয়ন ভাব ও পদ তালের ধারক। রস ও ভাব-এর অধিকতর স্ফুরণ অভিনয়ে এবং বোধ হয় তা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও সহজ-উপভোগ্য বলেই নৃত্য ইত্যাদির মধ্যে অভিনয়কেই সবচেয়ে প্রাধান্য দান করা হয়েছে। "তত্র ত্বাভিনয়স্যৈব প্রাধান্যমিতি কথ্যতে"। কাজেই শাস্ত্র আলোচনা ও পুরাণ কাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে অনুমান করা চলে প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনে অভিনয়ের স্থান ছিল অদ্বিতীয়। অভিনয়-দর্পণে চার প্রকার ভাবব্যঞ্জক অভিনয়ের বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে, এ'গুলিকে অভিনয়ের বিভিন্ন অঙ্গও বলা চলে। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ করে অভিনয় করাকে (অঙ্গাভিনয়) 'আঙ্গিক', কাব্য নাটকের বাক্যবিন্যাস দ্বারা অভিনয়কে 'বাচিক', সাজসজ্জা ও উপকরণসমৃদ্ধ অভিনয়কে 'আহার্য' এবং সাত্ত্বিক ভাবগুলির মাধ্যমে অভিনয়কে 'সাত্ত্বিক' অভিনয় বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। চতুর্বিধ অভিনয়ের উল্লেখ করলেও নন্দিকেশ্বর "অভিনয়দর্পণে" আঙ্গিকাভিনয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নৃত্যগীত-এর সাথে সাথে অভিনয়ও তালযুক্ত হওয়া চাই বলাতে এবং ভাব, হস্তলক্ষণ ও পদবিন্যাস-এর নির্দেশনা থেকে মনে হয় এ'স্থলে তিনি নাট্য বলতে নৃত্যনাট্যই বুঝিয়েছেন। নাট্য ও নাটক অভেদ বলেও আবার উল্লেখ করেছেন। ভাব-সম্প্রসারণের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, গতি, চারি, মণ্ডল সমস্তই নৃত্যাত্মক। তিনি প্রায়ই অভিনয়স্থলে নাট্য বলে উল্লেখ করলেও এগুলি নৃত্যনাট্যের লক্ষণ। মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ডিম, নাটিকা, ইহামৃগ ইত্যাদি দশ প্রকার নাট্যের উল্লেখ করেছেন। নাটকের বিবরণ দিতে অঙ্গহার ও চারী প্রযুক্ত এবং কলা, তাল-লয়যুক্ত বলে তার লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য অনেক স্থলে নাট্য ও নাটক শব্দ সম অর্থে ব্যবহার করেছেন। যা-ই হোক তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় নাট্যে নৃত্যের তথা অঙ্গাভিনয়ের একটি নির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট স্থান ছিল। নৃত্যবহুল নাট্য 'চিত্র' প্রথম স্তরের নাট্যরূপে গণ্য হোত।

এজন্যই বার বার তিনি প্রসঙ্গক্রমে 'সাঙ্গোপাঙ্গপ্রভেদৈঃ অভিনীয়তে গম্যতে চ তস্মাদ্বৈ নাটকং স্মৃতম্'। "সাঙ্গাভিনয়-সংযুক্তো নাট্যমিত্যভিধীয়তে" বা "তদঙ্গাভিনয়োপেতং নাট্যমিত্যভিসংজ্ঞিতম্" ইত্যাদি প্রমাণ-বচন উত্থাপিত করেছেন।

এ'ছাড়া 'চিত্রাভিনয়'-এর আলোচনা করেছেন পৃথক রূপে। নাট্যশাস্ত্রের উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে 'অভিনয়' কেবলমাত্র ভাব ও অঙ্গ তথা নানাপ্রকার মুদ্রা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সম্পাদিত হোত। ভরত তাকে 'বিশেষ' আখ্যা দিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। মনে হয় নৃত্যনাট্যের জনক এই 'চিত্র'-অভিনয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনাক্রমে উল্লিখিত ঘটনাটি থেকে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। "অমৃতমন্থন" ও "ত্রিপুরদাহ" দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে শিব তাঁর নৃত্যকলার কথা স্মরণ করেন এবং নাট্যের

গোড়ার অংশে 'করণ' ও অঙ্গহারযুক্ত অভিনয়ের প্রবর্তন করতে বলেন এবং এই প্রকার অভিনয়কে 'চিত্র' নামে অভিহিত করার নির্দেশ দেন।

সুতরাং ভরত-পূর্ব যুগেও যে নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভরতোত্তর যুগে সে নাট্য আরও সমাদর লাভ করে—এর প্রমাণ সর্বসাধারণের মধ্যে তার ব্যাপ্তি। লোকনাট্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করল নৃত্যনাট্য। দক্ষিণদেশে লোকনৃত্যের মধ্যে তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি পায়। কোন আর্য কলাবিদ-এর মাধ্যমে এই কলা দাক্ষিণাত্যে আপন পথ করে নেয় বলেই বিশ্বাস। খৃষ্টীয় ২য় শতকে লেখা 'শিলপ্পদিকরণ'-এ "চক্কিয়ার কুপু" অভিহিত এক পদ্ধতির নৃত্যানুগ নাট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যা কেবল মন্দিরে অনুষ্ঠিত হোত। কিন্তু কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এই প্রকৃতির নাট্যে শাস্ত্র-বর্ণিত নিয়ম ও ধারার প্রবর্তন ছিল। ত্রিপুরা-সংহার এই পদ্ধতিতে অভিনীত হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ত্রিপুরাদাহ' নামে ভিন্ন শ্রেণীর নাট্যের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে মেলে। সুতরাং এই নাট্য ও তার ধারার ভিত্তি নাট্যশাস্ত্র-এ অনুমান অসঙ্গত নয় বলেই মনে হয়।

ভগবতীর বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে রচিত 'তিরুঅট্টম', 'মীনাক্ষীনাটকম্' ইত্যাদি নাট্যের উৎপত্তি এই পদ্ধতিতে।

এই ধারাকে আশ্রয় করেই ১৭শ শতাব্দীতে রচিত হয় কৃষ্ণ-অট্টম। গীতগোবিন্দের রসপুষ্ট এই কৃষ্ণ-অট্টম, গীতগোবিন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কেরলে শীঘ্রই জনপ্রিয়তা ও অতি সমাদর লাভ করে। লোকশিল্পের গণ্ডীতে প্রবেশ করলেও কেরলের নৃত্যনাট্য তার শাস্ত্রানুগত্য ও উচ্চস্তরের শিল্প-স্বভাব হতে ভ্রষ্ট হয়নি; তার অলঙ্কার সে বর্জন করেনি। তাই সেই ধারাকে অবলম্বন করেই শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে কৃষ্ণ-অট্টম রচনা ও প্রযোজনা করতে কষ্ট পেতে হয়নি মানদেবকে; কালিকটের রাজ-ভাগিনেয় মানদেব গীতগোবিন্দের রস গ্রহণ করে নাট্যশাস্ত্রবর্ণিত রীতি তথা কেরলের নৃত্যনাট্যের পদ্ধতিতে রচনা করলেন সম্ভবতঃ প্রথম কথাকলি সংজ্ঞার নাট্য কৃষ্ণ-অট্টম। এতেই সর্বপ্রথম অন্তরাল গীত সমবেত কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাথে সাথে বিচিত্র সাজসজ্জা, অঙ্গাভরণ, মুখোশ ইত্যাদি ব্যবহার করে নৃত্যাভিনয়ের প্রবর্তন হয় বলে শোনা যায়। এরই জবাবে সৃষ্ট হয় 'রাম-অট্টম'। প্রবাদ, কোট্টরকারার রাজা থম্পুরণ মানদেবের কাছে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে 'কৃষ্ণ-অট্টম'-এর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। রাজা থম্পুরণ স্বয়ং নৃত্যবিদ ও একজন বিশেষ গুণী শিল্পী বলে আজও প্রচারিত। এই অপমানের প্রতিশোধকল্পে রাজা স্বয়ং আত্ম-প্রয়োগ করেন এই নৃত্যকলা সৃষ্টিতে, ফলে জন্ম নেয় 'রাম-অট্টম'।

অতঃপর এই বিশেষ পদ্ধতির নৃত্যনাট্য অট্ট-কথা বা কথাকলি রূপে পরিচিতি লাভ করে। কথাকলির দৃশ্য-কল্পনা, সাজসজ্জা, অঙ্গ চিত্রণ, অভিনয়পদ্ধতি, মুদ্রা-সংযোগ, সঙ্গীত-ধারা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও লোকশিল্প, ব্যক্তি বিশেষ ও স্থান-কালের প্রভাবে যে পরিবর্তন বা বিশেষত্ব তার মাঝে রূপ লাভ করেছে তারই লক্ষণ নিয়ে গঠিত হ'য়েছে কথাকলি নৃত্যশাস্ত্র। 'হস্তলক্ষণদীপিকা' যার প্রামাণ্য, 'বলরামভরতম্' ও তার অনুগামী। এরপর বহু নাট্য রচনা করা হয় কেরল-এর ভাষা 'মলয়লম'-এ। নাম্বারদের অনুশীলন ও নম্বুদ্রী জমিদার সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলার উৎকর্ষ সাধিত হয় প্রায় শতাব্দী ধরে। বহু রাজার শিল্প-সৃজনী প্রাসাদে সমৃদ্ধ হয়েছে কথাকলি। খৃষ্টীয় ১৭শ থেকে প্রায় ১৯শ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে এক এক রাজা তাঁদের শিল্প সাধনার উৎকর্ষের

প্রমাণ রেখে গেছেন কথাকলি নৃত্যনাট্যের আখ্যান ভাগ রচনা ও তাদের প্রযোজনার মাঝে। রাজা কার্তিক তিরুনল, তিরুনল রামবর্মা, উত্রম তিরুনল প্রভৃতি ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশীয় গুণীদের ও তাঁদের সমসাময়িক কবিদের অবদান কথাকলিতে অক্ষয়।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি তার গতিরোধ ঘটে, ক্রমশঃ যেন শ্লথ এই নাট্যকলার ক্রমবিপর্য্যয় সূচিত হলে তাকে অধোগতি থেকে রক্ষা করেন ও অবলুপ্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন 'কেরল কলামণ্ডলে'র প্রতিষ্ঠাতা কবি ভাল্লাথল। তার অবদানে আরও রসসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কথাকলি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু গুণী ও সাধক-শিল্পীর শিল্প-সাধনার স্বাক্ষর বহে নিয়ে চলেছে কথাকলি আজও তেমনই সগৌরবে। তার সাথে মিশে আছে কেরলের গৌরব—মিশে আছে অতীত ভারতের শিল্প-প্রাণের গৌরব আর মিশে আছে গীত-গোবিন্দের বাঙ্গলার রসিক মনের গৌরব।

দেবীমাহাত্ম্যে অদ্বৈত তত্ত্ব

শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ

বহুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি, সমস্ত বৈচিত্র্যের মূলে এক সত্য বস্তুর অনুভূতিই ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে, দর্শনে, ধর্মানুশীলনে —সর্বত্রই এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। ভারতীয় মনীষার পরম নিদর্শন স্বরূপ উপনিষদ-সমূহেও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপূরক মহাবাণী প্রচারিত হইয়াছে। উপনিষদ যুগের পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ পুরাণশাস্ত্রেও নানাভাবে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যেও স্বাভাবিকভাবেই এই তত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। যদিও উপনিষদুক্ত অদ্বৈত তত্ত্বের সহিত দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত অদ্বৈত তত্ত্বের পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি অদ্বৈত তত্ত্বই দেবীমাহাত্ম্যেরও উপজীব্য—এই কথা অনায়াসেই বলা চলে। এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য দেবীমাহাত্ম্যে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপনিষদে আছে : "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এই ব্রহ্মাণ্ডে 'নানা' অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের কোন কিছুই নাই। ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া যাহা আমরা অনুভব করি, মূলতঃ তাহা একই সত্তা। কেবলমাত্র নাম ও রূপের ফলেই এক সত্তা বহু রূপে প্রতিভাত হয়। আসলে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ। একই মৃত্তিকা যেমন অবস্থাবিশেষের ফলে ঘট, থালা, সরাব প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার অতিরিক্ত কোন মৌলিক পদার্থই সেখানে নাই, তেমনই এক ব্রহ্মই নাম ও রূপের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"।

দেবীমাহাত্ম্যেও দেখা যায়—এক ভগবতী মহামায়াই সমস্ত বিশ্বসংসারে চৈতন্যরূপে বিরাজিতা, যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়—তাহা সেই মহামায়ারই বিকৃতি মাত্র।

শুম্ভ-বধ মাহাত্ম্যে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—আকাশচুম্বী দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি অমিত বলবীর্যশালী দানবাধিপতি শুম্ভ বিশ্বরূপা মহামায়ার সহিত সমুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া মহামায়ার বিকৃতিস্বরূপা ব্রহ্মাণী প্রভৃতিকে দেবীর চারিপার্শ্বে দেখিয়া অত্যন্ত দর্পভরে বলিয়াছিল : অয়ি বলদর্পিতে বীর্যাভিমানি দুর্গা। রক্তবীজ, নিশুম্ভ প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠ অসুরদিগকে নিধন করিয়াছ বলিয়া তুমি গর্বে উল্লসিত হইও না, কারণ তুমি তো নিজের শক্তিপ্রভাবে ইহাদিগকে নিধন

করিতে পার নাই। এই মহাসমরে অন্যান্য দেবশক্তির সাহায্যলাভ করিয়াই তুমি এই পর্যন্ত জয়লাভ করিতে পারিয়াছ। মহাভয়ঙ্করী চামুণ্ডা, কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মাণী, বৃষভারূঢ়া ত্রিশূলহস্তা মহেশ্বরী প্রভৃতি শক্তিময়ী দেবীগণ তোমার সহায় না হইলে কেবলমাত্র স্বীয় শক্তিতে তুমি এই বীরবৃন্দ-নিধনে সমর্থ হইতে না।

মোহগ্রস্ত শুম্ভের অজ্ঞতাপ্রসূত এইরূপ দম্ভোক্তি শ্রবণ করিয়া মহাশক্তি মহামায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া ক মমাপরা"—হে দর্পমত্ত শুম্ভ! শুন, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আমিই সর্বত্র সবরূপে বিরাজ করিতেছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সুতরাং এই যুদ্ধক্ষেত্রেও একাকীই আমি রহিয়াছি, তুমি যাহাদিগকে দেখিয়া আমার বলদর্পের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছ, তাহারা আমারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। এই দেখ, তাহারা আমার ভিতরেই লীন হইয়া যাইতেছে।

দেবী আরও বলিলেন,

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥

"আমি স্বকীয় বিভূতির প্রভাবে যেই বহুমূর্তি প্রকটিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত বিভূতি আমি উপসংহৃত করিলাম, এখন আমি একাই রহিলাম, তুমি এইবার সংগ্রামে স্থির হও"।

ভগবতীর উপরোক্ত বাক্য পরম্পরা হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, চৈতন্যরূপিণী ভগবতীই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান, বিশ্বমূর্তি দেবী মহামায়াই সংসারের সর্বত্র বিচিত্ররূপে অবস্থিত; যাহা কিছু আমরা দেখি তাহা সমস্তই ভগবতীর রূপবিলাস মাত্র, তাহার স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছুই বস্তু নাই।

অদ্বৈত তত্ত্বের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম নামরূপবিহীন হইয়াও অনাদি অবিদ্যাবশে সৃষ্টির মূল কারণ হইয়াছে; সৃষ্টির আদিম প্রভাতে নির্গুণ ব্রহ্মেরই সগুণরূপে একটা অভিব্যক্তি ঘটিল, তাহার সঙ্কল্প হইল: "একোঽহং বহুস্যাম্, প্রজায়েয়",—আমি এক, আমি বহুরূপে পরিণত হইব। এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তরূপ ও নামের ভিতর দিয়া অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড আকারে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইল।

দেবীমাহাত্ম্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চৈতন্যরূপিণী মহামায়া দানব উৎপীড়নে ভীত ও সন্ত্রস্ত দেবগণের আকুল প্রার্থনায় অনুপম রূপলাবণ্যময়ী মহাশক্তিরূপিণী নারীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। নামরূপবিহীন চৈতন্য কামনার ভিতর দিয়া রূপপরিগ্রহ করিল, ধ্যান-রাজ্যের সীমানা হইতে বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। দেবগণ মহামায়ার স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ নমস্তস্যৈ"। (অর্থাৎ চৈতন্যরূপে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যিনি বিরাজ করেন, তাঁহাকে নমস্কার"।)

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে, নমস্তস্যৈ"। (অর্থাৎ যাহাকে সমস্ত প্রাণীর চেতনারূপে অভিহিত করা হয়, তাহাকে নমস্কার।) দেবগণের আকুল প্রার্থনার ফলে চৈতন্যরূপিণী মহামায়া সেখানে মূর্তিময়ী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। আত্মশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায় দুর্বল অমরবৃন্দ একাগ্র সাধনায় চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির বোধন করিলেন, আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়া প্রয়োজন সম্পাদনের উপযোগী মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বভাব হইয়াও জীবজগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ-রূপে

বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মস্বরূপ নির্ধারণ করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে: "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার সংঘটিত হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তৈত্তীরিয় উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম"—যাহা হইতে সমস্ত জগত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চ স্থিতিশীল হইয়াছে, এবং প্রলয়কালে যাহার ভিতর জগত লীন হইয়া যায় তাহাই ব্রহ্ম।

দেবীমাহাত্ম্যেও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মকৃত যোগনিদ্রা-স্তবে দেবী মহামায়াকে উক্ত শ্রুতির অনুরূপ বাক্যেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি। ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

হে দেবি! তোমার দ্বারাই সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তুমিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, আবার প্রলয়কালে তুমিই সমস্ত জগৎ বিনাশ কর।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন, বিশ্বস্যৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

হে বিশ্বময়ি দেবি! যখন বিশ্বসংসার কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্য অবস্থায় তুমিই সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হও; সমগ্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তুমিই স্থিতিশক্তিরূপে জগৎ পালন করিতেছ; আবার অন্তকালে তুমিই সংহাররূপিণী হইয়া সমস্ত বিধ্বংস কর।

মধুকৈটভ বধ-মাহাত্ম্যেও ঋষি সুরথ রাজাকে বলিয়াছেন,

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

বিশ্বরূপিণী সেই মহামায়া নিত্যস্বরূপা, তিনিই সমস্ত প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥

ঋষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেন: হে মনুজেশ্বর! সেই মহামায়াই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত, মহাকাল প্রবাহের মধ্যে মহাধ্বংসকারিণীরূপে সেই মহাকালীই সর্ব্বত্র আপন সত্তা প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বসংহারকাল সমুপস্থিত হইলে মহামারীরূপে তিনিই জগতের বিনাশ সাধন করেন, আবার শাশ্বত চৈতন্যরূপিণী তিনিই মহাশূন্যময় কাল-সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি-পদ্মরূপে প্রকাশিত হন। তিনিই বরদাত্রী কল্যাণময়ীরূপে বিশ্বের রক্ষা-বিধান করেন। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার—তাঁহারই রূপভেদ মাত্র, সকলের মূলে শাশ্বত চৈতন্য-রূপে নির্বিকার স্বভাব মহামায়া সততই অবস্থান করিতেছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি সংহারকারিণীরূপে পরমেশ্বরী মহামায়ার বর্ণনার সহিত উপনিষদ্‌উক্ত জন্মাদির কারণস্বরূপ ব্রহ্ম নিরূপণের এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, মনে হয় উপনিষদের ঋষিই ব্রহ্মময়ী দেবীর লীলাবিলাস দর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে ব্রহ্মেরই অপরূপ লীলা মহিমার বন্দনা গান করিতেছেন।

দেবীমাহাত্ম্যের এই সমস্ত বাক্য হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দেবীরূপে যাহাকে উপলব্ধি করিয়া ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মরূপা, সমগ্র শ্রুতি প্রতিপাদিত

ব্রহ্ম স্বরূপই জগতের অকল্যাণ দূর করিবার জন্য ভক্তজন-মনোরঞ্জন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

উপনিষদে আছে—ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বম্। আমরা যাহা কিছু অনুভব করি তাহা সমস্তই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইহা উপনিষদের শাশ্বত বাণী। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ"—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, ব্রহ্ম তাহার সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। দেবীমাহাত্ম্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা দেবী মহামায়াকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর মূল-শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

পৃথিবীর যে কোন বস্তু—তাহা সৎই হউক বা অসৎই হউক, ব্যবহারের বিষয় বা অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে; সেই সমস্ত বস্তুর যাহা শক্তি অর্থাৎ যেই শক্তির সত্তায় তাহারা সত্তাবান্ বা অস্তিত্বশীল হইয়া রহিয়াছে তুমিই সেই শক্তি। সুতরাং হে বিশ্বরূপিণি মহামায়া! তোমাকে আর কি স্তব করিব?

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতই দৃশ্যমান জগতের মৌলিক পদার্থ। দেবীমাহাত্ম্যে এই পঞ্চভূতকেও মহামায়ার রূপভেদমাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবী মহামায়াই একমাত্র বস্তু, সুতরাং যাহা কিছু আছে তাহাও তিনিই। শুম্ভবধের পরে দেবগণ-কৃত স্তবের ভিতর বর্ণিত হইয়াছে :

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

হে অনতিক্রমনীয় বলবীর্যশালিনি। তুমিই জগতের একমাত্র আধার, কারণ তুমি পৃথিবীরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমি জলরূপে সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ।

ব্রহ্মাকৃত স্তবেও উল্লিখিত হইয়াছে :

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।"

তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা স্বরূপে সমস্ত প্রপঞ্চের মূল প্রকৃতি নামে অভিহিত হও।

কেবল বহির্জগতের পদার্থকেই দেবীর স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ঋষি বিরত হন নাই, মনো-রাজ্যের যাহা বিষয়, সুখ, দুঃখ, দয়া, তুষ্টি প্রভৃতি—তাহাও মহামায়ারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, ইহাই দেবীমাহাত্ম্যে সুনিপুণ ভাবে মধুর ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। মধুকৈটভ বধমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাকৃত স্তবের মধ্যে দেবীকে মহাবিদ্যা, মায়া, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, বুদ্ধি, পুষ্টি, তুষ্টি প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (দেবীমাহাত্ম্য ১ম অঃ ৭৭-৭৯ শ্লোক)

উত্তর চরিতের প্রথম অধ্যায়ে (দেবী মাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ে) দেবগণের স্তবের মধ্যে দেবীকে 'সুখ' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—"সুখায়ৈ সততং নমঃ।" সেখানেই মহামায়াকে চেতনা, বুদ্ধি, ক্ষুধা, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, ধৃতি, শ্রদ্ধা, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি প্রভৃতি আন্তর বিষয় রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। (৫ অঃ ১৭-৭৫ শ্লোক) কেবল ইহাই নহে, মহামায়াকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেও বলা হইয়াছে। সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই দেবী মহামায়া বিচিত্ররূপে বিরাজমানা। তিনিই শুদ্ধ চৈতন্যরূপে বোধস্বরূপ প্রমাজ্ঞানমূর্তি, আবার তিনিই ভ্রান্তিরূপে মানবের অযথার্থ-জ্ঞান জননী।

উপনিষদুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ, দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত মহামায়ার স্বরূপও তাহাই। শুদ্ধ ব্রহ্মই চৈতন্যরূপ যথার্থ বোধ বা প্রমা, আবার ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত অনির্বাচ্য মায়াই অখিল ভ্রমের কারণ। মহামায়াও বোধস্বরূপা অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরূপা আবার ভ্রান্তিরূপাও তিনি।

দেবীমাহাত্ম্যে অদ্বৈত তত্ত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে—ইহার সমর্থনসূচক অনেক কথা বলা হইল। কিন্তু উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত এই অদ্বৈতবাদের একটু পার্থক্য আছে। উপনিষদের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ পদার্থ, দেবীমাহাত্ম্যের মতেও একমাত্র দেবীই সৎপদার্থ। প্রধান প্রতিপাদ্য এই মূল তত্ত্বের বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু নামরূপাত্মক জগত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের ভিতর দিয়া যাহা আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহার বাস্তব কোন সত্তা নাই, তাহা সমস্তই অনাদি অবিদ্যাবশে ব্রহ্মে কল্পিত মাত্র, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই বিষয়ে দেবীমাহাত্ম্যের সিদ্ধান্ত একটু অন্য রকম, দেবীমাহাত্ম্যের মতে দেবী মহামায়া চৈতন্যরূপিণী এবং সর্বব্যাপিকা হইলেও নামরূপাত্মক জগতও তাহারই রূপভেদ মাত্র। যাহা কিছু লৌকিক অনুভবের বিষয় তাহাও সেই মহামায়ারই অভিব্যক্তি; সুতরাং তাহা নিছক কল্পিত বস্তু নহে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে দেবী মহামায়াই জগতের মূল কারণ, সুতরাং অনুভূয়মান বস্তুনিচয় দেবী মহামায়ারই পরিণাম বা অবস্থাভেদ মাত্র। নিখিল বস্তুকে তাহার বিভূতি বা বিকাশাত্মিকা মূর্তি বলিয়াই ধরিতে হইবে, উহা অসৎ বা অলীক নহে।

উপনিষদের মতে নামরূপাত্মক জগতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মলাভ হয় না। জাগতিক সমস্ত পদার্থকে বর্জন করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের সাধনা ব্যতিরেকে ব্রহ্মলাভ হয় না, সুতরাং ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নিজেকে একটি অচল অনড় পাষাণ প্রতিমায় পরিণত করাই উপনিষদের সাধনা।

কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যে এইরূপ কোন শুষ্ক বৈরাগ্য সাধনার কথা প্রচারিত হয় নাই। ব্রহ্মময়ী মহামায়াই একমাত্র সত্য ইহা ঠিক, কিন্তু যাহা কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই সমস্ত বস্তুও দেবী মহামায়ারই রূপবিশেষ মাত্র, তিনিই বিভিন্নরূপে বিরাজমান। অতএব দেবীর নিজস্ব যা যা রূপ বা বিভূতি, তাহাকে অসৎ বা কল্পিত বলা চলে না। দেবী মহামায়ার অনন্ত রূপমাধুরী দর্শনে মুগ্ধচিত্তে দেবগণ বলিয়াছেন,

"কিং বর্ণয়াম তব রূপ মচিন্ত্য মেতৎ"

বিশ্বরূপা পরমেশ্বরীর অনন্তরূপের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা কাহার? তিনিই অশেষ কল্যাণময়ী, আবার তিনিই ব্যাধি-মহামারীরূপা। তিনিই জগত সৃষ্টি করেন, আবার মহামারীরূপা মহাকালী হইয়া তিনিই জগৎধ্বংস করেন। চৈতন্যরূপিণী নিরাকারা তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, আবার আরাধিতা হইয়া প্রার্থিত রূপ ধারণ করিয়া তিনিই ভোগ-স্বর্গ ও অপবর্গ দান করেন। কখনও তিনি করালবদনা ভীম খড়্গধারিণী মুণ্ডমালা বিভূষণা জিহ্বাললনভীষণা আলুলায়িতকুন্তলা চামুণ্ডারূপে মহাভয়ঙ্করী, আবার কখনও বা রূপের ছটায় ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া মধুরহাসিনী পরমাসুন্দরী। অতি সৌম্যাও তিনি, আবার অতি রৌদ্রাও তিনিই। বিচিত্ররূপিণী অচিন্ত্যলীলাময়ী মহামায়ার মহিমা অদ্ভুত, রূপও অনন্ত। ভক্তিরসে জারিত করিয়া অদ্বৈত তত্ত্বের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ দেবীমাহাত্ম্যে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্ত কবি গোবিন্দ রায় যথার্থই বলিয়াছেন,

ত্রিভুজ কি চতুর্ভুজ কি বা দশভুজ বেশ
হেরিয়া ভেবেছ মন এই কি রূপের শেষ।
অন্তরে হেরিলে ওরে
দেখিবে কি রূপ ধরে
চিৎরূপে ভাসে সেই এই অনন্ত বিশ্বাকারে।
কভু মহাকালীরূপে শ্মশানেতে করে বাস
রাজরাজেশ্বরীরূপে কভু মুখে মৃদু হাস।
যে জন যে ভাবে চায়
সে সেই ভাবে পায়
জ্যোতিরূপে পরব্রহ্ম শব্দরূপে ওঙ্কারে।

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে শিল্পাচার্য
শ্রীনন্দলাল বসুর
'শিল্প' সম্বন্ধে আলোচনা ধারাবাহিক
প্রকাশিত হবে।

চলচ্চিত্রে সামাজিক দায়িত্ব *

পঙ্কজকুমার দত্ত

বাস্তবের চেয়ে বাস্তবের ছায়া যে কত প্রবল প্রভাবশালী হতে পারে তারই প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত চলচ্চিত্র। যন্ত্রযুগের বৈচিত্র্যপ্রিয় মনের এটা একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। সবচেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি বলেও আখ্যাত করা যায়। চলচ্চিত্র মানুষের ওপরে প্রচণ্ড প্রভাব এনে দেয়—মুখ্যত প্রমোদ উপভোগের উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি দেখতে বসলেও পর্দায় যা প্রতিফলিত হয় তা অতি নিঃসাড়ে অন্তরের গভীরে প্রভাব ছড়িয়ে জীবনের সমগ্র আচরণের ধারাকেই আলোড়িত করে তোলে যেটা সহজমন দর্শক ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না।

পণ্ডিতেরা চলচ্চিত্রকে বলেছেন: Synthesis of all arts। জগতের সকল শিল্পকে সঙ্গে নিয়ে চলচ্চিত্র একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ গড়ে তুলেছে বাকে এমনি এসকুাইথের কথায় বলতে হয়। "The tenth muse"। কিন্তু এটা দেখা যায় যে, হয়তো সকলপ্রকার শিল্পের সমন্বয় ঘটেছে বলেই চলচ্চিত্র শিল্প প্রশস্ততায় অন্য সকল শিল্পের চেয়ে ব্যাপকতর।

প্রখ্যাত প্রযোজক হার্বার্ট মার্শালের উক্তিতে বলা যায়: "Here is the dynamic flow of word and mind, here is past and present and future; space and time, colour and sound, mind and matter, fused into one unity"। মানুষের সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাসে চলচ্চিত্রের মতো সর্বাত্মক প্রভাববিস্তারী শিল্প আর আবিষ্কৃত হয় নি। এতে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদির সমন্বয় ছাড়াও আরো কিছু আছে। বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা আইসেনস্টাইনের কথা এখানে তুলে দেওয়া যায়। তাঁর মতে:

"The Cinema would seem to be the highest stage of embodiment for the potentialities and aspirations of each of the arts...For sculpture cinema is a chain of changing plastic forms, bursting, at long last, ages of immobility.

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ সাংস্কৃতিক বৈঠকে পঠিত।

"For painting cinema is not only a solution for the problem of movement in pictorial images, but also the achievement of new and unprecedented form of graphic art that is a free stream of changing, transforming, commingling forms, pictures and compositions, hitherto possible only in music.

"Music has always possessed this possibility, but with the advent of cinema, the melodious and rythemic flow of music acquired new potentialities of imagery—visual, palpable, concrete.

"For literature cinema is an expansion of the strict diction achieved by poetry and prose into a new realm where the desired image is directly materialised is audio-visual perceptions.

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো এইটে বোঝাবার জন্যে যে, চলচ্চিত্র সকল শিল্পকে দিয়ে এবং প্রত্যেক শিল্পকে ছাপিয়ে যে রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার প্রভাব থেকে আজকের ব্যক্তি বা সমাজের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কোন উপায় নেই। কেউ যদি বলেন, ছবি দেখিনা, তাহলেই যে তিনি চলচ্চিত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত তা হয় না। যেমন, গঙ্গাস্নানে যাইনা বললেই হিন্দুর ধর্মের গা থেকে গঙ্গার প্রভাবকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি সিনেমায় যাওয়া না-যাওয়ার ওপরে চলচ্চিত্রের প্রভাবও নড়চড় হবার নয়।

কয়েকদিন আগে একজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে কথা হচ্ছিল যিনি জীবনে মাত্র দু'তিনবার সিনেমায় গেছেন তাও বছর পঁচিশেক আগে, অথচ না দেখেই তিনি "শ্রীশ্রীমা"র মতো ছবি তোলার প্রচেষ্টাকে নিন্দে করলেন। নিন্দে করলেন এই বলে যে, যাঁদের আমরা দেবতা জ্ঞান করি, একজন সাধারণ মানুষকে সাজিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তি বলে পর্দায় উপস্থিত করা উচিত নয়। উচিত কি অনুচিত সে বিচার স্বতন্ত্র, কিন্তু ঐ ব্যক্তির উক্তি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যদিও তিনি সিনেমা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, কিন্তু চেতনা থেকে চলচ্চিত্রকে হটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। বাস্তবিকই এ যুগের কোন স্থানের কোন মানুষের পক্ষেই চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়ে থাকা সম্ভব হতে পারে না।

সমাজে সিনেমার এই প্রতিষ্ঠা এসে পড়ায় চলচ্চিত্রে সামাজিক দায়িত্বের কথাও সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, চলচ্চিত্রের প্রতি টান তাদেরই সবচেয়ে প্রবল যাদের ওপরে সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী—অর্থাৎ বালকবালিকা থেকে যুব সম্প্রদায় পর্যন্ত। এই কারণেই চলচ্চিত্রের দায়িত্ব পালন ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। এ নিয়ে বিচার করতে বসলে প্রথমেই দেখতে হয় চলচ্চিত্রে সামাজিক দায়িত্ব-রক্ষায় চিত্রনির্মাতাদের দক্ষতা, জ্ঞান ও সচেতনতা কতখানি। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ আরম্ভই হয় বড়ো অসামাজিক পরিবেশে এবং সমাজবোধহীন ব্যক্তিদের হাতে। এখনও তারই জের চলে আসছে। সমাজ যাদের কুলাঙ্গার বলে দূর করে দিত তারাই এসে জুটতো চলচ্চিত্রের অঙ্গনে, ক্রমে সে অবস্থার পরিবর্তন অনেকখানিই হয়েছে অন্ততঃ ব্যক্তির দিক থেকে, কিন্তু আগেকার পরিবেশের জের বেশ তীব্রভাবেই রয়েছে। যখনই ভাবা যায় যে, চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশেরই নৈতিক চরিত্রের কোন বালাই নেই, তখন

কি করে এদেরই দ্বারা সামাজিক দায়িত্ব পালন হতে পারে বলে মনে করা যায় ? লেখাপড়া জানা বা ভদ্রবংশজাত বলতে গেলে, চলচ্চিত্র নির্মাণে রত, এমন সকলেই, কিন্তু সুস্থ ও সংযমী মন এদের মধ্যে কমই পাওয়া যায়। ফলে চলচ্চিত্র এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সমাজের যারা মঙ্গল চায় তাদের কাছে ওর কোন রকম আদর প্রায় চলে যেতেই বসেছে। যদি দেখা যায় চলচ্চিত্রের প্রভাব ছেলেমেয়েদের বেশভূষা ও কেশ-বিন্যাসের ধরণটাকে বেচাল করে দিচ্ছে, তাদের আচরণকে কেবলই গর্হিত কর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে সহায়ক হচ্ছে তাহলে চলচ্চিত্রের প্রতি সমাজের মায়া থাকবার কথা নয়। এখন যা হচ্ছে তাতে দেখা যায় বেশীরভাগ চিত্রনির্মাতাই, শুধু মাত্র পয়সার লোভেই নয়, তাদের নিজেদের বিশেষ মানসিক গঠনকে পরিতৃপ্ত করার দিকেই বেশী সচেষ্ট। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজকে সেবা করার চেয়ে তাকে বিকৃতির পথ ধরিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তই ছেয়ে রয়েছে। সমাজের প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে চলচ্চিত্র তার নিজের সুবিধা করে নেওয়ার দিকেই বেশী সচেষ্ট, এবং ঠিক ও দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিদের হাতে চিত্রনির্মাণের ভার না থাকার সব ব্যাপারেই বিকৃতিটাই গ্রাহ্য হবার জোর নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তাই দেখা যায় কেবলই সুন্দর থেকে অসুন্দরে নেমে যাওয়া, বিদ্যা থেকে অবিদ্যাতে, ধর্ম থেকে অধর্মে। চিত্রনির্মাতা সৎ সাহিত্যের বা শিল্পকলার ধার দিয়েও ঘেঁষতে চাননা পাছে তাঁর অবিদ্যা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তিনি দলে টানেন এমন চিত্র-নাট্যকার, সঙ্গীতপরিচালক, শিল্পনির্দেশক প্রভৃতিকে যারা তাঁর মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এইভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বসন ব্যসন চিন্তা ও আচরণের ওপর অবাঞ্ছিত প্রভাবের প্রকোপ এসে যাচ্ছে।

আজকের যুবসম্প্রদায়ের কোন বিষয়ের জ্ঞান নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে চলচ্চিত্র যা দেখায় তার উপর। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতাদির মান আজ নির্ধারিত হচ্ছে চলচ্চিত্রের দৃষ্টান্ত ধরে। অথচ চিত্রনির্মাতাদের অধিকাংশকেই দেখা যায় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন। চলচ্চিত্র পাশ্চাত্ত্য থেকে এসেছে বলে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের দিকেই যেন বেশী ঝোঁক। তাই দেখা যায় চিত্রের কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশের সাহিত্য বেশী আমল পায় না—যতো ছবি হয় তার মধ্যে প্রকৃত সাহিত্যিক রচিত কাহিনী, সর্বভারতীয় হিসাব ধরলে, শতকরা পাঁচটিও থাকে না। তার চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পায় বিদেশী ছবির অনুসরণ, আর নয়তো, নিজেদের চিন্তার স্তর অনুযায়ী উদ্ভূত এমন একটা কিছু যা অহিতেরই বেশী হাতধরা। সিনেমা-সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র স্তরই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যেমন হয়েছে 'ফিল্মি গান'। যে দেশের রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত চমকপ্রদ বৈচিত্র্যে ভরে রয়েছে, সে দেশেরও ছবিতে রম্বা, সম্বা, রক-এন-রোল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে মাতামাতি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এ দেশের সমাজে যা নেই, যা খাপ খায়না ছবিতে তারই প্রাদুর্ভাবই যেন বেশী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় বিদেশী পোশাকের কথা। বাস্তবিক পক্ষে অল্প সংখ্যক ছবিরই নাম করা যায় যেগুলি আকারে ও প্রকারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বর্জিত। পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বিত চিত্রাবলী, যাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকবার কথা নয়, কিন্তু তাদেরও মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সঙ্গীত ও বেশভূষাদির দিক থেকে বিদেশী ছবির অনুকরণ। মহাভারতের একটা গল্প নিয়ে একখানি ছবিতে দেখা গিয়েছিল 'ক্লিওপেট্রা' ছবির অনেক অনুকরণ—সাজপোষাক, দৃশ্যসজ্জা এবং সঙ্গীতের দিক থেকে। এটা ব্যতিক্রম নয়, এটা প্রায় এ দেশের ছবির নিয়মই বলা চলে। দেশের সংস্কৃতি বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকতে হবে, তা নয়, দরকার হলে আমাদের যা নেই তা অন্য দেশ থেকে

অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু এমন জিনিসকে কেন আমদানী করা হবে যা সমাজ-জীবনকে অসুস্থ করে তোলে।

দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি সত্যিকারের মমতা থাকলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্তব্যবোধ ভুলে থাকা যায় না। কোন চিত্রনির্মাতারই এই কর্তব্য ভুলে যাওয়া উচিতও নয়। শুধু অঙ্গভঙ্গিতেই নয়, ভাবের দিক থেকেও চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য মূর্ত থাকা একান্তই দরকার। প্রখ্যাত পরিচালক ভি. শান্তারাম একবার বলেছিলেন: The conception of a modern bride who signs on the dotted line before the registrarar and goes away with her husband for a honeymoon is quite different from the conceptton or the shy Indian bride given away by her father in holy wedlock and going to the bridegrooms place in a doli, The latter though it may be old fashioned is any day more romantic, picturesque, colourful. realistic and Indian to our audience.....

So culturally the producer can exert a good influence on the public by creating a taste for artistic clothes aud the right kind of music, poetry and literature; and generally speaking, the film producer can and should help the picturegoer to have not only an aesthetic taste but correct values of life and help the public to retain the Indian culture."

সাধারণতঃ চিত্রনির্মাতারা ধরে নিয়ে রেখেছেন যে, চলচ্চিত্রের একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে আমোদ উপভোগের সুযোগ করে দেওয়া। চলচ্চিত্রকে শিক্ষার মাধ্যম বলে তাঁরা স্বীকৃতিই দিতে চান না। এটা ঠিক যে, চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রেখে হয় নি, কিন্তু চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেতে লাগলো যে, মানুষের তথা সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তার এতো প্রবল হয়ে উঠেছে যে, শিক্ষকের ভূমিকা তার অনিবার্য। ছবি দর্শকমনকে আলোকিত করে তোলার জন্য উদ্দেশ্যমূলক হোক আর না হোক, তার দ্বারা দর্শকমনে একটা কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই, ভালর দিকে হোক, আর মন্দের দিকেই হোক। এই কথাটা যদি অনুভবের মধ্যে রাখা যায় তাহলে চিত্রনির্মাতার স্বতঃই কর্তব্য এসে যায় দর্শকমনের সেইসব প্রতিক্রিয়াগুলি দেখে বিচার করা যে, তিনি তার সামাজিক দায়িত্ব কতখানি পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। যদি প্রতিক্রিয়াগুলি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে বুঝতে হবে চিত্রনির্মাতা তার কর্তব্যের হয় অবহেলা করেছেন, আর নয় কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নন।

প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চিত, তাই কু অমঙ্গলের তা শুধু পরিহার করে চলাই নয়, মঙ্গলকে সামনে তুলে ধরাটাই হচ্ছে আসল কথা। অপরাধমূলক কাহিনীর পরিশিষ্টে অপরাধীর শাস্তিলাভ দেখিয়া অপরাধ করার পরিণাম বোঝানোটাই যথেষ্ট নয়; পাপ কাজকে এমন উন্মুক্ত করে তুলে ধরতে হবে যাতে লোকে তেমন পাপ করার কথা মনেও ঠাঁই দিতে না পারে। এই সূত্রে "দেবদাস" ছবিখানির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই চাননি যে তাঁর রচনাটি সমাজে একটা অহিত প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু চিত্রনির্মাতা চলচ্চিত্রের প্রভাব-বিস্তারী ক্ষমতা সম্পর্কে হয়তো ততটা সচেতন ছিলেন না, কিংবা প্রতিক্রিয়ার দিকটা হয়তো

ভেবে দেখেন নি। ছবিখানির অন্যান্য গুণের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না কিন্তু নীতির দিক থেকে এ ধরণের বিষয়বস্তু সমাজে প্রশ্রয় পাবার যোগ্য নয়। এক যুবক প্রণয়ে ব্যর্থতার জন্য সুরাসক্ত হয়ে জীবনপাত করলো—এ দৃষ্টান্ত চোখের সামনে তুলে ধরার মতো নয়। মানুষের পাপাচরণের প্রতিচ্ছবি দেখানো অন্যায় নয়, কিন্তু এমনভাবে যেন প্রতিফলিত হয় যা সরলমতিকে পাঁপের প্রতি আসক্ত না করে তোলে। অপরাধমূলক ছবি যুবকদের মানসিক অবস্থাকে যে বিপর্যস্ত করে তোলে তার অনেক প্রমাণই আজ পাওয়া যায়। ছবিতে গুণ্ডামী ডাকাতি দেখে অল্পবয়সীরা গুণ্ডামী ও ডাকাতিতে লিপ্ত হওয়ার অনেক খবরই শোনা গিয়েছে। বিশেষভাবে ছবির গুণ্ডা ও দুষ্ট চরিত্রটি যদি কোন জনপ্রিয় শিল্পী দ্বারা অভিনীত হয় তাহলে প্রভাবটা চট্ করেই মনে ধরে যায়। কারণ জনপ্রিয় শিল্পী মানে, সে যেন রূপকথার রাজপুত্তুর। রাজকন্যা ও রাজপুত্রের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ যেমন শিশুমনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে সিনেমার নায়িকা ও নায়ক। শুধু পর্দায় দেখেই খুসী নয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ওরা কে কি চালে চলে, কে কি খায়, কে কি প্রসাধন ব্যবহার করে, কে কি রকমের পোষাক ব্যবহার করে, কার কখানা কি ধরণের গাড়ী আর বাড়ী—এসব জানবার জন্য কৌতূহলের অন্ত নেই। ব্যবসায়ীরা এই কৌতূহলের সুযোগ নেয় চিত্রশিল্পীদের নামে, ছবির নামে তাদের সামগ্রীর নামকরণ করে, অথবা চিত্রশিল্পীদের দেওয়া তারিফ-পত্র প্রচার করে। একখানা গাড়ী কেনার জন্য প্রলুব্ধ করা হচ্ছে, কারণ গাড়ীর ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ সে গাড়ীর তারিফ করছেন বলে নয়, তার কারণ কোন চিত্রশিল্পী সে গাড়ী ব্যবহার করেন বলে। এইভাবে চিত্রশিল্পীদের জ্ঞানবিচারের ঊর্ধ্বে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের স্তরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। দেশের একজন পণ্ডিত, কোন মনীষী পথ দিয়ে চললে তাঁকে চিনবেও না কেউ, কিন্তু একজন চিত্রশিল্পীর পক্ষে পথ দিয়ে চলাই মুস্কিল—লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে সেস্থান। রাশিয়া ফিরৎ একজন বললেন—সেখানে ভারতের দু'জন লোক অতি পরিচিত: একজন পণ্ডিত নেহেরু, অপরজন রাজকাপুর; আর সেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে প্রিয় হচ্ছে "আওয়ারাহ্"। এটা সিনেমার জনপ্রিয়তা প্রতিপন্ন করে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এটাও ভারতে লজ্জা পাবার কথা ভারতকে চিনতে হয় রাজ-কাপুর আর তার 'আওয়ারা' গানে। সিনেমাকে যতো ভাল চোখেই দেখা যাক এ অবস্থাটা বাঞ্ছনীয় বলবে না কেউই। তবু এসব থেকে এই প্রমাণটাই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, এ যুগে সিনেমার প্রভাব প্রচণ্ড, আর সেই কারণেই চিত্রনির্মাতাদের দায়িত্বও বিরাট।

এখনকার অবস্থা যা তাতে দেখা যায় যে, চলচ্চিত্র মানুষের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের পরিধিকে ক্রমশঃই যেন সংক্ষেপিত করে দিচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, চলচ্চিত্রের দ্বারা মানুষকে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনে যথেষ্ট সাহায্যও করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় চলচ্চিত্র নির্মাণে আজ যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নিজেদেরই পাণ্ডিত্য বলতে নেই, তাই চলচ্চিত্র আজ যে রূপ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তার দ্বারা সমাজের উপকার তো হচ্ছেই না, বরং বিশেষভাবে অপকারই হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি সিনেমাকে আমোদ বিতরণের কাজ থেকে সরিয়ে রাখা হবে? কথাটা তা নয়, আমোদ অবশ্যই বিতরণ করবে এবং চলচ্চিত্রের মুখ্য ভূমিকাই হচ্ছে তাই, কিন্তু এমন আমোদের উপাদান যেন পরিবেশিত না হয় যা অনিষ্টকর হতে পারে। মানুষের রসিকমনকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে শুদ্ধারজনক উপাদান, বিজাতীয় উপাদান পরিবেশন করতেই হবে, এমন কোন কথা নয়। "পথের পাঁচালী"র মতোও ছবি হতে পারে যা রসিক-মনকে আনন্দও দেয়, আবার চিত্তকে পুষ্ট করার সুযোগও দেয়। আরো এমনি ধারা ছবির

নাম করা যায়, কিন্তু সংখ্যায় তা খুব বেশী দাঁড়াবে না। পৌরাণিক ছবির প্রভূত প্রচলন আমাদের দেশে, কিন্তু দেখা যায়, ছবিগুলিকে সহজ আমোদের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, চরিত্রাবলীকে এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যাতে পুরাণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা চলে যায়। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প নিয়ে প্রায়ই ছবি হয়, কিন্তু কাহিনীকে আমোদের করে তোলার জন্যে এমন সব উপাদান কল্পনা থেকে উদ্ভব করে যোগ করে দেওয়া হয় যে মূল কাহিনী আর চেনার উপায় থাকে না। এ দেশের সমাজের ওপরে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ গ্রন্থাদির প্রভাব অসামান্য, কিন্তু সেইসবই যদি বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয় তাহলে ছবির প্রভাব সমাজ-জীবনকেই বিকৃত করে দেবে।

এইভাবে দেখা যায় চলচ্চিত্র সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, তার এই অসচেতনতা সম্পর্কে দেশের বৃহদংশ জনসাধারণ সতর্ক নয়।

বৈষ্ণব সহজিয়া মত

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

সহজিয়া ধর্মের মূল ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি প্রাচীন গুহ্যসাধনার উপর—ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। সেই গুহ্য তত্ত্বই এক এক যুগে এক একটি ধর্মমতের সহিত যুক্ত হইয়া এক একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কখনও ইহা আসিয়া তন্ত্র-সাধনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে—কখনও বা ঘটিয়াছে বৌদ্ধ-সহজিয়ার ভিতর রূপান্তর—আবার সেই সাধন-প্রণালীই বৈষ্ণবধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে (১)। সাধারণতঃ নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম একটা বিশিষ্ট ক্রিয়ামূলক তান্ত্রিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। হিন্দু-শৈব আগম ও প্রাচীন তন্ত্রের শিব-শক্তিবাদ ও হঠযোগ পদ্ধতির সহিত বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞা-উপায়বাদ মিলিত হইয়া বজ্রযান ও শেষে সহজযানের একটি পরিপূর্ণ রূপ রচিত হয়। পালবংশের রাজত্বকালেই বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে বদ্ধমূল লাভ করে। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সেনবংশ বাংলায় রাজত্ব করে। সেন-বংশীয়েরা ছিলেন বৈষ্ণব। হিন্দুর শিব-শক্তিবাদ পালযুগে বৌদ্ধ-প্রজ্ঞা-উপায়বাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এখন সেনযুগে প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে প্রকৃতি পুরুষরূপে রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব হইতেই প্রকৃতি-মিলন ও যোগ-সাধন ধর্মের ক্রিয়াপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈষ্ণব আমলেও সেই মূল ক্রিয়াটি রক্ষিত হইল—এইভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইল এবং বুদ্ধও হিন্দুর অবতারে পরিণত হইলেন। এই সময়েই বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব। সাধারণ লোকদের অনেকেই স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধ-সহজিয়া হইতে বৈষ্ণব-সহজিয়াতে রূপান্তরিত হইল। আর বৈষ্ণব-সহজ-সাধন চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পর নূতন শক্তি ও রূপ লইয়া আবির্ভূত হইল বটে কিন্তু ইহার বীজ পূর্বেই অঙ্কুরিত ও অনেকদিন বর্ধিত হইয়াছিল। (২)

---

(১) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(২) বাংলার বাউল ও বাউল গান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

বৈষ্ণবগণ সহজিয়া মতের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন : "আমরা সকলেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি"। পরমাত্মা জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় কিনা—তাহা সহজিয়া মতের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু তিনি যে প্রেমময় ইহা সহজিয়াগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রেমময় পরমাত্মা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া প্রেমের বীজ আমাদের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বর্ধিত করিয়া পরিব্যাপ্ত করাই সহজিয়া সাধনার উদ্দেশ্য। সেইরূপ প্রেমের পূর্ণ স্ফূর্তিতে লোক প্রেমময় পরমাত্মার সমকক্ষ হইতে পারে। "বৈষ্ণব সহজিয়া মতে যুগল তত্ত্বই হইল পরম তত্ত্ব এবং এক অদ্বয় আনন্দ স্বরূপে স্থিতিই চরম লক্ষ্য (৩)।

প্রেমের বীজ আমাদের হৃদয়ে নিহিত থাকিলেও আমরা সাধারণতঃ ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না। অতএব এই অনুভূতি জাগ্রত করা এক প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। সহজিয়ারা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে দেখিয়াই চিত্ত আকৃষ্ট হউক না কেন—তাহাকে লইয়াই সর্বপ্রথম সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। মানুষের মন সাধারণতঃ শারীরিক সৌন্দর্যের দিকেই আকৃষ্ট হয়—সাধনার ক্ষেত্রে এই আকৃষ্ট হওয়াই প্রেমের প্রথম উন্মেষ। পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যাহারা ভালবাসিতে জানে না—এই জাতীয় লোকের পক্ষে যেভাবেই হউক প্রেমের অনুভূতি লাভ করা অত্যাবশ্যক। তারপর শারীরিক সৌন্দর্যের সাধনার দ্বারা পূর্ণ মাধুর্যের ধারণায় কিরূপে উপনীত হইতে হয় সহজিয়ারা তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। শারীরিক সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়। যে একবার সৌন্দর্য ভালবাসিয়াছে, যাবতীয় সুন্দর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব সৌন্দর্যের উপাসক যাবতীয় সুন্দর জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সে বুঝিতে পারে যে, সৌন্দর্য কোন বস্তু বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তুতে, বিভিন্ন প্রকারে ইহার স্ফূর্তি রহিয়াছে। সুতরাং যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল—এই অবস্থায় উপনীত হইয়া সে বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রেম সেই বস্তু বিশেষেই সীমাবদ্ধ নয়—জগতের যাবতীয় সুন্দরকেই সে ভালবাসিতে শিখিয়াছে; অর্থাৎ বিশেষকে অবলম্বন করিয়াই তাহার প্রেম এখন নির্বিশেষে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

সৌন্দর্যের উপাসক অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারে যে শারীরিক সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য সহজে লোপ পায় না। সেইজন্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে—তাহার শারীরিক সৌন্দর্য অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্যের দিকে সাধকেরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এইজন্যই উভয়ের সাহচর্যে যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শারীরিক সৌন্দর্যের সংস্কৃতি অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্যের সংস্কৃতি উভয়েরই চরম লক্ষ্য হইয়া থাকে। মানুষের স্বভাবই হইল তাহারা অন্যায় কার্য যথাসম্ভব গোপনে অনুষ্ঠিত করিতে চায়—ইহার কারণ পরিচিত লোকের নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয়। ইহা প্রতিরোধের জন্যই প্রিয়জনের অজ্ঞাতে অন্যায় আচরণের চেষ্টা হইয়া থাকে। এইজন্য যাহাকে তুমি ভালবাস তাহার নিকট ঘৃণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা লোকের থাকে না। অতএব অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইবার চেষ্টা স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই করিয়া থাকে। এই ভাবেই নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং উভয়ের প্রেম স্বর্গীয়ত্ব লাভ করে—এক কথায় "রূপলীলা" হইতে "স্বরূপ" লীলায় উপনীত হওয়ার সাধনাই—সহজিয়া-সাধনা।

---

(৩) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

"রূপ ও স্বরূপতত্ত্ব"—'রূপ' বলিতে বাহিরের একটা আকার বুঝায় আর এই রূপের অভ্যন্তরে উহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাহাকে 'স্বরূপ' বলা যায়।

হিন্দু-তন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধ-তন্ত্র-সাধনা বা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় নরনারী-মিলন ছিল বিশেষ-ভাবে যোগমূলক ও জ্ঞানমূলক কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের রাধাকৃষ্ণ-লীলাবাদের ও প্রেমধর্মের বিপুল প্রচার প্রসারের ফলে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে যোগক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে প্রেমের অবতারণা করা হইয়াছিল। হিন্দু-তন্ত্রে যেমন শিব-শক্তিতত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও তেমনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনই হইল বৈষ্ণব-সহজিয়াদের পরম তত্ত্ব। জগতের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর যে 'রূপ' তাহা তাহাদের বাহিরের 'রূপ'। এই 'রূপ' বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব তাহাই 'স্বরূপ'। এই দৃশ্যমান স্থূল, 'প্রাকৃতরূপ'-এর অন্তরালে উহার 'স্বরূপ' অবস্থিত। জগতের প্রত্যেক পুরুষ, 'রূপ'-এ পুরুষ কিন্তু 'স্বরূপে' 'কৃষ্ণ'—আবার প্রত্যেক নারী, 'রূপ'-এ নারী কিন্তু 'স্বরূপে' রাধা। নরনারী যখন রূপের মধ্য দিয়া তাহাদের 'স্বরূপ' উপলব্ধি করিবে তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নরনারীর মিলন হইবে রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলা। মর্ত্যের প্রাকৃত-প্রেম মিলন হইবে নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজলীলা। উহাই সংক্ষেপে 'রূপ'-স্বরূপতত্ত্ব। (৪)

তান্ত্রিক সাধনায় নিত্য-নূতন সহকারী গ্রহণের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সহজিয়া সাধনায় এইরূপ পরিবর্তন স্বীকৃত হয় না। উভয়েই নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে ইহাই সহজিয়া সাধনার মূলসূত্র।

"সহজ ধর্মেও পরকীয়া গ্রহণের রীতি আছে। পরকীয়াতে প্রেম গভীরতা প্রাপ্ত হয়" ইহাই সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছেন।

সাধারণতঃ পরকীয়া অর্থে পরস্ত্রী বুঝাইয়া থাকে। চৈতন্যের পরবর্তী কালেই-পরকীয়া—প্রেম তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহার আবির্ভাবের পরে—বৃন্দাবন গোস্বামিগণেরও পরবর্তী কালে। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে পরকীয়াতত্ত্বের আদর্শ স্বয়ং মহাপ্রভু কর্তৃকই প্রচারিত হইয়াছে। প্রেমের যে বিভিন্ন স্তরভেদ আছে, পরকীয়াতত্ত্ব সেই প্রেমেরই বা রসেরই একটি বিশেষাবস্থা। পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। 'পরকীয়া রসে অতি ভাবের উল্লাস'—সহজিয়াগণ সকাম ধর্মকে স্বকীয়া ও নিষ্কাম ধর্মকে পরকীয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদে তাঁহারা বলিতে চান যে, সকাম সাধনা অপেক্ষা নিষ্কাম সাধনাই শ্রেষ্ঠতর। এই মতে ভক্তিমার্গের উপাসনায় পরকীয়া ভিত্তিরূপে কল্পিত। যাবতীয় বৈধী সাধনা ইহকালে-পরকালে সুখসম্ভোগের বাসনা প্রভৃতি স্বকীয়া পর্যায়ভুক্ত। কামনারহিত হইয়া কর্মানুষ্ঠানই 'পরকীয়া'। রাধাদি গোপীগণ এই পরকীয়া ভাবের প্রতীক—আর রুক্মিণী আদি মহিষীগণ স্বকীয়া ভাবের প্রতীক্ (৫)। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে বৈষ্ণবধর্মের সার মর্ম অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়া-মত গড়িয়া উঠিয়াছে :—

(ক) পূর্ববর্তী রসশাস্ত্রকারগণ পরকীয়াকে রসপর্যায়ে স্বীকার করেন নাই কিন্তু বৈষ্ণবগণ রাধার প্রেমমূলক ধর্মকে ভিত্তি করিয়া পরকীয়াকে রসপর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন

(৪) বাংলার বাউল ও বাউল গান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
(৫) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

এবং তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন যে, 'স্বকীয়া' অপেক্ষা 'পরকীয়া'র আনন্দ ও রসের অনুভূতি অধিক। কিন্তু পরবর্তী সহজিয়াগণ বৈষ্ণবগণের এই মতবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, 'পরকীয়া'-ই একমাত্র 'রস'—'স্বকীয়া' রসাভাস মাত্র।

(খ) বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যের মধুরতা স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে মাধুর্য রস প্রধানতঃ চারি প্রকার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহারা বলিয়া থাকেন যে, এই চারিটির মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলেই ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তি সম্ভব কিন্তু সহজিয়ামতে একমাত্র মধুরকেই অবলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহারা বলেন যে, "শ্রীরাধার অনুগত ভজনে যে হয় রত, স্থিতি তার কেবল মধুরে"। অর্থাৎ এই সাধনায় দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের কোন স্থান নাই। অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়াইল যে, বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য-ভাবের উপাসনার পরিবর্তে মাধুর্যভাবের উপাসনার কথা স্বীকার করিলেন—ইহাকে অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সহজিয়াগণ একমাত্র মধুরকে অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। এই সকল কারণে বৈষ্ণব-সহজিয়া-ধর্ম বৈষ্ণবধর্ম হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন পন্থানুসরণ করিয়াছে। সুতরাং একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না যে, একমাত্র বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়া-মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের জন্মকথা

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ.

কোন একটি সাহিত্য-বস্তুর জন্মকথা আলোচনার প্রসংগে সন, তারিখ প্রভৃতি উল্লেখ না করাই শোভন ও সমীচীন। কারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয়ের উদ্গম, কি পূর্বধারার বিবর্তন অথবা অভিনব দিক্‌দর্শন কখনো হঠাৎ ঘটে না। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, লেখকের অনুকূল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি গড়ে উঠবার উপযুক্ত পটভূমিকা ও জাতীয় জীবনে দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি ও সম্ভাবনাই কোন একটি নতুন সাহিত্যিক ধারার জন্ম দেয়।

কিন্তু বাংলা উপন্যাসের জন্মসূত্র নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এটি যত বেশী এই সমস্ত সর্তগুলিকে গ্রহণ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী অতিক্রম করেছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য নতুন সমাজ-পরিবেশ, নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা ও উনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁ।

উনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁর প্লাবনে বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে বহু আবর্জনা ভেসে এসেছে, বহু পংকিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই রেণেসাঁ উপযুক্ত পলিমাটির কাজ করেছে। কারণ পরবর্তী কালে এই উর্বর ভূমিতে কর্ষণার ফলে বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ধারার সংগে দুটি বিশেষ নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে—একটি পদ্য মহাকাব্যের ধারা, অপরটি গদ্য মহাকাব্য বা উপন্যাসের ধারা।

কিন্তু বাংলা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁরই দান—এ কথা স্বীকার করে নেবার আগে একবার আমাদের প্রাক্-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। প্রসিদ্ধ ইংরেজ-সমালোচক এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন যে, নিছক চারা রোপণের দ্বারা কখনও কোন একটি নতুন সাহিত্যিক ধারার সূত্রপাত হয় না, যদি না সেই দেশের মাটিতে ঐ সাহিত্য সৃষ্টির বীজ আগে থেকেই নিহিত থাকে। তাই স্বভাবতঃই আমরা প্রাক্-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের নিরুদ্দিষ্ট বীজগুলির সন্ধান পাবার চেষ্টা করি। আর এই প্রচেষ্টার জন্যই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমরা যথেষ্ট অবিচার করে থাকি। বস্তুতঃ উপন্যাস

এমনই একটি আধুনিক সমাজ-চেতনা-প্রসূত ফল, যা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একরকম অসম্ভবই। কিন্তু তবু কখনো কখনো সাহিত্যিকের অবচেতন মনে ভাবী মহীরুহের বীজ-রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং সকল দেশের সমালোচকই এই বীজ-রূপের নজীর দেখিয়েছেন। উপন্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে ইতালীয় সাহিত্যে বোকাচ্চিওর মধ্যে, কি ইংরেজি সাহিত্যে চসারের মধ্যে ঔপন্যাসিক গুণের পরিচয় আজ আর কারোর অজানা নয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি শাখাতেই সমালোচকেরা উপন্যাসের পদধ্বনি শুনেছেন। কিন্তু সে পদধ্বনি খুবই অস্ফুট, এবং তাও মাত্র দু'একটি শাখার মধ্যেই অনুভব করা যায়। মংগল-সাহিত্য এই সমস্ত শাখার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু দৈববাদ-নির্ভর মংগল কাব্যগুলির মধ্যে মানবতাবাদ যতই কেন মুখোস খুলে বেরিয়ে আসুক না, তার মধ্যে যে গোষ্ঠীগত আবেদন আছে, তাই সবচেয়ে বেশী বাধা দিয়েছে মংগল কাব্যগুলিকে উপন্যাসধর্মী হয়ে উঠতে। কিন্তু তবু মংগল কাব্যগুলি যে গুণের জন্য উপন্যাসের পূর্বসূত্র যোজনার দাবী করতে পারে, তা হচ্ছে বাস্তবতাবোধ। অবশ্য বাস্তববাদ উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলেও একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবু-চরিত্র সম্বলীয় বইগুলিতে, কি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র বাস্তব-চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এগুলি উপন্যাসের পূর্ণ মর্যাদা পায় নি। তা ছাড়া, মংগল কাব্যগুলির মধ্যে যে বাস্তব প্রেরণা আছে, তা বহু জায়গাতেই এত বেশী রসায়িত ও ফেনায়িত যে শেষ পর্যন্ত তা সমগ্র কাব্যটির সংগে সংগতিহীন হয়ে পড়েছে। আর উপন্যাসের মধ্যে যে বাস্তব চেতনার সন্ধান আমরা দেখি, তা মূল সুরটির সংগে এমনই অংগাংগীভাবে জড়িত যে, সেটুকু বাদ দিলে উপন্যাস শুধু যে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে তা নয়, অসার্থক হয়ে ওঠে। সুতরাং মংগল কাব্যের বাস্তবতার সংগে উপন্যাসের মিল থাকলেও, এদিক দিয়ে মংগল কাব্যগুলি কখনই উপন্যাসের পূর্বসূরীত্বের দাবী করতে পারে না।

তবে অপর একটি দিক থেকে মংগল কাব্যগুলির উপন্যাসধর্মী হয়ে ওঠার পথে সার্থকতা আছে। বহু ক্ষেত্রেই কাব্যকার নিছক গল্প রসসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন দেখা যায়। যদিও তা প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেছে এই মংগল-কবিদের দৈবী-বিশ্বাস ও অলৌকিক কাহিনী রচনার ফলে। কিন্তু এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি—দৈবী বিশ্বাস, অলৌকিক কল্পনা, গোষ্ঠীগত চেতনা—বর্জন করার ফলে প্রাচীন সাহিত্যের রূপকথাগুলি বহু ক্ষেত্রেই উপন্যাসের সমধর্মী হয়ে উঠেছে। রূপকথাগুলির ভেতর শুধু নিছক গল্প-রস সৃষ্টি করারই প্রেরণা নেই, তার সংগে রোমান্টিক কল্পনার স্ফূর্তি এগুলিকে প্রায় রোমান্টিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে।

প্রাক্-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের আর একটি মাত্র শাখার মধ্যে আমরা উপন্যাস-সুলভ গুণের পরিচয় পাই। এটি অবশ্য লিখিত সাহিত্য বা পুরোপুরি মধ্যযুগীয় সাহিত্য নয়; কারণ এই ধারাটি সৃষ্টি হয়েছে লোক-সাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাহে। পাঠক-সমাজের কাছে এই ধারাটি সাধারণতঃ গীতিকা হিসাবে পরিচিত, এবং আমি এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই গীতিকাগুলির মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম বাস্তব ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সমাজ-চিত্র এবং ব্যক্তি হৃদয়ের সুখ-দুঃখের পরিচয় পেলাম। যদিও লোক-সাহিত্য হিসাবে এগুলির মধ্যে গোষ্ঠীগত আবেদন বিদ্যমান, কিন্তু তবু একক জীবন বা ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ-আদর্শ শাশ্বত রসের মধ্যে যে পরিণতি পেয়েছে, তার পরিচয় আমরা এগুলির মধ্যে পাই। প্রেম, সমাজ-গর্হিত বা অবৈধ প্রেম—যা বিশেষভাবে উপন্যাসেরই উপজীব্য, এই গীতিকারেরা সেই প্রেমমূলক সাহিত্য রচনা করে কাব্য-উপন্যাস

গড়ে তুলেছেন। আর মংগল কাব্যের অলৌকিকতা কি রূপকথার ঐন্দ্রজালিকতাও এই গীতিকাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে। তাই এই গীতিকাগুলির সংগেই আমরা সবচেয়ে বেশী উপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

কিন্তু এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এর আগে যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টি হয় নি, তার কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং দূরবাহী কারণ আছে। ঐতিহাসিক দর্শনে বলে—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর বিশুদ্ধ দর্শনে এবং আধুনিক বিজ্ঞানেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, একই কারণের দ্বারা একই রকম ফলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ তত্ত্ব শুধু ইতিহাস, দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খাটে। দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, একই কারণের ফলে একই রকম সাহিত্যিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই।

বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ব্যাপারেও এই রকম কতকগুলি সর্বকালীন কারণ আছে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য গদ্যভাষা। একটি সর্বজনবোধ্য, সর্বজন-ব্যবহার্য, সর্বপ্রকার ভাব ও চিন্তা প্রকাশের বাহন অথবা মাধ্যমরূপে উপযুক্ত গদ্যভাষা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একান্তরূপে প্রয়োজন। এই ধরণের গদ্যভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। কিন্তু আগেই বলেছি, শুধু গদ্যভাষা সৃষ্টি হলেই হবে না, সেটি সর্বজনবোধ্য ও ব্যবহার্য হওয়া চাই, অর্থাৎ 'staudard' হওয়া চাই। তাই ১৮০০, ১৮০১, অথবা ১৮০২ খৃঃ থেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতির চেষ্টায় বাংলা গদ্য রচনা আরম্ভ হলেও উপন্যাসের জন্য আমাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৬৫ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৮০০-১৮৬৫ খৃঃ পর্যন্ত সময়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এই সময়টা মূলতঃ বাংলা গদ্যের অনুশীলনের যুগ (আমি কেবল মাত্র বাংলা গদ্যের আংগিকের বিষয়ে বলছি)। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর আগে বাংলা গদ্যের মোটামুটি দু'রকম রচনারীতি ছিল। একটি রীতির জন্য মূলতঃ প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ দায়ী। অপরটির জন্য স্বয়ং বিদ্যাসাগর দায়ী। ১৮৫৮ খৃঃ প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্যারীচাঁদ আরবী ফারসী বহুল চলিত ভাষার প্রবর্তন করলেন; আর ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-তে কলকাতার সমকালীন জনসমাজের কথ্যভাষা সাহিত্যে স্থান পেল। কিন্তু এই ধরণের চল্‌তি ভাষা বা কথ্যভাষা সর্বসাধারণের ভাষা ও সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে হবার উপযুক্ত নয়; তাই এই দু'খানি গ্রন্থের কোনটিই পরিপূর্ণ উপন্যাস হতে পারল না। অপরদিকে প্রায় এই সময়েই বিদ্যাসাগর সংস্কৃতবহুল বাংলা সাধু-গদ্যের প্রবর্তন করলেন। আর শুধু সাধু-গদ্য রচনা নয়, বাংলা গদ্যের প্রাণশক্তিরও পরিচয় দিলেন তিনি। রামমোহনের প্রযত্নে লালিত কিশোরীটি বিদ্যাসাগরের অনুশীলনের ফলে বয়ঃসন্ধির পর্বে এসে পৌঁছল। এরপর বঙ্কিম প্যারীচাঁদ মিত্রের চলিত ভাষা বা কালীপ্রসন্ন সিংহের কথ্যভাষার সংগে বিদ্যাসাগর রচিত সাধুভাষার সমন্বয় ঘটালেন; তার ফলে বয়ঃসন্ধি পর্বের কিশোরীটি যৌবনবতী হয়ে উঠল। তার সর্বাংগে লাবণ্যপ্রভা প্রকাশ পেল, তার কমনীয় কান্তি সমস্ত পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জন করলো। আর তাই এবার সম্ভব হল সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি—'দুর্গেশনন্দিনী'।

কিন্তু উপন্যাস সৃষ্টির অনুকূলে শুধু উপযুক্ত গদ্যভাষা রচনাই যথেষ্ট নয়। এরই সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত আছে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়

যে, রাজা আলফ্রেডের সময় অর্থাৎ প্রায় দশম শতাব্দী থেকেই গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হয়েছে। কিন্তু গদ্যভাষা সৃষ্টি হলেও প্রায় দীর্ঘ ৫০০ শত বৎসর ধরে তা সর্বজন-ব্যবহার্য হয়ে উঠতে পারে নি; এবং উপন্যাস রচনাও সম্ভব হয়নি। তার কারণ তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়নি। ১৪৭৬ খৃঃ কাক্সটন্ ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, আর এরপর ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইংরেজী উপন্যাস পাওয়া গেল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হলে গদ্যভাষা তার পরিণতি পায় না। মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে গদ্যভাষা যখন বহুজনের দ্বারা অনুশীলিত ও কথিত হয়, তখনই তা সর্বজন-ব্যবহার্য ও সর্বকার্যের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, আর তখনই সম্ভব হয় উপন্যাস রচনা।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসংগে স্বভাবতঃই উপন্যাসের আর একটি সর্ত সংবাদপত্রের কথা এসে পড়ে। সংবাদপত্র উপন্যাসের উপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ক্রিয়াশীল। সংবাদপত্রেই সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনের সত্য ও উপভোগ্য চিত্র প্রকাশিত হয়। এর ফলে সাধারণ পাঠকসমাজ ধীরে ধীরে মধ্যযুগের অলৌকিক ও দৈবী কাহিনীর প্রভাব কাটিয়ে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে; তাই কাব্য-সাহিত্যও আর তাদের মনের তৃষ্ণা অনুযায়ী রসের যোগান দিতে পারে না। ক্রমশঃ উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা এগিয়ে আসে। সমকালীন সাহিত্যিকের মনেও সংবাদপত্র একইভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভাবীকালের ঔপন্যাসিকের অবচেতন মনও ক্রমশঃ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা উপন্যাস সৃষ্টির অনুকূল প্রেরণা পায়। এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ প্রমাণও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আছে। ১৮১৮ খৃঃ বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ১৮২৩ খৃঃ সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাসধর্মী রচনা দেখা যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' বইটিতে।

কিন্তু এই সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্ত প্রকার জন-সমাজের মধ্যে আসে না। কোন একটি সুগঠিত নাগরিক সমাজ যখন শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে মননে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়, তখনই তার মধ্যে আসে সৃজনশীল ক্ষমতা ও গ্রহণীয় বৃত্তি। এই সমাজ-মানসে তখন নতুন দৃষ্টিভংগীর উন্মেষ ঘটে। আসে নতুন সমাজ-চেতনা, নতুন আদর্শবাদ, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি। আর তাই নাগরিক সভ্যতার পত্তনের সংগে উপন্যাসের উদ্ভব কার্য-কারণ সূত্রে জড়িত। বাংলা দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ১৬৫৭ খৃঃ সুবেবাংলার শাসনকর্তা শাহাজাদা সুজা বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরেই দীর্ঘকালীন ব্যবস্থায় অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে গঠিত বাংলার গ্রামীন সমাজ গেল ধ্বংস হয়ে। আর তারপর দিল্লী নগরীর অনুকরণে স্থানীয় স্বাধীন শাসনকর্তাগণ আরম্ভ করলেন বিলাসব্যসন-উৎসব-পূর্ণ জীবনযাত্রা। ইতিমধ্যে পর্তুগীজ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিরা এদেশে এসে নাগর সভ্যতার প্রতীক কুঠি-বন্দর-বাংলো গড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর এই কাজ আরও বেশী ত্বরান্বিত হয়েছে ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের বিজয়ে। এই যুদ্ধ বিজয়ের দূরবাহী ফল ১৮১৭ খৃঃ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা; অর্থাৎ পূর্ণাংগ নাগর সভ্যতার পত্তন। আর তাই 'নববাবু বিলাস', 'হুতোম-প্যাঁচার নক্‌শা'র ধারায় ১৮৭৩ খৃঃ পেলাম বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'।

এই নাগর সভ্যতার পত্তন স্বভাবতঃই উপন্যাস সৃষ্টির আর একটি বীজ উপ্ত করেছে। কারণ বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যুদয় না হলে উপন্যাসের লেখক ও পাঠক সৃষ্টি হয় না। আর বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজ-পরিবেশ একান্তরূপে নাগর সভ্যতারই দান। ফিউডাল সমাজ-পরিবেশ যেমন গ্রামীন্ সভ্যতার দান। তাই এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ সমালোচকের

উক্তি প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতই সত্য যে—The novel is the epic art form of our modern, bourgeois, society. আর শুধু তাই নয়, এর সংগে সমালোচক প্রশ্নও করেছেন—will it die with the death of our civilization ; as the epic art died with the death of ancient society ? কারণ উপন্যাস একান্তভাবেই, ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রকাশ ও বিকাশের কথা। ঔপন্যাসিক আবিষ্কার করেন ব্যক্তিজীবনকে, উপলব্ধি করেন তার মনের গতিপ্রকৃতি, প্রসার ও জটিলতা ; আর তারই সংগে করেন আত্মসমীক্ষা। অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলন ও পরিপোষণ ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ মধ্যযুগের, রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সাহিত্যে, কি গোষ্ঠী-চেতনা-সম্ভূত গ্রামীন সমাজজীবনে কখনোই সম্ভব নয়। অতএব উপন্যাস একান্তরূপে বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতারই দান।

কিন্তু এই সমস্ত সর্তাবলী ও কারণ বিবেচনা করেও আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ কারণ একমাত্র রেণেসাঁ বা নবজাগরণ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সাধারণভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যেও উপন্যাসের জন্ম-প্রসংগে অত্যন্ত জোরালোভাবে এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে যে—If (novel) did not exist, except in very rudimentary form, before that modern civilization which began with the Renaissance, and like every new art form it has served its purpose of extending and deepening human consciousness. প্রাক্-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে 'rudimentary form' দেখা যায়, তা ইতিপূর্বেই মংগলকাব্য, রূপকথা ও গীতিকার প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এরপর মন্তব্যটির দ্বিতীয়াংশে যে মানবানুভূতির প্রসার ও গভীরতায় অবগাহন করার কথা বলা হয়েছে, একটু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাও অনুভব করা যায়। কারণ মধ্যযুগীয় গোষ্ঠী- আবেদনমূলক সাহিত্যে, কি দৈবী শক্তি-নির্ভর সাহিত্যে পূর্ণাংগ মানবতার প্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভব নয়।

রেণেসাঁ কথাটির সাহিত্যিক অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে Jules Michelet বলেছেন, রেণেসাঁ হচ্ছে—Discovery of the world and man. ইউরোপে এই নতুন জগৎ ও নতুন মানুষ আবিষ্কারের প্রেরণা আসবার একটি প্রত্যক্ষ কারণও ঘটেছিল। ১৪৫৩ খৃঃ কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর গ্রীক পণ্ডিতেরা পালিয়ে এসেছিলেন ইতালীতে। কিন্তু তাঁরা নিছক শুধু হাতে আসেন নি, সংগে নিয়ে এসেছিলেন গ্রীক 'ক্লাসিক্স্'-এর ভাবধারা ও আর এক প্রাণশীল সভ্যতা ও সংস্কৃতির মশাল। আর এরই ফলে ইতালীতে ও পরে সমস্ত ইউরোপে রেণেসাঁ পরবর্তী সাহিত্যের জন্ম। বাংলা দেশেও ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে রেণেসাঁ আগমনের পথ সুগম হল। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল—এলো নতুন সভ্যতা, নতুন শিক্ষা, নতুন আদর্শ—বাধল সংঘাত—তীব্রতর হল প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রতিক্রিয়াকে শোধন করে নেওয়া হল সমন্বয়ের দ্বারা, গতি-শীলতার বেগকে মন্থর করে দিয়ে স্থিতিশীল হল সমাজ-পরিবেশ, আর তারই পরে সম্ভব হল সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীতে নবীনচন্দ্র সেন, কি গিরিশচন্দ্র ঘোষও সমন্বয় প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ সমন্বয়-সাধক হলেও, আন্তর ধর্মে তাঁরা তখনও ছিলেন দৈবী চেতনায় নিষ্ঠাবান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার দৈবী চেতনাকে ঠিক এই সময়েই যুক্তিমার্গে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন আর তার ফলে সার্থক সমন্বয়-সাধনও তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাই

নবীনচন্দ্র, কি গিরিশচন্দ্র সেখানে রেণেসাঁ-প্রসূত ফল-স্বরূপ সার্থক কাব্য কি নাটক রচনায় সিদ্ধকাম হতে পারেন নি, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র পেরেছিলেন সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে।

এখন দেখা যাক, পূর্বোক্ত নতুন জগৎ ও নতুন মানুষের আবিষ্কার সম্ভব হল কি করে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জগৎ-চেতনার উন্মেষ না হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিদেশী সমালোচক বলেছেন—In the middle ages individuality had been lost. The church had taught that individuality was sinful and that one must diverse oneself of selfhood, imitate christ and the saints and strive for self-abnegation. মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও আমরা দেখতে পাই কি মংগলকাব্য, কি বৈষ্ণবকাব্য, কি অনুবাদ-সাহিত্য—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান কোথাও ছিল না। আর বাউল সংগীতে, কি শ্যামা সংগীতে 'self-abnegation' স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধরা পড়ে। কিন্তু রেণেসাঁ এই সমাজ ও সাহিত্যের উপর কি প্রভাব বিস্তার করলো।—Man began to discover that the present world is interesting and beautiful, real and God-given and that whatever may be the validity of the claims of the other world, simple human joys and loves on this side of the grave have a legitimate right to the large part of man's endeavour. সুতরাং উন্মেষ হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, পরিপুষ্টি হল গদ্য-সাহিত্যের আর মানবিক অনুভূতি হল সাহিত্যের প্রাণ। সৃষ্টি হল শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যের ধারা—উপন্যাস এগিয়ে চললো ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা - স্বামী অভেদানন্দ

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫
২০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

STUDENTS
F. G.
COMMERCE

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। ফাল্গুন ১৩৬৪, বিশ্ববাণীর ২০শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা পঁচিশ নঃ পঃ, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ নঃ পঃ। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। বৎসরের যে কোন মাসে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়া যায়।

২। সাধারণতঃ, প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নামে বিশ্ববাণী পোষ্ট করা হইয়া থাকে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করিতে চাহিলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ চার পাতায় এবং কবিতা এক পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। তবে কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৮। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনদাতা অনুগ্রহপূর্বক বিশ্ববাণী আফিসে আসিয়া অথবা আমাদিগকে পত্র লিখিয়া বা কোন করিয়া উক্ত বিষয়ে সবিস্তার জানিয়া লইবেন।

ম্যানেজার, 'বিশ্ববাণী'
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ	৪৮৩	স্বামী দুর্গানন্দ
২। বৈদিক-সংস্কৃতি	৪৯০	ডক্টর শ্রীমতিলাল রায়
৩। বন্ধন	৪৯৪	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। প্রাচীন রাজগৃহ	৪৯৯	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম. এ., বি. এল.
৫। ভেদাভেদবাদ	৫০২	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। ঝাড়গ্রামের লোকসংগীত	৫০৫	শ্রীসংক্রমান রায়
৭। রামমোহন তীর্থে	৫১১	ডাঃ শ্রীকণ্ঠভূষণ পাল
৮। আনন্দ-বেণু বাজিছে কোথায় (কবিতা)	৫১৩	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	সুধন্বা (কবিতা)	.... ৫১৩	শ্রীবংশীধর মণ্ডল
১০।	ভারতের তীর্থ-দর্শনে	... ৫১৫	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১১।	সংকলন	... ৫২১	
১২।	গ্রন্থ-সমালোচনা	... ৫২৫	
১৩।	সংবাদবার্তা	... ৫২৬	

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :— বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

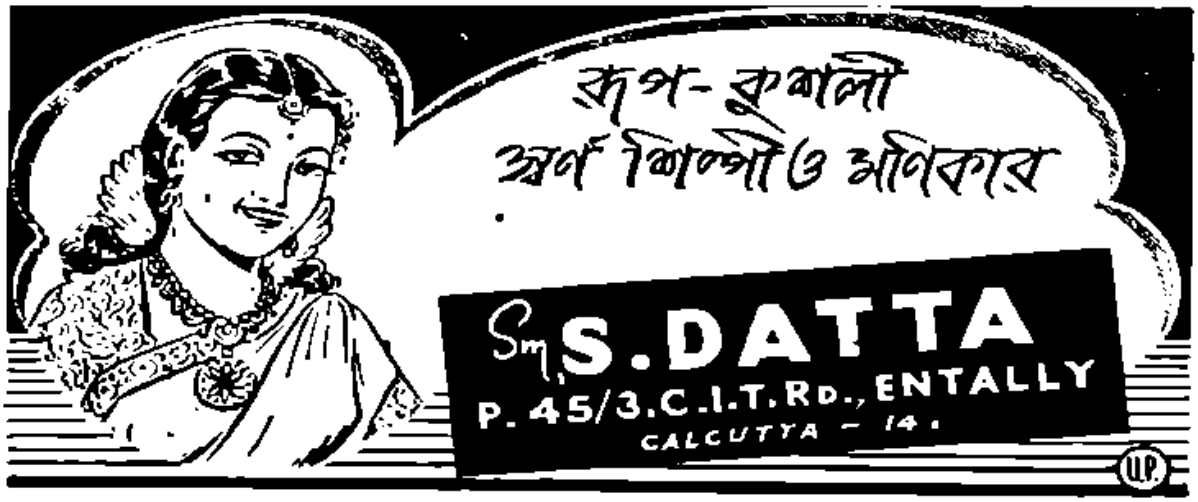

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীশচীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর
—কুষ্ঠ—

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দুষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেতি

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২৩৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল — বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহাই আদি ও অকৃত্রিম

ASCHARYA MALAM CHEMICAL WORKS PRIVATE LD
RADHATALA HOWRAH

বিশেষ অবদান :—"**আশ্চর্য্যমহামৃত**" সালসা
মেহ, প্রমেহ, প্রভৃতি রোগে বিশেষ স্ত্রীরোগে এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ইহা অদ্বিতীয়।

"লিভাজেমস্"
যাবতীয় যকৃৎঘটিত পীড়ায় বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে নিয়মিত সেবনে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

অগস্ত্যকরধ্বজ

যকৃৎস্থল প্লীহাদিস্থল কঠিন পরিণত বিশিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিভাজনের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্ববিধ নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (১ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ., এম্. ডি., বি. এল. আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর. গরদ. মটকা
সিল্ক. টিস্ শাড়ী
জহরলাল
পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ও প্রাঃ বেনারস. অমৃতসহর

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা: সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—স্বামী শ্যামানন্দ (গ্রন্থকার)
১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অবস্থা রোগের প্রভাবে শরীর ও রক্তের পুষ্টি হয়, রক্ত প্রবাহের সাথেই সারা পুষ্টিলাভ করে। তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

ব্যাধিটি সনাতন বলে তার ঔষধও সনাতন। সারিবাদি সালসা রোগের সকল উপসর্গের রক্ত থেকে মূলোচ্ছেদে সক্ষম। সারিবাদি সালসা রোগের বিষাক্ত কোষ সমূহের ধ্বংস সাধন, পুষ্টিকর ও রক্ত বর্ধক, এবং নূতন রক্ত সৃষ্টির সহায়তা করে। ইহা রক্তের দূষিত পদার্থ বিনাশ করে, শরীরের ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ সমূহ নির্গত করে, রক্তের তেজ বৃদ্ধি করে, ত্বক ও মাংসপেশীর সুস্থতা রক্ষা করে।

সারিবাদি সালসা

উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এল-সি-এস (লন্ডন), এফ-সি-এস (আমেরিকা), ডাইরেক্টর অফ দি ধন্বন্তরি ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

কলিকাতা কেন্দ্র—৩১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, বড়বাজার, কলিকাতা-৭

শাখা ঃ ৩৬, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

শাখা ঃ ৩৬নং পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা

সদ্য প্রকাশিত।

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত-সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবন তথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে' সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

অনামধন্য মনীষী ও আচার্য্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

॥ এম. এ. ক্লাশের ॥

শিক্ষার্থীর উপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল রকম গ্রন্থ

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

(ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস)

প্রথম খণ্ড

বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস এই প্রথম প্রকাশিত হোল। ইতিপূর্বে কোন ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হয়নি।

আলোচনা—

১। পূর্বাভাষ—বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্য থেকে সঙ্গীতের আলোচনা ; ২। অবতরণিকায়—বিশ্বের সমস্ত জাতির সঙ্গীতের পরিচয় তুলনামূলক-ভাবে এবং বৈদিক যুগের কাল-নির্ণয় ; ৩। সামবেদভাষ্যভূমিকায় সঙ্গীত ; ৪। সামবিধানব্রাহ্মণে সঙ্গীত ; ৫। আরণ্যক ও উপনিষদে সঙ্গীত ; ৬। কল্পসূত্রে সঙ্গীত ; ৭। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত ; ৮। সামপ্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত ; ১১। তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত ; ১২। পাণিনীয়শিক্ষায় সঙ্গীত ; ১৩। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সঙ্গীত ; ১৪। মাণ্ডুকীশিক্ষায় সঙ্গীত ; ১৫। বর্ণরত্নপ্রদীপিকাশিক্ষায় সঙ্গীত ; ১৬। নারদীয়-শিক্ষায় সঙ্গীত। এ'ছাড়া তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচী সংযোজিত হয়েছে। অনেকগুলি চিত্রসহ, এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, ৪০০ পৃষ্ঠার অধিক, ডিমাই সাইজ, বোর্ড বাঁধাই।

এর সুদৃশ্য ত্রিবর্ণবিশিষ্ট প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু। সুন্দর বাঁধাই মূল্য : ৭'৫০

দ্বিতীয় খণ্ড

গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হোল। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা।

॥ বাঙলা ভাষায় এইরূপ পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

ডিমাই সাইজে ছয়শত পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন অপ্রকাশিত ভাস্কর্য চিত্র সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

রাগ ও রূপ

ভারতীয় সঙ্গীতের যাবতীয় ঔপপত্তিক উপাদানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস—যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিকথা ও বিবরণ—উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীতপদ্ধতি, নৃত্য ও মুদ্রার বিকাশ প্রভৃতি এতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাস ও মূর্তির চাক্ষুষ পরিচয় দিয়াছেন অধ্যাপক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মকামী সাধকদের ধ্যানলোকেরই পবিত্র প্রতিচ্ছবি। হনুমন্মতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, স্বরূপ, স্বরের বিস্তার ও ঔপপত্তিক অংশ এবং রাগ, স্বর, মার্গসঙ্গীত, দেশীসঙ্গীত, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতির ধারাবাহিক আলোচনা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

দুইটী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত, ছাব্বিশখানি রাগের চিত্র ও নবরসের রেখাচিত্র সংযুক্ত। রয়েল সাইজ, অপূর্ব প্রচ্ছদপট সংবলিত।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য : ৭'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

কাশ্মীর ও তিব্বতে

তুষর্ণ কাশ্মীরের মধ্য দিয়া চিররহস্যাবৃত এবং চিরতুষারাবৃত তিব্বতের পথে স্বামিজীর ভ্রমণ-কাহিনী।

হিমিস্ গুম্ফায় গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে যীশুখৃষ্টের অপ্রকাশিত জীবনের ঘটনাবলী। যীশুখৃষ্ট যে সিন্ধুদেশ হয়ে এদেশে পুরী ও কাশীতে গিয়ে বেদ, বেদান্ত অধ্যয়ন করে মন্দির প্রবেশে হরিজনদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এবং তারপর পুনরায় ক্রুশবিদ্ধ হবার পর কবর থেকে উঠে তিব্বতে এসে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তাহা স্বামীজী তিব্বতী-ভাষা হ'তে অনুবাদ ক'রে দেখিয়েছেন এই পুস্তকে। পরিশিষ্টে নিকোলাস নটোভিচের "The Unknown Life of Jesus Christ" এই দুষ্প্রাপ্য বইখানি হ'তেও কতকাংশ উদ্ধৃত আছে। সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত গ্রন্থমালা

হিন্দুধর্ম ২।০, বেদান্ত ২৲, প্রেমযোগ ১৲, যোগ ১।০, সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ১ম (৩য় সং) ২।০, ২য় ভাগ ২৲, উপনিষৎ ১ম ২৲, ২য় ২৸০, নবযুগের মহাপুরুষ ১ম ৫৲, ২য় ৫৲, কিশোর গীতা ১।০ কিশোর চণ্ডী ১৲, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে ব্রহ্মচর্য্য ১৲, মহামায়া ১।০, বিনা চশমায় ক্ষীণ দৃষ্টির প্রতিকার (২য় সং) ১।০, শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদপ্রসঙ্গ ২।০, দেশবিদেশের মহামানব ৩৲, বুদ্ধের কথা ও গল্প ৩৲, স্বামী নির্মলানন্দ (প্রকাশমান) ৪৲, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (৭ম সং) ২৲, শ্রীশ্রীচণ্ডী (৮ম সং) ২৲, স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত ১৲, স্বামিজীর দুই সন্ন্যাসী শিষ্য ১৲, গীতার আলো ১।০, গুরু-প্রসঙ্গ (প্রকাশমান) ২৲, সারদাদেবীর কথা ও গল্প ১৲।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, ২১১এ, গিরিশ ঘোষ রোড, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সকল প্রকার ছাপার কাজের জন্য

হিন্দ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৬এ, গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্তোত্র-রত্নাকর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ছয়টি ও শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে একটি সংস্কৃত স্তোত্র, তাঁহাদের উভয়ের ধ্যানমন্ত্র, প্রণাম প্রভৃতি এবং প্রত্যেকটি স্তোত্রের পদ্যে বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমা ও শ্রীগুরুর দৈনিক ও বিশেষ পূজাপদ্ধতি এবং হোম ইহার সৌন্দর্য ও সম্পদ। পরিশেষে 'মুদ্রাপ্রকরণ' এবং তিনখানি সুদৃশ্য ছবি ও সুন্দর প্রচ্ছদপট। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য: দুই টাকা।

হিন্দুনারী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-সম্পাদিত ও সংযোজিত পরিশিষ্টসহ

বেদ, তন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, সংহিতা, বৌদ্ধসাহিত্য প্রভৃতিতে নারীজাতির স্থান—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের অভিমতের সমাবেশ—হিন্দুনারীর শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারীজাতির অধিকার—নারীজাতির প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচার—হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি—রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর অধিকার—সাহিত্যে ও সমাজে অবদান—নারীজাতির প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা—সতীদাহ বৈদিক কিনা প্রভৃতি বিষয়ে এবং বর্তমান যুগে নারীশিক্ষা কি প্রকার হওয়া উচিত তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় কর্তৃক প্রচ্ছদপট পরিকল্পিত ও অঙ্কিত। সুন্দর বাঁধাই। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য: আড়াই টাকা।

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

যোগশিক্ষা

যোগ কি, হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম প্রণালীটি বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আলোচনা করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকলের উদ্দেশ্য, কেবল কর্মের বা সাধনার উপায়-সমূহই পৃথক বলিয়া অনুভূত হয় মাত্র। যীশুখৃষ্ট যোগী ছিলেন কি না—এই আলোচনাটিতে স্বামীজী দেখাইয়াছেন—যীশুখৃষ্ট ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তের ও যোগশিক্ষার সাধনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে পাতঞ্জলদর্শন, নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র ও বিভিন্ন সংহিতা প্রভৃতি হইতে যোগসম্বন্ধীয় আলোচনা করা হইয়াছে। ষট্‌চক্রের একটি নিখুঁত চিত্রও বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য: দুই টাকা।

মনের বিচিত্র রূপ

সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্য মনেরই খেলা! সেই খেলার আপাতরম্য বিপুল ঐশ্বর্যের মোহে মানুষ হয় বিমূঢ় আর যাঁহার জন্য সেই খেলা অবিশ্রান্ত গতিতে হইতেছে তাঁহাকে যায় তাহারা ভুলিয়া! স্বামী অভেদানন্দ ইহাতে মুক্তি-প্রয়াসী ভগবৎসাধকদের কাছে মনের সকল গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের পারে যাইবার সন্ধান দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য: আড়াই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা-৬

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

ভারতীয় সংস্কৃতি

এই পুস্তকে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, বর্তমান ভারতের ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা, রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপ ও কর্মপ্রচেষ্টা, ভারতের শিক্ষানীতি, তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের ও ভারতের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব, ইংরাজ-শাসনের আমলে ভারতের অবস্থা এবং স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস ইহাতে যুক্তির আলোকে সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, সকল কিছুর খুঁটিনাটির সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত হইতে চান, তাঁহাদের এই বইখানিকে সংগ্রহ করিতে আমরা অনুরোধ করি। তৃতীয়—নূতন সংস্করণ। মূল্য : ছয় টাকা।

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম

এই পুস্তকে স্বামী অভেদানন্দ শিক্ষার যথার্থ রূপ ও রহস্য, সমাজ কি ভাবে চলিলে দেশ, দশ ও জাতির কল্যাণ হইবে এবং 'ধর্ম' বলিতে প্রকৃত কি বুঝায় তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী, সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিরই এই বই পাঠ করা উচিত। মূল্য : আড়াই টাকা।

কর্মবিজ্ঞান

স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম যেমন বন্ধন, তাহার ফলও তেমনি বন্ধন। তাই, কি প্রণালীতে কর্ম করিলে তাহার ফলভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ যথার্থ শান্তি এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে এই রহস্যই বইখানির পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য : দুই টাকা।

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

আত্মজ্ঞান

এই পুস্তকে স্বামিজী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে উপনিষদের সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান কি—প্রাণ ও আত্মা—আত্মার অন্বেষণ—আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়—অমরত্ব ও আত্মা—প্রাণ, প্রজ্ঞা ও আত্মা—জড় ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও বিরোচন—আত্মতত্ত্ব-বিচার—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—আধ্যাত্মিকতা ও সর্বোপরি আত্মানুভূতির স্বরূপ কি?—এই সকল জটিল বিষয় সরল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য : দুই টাকা।

আত্মবিকাশ

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সাধক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিময় অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সাধকের জন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মান্বেষীর জীবনে এই গ্রন্থ চিরসঙ্গীরূপে সহায়ক হইবে ও সূক্ষ্ম সাধন-জগতের জটিলতা দূর করিয়া চির সম্ভাবনা ও আশার আলোক বিতরণ করিবে। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য : এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

STUDENTS COMMON-ROOM

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

(পঞ্চম পর্যায়)

যে জন্মভূমি শৈশবের শিশুশয্যা, বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্র, কৈশোরের রঙ্গালয়, যৌবনের নন্দন-কানন, প্রৌঢ়ের আনন্দনিকেতন, বার্ধক্যের পুণ্যতীর্থ ও অন্তিমের মণিকর্ণিকাসদৃশ সেই পবিত্র স্থান ত্যাগ করিয়া গদাধর সন ১২৫৯ (ইং ১৮৫২-৫৩) সালে মাত্র ১৭ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত এই সর্বপ্রথমে কলিকাতায় যাত্রা করিল। ভুলিতে হইল স্নেহময়ী জননীর বাৎসল্য, মধ্যমাগ্রজের ভ্রাতৃস্নেহ, কনিষ্ঠা ভগিনীর আবদার ও ভালবাসা, আর ভুলিতে হইল পরম আদরের মাতৃহীন শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়কুমারকে। বাল্যক্রীড়ার সহচর ও সহপাঠীদের কথাও মনে হইতেছে না, রাখাল বালক ও বালিকা যাহাদের সহিত মাণিক রাজার আম্রকুঞ্জে খেলাধূলা হইত, যাহাদের লইয়া বৃন্দাবন-লীলা যাত্রাভিনয় হইত এখন আর তাহাদের কাহারো কথা মনে নাই। যে পল্লীবাসী রমণীগণ দিনান্তেও একবার গদাধরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না এবং জাতিধর্ম বিচার না করিয়া গদাধরও যাহাদিগকে আত্মীয়বোধে ভালবাসিত এখন তাহাদের প্রতিও আর আকর্ষণ নাই ; এখন মনের একটানা গতি কলিকাতাভিমুখে। মনের স্বভাবটি এখন পঞ্চম বর্ষীয় বালকের মত। কথামৃতে আছে "মার মন্দিরে যাইব বলিয়া মনে হইয়াছে তো একেবারে মন্দিরেই যাইতে হইবে, শিব মন্দির বা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে যাইতে চাহিলেও পা কিছুতেই সেদিকে যাইবে না"। এমনি ছিল তাহার চিত্তের একাগ্রতা। মাতৃ আজ্ঞা,—কলিকাতায় গিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইবে, জ্যেষ্ঠের কাজকর্মে সহায়তা করিতে হইবে ইহা কি কম আনন্দের কথা। তাহা ছাড়া গঙ্গাস্নান গঙ্গাদর্শন ও কলিকাতা নগরী দেখা যাইবে ইহাও তো কম কথা নয়। তাই বালক-স্বভাব গদাধরকে এখন আর কোন আকর্ষণই বাধা দিতে পারিতেছে না। আমরা অনেকেই সংস্কারের বশে চলিতে বাধ্য হই, কিন্তু বাল্যাবধি

গদাধর কোন সংস্কারের বশীভূত ছিল না। কথামৃতের দৃষ্টান্তগুলি এখানে উল্লেখ করিতেছি, ইহাই তাহার চরিত্রের অবিকল চিত্র।

"ঈশ্বরলাভ হ'লে, পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। বালকের 'আমি' পাকা আমি, বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব কত খেলা। রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতালে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল, মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি কাপড় পরে' বেড়াচ্ছে; খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে, হয়ত কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল, নয়ত বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটিকে বল—বেশ কাপড়খানি কার কাপড় রে? সে বলে—আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে,—না আমি দেব না। তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও তাহলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না, কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল, তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়ল, পুরানো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাতি অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার দাদা, তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয় তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আবার শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোচাবার পর মাকে তাকে পিছন ফিরে বলে—দেখ দেকি আমার ছোঁচান হয়েছে কিনা"?

এই বাণীর মাধ্যমে আমরা গদাধরের বালকভাবাপন্ন স্বভাবের ইঙ্গিত পাইয়া থাকি। আজীবন তাহার এ স্বভাবটিও বজায় ছিল। যেমন পঞ্চম বর্ষীয় বালক। কাহারো প্রতি অবিশ্বাস নাই; আত্মপর জ্ঞান নাই; সরল হৃদয়ের প্রেরণায় কর্মপ্রচেষ্টা; কোন কামনার বশীভূত হইয়া নয়; তাহার ভালবাসার মধ্যে মায়ার আকর্ষণ নাই, অনুরাগের ভিতর মোহ নাই, হর্ষ বা শোক অর্থহীন। আপনার ভাবে আপনি মত্ত। নির্জীব পুতুলটিকেও সে জীবন্ত ভাবিয়া আদর করে। তাহার কাছে সবই চৈতন্যময়। এই অবস্থাটি যে তাহার শুধু বাল্যকালেই ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সেই চিরন্তন ভাবটি আরও পরিস্ফুট হইয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল। তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা পরমহংস পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

অথবা বলা যাইতে পারে, কোনও মহান্ কর্তব্য সাধনে তাহার এই বিদেহ যাত্রার অভিনয়—যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহার বাল্যলীলা সাঙ্গ করিয়া এমনিভাবে

পিতা মাতার স্নেহবন্ধন ও বান্ধব বান্ধবীদের প্রেমের বাঁধন ছিন্ন করিয়া স্বকার্যসাধনে উদ্ধবের সহিত মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতের দমন, নির্যাতিত জীবের পরিত্রাণ ও ধর্মসংস্থাপন। মানবের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে স্বেচ্ছায় শ্রীভগবান এইভাবে মানবদেহেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানুষের মতই তাঁহাদের প্রচেষ্টা ও মানুষের মতই তাঁহাদের আচরণ, তাই সাধারণ লোকে তাঁহাদের চিনিতে সমর্থ হয় না। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অসাধারণ ঐশী শক্তি বিদ্যমান থাকে, কখন কখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, জনসাধারণ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে সকল দিব্য শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, কয়জন তাহা বুঝিয়াছে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে? এমন কি মা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াও অপত্য স্নেহের বশে উহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া উহাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বাল্যকালে গদাধরের ভাবসমাধির কথা ও পণ্ডিতগণের কূটতর্কের মীমাংসা করা, আশ্চর্য ঘটনা হইলেও কে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে যত্ন করিয়াছে? কেবল জ্ঞানিগণই এই সব মহাপুরুষগণের অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদের চিনিতে সমর্থ হন।

আরও এক কথা, গদাধর ছিল আজন্ম জগদম্বার একনিষ্ঠ সন্তান। জগন্মাতার উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাহার মুখের কথাই ইহার প্রমাণ। সাধনকালে জগন্মাতাকে আবদার করিয়া বলিত "মা, আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনীয়র; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। আমি কেহ নই, তুমি কর্তা"। সুতরাং জগদম্বার ইচ্ছাতেই যে গদাধর পরিচালিত হইবে তাহাও আশ্চর্যের কিছু নয় এবং জগদম্বার মহতী ইচ্ছাতেই যে গদাধর তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ পরিচালিত হইতেছে, তাহাও আমরা ঘটনা পরম্পরাক্রমে দেখিতে পাইব। অতএব বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গদাধর এক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আসিল। এই সময় রামকুমারের টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল আহিরীটোলা, নাথের বাগানে।* নিকটেই পতিতপাবনী গঙ্গা। গঙ্গাদর্শন করিয়া গদাধরের আনন্দের সীমা নাই। টোলে অবস্থান করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান হইবে ইহা খুব আনন্দেরই কথা। দেশদেশান্তর হইতে কত লোক কত কষ্ট স্বীকার করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যলাভ করে, আর সেই গঙ্গা এত নিকটে, ইহাপেক্ষা আর আনন্দের কথা কি আছে? জননী, জন্মভূমি ও প্রিয় বস্তুনিচয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত সাময়িক মনোকষ্ট তাহার হইয়াছিল কিনা জানিবার উপায় নাই, হইলেও কলিকাতার তৎকালিক পরিবেশ, নগরীর বিভিন্ন সৌন্দর্য ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাহার সে কষ্ট স্থায়ী হয় নাই বলিয়া

* ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" পুস্তকে আছে—গদাধরকে এই চতুষ্পাঠীতে আনা হইয়াছিল। কিন্তু "লীলা-প্রসঙ্গে" আছে কামারপুকুরে ৺বিশ্বম্ভর বিদ্যের বাটীর সন্নিকটে স্থাপিত টোলেই গদাধর প্রথমে আসিয়াছিল।

মনে হয়। কারণ অগ্রজের কাছে কয়েকদিন থাকিতে থাকিতে প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে যত্নবান হইল এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া সানন্দে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিল। এইভাবে পড়াশুনা ও কাজকর্ম লইয়া কিছুদিন অতিবাহিত হইলেও চতুষ্পাঠীর পাঠ্য তাহার আদৌ মনঃপুত হইতেছিল না। টোলের পাঠ্য ছিল ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ ইত্যাদি যাহা গদাধরের বিবেকের একান্ত বিরোধী। কারণ ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদ, নাম-যশ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে আবাল্য তাহার মন একান্ত উদাসীন।° ধর্মহীন ও শুধু অর্থকরী বিদ্যা তাহার কাছে নিতান্ত হেয় বলিয়া বোধ হইত। যে বিদ্যায় ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, সত্যলাভ হয়, যাহাতে ভববন্ধন মুক্ত হওয়া যায় ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেই পরাবিদ্যা লাভের জন্যই তাহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; তাই তাহার অন্য কথা আর কিছু ভাল লাগিতেছে না। কে যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিতেছেন: "সংসারের অনিত্য প্রলোভনে প্রলোভিত হইও না; ভোগাসক্তিই বন্ধন, তথাকথিত শাস্ত্রাধ্যয়নে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া পরম সত্য পরমেশ্বরের চিন্তায় মনোনিবেশ কর"। এই দৈব প্রেরণাই নিরন্তর তাহাকে উদ্বোধিত ও ব্যাকুলিত করিয়াছিল।

এদিকে রামকুমারের অভিপ্রায় যে, গদাধর এই সকল প্রচলিত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অর্থোপার্জনপূর্বক সংসারের উন্নতিবিধান ও সচ্ছলতা-সম্পাদনে সমর্থ হউক; কিন্তু গদাধর ত সংসারের চিন্তায় মন দেয় না, লেখাপড়াতেও অমনোযোগী। প্রবল ধর্মানুরাগবশতঃ অধিকাংশ সময় আপনভাবে তন্ময় হইয়া থাকে, ভক্তিমূলক সঙ্গীতাদি গাহিতে গাহিতে অশ্রু বর্ষণ করে। এই সকল দেখিয়া তিনি ক্রমে হতাশ হইতে লাগিলেন। তখন রামকুমারের টোল কামারপুকুরে ৺শিবচন্দর মিত্রের বাটীর সন্নিকটে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে; কয়েকটি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে তিনি দেবসেবার অধিকারও পাইয়াছেন; কিন্তু নিত্যপূজা সম্পন্ন করিয়া ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতে হয়, এই সকল কারণে গৃহস্থের বাটীতে পূজাদি করার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সকলেই অসুবিধা ভোগ করে। এজন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া রামকুমার এক্ষণে গদাধরকেই ঐ গৃহস্থবাড়ীর পূজার ভার অর্পণ করিলেন। গদাধরও তাহার মনোমত কর্ম পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত পূজা স্তোত্র পাঠাদি সমাপন পূর্বক অগ্রজের কাজে সাহায্য করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় গৃহস্থ বাটীতে গদাধরের সুখ্যাতি লাভ হইয়াছে, কামারপুকুরের মিত্রদের বাটীর এবং ঝাঁটপুর নিবাসী রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বাটীর পরিজনদের সহিতও বেশ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। সকলেই গদাধরকে ভালবাসে, তাহার মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হয়; এমন কি সময়ে সময়ে তাহার গান শুনিবার জন্য সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে গাহিবার জন্য অনুরোধ করে। ফলে এখানেও ক্রমে কামারপুকুরের ন্যায় তাহার আদর হইতে থাকিল। তাহার দেবভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত পূজাপাঠ দেখিয়াও অনেকে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও গদাধর কিন্তু

দেশের তুলনায় এখানকার গৃহস্থ বাড়ীতে যাতায়াত করিতে করিতে তাহার স্বদেশের সাধারণ লোকের গ্রাম্য সরলতা ও ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া এই সকল সংসারী লোকের বিষয়ানুরাগের প্রাবল্য ও ঈশ্বরবিমুখতা দেখিয়া অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ করিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতার যজমান-গৃহে পূজা করিতে যাইয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ধর্মহীনতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন: "ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে, পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘষা এই সব হচ্ছে, ঈশ্বরের কথা একটা নাই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না', কাল ঐ তরকারীটা বেশ হয়েছিল, এ ছেলেটি আমার খুড়তুতো ভাই, এইসব আজেবাজে কথা। দেখ দেখি—ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এইসব কথাবার্তা কি ভাল"?

ইতঃপূর্বে গদাধর দেশের পল্লীগ্রামে লোকের বাড়ীতে কোন যাগ-যজ্ঞাদি ও দুর্গোৎসবের মত কোন বিশেষ পূজার অনুষ্ঠানে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে তথাকথিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালাপ শুনিয়াছিল, উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও দেখিয়াছিল এবং কর্মসমাপ্তির পর দক্ষিণার টাকা ও যাজকগণের প্রাপ্য দ্রব্যাদির অংশ বণ্টন লইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহও লক্ষ্য করিয়াছিল। সম্মানী অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী এই সকল বিদ্বানগণের, যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া বড়াই করেন তাঁহাদের এই লোচনীয় হীন স্বার্থ-পরতার পরিচয় পাইয়া গভীর মর্মবেদনায় ব্যথিতও হইয়াছিল। এইজন্যই মনে হয় অর্থকরী বিদ্যার্জনে প্রথম হইতেই গদাধরের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল এবং এই কারণেই বোধহয় রামকুমার যখন তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে বলিয়াছিলেন, উদারমনা গদাধর তখনই সাহসপূর্বক সরল প্রাণে উত্তর করিয়াছিল: "চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাই না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাই যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়"। তথাকথিত পণ্ডিতগণের অবস্থা দেখিয়া পরবর্তীকালে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন—"চিল শকুনী খুব উঁচু আকাশে উঠে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে পচা শবদেহের উপর"। অর্থাৎ পূর্বকথিত পণ্ডিতগণ মুখে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে প্রাপ্য বস্তু চাল কলার দিকে। তিনি আরও বলিতেন: "যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়। ● ● ● হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। যে বিদ্যালাভ করলে তাঁকে জানা যায় সে-ই বিদ্যা, আর সব মিছে। শুধু নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে? ভবনদী পার হ'তে জানাই দরকার। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই তাকে খড় কুটো বলে মনে হয়। পণ্ডিতের যদি বিবেক বৈরাগ্য থাকে তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে তাদের কথা নিয়ে কি হবে? ● ● ● ওদের চিন্তা দু'পয়সা পাবার জন্য। আমি দেখেছি—ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডী কি আর কিছু পাঠ করছে; তা দেখেছি অর্ধেক পাতা শুধু উল্টে

যাবে। • • • বই পড়ে কতকগুলো তর্কযুক্তি করতে পারলে কিছু হবেনা। • • • বই শাস্ত্র —এসব কেবল তাঁর কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর ও-সবের দরকার হয় না। তখন নিজে কাজ করতে হয়। বসে বসে কেবল শাস্ত্রের কথা নিয়ে বিচার করলে কি হবে? ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হবে। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার বেড়ে যায় মাত্র। গ্রন্থ নয় গ্রন্থি —গাঁট"।

যাহা হউক, এ দিকে বালক গদাধর অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া যে-সব উক্তি করিল, রামকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন গদাধর উহা ক্রোধভরে না বুঝিয়া একটা কথার কথা মাত্র বলিয়াছে। সত্য সত্যই গদাধর এত অল্প বয়সে ভালমন্দ বিচার করিয়া-সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া যে অর্থলালসা তুচ্ছ বোধ করিতেছে ইহা মনে হয় না এবং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় ও নির্ধারিত করিতে পারিয়াছে ইহাও সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কনিষ্ঠকে স্নেহ ভালবাসার তুষ্ট করিয়া মিষ্টবাক্যে নানা উপায়ে তাহার মত পরিবর্তনের চেষ্টায় থাকিলেন। গদাধরও অন্য উপায়ে নিজের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিল। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, রামকুমারের চেষ্টা ফলদায়ক হইল না, বরং গদাধরের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। ওদিকে সংসারের অভাবও দিন দিন বাড়িয়া চলিতে দেখিয়া তিনি আরও দুশ্চিন্তায় পতিত হইলেন, কিন্তু উপায় কি? তিনি ত অধ্যাপনা ও যাজ্যক্রিয়া ছাড়া জীবিকা-অর্জনের অন্য কোনও পন্থা শিখেন নাই। একদিকে গদাধরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা আর অন্য-দিকে সংসারের অভাব অনটনের চিন্তা, এই উভয় চিন্তায় তিনি "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" হইয়া পড়িলেন। যখন ভাবিতেন যে কলিকাতার চতুষ্পাঠী উঠাইয়া দিবেন, তখন তাহার পরিবর্তে কি অবলম্বন করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইতেন না। অগত্যা তখন গৃহদেবতা ৺রঘুবীরকে স্মরণ করিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিতেন। নির্লোভ রামকুমার এইভাবে অভাবের তাড়নার মধ্যে মধ্যে বিচলিত হইলেও অসদুপায়ে অর্থার্জনের চিন্তা তাঁহার মনে কোনদিনই উদিত হয় নাই। পরিশ্রম করিয়া যাহা পান তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন। ভগবানের উপর নির্ভরশীল ধর্মপ্রাণ রামকুমারকে অতঃপর দীর্ঘকাল আর অপেক্ষা করিতে হয় নাই; অবিলম্বেই দৈবকৃপায় তাঁহার উপযোগী একটী সৎপন্থা অভাবনীয় ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল।

কলিকাতা জানবাজারের প্রসিদ্ধ মাড়বংশীয় রাজচন্দ্র দাসের পত্নী, স্বনামধন্যা রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে প্রায় ৬০ বিঘা জমির উপরে এক, মনোরম উদ্যান ও তন্মধ্যে সুবিশাল কালীমন্দির ও সেই সঙ্গে বিষ্ণু মন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির এবং কালীমন্দিরের সংলগ্ন বিরাট নাটমন্দির, প্রশস্ত টালি বিছান পাকা প্রাঙ্গণ ও পশ্চিমে গঙ্গার সুবিস্তৃত বাঁধা ঘাট, মন্দিরের পূর্বে ভাঁড়ার ঘর রান্নাঘর,

ভোগঘর ও অতিথিশালা ; দক্ষিণে দপ্তরখানা, উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর এবং পূজারী কর্মচারীদের ও প্রহরীদের থাকার ঘর ইত্যাদিসহ এক মনোরম দেবালয় নির্মাণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর নাম "ভবতারিণী"। মার মূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত এবং শিব মূর্তি—শ্বেত প্রস্তরনির্মিত। নবরত্ন-মন্দির-মধ্যে রৌপ্যনির্মিত সহস্রদল পদ্ম ও তদুপরি মহাদেবের এবং মহাদেবের উপর ৺কালী-প্রতিমা দক্ষিণাস্যা হইয়া দণ্ডায়মানা। মন্দিরের মেজে শ্বেত-কৃষ্ণ মর্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত। বিষ্ণুমন্দির বা রাধাকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সিংহাসনের উপর পশ্চিম মুখে বিরাজিত। উভয় মন্দিরে অন্ন ভোগের ব্যবস্থা এবং সদাব্রতে পূজারী ও মন্দিরের কর্মচারী ব্যতীত, অতিথি, কাঙ্গালী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই ঠাকুরবাড়ী প্রস্তুত করিতে তখনকার দিনে নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল এবং এই দেবালয়ে দেবসেবার ব্যয় নির্বাহার্থে ২,২৬০০০ টাকা মূল্যে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলায় শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া রাণী দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

পুণ্যবতী দানশীলা রাণীর উদ্দেশ্য ছিল, উল্লিখিত মন্দিরে দেবদেবীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও ভক্তিমান ব্রাহ্মণদ্বারা পূজা ভোগের ব্যবস্থা করিবেন এবং ভোগের অন্ন-প্রসাদাদি সাধুসন্ত, অতিথি অভ্যাগত ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতিতে তিনি মাহিষ্য বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর কোন জাতি তাৎকালিক সমাজপ্রথা লঙ্ঘন করিয়া ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না এই প্রকার আপত্তিজনক কথা প্রচারিত হইল। রাণীর সমুদয় আশা এক্ষণে পণ্ড হইবার উপক্রম। তিনি খুব বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিয়া পণ্ডিতগণের অনুমোদন প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই রাণীর অভিপ্রায় সমর্থন করিলেন না এবং কোন বিকল্প বিধি অনুসারে বিধান দিয়াও তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। সুতরাং রাণী রাসমণির মহতী আশা এখন নিরাশায় পর্যবসিত হইবার উপক্রম হইল।

শ্রীযুক্ত রামকুমারের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন : "রাণী রাসমণি যখন ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষম চিন্তায় পতিতা হইয়াছেন সেইসময় সংবাদ আসিল ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠী হইতে ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বিধান দিয়াছেন যে, "প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না"। এইরূপ ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর আশা আবার মুকুলিতা হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সংকল্প করিলেন। এইরূপ সংকটকালে শ্রীযুক্ত রামকুমারের এই উদার ব্যবস্থা যে রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাঁহার প্রতি যে তিনি শ্রদ্ধান্বিতা হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈদিক-সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

(প্রথম পর্যায়)

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ। বেদ আমাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বেদের উপর নির্ভরশীল। মনু বলেছেন : বেদ অখিল ধর্মের মূল। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, ইতিহাসের পটভূমিকায় নব নব রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিবর্তনের মাঝে ভারতবর্ষ ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বেদকে অক্ষয় শাস্ত্র হিসাবে আঁকড়ে ধরে আছে।

আধুনিক যাঁরা, বৈজ্ঞানিক মনোভাবে যাঁরা পুষ্ট—তাঁরা তর্ক করেন—বেদ অতীতের সংকলন—আজ আর তার প্রয়োজন নেই। গঙ্গা যেমন হরিদ্বারে ফিরবে না ও ফিরতে পারে না—ভারতবর্ষ তেমনিই বেদের যুগে ফিরতে পারে না ও ফিরবে না। আমাদের উচিত পশ্চিমের ক্রমবর্ধমান নবনবোন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুসরণ—বিজ্ঞানই এনে দেবে আমাদের বাঞ্ছিত অভ্যুদয়।

এ কথা ঠিক নয়—বিজ্ঞানের অনুশীলন সর্বথা কর্তব্য—কিন্তু সেই মনোবৃত্তির সহিত বেদ অবশ্য পঠিতব্য—বেদ দিবে অন্তরের পরম জ্যোতিঃ—আত্মার অনির্বাণ আলোক—জীবন পথে চলার পাথেয়। বিজ্ঞানের সহিত তার বিরোধ নেই—কারণ একান্তভাবে অগ্রগতির গানই বৈদিক-সভ্যতার বিশেষত্ব। কাজেই বেদ আমাদিগকে অত্যাধুনিক হতে আদৌ বারণ করে না—বেদ-পুরুষ আমাদিগকে উগ্র আগ্রহে অগ্রসর হতে বলেন—নব নব ভাবে পরিপুষ্ট হবে, নব নব পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই জীবনকে পূর্ণতায় আস্বাদন করতে বলেন।

বৈদিক-সংস্কৃতি বৈরাগ্যসাধনের মন্ত্র পড়ায় না—অতন্দ্র হয়ে কর্ম করতে বলে—শুধু চলতে বলে। ঘরের অচলায়তনে বদ্ধ থাকা বৈদিক কল্পনা নয়:

সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।

পৃথিবী আমাদের বাড়বার বাঁচবার জন্য যেন যেন বিস্তৃত পরিসর—যে পৃথিবী আমাদের অতীতের ধাত্রী—আমাদের ভবিষ্যতের জননী—সেই পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা করি—দীর্ঘায়ত লোক—অবাধ পরিসর—অমিত ব্যাপ্তি—অপরিমিত বিস্তৃতি।

আমাদের পিতামহেরা ছিলেন জীবনবাদী। পৃথিবী পাপময়, তাকে ত্যাগ করে বৈরাগ্যের অভয়লোকে যাত্রার স্বপ্ন তাঁহাদের ছিল না। পৃথিবীকে তাঁরা সম্ভোগ করতে চাইতেন। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ কর।

বশিষ্ঠ ঋষি প্রার্থনা করেছিলেন:

উচ্চর্ক্ দেবহিতং তন্মুচ্চরৎ।
পশ্যেমশরদঃশতং জীবেম শরদঃশতম্।

আমরা যেন একশত শরৎ দেখি অরুণোদয়—জ্যোতির্ময় সবিতার উৎসরণ, দেবহিতে ব্যবহিত জাগরণ। আমরা যেন একশত শরৎ বাঁচি—পরিপূর্ণ প্রাণ-শক্তিতে দীপ্ত জীবন যেন পাই আমরা।

শতায়ু মানুষ পৃথিবীতে দীন, হীন ও ক্লীব হয়ে জীবন যাপন করবে না।

তার চাই সমৃদ্ধি—তার চাই বীর্য ও বিজয়। তাইত গৃৎসমদ ইন্দ্রের স্তবে বলছেন:

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
বিশ্বিং ধক্ষস্ব সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়িণামরিষ্টিং তনূনাম্
সাধ্বানং বাচঃ সুষ্ঠিমদ্ধমহতাম্।

হে পরমেশ! যা শ্রেষ্ঠ সম্পৎ, যা লোকোত্তর ধন, সেই সর্বোত্তম দ্রবিণ আমাদিগকে দাও, দাও কর্মনৈপুণ্য—সুদক্ষ চিত্ত—দাও অপরাজেয় সৌভাগ্য—কল্যাণপ্রসূ শুভাদৃষ্ট। আমাদের পার্থিব ও অপার্থিব যা কিছু ঐশ্বর্য—দিন দিন হোক তার পুষ্টি—হোক নিত্যবৃদ্ধি—আসুক দেহে লাবণ্যসলাম স্বাস্থ্য—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আসুক ব্যাধিহীন দৃঢ়তা, বাক্য হোক শোভন ও সুন্দর—আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হোক সর্বসুখময়—প্রত্যহ হোক আনন্দপরিবেশ দীপ্ত সুদিন।

এই জীবনবাদী বলিষ্ঠ দ্রষ্টা পিতামহেরা জানতেন—চলাই জীবন। তাইত তাদের মন্ত্র: চরৈবেতি, চরৈবেতি। এই চলবার আদর্শ আকাশের সূর্য—গতি যার অব্যাহত। অতন্দ্র যাত্রী দেব দিবাকরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে—শুধু চলো, শুধু চলো।

জীবন-সংগ্রামে অলসের স্থান নেই—লক্ষ্মী ও শ্রী তাঁর বরমাল্য দেন শ্রান্ত কর্মীর গলদেশে—ইন্দ্রদেব পথিকের বন্ধু—অতএব চরৈবেতি, চরৈবেতি। কিন্তু এই অগ্রগতি য়ুরোপীয় Progress

নয়—উদ্দেশ্যহীন অবিরাম যাত্রা নয়। ঋষিরা জানতেন যে, সত্য ও ঋত, দীক্ষা ও তপস্যা, ব্রহ্ম ও যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করে। তাই জীবনের প্রসার সত্যের উপলব্ধিতে, ঋতের অনুভূতিতে, ব্রতধারীর দীক্ষায়, উগ্র তপস্যায়, বেদাধ্যয়নে এবং যজ্ঞকর্মে।

ঋষিরা মানুষকে শ্রান্তিহীন কর্মে ব্রতী হতে বলেছেন—সর্বক্ষণ অবিরাম কাজ করবার উপদেশ দিয়েছেন—দেবতার মত অতন্দ্র হতে বলেছেন—কিন্তু এই কর্ম স্বার্থপরের প্রচেষ্টা নয়, আত্মাধিকারের বিস্তারের দুরাশা নয়, দুর্বল লোভের দুরতিক্রম্য বেগ নয়। ইহা ভাগবত জীবনের দিব্য আলোক—নিবেদিত শরণাগতির সৌরভে সুরভি, যজ্ঞ-ভাবনার মাধুর্যে মধুর। বৈদিক-সংস্কৃতি তাই কেবল গতি নয়—ইহা মানব জীবনে পরমের আবির্ভাবের পন্থা—মানুষকে দেব ও দিব্যজীবনের জ্যোতির্লোকে নিবার সোপান।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on the Gita নামক অমূল্য পুস্তকে লিখেছেন :

"The Asurie Prakriti is the rajasic at its height ; it leads to the slavery of the soul in Nature, to desire, wrath and greed, the three powers of the rajasic ego, and these are the threefold doors of Hell, the Hell into which the natural being falls when it indulges the impurity and evil and error of its lower or perverted instincts. These three are again the doors of a great darkness, they fold back into tamas, the characteristic power of the original ignorance ; for the unbridled force of the rajasic nature, when exhausted, falls back into the weakness, collapse, darkness, incapacity of the worst tamasic soul-status. To escape from this downfall one must get rid of these three evil forces and turn to the light of the Sattwic quality, live by the right, in the true relations, according to the Truth and the Law ; then one follows one's own higher good and arrives at the highest soul-status. To follow the law of desire is not the true rule of our nature ; there is a higher and juster standard of its works. But where is it embodied or how is it to be found ? In the first place, the human race has always been seeking for this just and high law and whatever it has discovered is embodied in its Shastra, its rule of science and knowledge, rule of ethics, rule of religion, rule of best social living, rule of one's right relations with man and God and Nature. Shastra does not mean a mass of customs, some good, some bad, unintelligently followed by the customary routine mind of the tamasic man. Shastra is the knowledge and teaching laid down by intuition, experience and wisdom, the science and art and ethic of life, the best standards available to the race. The half-awakened man who leaves

the observance of its rule to follow the guidance of his instincts and desires, can get pleasure but not happiness, for the inner happiness can come only by right living. He cannot move to perfection, cannot acquire the highest spiritual status. The law of instinct and desire seems to come first in the animal world, but the manhood of man grows by the pursuit of truth and religion and knowledge and a right life. The Shastra, the recognised Right that he has set up to govern his lower members by his reason and intelligence will, must therefore first be observed and made the authority for conduct and works and for what should or should not be done, till the instinctive desire nature is schooled and abated and put down by the habit of self-control and man is ready first for a freer intelligent self- guidance and then for the highest supreme law and supreme liberty of the spiritual nature."

নন্দলাল
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রথম পর্যায়)

বর্তমান লেখাটি হচ্ছে, পরম পূজনীয় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সহিত আমার যে-সব আলোচনা। এই অতি সহজ খোলামেলা আলাপের ভেতর তিনি যে কি অপূর্ব সব কথা ব'লেছেন তাই ঠিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেমনটি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। যদি কোনরূপ লেখার ভুলভ্রান্তির দরুণ বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে তার জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী, আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা বলে হয়তো খুব অন্যায় হবে না।

তখন সময়টা ১৯৫০ সালের মে মাস, প্রচণ্ড গরম, কলকাতা থেকে পরম পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের চিঠি নিয়ে এলাম শান্তিনিকেতনে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সাথে দেখা করতে। ঠিক দুপুর বেলা, রাস্তা একেবারে লোকজন শূন্য, কেবল গরম হাওয়ার সাথে উড়ছে লাল ধুলো, তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে শুনলুম তিনি বিশ্রাম করছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ব'সে আছি, এমন সময় অতি সাধারণভাবে হাতে একটি লাঠি নিয়ে আমার কাছে এসে বল্লেন—ভিতরে এসে ব'স। তাঁর সাথে দেখা হওয়ার যে কি অনুভূতি তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আর এই প্রথম দেখলাম যে বিরাট এত সহজ হতে পারে, প্রণাম ক'রে মহারাজের চিঠি দিলাম। তিনি তা পড়ে বল্লেন : খুব ভালো কথা, 'ছবি আঁকা শিখবে'। মহারাজের কাছ থেকে এসেছ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত তোমরা…। নিজের আঁকা কতকগুলো ছবি দেখালাম। খুব খুশী হ'য়ে বল্লেন. বেশ হ'য়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা। তোমার মা, বাবা তোমার কাছ থেকে কিছু আশা করেন কি? আমি বল্লাম—না, তাঁরা কিছুই আশা করেন না। তাঁরা চান আমি মানুষ হই। তারপর বল্লেন, জানতো এ রাস্তা বড় কঠিন। মা, বাবা

যদি অর্থ চান তা হলে এস না, এ বিদ্যা বড় কষ্টের। প্রচুর সাধনা করতে হবে, তাড়াতাড়ি ফললাভ হবে না। খুব ভালো ক'রে চিন্তা ক'রো এ রাস্তায় আসার আগে। আমিও নাছোড়বান্দা. কোন মতেই ছাড়বো না তাঁকে, বল্লাম আপনার কাছে শিখবো। বল্লেন, আমি তো আর কলাভবনে নেই—তবে আমার কাছে এসে সর্বদাই শিখতে পার, যখন তোমার ইচ্ছা হয়। মঠের মহারাজদের কুশল সংবাদ দিয়ে, সেদিনের মতো তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। তারপর মহারাজের ও আমার মায়ের আকুল প্রচেষ্টায় আমি শান্তিনিকেতনে (কলাভবন) ভর্তি হলুম।

মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাইয়ের (শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছাত্রী সবাইয়ের কাছেই মাষ্টার মশাই। তাঁর কাছে শুনেছি, প্রথম যখন তিনি ক'লকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন, তখন তাঁর সাথে যে কয়েকজন ছাত্র আসেন এবং তাঁরা তাঁকে মাষ্টার মশাই ব'লতেন। তাই কিছুদিনের ভেতর তিনি সবাইয়ের মাষ্টার মশাই হলেন) কাছে যাই—সাহস হয় না প্রথম প্রথম কোন কাজ (ছবি) দেখাতে। রোজই জিজ্ঞাসা করেন, কি করেছ আজ। উত্তর দিতে পারি না, চুপ করে থাকি, তারপর নিজেই খাতা পেন্সিল নিয়ে দেখাতে থাকেন কিভাবে স্কেচ্ করবে, কিভাবে বস্তুর আকার ধরবে (কর্ষ) ইত্যাদি। এ রকম দু'চারদিন আনা গোনার ফলে ভয় গেল কেটে—স্কেচ্ খাতা নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে।

সেদিন ১৪ই জুলাই ১৯৫৩ সাল। আমায় সস্নেহে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে স্কেচ্ করতে হয়। ছবি সম্বন্ধে নানা কথা বল্লেন। বল্লেন, দেশের জিনিষ (শিল্প) ভালো ক'রে দেখবে, বুঝবে, কোথায় কি আছে জানবে। দেশের মাটির বুকে কি আছে তাকে আগে জানবে, আমাদের দেশ শিল্পের আকর। এ রাস্তায় থাকতে থাকতেই তা বুঝতে পারবে। সেদিন একটি কার্ড দিয়ে বল্লেন আবার আসতে। তারপর তাঁর সাথে শিল্প সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করতে সাহস করি নি।

ঠিক দুর্গাপূজার আগে গেলুম তাঁর কাছে, চৈতন্যের ছবি নিয়ে। ছবি দেখে প্রশ্ন করলেন চৈতন্য সম্বন্ধে কোন কিছু বই-টই পড়েছ কি? বল্লুম, না। উত্তরে বল্লেন, দেখ যে কোন জীবন-চরিত আঁকতে গেলে অর্থাৎ যাঁর জীবনী তুমি আঁকতে যাচ্ছ, তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভালো ক'রে জানতে হবে। কারণ তাতে তুমি ইচ্ছামত কিছু ছুড়ে দিতে পারবে না। যেমন ধর, মহাপ্রভুর জন্মস্থানটির পাশে একটি নিমগাছ ছিল, তুমি তা না দিয়ে বটগাছ দিলে, তাতো হবে না। তোমাকে নিমগাছের জায়গায় নিমগাছই দিতে হবে। আর যদি নিমগাছের জায়গায় বটগাছ দাও তাহলে তা তোমার কাহিনীর সাথে মিলবে না, আর ছবিও ঠিক হবে না। তাই জীবনীতে ঠিক যা দেওয়া আছে তার বেশী তুমি দিতে পারবে না, তবে প্রকাশ ভঙ্গীর তফাত হ'তে পারে। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ সম্প্রতি তাঁর লেখা একটি চিঠির কথা মনে পড়লো। আমায় লিখেছিলেন, কারণ আমি তখন ফুলিয়ায় (নদীয়া) মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে

বড় ছবি আঁকছিলাম। আর প্রশ্ন ক'রেছিলাম কি ক'রে ছবি সাজাব, তারই উত্তরে তাঁর এই চিঠি পাই।

রামজী,

তোমার চিঠি পেলাম, তোমার পোঃ ছবি দেখে মনে হচ্ছে ওখানকার দৃশ্য বীরভূমেরই মত। এখানে একটানা হাওয়া বড় বিরক্তিকর।

চৈতন্যের যে ছবি করবে তাতে ওখানকার গ্রামের বাড়ী, গ্রামের লোক, বৌ, ঝি সব ছবি দেবে, যা করবে এখন তার সব বিষয়বস্তু গ্রামেই দেখতে পাবে, বাড়ীর ভেতর উঠান, ঘর দাওয়া যা বর্ণনায় আছে সবই আছে। শ্রীচৈতন্যের বিষয় সব বই পড়বে, আন্দাজে না করাই ভালো, চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি থাকলে ছবিতে রস আসবে।

এখানকার সব ভালো, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ লইবে। ইতি

আঃ নন্দলাল বসু

১লা বৈশাখ ১৩৬৫, শান্তিনিকেতন।

এই সব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার ছবি সংশোধন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের ধীরেনদা (শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ) তাঁর কাছে এলেন। মাষ্টার মশাই তখন আমার ছবির উপর পাতলা কাগজ (ট্রেসিং পেপার) ফেলে তার উপর সংশোধন করে দিচ্ছিলেন। কাজ শেষ করে বল্লেন দেখ। ধীরেন, তুমি এই রকম ভাবে ছবি সংশোধন করার পদ্ধতি শেখানর চেষ্টা করবে। এতে অনেক বেশী উপকার হয়। কারণ, যদি ধর ছাত্রের আঁকা হাত তুমি সংশোধন করার জন্যে রবার দিয়ে মুছে দিলে, তারপর তুমি তার ভুলটি ঠিক করে দিলে। সে সংশোধন ছাত্রের কোন কাজে এল না কেন জান! তুমি যে হাত মুছে (ছাত্রের হাত) নিজে হাতটি ক'রে দিলে (রবার মুছে) তাতে ছাত্রের হাতটি না থাকায় তোমার হাতের সাথে তার হাতের পার্থক্য কোথায় বুঝতে পারলো না, আর তার শেখাও হ'লো না, তাই তুমি যদি তার আঁকা হাতটির উপর একটি পাতলা কাগজ রেখে এঁকে দাও তাতে তোমার ওই উপরের সংশোধিত আঁকা দিয়ে, সে তার ভুলটি ঠিক ক'রে দিতে পারবে। এতে তার ভুলেরও সংশোধন হ'লো শেখাও হ'লো। তারপর একজন ছাত্র এলেন, প্রণাম করা মাত্রই মাষ্টার মশাই তাঁকে সব ছবির কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আর তারই ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন পাঠশালায় (শান্তিনিকেতনে) যে স্কেচ্‌গুলি করা আছে সেগুলি দেখেছ? ছাত্রটী অস্বীকার করায় বল্লেন যে, তোমরা শিল্পী হ'তে চলেছ অথচ তাকিয়ে দেখলে না তোমার সাধনা ক্ষেত্রের চারপাশে কি আছে। শিল্পী যেখানেই যাবে সে জায়গাকে সম্পূর্ণরূপে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে। মনের ভেতর সে জায়গার ছবি ঢুকে গেলে তবে তো হাত দিয়ে ছবি বেরোবে। আমার সময় কোন ছাত্র কোথাও থেকে এলে তাকে সেখানকার দেখবার জিনিষগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করতাম। যেমন একটি ছাত্র শালবীথির পাশ দিয়ে

আসছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো আচ্ছা! শালবীথির বা-পাশে কিছু আছে নাকি? সে উত্তর দিতে হয়তো পারলো না, তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শিল্পীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোন বস্তু এড়িয়ে যেতে পারবে না। আসল কথা কি জান—শিল্পীর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকবে, শুধু ঘরে ব'সে ছবি আঁকলেই শিল্পী হওয়া যায় না। শিল্পী-হ'তে গেলে ঘর ছেড়ে বাহিরকে (প্রকৃতিকে) বেশী ভালোবাসতে হবে। পরে ছাত্রটিকে বল্লেন, দেখ! যে জায়গাটিতেই যাবে সে জায়গাটি নিজের করে নেবে, এই হচ্ছে সব চেয়ে গোড়ার কথা। তারপর নানারকম আলোচনার পর আমরা মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এরপর পূজার ছুটি কাটিয়ে এসে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গেছি একটি আঁকা ছবি নিয়ে। ছবিটি ঠিক করতে করতে বল্লেন দেখ তুমি যে ধানের গোছাটি দিয়েছ তা স্পষ্ট করনি; তা হবে না, ছবির ভেতর ধোঁয়াটে ভাব হ'লে চলবে না, বিশেষ করে তুমি যে ধরণের ছবি করেছ। যে ধান দিয়েছো তা স্পষ্ট ক'রে রেখা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। তোমার তুলির রেখার প্রতি আরও জোর দিতে হবে। রাত্রে রঙের কাজ করবে না, কারণ রাত্রে রং ঠিক বোঝা যায় না, আমি অনেক সময় রাত্রে রঙের কাজ ক'রেছি, কিন্তু দিনে রং ঠিক ক'রে রেখেছি। অবশ্য তাতেও মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। তাই রাত্রে তুলির রেখা টানা অভ্যাস করতে পার। তাতে রেখারও জোর আসবে আর রেখা টানার জড়তাও কেটে যাবে। তাছাড়া পেন্সিল ড্রইংও করতে পার। রাত্রে পারতপক্ষে রঙের কাজ করবে না, তাতে চোখ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এরপর মাষ্টার মশাইয়ের কাছে অনেক দিন যাইনি। ৮ই ফাল্গুন বিকাল বেলা মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গেছি, একটি কার্ড দিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে ব'সলাম। কার্ডটিতে কালি কলমে করা বিহার প্রদেশের একটি দৃশ্য ছিল। তাই দেখে তিনি কালি কলমের কাজ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, দেখ! প্রথম প্রথম শিল্পী ড্রয়ারের বই থেকে কালি কলমের কাজ নকল করে হাত ঠিক করবে, যেমনটি যে জিনিষের গড়ন নিয়েছে সেই গড়নের প্রতি দৃষ্টি রেখে তোমার কলম চালাতে হবে, এই বলে তিনি আমায় একটি কার্ড করে বুঝিয়ে দিলেন—বল্লেন, কালি কলমের কাজে শুধু যেখানে সেখানে আঁচড় টানলেই কাজ হবে না, আকারের জ্ঞান ও আলোছায়ার জ্ঞান থাকা চাই।

এরপর ছুটিতে বাড়ী গেছি। বাড়ীর থেকে ৺কালীপূজায় কলকাতা যাচ্ছি, পথে হঠাৎ আশাতীত ভাবে মাষ্টার মশাইয়ের সাথে দেখা, তিনিও কলকাতা যাচ্ছেন চোখ দেখাতে, খুব খুশী হলেন আমাকে দেখে। তারপর হঠাৎ বকে উঠে বল্লেন, তুমি ট্রেণে চেপে বসতেও শেখনি এখনও। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, বসায় দোষটা আমার কোথায় হলো। কিছুক্ষণ বাদে তিনি বল্লেন, দেখ! ট্রেণ যে মুখে যাচ্ছে তার উল্টো মুখে বসবে, কারণ কি জান তাতে তুমি বাইরের দৃশ্য (প্রকৃতির) অনেকক্ষণ উপভোগ করতে পারবে,

তার মধ্যে যেটি ভালো লেগে গেল সেটিতে অনেকক্ষণ ষ্টাডি করতে পারবে। অবাক হয়েছিলুম তাঁর অতি সহজ সরল শেখানোর ধরণ দেখে, সামান্য ট্রেণের ভেতর বসাটার উপর আমরা তেমন গুরুত্ব আরোপ করি না, তাঁর এই সামান্য জিনিষের ভেতরও কি অপূর্ব নিষ্ঠা। আরও আশ্চর্য হয়েছিলুম যখন তিনি বল্লেন, দেখতো এ জায়গাটা মধুগ্রাম কি না? জিজ্ঞাসা করলুম আপনি কি করে বুঝতে পারলেন। বল্লেন, মন দিয়ে যাকে একবার পড়েছি তাকে কি কখনও ভোলা যায়। এরপর সমস্ত রাস্তা তিনি বাইরের দৃশ্য দেখে, জায়গার নাম বলে যেতে লাগলেন আবার বল্লেন, দেখো শান্তিনিকেতনে গিয়ে তুমি আমায় যে জায়গাটির ছবি আঁকতে বলবে তাই এঁকে দেব, কারণ কি জান! মন দিয়ে আগেই যে ছবি এঁকে ফেলেছি তাইতো কলম দিয়ে আঁকতে এত সোজা লাগে। জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতায় কোথায় উঠবে? বল্লুম, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। খুশী হয়ে বল্লেন, ঠাকুরের আশ্রয়ে আছ, মহারাজদের ভালবাসা পাচ্ছ, এর থেকে বড় সম্পদ আর কি থাকতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কোথায় থাকবেন? বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লেন, দেখ না আবার আমায় কলকাতায় আসতে হলো, কলকাতা আমার মোটেই ভালো লাগে না, যেদিকে তাকাও না চোখ যাবে আটকে। প্রাণভরে কিছুই দেখতে পাবো না, কেবল ঘরের মধ্যে বসে থাক আর চার দেওয়াল দেখ। সবুজের ছোঁয়া নেই কেবল রং বেরঙের আলোর বাহার আর এইজন্যেই তো সহরের লোকদের চোখ এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়, কারণ সবুজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। কলকাতা পৌঁছে তিনি গেলেন তাঁর বাড়ীর দিকে, আমিও তাঁকে প্রণাম করে মঠের দিকে রওনা দিলুম।

প্রাচীন রাজগৃহ

শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম. এ., বি. এল.

গঁয়া রাজ্য হইতে ভগবান বুদ্ধ সম্বোধি বৃক্ষের পূর্বদিকস্থ নৈরঞ্জনা নদী অতিক্রম করিয়া মাহি নদীর পূর্বভাগে 'কুক্কুটপাদ'-গিরি পৌঁছিলেন। ইহাকে গুরুপদ গিরিও বলা হইত। এই পর্বতে মহাতাপস কাশ্যপ বাস করিতেন। কথিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপিটকগুলির ভবিষ্যৎকালের প্রচারকার্য কাশ্যপের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই স্থানের পর্বতমালা তিনটি শৃঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে। জেনারেল কানিংহাম এই পর্বতকে 'ঘুরলি' পর্বতের অংশ মনে করেন। ইহা বর্তমানকালের কুর্কিহার গ্রামের তিন মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কুক্কুটপাদ গিরি অতিক্রম করিয়া তথাগত বুদ্ধবন নামক পর্বতে গমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাঁচশত অর্হৎ এইস্থানে বাস করিয়া ধর্মসাধনা করিতেন। বুদ্ধবন অতিক্রম করিয়া ভগবান বুদ্ধ যষ্টিবনে গমন করিলেন। এই স্থানের ভূভাগ বিশাল অরণ্যে পরিবেষ্টিত ছিল। অশোকরাজ একটি স্তূপ সেই অরণ্যে নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং হিউয়েন-সাঙ্ তাহা দেখিয়াছিলেন। এই অরণ্যে জয়সেন নামক এক তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য বহু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, রাজা ও মন্ত্রীগণ প্রায়ই গমন করিতেন। যষ্টিবনের দুই মাইল দক্ষিণে তপোবন নামক স্থানে দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ বলেন যে, সেই উষ্ণ জলধারায় স্নান করিয়া বহু ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইত। এই স্থানের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে একটি উষ্ণ পর্বত ছিল। কানিংহাম

ইহাকে বর্তমান কালের 'হাতিয়া' পর্বত বলিয়া মনে করেন। ইহার কিছু উত্তরে অন্য একটি পর্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। প্রফেসর জুলিয়ান বলেন যে, ঋষি ব্যাস এইস্থানে কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতে ভগবান বুদ্ধ কুশাগারপুর (রাজগৃহ বা গিরিব্রজ) গমন করিয়াছিলেন। কুশাগারপুর মগধ সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। পাঁচটি পর্বতমালার দ্বারা এই প্রাচীন নগরী বেষ্টিত ছিল। কথিত আছে যে, দেবদত্ত ও রাজা অজাতশত্রু এইস্থানে এক মত্ত হস্তীর দ্বারা ভগবান বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। শ্রীগুপ্ত নামক একজন উপাসক ভগবান বুদ্ধের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাগত সেই অগ্নিকুণ্ডকে পদ্মসরোবরে পরিণত করিয়াছিলেন। উক্ত উপাসক বিষ-মিশ্রিত অন্ন ভোজনের জন্য ভগবান বুদ্ধকে আহ্বান করিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহা অমৃতান্নে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীগুপ্ত এই অলৌকিক ঘটনাবলী দর্শনে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজগৃহ পর্বতমালার প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্বে গৃধ্রকূট নামক পর্বত বর্তমান ছিল। এই পর্বতে তথাগত বহুকাল বাস করিয়া তাঁহার 'সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সূত্র' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বলেন যে, বুদ্ধ এইস্থানে 'সুরঙ্গম-সূত্র' প্রচার করিয়াছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ তথাগতের বক্তৃতারত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি সেইস্থানে দেখিয়াছিলেন। সেই পর্বতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ তখন বর্তমান ছিল (এখনও আছে)। সেইকালের বৈভার-গিরি পর্বতকে বর্তমানকালে ব্যবহার-গিরি বলা হয়। ভগবান বুদ্ধের প্রস্তর নির্মিত অনেকানেক মূর্তি এখনও সেই পর্বতে দেখা যায়। এই মূর্তিগুলি শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী জৈন-সম্প্রদায় বিভিন্ন নিয়ম ও আচার অনুযায়ী পূজা উপাসনা করিয়া থাকেন। বিপুল নামক পর্বতের (বর্তমানের বিপ্রাচল) উত্তরে করণ্ডবেণুবন নামক বিস্তৃত অরণ্যানী সেইকালে দেখা যাইত। সেই বনমধ্যে তথাগত আসিয়া প্রায় বাস করিতেন। সেইস্থানে অজাতশত্রু রাজ-কর্তৃক নির্মিত তথাগতের মূর্তি ও স্তূপ চৈনিক পরিব্রাজক দেখিয়াছিলেন। ইহার নিকটে বুদ্ধস্নিগ্ধ আনন্দের পূতাস্থির উপরে অন্য একটি স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার সন্নিকটে ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়ন বর্ষা ঋতুতে বাস করিতেন—সেখানেও একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। গৃধ্রকূট-শিখর পর্বতের দুই মাইল উত্তরে বেণুবনের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ ছিল। কথিত আছে যে, এইস্থানে মহাকাশ্যপ ৯৯৯ জন অর্হৎসহ তথাগতের পরিনির্বাণের পর ত্রিপিটকের সাহায্যে ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত প্রথম ধর্ম-মহাসভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহা কাশ্যপের বার্ধক্যহেতু এই ধর্ম মহাসঙ্ঘকে স্থবির-মহাসঙ্ঘ বলা হইত। মল্লগণনির্মিত এই প্রস্তরনির্মিত বিরাট গৃহের সংলগ্ন প্রকৃতির হস্তনির্মিত সপ্তপর্ণ গুহা বিদ্যমান ছিল। এই ধর্ম-মহাসঙ্ঘে আনন্দ সূত্রপিটক, উপালি বিনয়-পিটক ও মহাকাশ্যপ অভিধর্ম পিটক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ষা ঋতুর অবসানে

যে সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও উপাসকগণ স্থবির মহাসঙ্ঘে যোগদান করিতে পারেন নাই তাঁহারা আর একটি ধর্ম মহাসঙ্ঘের উদ্বোধন করিয়া পঞ্চপিটক (সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্ম-পিটক, ক্ষুদ্রকনিকায় ও ধরণীপিটক) স্থির করিয়াছিলেন। বেণুবনের উত্তরে 'করণ্ড হ্রদ' নামক বিশাল একটি হ্রদ ছিল। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ইহা একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। হিউয়েন-সাঙ রাজগৃহ নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। অশোকরাজ তাঁহার রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করিবার সময় রাজগৃহ নগরীকে ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন এবং হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণকালে এক সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার সেইস্থানে বাস করিত।

ইহার পর রাজগৃহের কয়েক মাইল উত্তরে হিউয়েন-সাঙ্ নালন্দা সঙ্ঘারামে গমন করিয়াছিলেন। ইহা বর্তমান রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক গ্রামে অবস্থিত। বিহার-বখ্‌তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের নালন্দা ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। হিউয়েন-সাঙের সময় নালন্দা সঙ্ঘারামে কয়েক সহস্র উপাসক বাস করিতেন। তাঁহাদের নির্মল পবিত্র স্বভাব, জ্ঞান ও বিদ্যার তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ত্রিপিটকবর্ণিত নিয়মনীতি পালনে তৎপর ছিলেন। সেইস্থানে বহু দূর দেশ হইতে এবং ভারতবর্ষের বহিঃপ্রদেশ হইতে জ্ঞানী, ভক্ত ও পণ্ডিতগণ তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য সমাগত হইতেন। তৎকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ও ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সেখানে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের সহিত শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য নালন্দার অধ্যাপকগণ জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র এবং শীলভদ্র উল্লেখযোগ্য। মহারাজ হর্ষবর্ধন ও অন্যান্য রাজাদের দানে এই মহাবিহারের ব্যয়ভার বহন করা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক শীলভদ্রের নিকট অবস্থান করিয়া কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেইখানে শত শত স্তূপ ও বিহার বর্তমান ছিল। ভগবান বুদ্ধের প্রস্তর, তাম্র ও পিত্তলনির্মিত শতাধিক মূর্তি হিউয়েন-সাঙ্ দেখিয়াছিলেন। নালন্দায় আগমন-পূর্বক ভাগবান বুদ্ধ বহুবার ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে কুলিকগ্রামে বুদ্ধশিষ্য মুদ্গলপুত্রের জন্মস্থানে অশোকরাজনির্মিত স্তূপ বর্তমান ছিল। এই স্তূপের নিকটে অন্য একটি স্তূপ ছিল যেখানে মগধরাজ বিম্বিসার রাজগৃহ হইতে আগমন করিয়া ভগবানবুদ্ধের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানের ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'কালপিণাক' গ্রামে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রের জন্মস্থানে অশোকরাজ স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার ৪।৫ মাইল পূর্বদিকে 'ইন্দ্রশৈল গুহা' নামক পর্বতে বহু সঙ্ঘারাম ও স্তূপাদি দর্শন করিবার পর হিউয়েন-সাঙ্ 'হিরণ্যপর্বত' রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

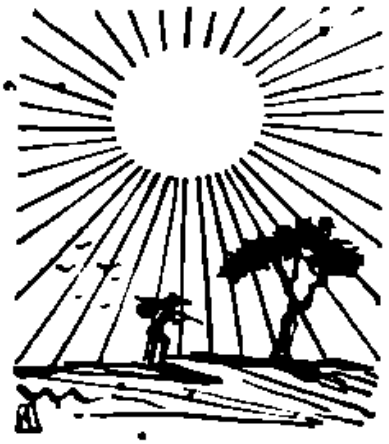

ভেদাভেদবাদ

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। এই ভেদাভেদবাদের প্রবর্তক ছিলেন আচার্য উড়ুলোমি। তাঁর মতে যতদিন সংসারী জীব দেহেন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পরমাত্মার সহিত তার ভেদভাব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা দেহেন্দ্রিয়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে পরমাত্মার সহিত একীকৃত হন; সুতরাং যতক্ষণ সংসার দৃশ্য ততক্ষণ ভেদ। মুমুক্ষু বা মুক্ত আত্মার পরমাত্মার সহিত অভেদ সাধনই বেদান্ত প্রতিপাদ্য। মহর্ষি বাদরায়ণও আচার্যের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মসূত্রে তা উল্লেখ করেছেন। আচার্য ভাস্কর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন এবং আচার্য উড়ুলোমির প্রবর্তিত ভেদাভেদবাদের ব্যাখ্যায় যে বিচার ও মনীষার পরিচয় দেন তা বাস্তবিকই অপূর্ব। আচার্য নিম্বার্ক পরে মহাত্মা ভাস্করের আদর্শে প্রভাবিত হ'য়ে অনুরূপ ভাষ্য রচনা ক'রে সুধীসমাজে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন, যদিও দু-এক স্থানে কিছু মতভেদ দেখা যায়।

আচার্য ভাস্কর ও আচার্য নিম্বার্ক উভয়েই ছিলেন ভেদাভেদবাদী, তাঁদের মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম একও বটেন ও অনেকও বটেন। যেমন সমুদ্র সমুদ্ররূপে এক হ'লেও তার তরঙ্গ, জলবুদ্বুদ ও ফেন-রূপটি নানা, এবং মৃত্তিকা মৃত্তিকারূপে এক হলেও ঘট, সরাবাদি রূপটি নানা; সুতরাং একই সময়ে একই বস্তুর একত্ব ও নানাত্ব সত্য ব'লেই প্রতীয়মান হয়। একই উপাদান-কারণ কার্যসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থেকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য উৎপন্ন করে, ও তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নানা প্রয়োজন সাধন করে বলে উহা সত্যস্বরূপ অনুমিত হয়। তা হ'লে, কার্যমাত্রই কারণ থেকে ভিন্নও বটে ও অভিন্নও বটে, যেমন জগতটি ব্রহ্মেরই কার্য,

এবং ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হওয়ায় জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম ও সত্য। মাকড়সা তার দেহ থেকে যেমন জাল বিস্তার ক'রে উহা তার নিজ দেহের মধ্যেই আবার লয় করে, ব্রহ্ম থেকে তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি হ'য়ে ব্রহ্মেতে উহা লয় প্রাপ্ত হয়।

আচার্য ভাস্করের মতে প্রপঞ্চরূপ এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম কিন্তু প্রপঞ্চস্বরূপ নয়। এখানে বিশেষত্ব এই যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, নির্বিকার নির্বিশেষ হয়েও সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, (অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ (৩।২।১৩ ব্রঃ সূঃ) মহাত্মা ভাস্করের ও অদ্বৈতবেদান্তীর মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে নিরাকার নির্বিশেষে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে পারেন না ; কারণ যেখানে শক্তি, সেখানে ক্রিয়া থাকবেই এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকারেরও সম্ভাবনা।

আচার্য ভাস্কর বলেন জীব ব্রহ্মেরই অংশ, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। জীব ঘটাকাশ ও ব্রহ্ম মহাকাশ। জীব ব্রহ্মেরই ভোক্তৃশক্তি। ব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এরূপ ব'লতে ব'লতে দেহান্তে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আচার্য ভাস্কর ও মহাত্মা রামানুজের "মুক্তি" সম্বন্ধে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য দেখা যায়। রামানুজের মতে জীব দাস ও ব্রহ্ম প্রভু। জীব অণু ও অল্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। ভাস্করের মতে জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

আচার্য ভাস্কর আবার জীবন্মুক্তি স্বীকার না করায় আচার্য শঙ্করের 'মুক্তির' সহিত প্রভেদ দেখা যায়। আচার্য শঙ্করের মতে ভাস্করীয় মুক্তি আপেক্ষিক, চিরনির্বাণ নহে। আচার্য শঙ্করের ন্যায় ভাস্কর জ্ঞানবাদী নন, জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী। আচার্য ভাস্কর বলেন : 'মুক্তি উপাসনালভ্য, জ্ঞান ব'লতে উপাসনাকে বোঝায়'।

আচার্য নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী হলেও আচার্য ভাস্করের ন্যায় 'মুক্তিতে' জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, মুক্ত জীবের কখনও জীবত্ব নাশ হয় না। জীব ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু জীব বিভু নন। মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি দ্বারা 'জীবই ব্রহ্ম' এই ভাবটি পরিস্ফুট হলেও অল্পজ্ঞ জীব ও সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের যে পার্থক্য তা চিরকালই থাকবে। এখন উপনিষদ প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মভাবের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি বলেন : ব্রহ্ম কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ অভিন্ন ; কারণ মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম থেকে অত্যন্ত ভিন্ন অযৌক্তিক, এবং অভিন্ন বলাও সঙ্গত নয়, কেননা লৌকিক বা বৈদিক সমস্ত ব্যবহারেই কিছু না কিছু ভেদ দেখা যায়। ঈশ্বর কারণ ও জীব তাঁর অংশ ও কার্য। কার্য ও কারণ অভিন্ন হওয়ায় জীব ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। জীব ও ঈশ্বর অজর ও নিত্য হয়েও মুক্তিতে জীবভাব অক্ষুণ্ণ থাকার কারণ জীব ঈশ্বর থেকে অভিন্ন হ'য়েও ভিন্ন।

আচার্য নিম্বার্কের এই মতটি অসঙ্গত ব'লে মনে হয় ; কারণ জীব ব্রহ্ম-কার্য হ'লে, তার নিত্যত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ? কার্য ও কারণ অভেদ স্বীকার করলে জীবই ব্রহ্ম এ কথা

বলাই সঙ্গত। জগতে সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে আচার্য নিম্বার্ক মহাত্মা ভাস্করের মতটি গ্রহণ ক'রেছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হলেও ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপ নহেন। কারণ-রূপে ব্রহ্ম নিরাকার ও কার্যরূপে তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব ব্রহ্মের ভোক্তৃশক্তি, এবং জগৎ-প্রপঞ্চ তার ভোগ্য-শক্তি। শক্তি যখন সত্য, জীব ও জগৎপ্রপঞ্চও সত্য। ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হয় ও প্রলয়ে জগৎ আবার লয় প্রাপ্ত হয়। স্বভাবতঃই এখন মনে উদয় হয় চিন্ময় ব্রহ্ম কিরূপে জড় জগৎ-রূপে পরিণত হয়, এবং প্রলয়ে জড় জগৎ ব্রহ্মে লয় হ'লে ব্রহ্ম কিরূপে অবিকৃত থাকে? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান বলা হ'য়ে থাকে। ব্রহ্মের এই সর্বশক্তিমানত্বের জন্যই চেতন ব্রহ্ম জড় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এবং সমস্ত বিকারের মধ্যেও তিনি অবিকারী। ব্রহ্মের এই যে শক্তি অচিন্ত্য ব'লে পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম সগুণ। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের ইয়ত্তা নাই ব'লে তিনি আবার নির্গুণ, অর্থাৎ অনন্তগুণময়। তাহলে, ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই। কেননা সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিঃশেষিত হন না এবং বিশ্বাতীত হ'য়ে অবস্থান করেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্ত ছাড়া বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ বেদান্ত চিন্তারাজ্যের মধ্যে উচ্চাসন পাবার যোগ্য।

ঝাড়গ্রামের লোকসংগীত

(টুসু গান)

শ্রীবসন্তকুমার রায়

প্রবাদটা,—'কারো পোষ মাস কারো সর্বনাশ' অভিধান বলে 'কাহারও সর্বনাশে কেহ লাভবান ও আনন্দিত হইলে ইহা বলা হয়'। ভগবান করুন যেন কারো সর্বনাশ না হয়।

প্রবাদটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে পৌষ-মহিমা কীর্তন করা। পৌষ মাস মানেই লাভবান হওয়া, আনন্দিত হওয়া। আমরা বলি, 'আরে ওর তো এখন পৌষ মাস'। কেন বলি? কারণ পৌষমাসে ঘরে ধান থাকে মজুত। অন্নের চিন্তা যা সবচেয়ে বড় চিন্তা তা আর তখন করতে হয় না। আর পেটের চিন্তা যদি না থাকে, তাহলে মন তো সব সময় আনন্দিত থাকবে। আর সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হোল 'ভাদুর গান' যা আগেই আলোচনা করেছি আর এই 'টুসু গান' প্রভৃতি এই সময়ের লোক-সংগীত এবং পরব-পার্বণ।

পৌষ মাসে ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের মত্ততা। শ্বশুর ঘর থেকে মেয়ে তাকু বুকে বাপের বাড়ী চলে আসে পৌষ মাসের দিন কয়েক আগে। একবার পৌষ মাস পড়ে গেলে, যতদিন না মাস শেষ হয় ততদিন সে বাপের বাড়ীতেই থাকবে। পৌষ মাসে বিদেশে যেতে নেই। কাজেই সে অন্ততঃ মাসখানেকের জন্য একটু বিশ্রাম করতে পাবে।

ঝাড়গ্রামের 'টুসু-ব্রত' এই পৌষ মাসে। ছোট একটা মাটির পুতুল। রঙীন ন্যাংতা আর রঙীন কাগজের ফুলে পুতুলটি নেয় নবরূপ। তখন আর পুতুল নয়—টুসু প্রতিমা। লম্বায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি থেকে দু'ফুট আড়াই ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। মূর্তি এবং বাহার অনুপাতে দাম উঠে পাঁচ-ছয় আনা থেকে আট-দশ টাকা পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, একমাত্র এই টুসু প্রতিমা বিক্রী করে এখানের কোন কোন কুমোর প্রায় পাঁচ-ছ'

পো টাকা পর্যন্ত প্রতি বছর লাভ করে বলে শোনা যায়। যাই হোক, এই রকম একটি মূর্তি কিনে তাকে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। প্রায় সারাটা মাস ধরে শোনা যায় টুসু-গান। তারপর আসে পৌষ-সংক্রান্তিপূর্ব-রাত্রি। সেদিন টুসু-প্রতিমার সামনে বসে গ্রামের মেয়েরা সারাটা রাত্রি ধরে গান গেয়ে পূজো করেন। তারপর ভোর হলে সেই প্রতিমাকে মাথায় নিয়ে দল বেঁধে সব যাত্রা করেন কোন নদী বা বাঁধের দিকে। সেখানে পৌঁছে সঙ্গেসঙ্গেই বিসর্জন* দিয়ে দেওয়া হয় না। গান চলতে থাকে। তারপর একসময় শ্রান্ত পূজারিণী মাথায় প্রতিমা নিয়ে জলে নামেন এবং মাথায় মূর্তি নিয়েই ডুব দেন।—এইটিই হোল পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য, নদী বা বাঁধে নিয়ে যাবার সময় বা রাত্রে মূর্তির সামনে বসে যে সমস্ত গান হয়, তাই হোল বিখ্যাত 'টুসু-গান'। বাঙ্গালীর কাছে টুসু-গান প্রচলিত হয়েছে নানা কারণে। যাক, সে ব্যাখ্যান থেকে বিরত রইলাম। তবে মানভূম বা পুরুলিয়াতে টুসু-গান যেমন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ এবং ব্যবহার করা হয়, এখানে তা হয় না।

কেউ কেউ বলেন টুসু লক্ষ্মীর মেয়ে। হয়ত পৌষ মাস, লক্ষ্মীপূজো কিংবা গোলাভর্তি ধানের দিকে নজর দিয়েই একথা তাঁরা বলেন। তা ছাড়াও টুসু কথাটি সৃষ্টি হয়েছে ধানের তুঁষ থেকে বলে মনে হয়। যেমন, তুষ থেকে তুষু এবং পরে টুসু। যাই হোক, এদিক দিয়েও দেখা যায় ধানের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। কাজেই টুসু যে লক্ষ্মীর মেয়ে, এ বিষয়ে বোধহয় কোন মতভেদ হবে না।

টুসু সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে।—হয়ত কোন নারীর সন্তান-সন্ততি হয় নি (এখানের চলতি কথায় সেই নারীকে বলা হয় বাঁজা বা শুদ্ধ বাংলায় বন্ধ্যা)। সে যদি মনে প্রাণে ভক্তিভরে টুসু-পূজো করে তবে নিশ্চয়ই সন্তান লাভ করবে। শুধু তাই নয়, এমনও শোনা গেছে যে, সন্তানের কল্যাণ কামনাতেও অনেকে টুসু-পূজো করে থাকেন। কাজেই টুসু-পূজোকে 'কামনাব্রত' বলেও আর একটা নাম দেওয়া যায়। আমাদের ঘরে ঘরে যেমন ষষ্ঠীপূজো, এঁদের মধ্যে তেমনি এই টুসু-পূজো। টুসু-পূজো বা তার উদ্দেশ্য অথবা প্রতিমার শিল্প-বৈশিষ্ট্য যা-ই থাক না কেন, আসলে এ সবই উপলক্ষ্য। চুপি চুপি জানিয়ে রাখি—প্রধান লক্ষ্য থাকে কিন্তু গান। যার সুর আর ভাব কখনও আপনার বিস্ময়াবিভূত করবে, আবার কখনও আপনার মন এক নির্মল আনন্দানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এইখানেই পূজোর সার্থকতা তথা শিল্পীর চরম পুরস্কার প্রাপ্তি।

টুসুর প্রতি দরদ বা ভালোবাসা সম্বন্ধীয় গান স্বভাবতঃই সংখ্যায় বেশী। কারণ এতে প্রচ্ছন্ন আরাধনার ভাব থাকে। আর সেইটাই তো পূজো। তার চেয়েও বড় হ'ল যে, টুসুকে একান্ত আপনজন ভেবে নিয়েই গান বাঁধা হ'য়েছে। নিজের নিকট আত্মীয়ার বয়সের

* এখানে এই বিসর্জনকে বলা হয় টুসু ভাসান।

প্রতি আপনার সব সময় সজাগ দৃষ্টি। ধরুন তিনি আপনার পাড়ায় নতুন এসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনিও, যদি আপনি একজন ভদ্রমহিলা হন, নিশ্চয়ই তাঁকে আশপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ক'রে দেবেন। তেমনি পল্লীতে টুসু এসেছেন, গায়িকা গান গেয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এদিকের হালচাল :

উপর কুল্‌হি গেছলে টুসু ?
নাম্‌হো কুল্‌হি যাইয়ো না
মাঝ কুল্‌হিরে কুইনি আছে লো
পান দিলে পান খেয়ো না।

অর্থাৎ—টুসু তুমি উপরের গ্রামে (বেড়াতে) গেছলে ? কিন্তু নীচের গ্রামে যেন আর যেয়ো না। আর মধ্য-গ্রামে এক ঝগড়াটে স্ত্রীলোক আছে। সে যদি পান দেয় তো সে পান খেয়ো না।—গায়িকা গানটির মাধ্যমে আশপাশের গ্রামের একটা মোটামুটি মেয়েলী খবর যেন আগাম দিয়ে দিতে চায়। কারণ আর কিছু না—টুসুকে নিরাপদে রাখা। তাঁর যাতে কোন অনিষ্ট না হয়।

উপরের গানটির অর্থ ক'রতে গিয়ে আর একটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তা হোল, গ্রাম্য নারীদের পরচর্চা-প্রবণতা। এর প্রবলতার ফল সময় সময় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তাতে তিক্ত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয়। শুধু তাই নয়, গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর খুঁটিনাটি সব কিছু খবরের প্রত্যেকেই যেন এক একটি বিশেষ এজেন্ট।

এই গানটিও টুসুর ভালমন্দের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে বাঁধা হয়েছে :

বড় বাঁধে যাইয়ো না টুসু
বড় বাঁধে ভূত আছে,
কি জানি কি কওয়া যায় না লো
কার কপালে কি আছে।

ভূতের পাল্লায় টুসুও পড়তে পারেন। আশ্চর্যের বিষয় টুসু স্বয়ং দেবী হ'য়েও মানুষের মত ভূতের হাত এড়াতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের কিছুই নেই। টুসু দেবীই হোন আর যাই হোন, আসলে তো নিজের জন। কাজেই নিজের যা ভালমন্দ টুসুর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। গানটির শেষ দুটি লাইনে তাই দেখি, 'কি জানি কার কপালে কি আছে কিছুই বলা যায় না' —নিজের ভাগ্যকেও গীতিকার টুসুর সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন।

আর একটি গান যাতে 'টুসুর প্রতি ভালবাসা' এই রূপটি আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—

টুসুর জীবন আমার জীবন
মোর জীবনে দেখেছি

কত আকাল গেল সেবার
টুনু বুকে রেখেছি লো
টুনু মোর জীবন ॥

—'টুনুর জীবন আর আমার জীবনে কোন পার্থক্য নেই। আমি আমার এই জন্মেই সেবারের যে সেই দুর্দিন গেল তা দেখেছি। তখন শুধু টুনুকে বুকে রেখেছি।' একটা পরম নির্ভরতা। অটল বিশ্বাস। যার জোরে যে কোন বাধা স্বচ্ছন্দে তরে যাওয়া যায়। দুর্দিন, বিপদ, এত তুচ্ছ। গায়িকা গান গেয়ে তাই যেন টুনুর সেই মহিমাকে প্রচারিত করছেন।

টুনুর নাকি আবার ছেলেও আছে। কাজেই একে তো টুনুর জন্যেই অনেক ভাবনা চিন্তা, আবার তার সঙ্গে এবার টুনুর ছেলেও মাঝে-মধ্যে চিন্তায় ফেলে। যেমন এই গানটি,—

আমার টুনুর একটি ছাইল্যা
কুল তলা বই গেলে না
কোন্ সভিনে ধূলা দিলো লো
ধূলার দাগ আর গেল না ॥

অর্থাৎ —'আমার টুনুর একটি ছেলে। সে কুলগাছের নীচে ছাড়া খেলে না। কিন্তু কোন্ সতিনে যে ধূলা দিল অর্থাৎ তুক করল যে তা আর ভাল হোল না।' এই গানটিতে দেখা গেল যে টুনুর একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু একটির বেশি ছেলে থাকাও বিচিত্র নয়। অথবা এখন একটি মাত্র ছেলেই আছে। অদূর ভবিষ্যতে টুনুর আরও ছেলেপিলে হ'তে পারে। যাই হোক, টুনুর ছেলে সম্বন্ধীয় আরও একটি গান পাওয়া গেছে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে টুনুর ঐ একটিই ছেলে এবং সে অত্যন্ত আদুরে। গানটি এইরকম,—

আমার টুনুর একটি ছাইল্যা
তাই গেছে কলকাতা
ভালই ভালই ঘুরে আসুক লো
থানে দিব জোড় পাঠা ॥

—'আমার টুনুর একটি ছেলে। তাই সে কলকাতা গেছে বটে কিন্তু মনে বড় ভাবনা তার কিছু ভালমন্দের জন্য। ভালয় ভালয় সে ফিরে আসুক। আমি ঠাকুরের কাছে জোড়া পাঠা বলি দেব।' এই গানটি গ্রাম্য সংস্কারের আর একটি দিক আলোকিত করে। আত্মীয়-স্বজন যদি কেউ বিদেশে যায় তাহলে চিন্তা ভাবনাটা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, এঁরা পদে পদে মানসিক করেন সেবস্থানে প্রবাসী আত্মীয়ের কল্যাণ কামনায়।

আর একটি গান :

ওরে ওরে ও চৌকিদার
কোন কুলহিতে হাঁক দিলি
আমার পাড়ায় টুসু চুরি
কোনখানে ঘুমিয়ে ছিলি ?

গ্রামে রাত্রে চৌকিদারা পাড়ায় পাড়ায় হাঁক দেয় 'হুঁসিয়ার' ব'লে। অর্থাৎ, 'চোর ডাকাত তোমরা কোথাও চুরি বাটপাড়ির ধান্ধায় থাক তবে আর রক্ষা নাই। কারণ আমি টহল দিচ্ছি। কাজেই এইবেলা হুঁসিয়ার হ'য়ে যাও।' সারারাত্রি ধরে হাঁক দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত চৌকিদার ঘুমিয়ে পড়েছিল আর সেই ফাঁকে টুসু চুরি হ'য়ে গেছে। আসলে এটা ফাঁকিবাজ চৌকিদারদের প্রতি প্রকারান্তরে কটাক্ষপাত।

বিদেশের টুসু প্রতিমা সম্বন্ধেও এঁদের কৌতূহল। যেমন—

মেদিনপুরে দেখে আইলম
সোনার টুসু যায় চলে
হায়রে হাতে নাইখো পয়সা
নিতম টুসু দর করে।

তাহলে এঁরাও ক্রমশঃ আধুনিকপন্থী হ'য়ে পড়ছেন। আমরা দোষ দিই স্কুল, কলেজের সরস্বতী-ভক্তকুলকে। দোষ দিই দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের। বলি, এই দুর্দিনে কেন মিছিমিছি হুড়োহুড়ি করে একগাদা টাকা শুধু প্রতিমার পেছনে খরচ কর। প্রতিমা—তা সে যেমনই হোক না কেন, ভক্তি থাকলে সবতাতেই সমান ফল হ'বে। কিন্তু মন কি তা মানে। নিজের পাড়ার প্রতিমার সঙ্গে অন্য পাড়ার প্রতিমার একটা তুলনামূলক বিচার না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। ঠিক তেমনই নিজের দেশের, নিজের গ্রামের তৈরী টুসুতে ঠিক মন উঠে নি। মেদিনীপুরের সোনার টুসু (হয়ত আসল নয় তবে তেমনই দামী) চলে যায় দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'হায়রে হাতে পয়সা নেই, নাহলে দর ক'রে টুসুকে কিনে নিতাম'।

ঠিক এমনই আর একটি গান :

টুসুর কাছে আলো জ্বলে
দেখায় লো কালো কালো
বিষ্ণুপুরের টুসু আমার
খুঁজেগো ঝাড়ের আলো।

টুসুর কাছে আলো জ্বলছে বটে কিন্তু টুসুর নিজস্ব উজ্জ্বলতার কাছে সে আলো ম্লান হ'য়ে যায়। কারণ এ বিষ্ণুপুরের টুসু, এবং একমাত্র ঝাড়ের আলোই এর সামনে স্থান পেতে পারে। জানি না এখানে কার্যকর কিনা, তবে একটা কথা আছে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না'

না'—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করিয়ে দেয় সেই হিন্দী প্রবচনটি 'ঘরকী মুরগী দাল বরাবর'।

টুসুপুজোর সময় অর্থাৎ ঘরে টুসু প্রতিমার সামনে বসে গীত এই গানটি লক্ষ্যণীয়। ভাবে-আর ভাষায় এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ নিয়েছে গানটি—

টুসু ভাসান দিনে সই পাতব
আছে গো আমার মনে
চাঁদকে যেমন তারায় ঘেরে
অমনু ঘেরে গোপীগণ
আমরা তেমনি ঘিরে আছি
টুসু মায়ের শ্রীচরণ॥

প্রথম দুটি লাইন বাদ দিয়ে মানে করলে দাঁড়ায়, আকাশের চাঁদ যেমন তারা দ্বারা পরিবেষ্টিত, কৃষ্ণ যেমন গোপীদ্বারা পরিবেষ্টিত, টুসুমায়ের শ্রীচরণও তেমনি আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছে।

এর আগে বলেছি যে, এই লোক-সংগীতগুলিকে স্বরলিপিতে বাঁধা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই যে, জনৈক সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে তাঁর মতামত জানতে চাই। তাতে তিনি বলেন যে, যে কোন সুরকে তথা শব্দকে স্বরলিপিতে বাঁধা যায়। এমনকি কাক যে কা-কা করে ডাকে তারও স্বরলিপি করা সম্ভব। ভাদুর গান বা টুসুর গানের স্বরলিপি করে দেখেছি কেউ আসল সুর শোনা না থাকলে, স্বরলিপি দেখে গাইতে গেলে হয়ত সুর ঠিক হয় কিন্তু সেই বিশেষ ঢঙটি আসে না গানের মধ্যে। অর্থাৎ গায়কীটি ঐরকম স্বরলিপিতে পাওয়া যায় না। অনেক দিনের কথা—সব কথা ঠিক স্মরণ নেই। তবে যতদূর মনে হয় এই বিষয় তিনি বোধহয় একমত ছিলেন। টুসু গান আমি এখানে যেমন সুরে শুনেছি তার একটা মোটামুটি ছক দিতে চেষ্টা করছি :

I জ্ঞ ম প দ পম ম পম জ্ঞ। জ্ঞ ম প দপ ম। গ ম প গ ম দ পমগস স জ্ঞ র ণ. স জ্ঞ র স I

দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হোল শুধু দম নিতে যে বিরতি পড়ে সেইজন্য। মাত্রা ভাগ করে দেখানো সম্ভব নয় কারণ এই গান এখানে কোনরকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গাওয়া হয় এবং কোন তালও থাকে না।

ভাল কথা, গানগুলি কিন্তু খুব চড়িয়ে গাওয়া হয়। কখনও একক ভাবে কখনও সমবেত ভাবে। খাদের দিকে সাধারণতঃ গাওয়া হয় না। কারণ তাতে যে সবাই শুনতে পাবে না। কাজেই আমরা যে সপ্তকে গান করি তার থেকে অন্ততঃ আধ সপ্তক চড়িয়েই এই লোক-সংগীতগুলি গাওয়া হয়।

রামমোহন তীর্থে

ডাঃ শ্রীকণ্ঠকুমার পাল

Beneath this stone rest the remains of
Raja Rammohan Roy Bahadur.

A conscientius and steadfast believer in the unity of the Godhead he consecrated his life with entire devotion to the worship of the Divine spirit alone to great natural talents, he united through mastery of many languages and early distinguished himself as one of the Greatest Scholars of his day. His unwearied labours to promote the social, moral and physical conditions of the people of India, his earnest endeavours to suppress idolatry and the Rite of Suttee and his constant jealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man live in the grateful remember of his countryman.

This Tablet

records the sorrow and pride with which His memory is cherished by his descendants. He was born at Radhanagore in Bengal in 1774, and died at Bristol, September 27th 1835.

সেদিন ছিল শনিবার। বেলা দেড়টার সময় বাড়ী ফিরে এসে দেখি একটি টেলিগ্রাম পড়ে আছে। খুলে দেখলাম যে ব্রিষ্টল থেকে Professor Patterson (প্রফেসার প্যাটারসন) লিখেছেন সোমবারে Bristol University-তে এসে আমার লেক্‌চার দিয়ে যেতে। অগত্যা উঠে তৈরী হতে হোলো ব্রিষ্টলে যাবার জন্যে। মাত্র আড়াই ঘন্টার পথ ট্রেনে। সুন্দর কাউন্টি গ্লষ্টার শায়ারের অন্তর্গত।

রবিবারে সকালে উঠে ব্রেকফাষ্ট খাবার পর, প্রফেসারের দুহিতা বল্লেন, চলো ঘুরে আসি। আমি বহুত এক সর্তে রাজি—গাড়ীতে নয়, পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। শ্রীমতী রাজী হলেন। দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম পুরোনো সমাধিস্থানে। রবিবার রাস্তাঘাট খুব খালি, পথে গাড়ীর ভীড় কম। ক্রিমেটোরিয়ামের উল্টোদিকে কয়েকটা চকোলেট ও ফুলের দোকান খোলা আছে। আমি একটি দোকানে ঢুকে কিছু ফুল কিনলাম দোকানী বৃদ্ধা মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কি ইণ্ডিয়ান রাজার সমাধিতে ফুল দিতে যাচ্ছি? উত্তর দিলুম 'হ্যাঁ'। তিনি বল্লেন, দরজা দিয়ে ঢুকলে সামনে ডান দিকে। তুমি এখান থেকেই প্রায় দেখতে পাবে।

সমাধিস্থান শূন্য। তখন অবধি কেহ আসে নি তাদের প্রিয়জনের সমাধিস্থলে ফুল দিতে। সাধারণতঃ লাকের পর সবাই বিকেলের দিকে আসে।

দিনটা মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তবে কিনা মোটামুটিভাবে আকাশ লহনা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সমাধির ওপর ফুল দিয়ে মহামানবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। আগে আরও কয়েকবার এসেছি কিন্তু সমাধির প্রস্তর-ফলকের গায়ে যে কি কথাগুলো লেখা আছে, পড়তে আগ্রহ করি নি। আজ পড়লাম এবং কাগজে লিখে নিলাম। সোনালী জলে লেখা। স্থানে স্থানে আবছা হয়ে গেছে।

অনেকবারই মনে হয়েছে আজ কি ভারতবাসীর সময় হয় নি এ সমাধিকে ক'লকাতায় রাখার বাড়ীতে পুনঃ সমাহিত করবার। নেপোলিয়ঁর সমাধি সেণ্ট হেলেনা থেকে এনে প্যারীতে পুনরায় সমাহিত করা হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ ফরাসী প্রতি বছর তাদের বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নিকট ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পত্র লিখেছিলাম। উত্তর এলো নেহেরুর কাছ থেকে যে, বর্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন পরিকল্পনা নাই ঐ সমাধি ভারতে আনবার জন্য। তবে তিনি ভারতীয় হাই কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন উপযুক্ত ব্যয়ে সমাধি প্রয়োজনবোধে মেরামত করা হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজের হাতে বাংলা ভাষায় আমাকে চিঠিতে জানান যে, এতদিনের সমাধি তুলে আনা সম্ভবপর কিনা খবরাদি নিয়ে তাঁকে জানাবার জন্যে। আমি খবর নিয়ে ডাঃ রায়কে জানালাম এবং Bristol Cremetorium-এর Caretakerএর চিঠি (আমাকে লেখা) সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। উত্তর এসেছিল "সম্ভব" সমাধি ভারতে পাঠানো। এডুকেশান মিনিষ্ট্রি থেকে পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে চিঠি এলো। ব্যস এই অবধি। চিঠির উপরে আমার নাম ও ঠিকানা ভুল লেখা ছিল। ও নিয়ে দু' ভাই আমরা বেশ হাসাহাসি করলাম।

রাজা রামমোহন রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরাটতম পুরুষ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতিকে তিনি জাগালেন ও দিলেন মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা।

বাঙ্গালী যদি এই বীর সন্তানের দেহাবশেষকে বাঙ্গলাতে ফিরিয়ে আনতে পারে তবেই তাঁর প্রতি আমাদের উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

এদেশে একটি কথা আছে "Hero should come back Home"। আজ সেই সময় কি আসে নি ?

আনন্দ-বেণু বাজিছে কোথায় ?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জন্ম মরণ প্রবাহের টানে প্রাণতরী চলে ভেসে,
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের কথা যাই সব ভুলে।
কালের গতির আবর্তনে যে মায়ার নোঙর তুলে
ঘাট হোতে ঘাটে ঘুরে ঘুরে তরী যাবে কি নিরুদ্দেশে ?

তুমার সাধনা যুগ যুগ ধরে করিলাম বটে আমি,
তবু ক্ষুদ্রতা দিতেছে বেদনা ভৈরবধর্ম লভি।
বিশ্বভুবনে আপন সত্তা হেরিবারে দিবাযামী
কত সাধ মোর ?—ভুলের ফসল মিছে তুলিলাম, কবি !

মোহাতুর মন বিহগের মত কেন যে কূজন করে ?
বিস্মৃতিভরা পার্থিব লোকে আসা যাওয়া হোলো সার,
অকথিত কথা ফেলে ফেলে যাই কি জানি কাদের তরে।
অস্ফুট কুঁড়ি বুকে ব্যথা লয়ে শুনি করে হাহাকার।

মোর স্বরূপের বেলাভূমে যত ছিল অতীতের স্মৃতি
আজ যেন তারা ঝড়ে ভেঙে গেছে, নাহি ফোলে কিশলয়।
জীবন-নদীতে জেগে ওঠে চর দিতে কার পরিচয় ?
রসগন্ধের সুরভি মাখিয়া শুনি অসীমের গীতি।

আনন্দ-বেণু বাজিছে কোথায় ? মুকুরে প্রেমলতা !
কে দেবে আমায় যাত্রাপথের পরম নির্ভরতা ?

সাধনা

শ্রীবংশীধর মণ্ডল

এ জীবনে সাধনার পুঞ্জীভূত অশান্ত বেদন
আঁকিয়া দিলাম রাখি। জন্মান্তের শুভ আলিম্পন
দেখা দিবে আরবার ; যাহা আজি অসমাপ্ত পথে।
সৌন্দর্য গোধূলি লয়ে হে নূতন সাফল্যের স্রোতে
পরাবে বিজয় মালা ? প্রদীপের শুভ্র স্বচ্ছ বাতি
জ্বলিবে কি অনর্গল কেটে দিয়ে দুর্যোগের রাতি।
তোমার কালের গর্ভে নিমজ্জিত অতীত চেতনা
বাহিরিবে দ্বার খুলি সে জন্মের করিবে বন্দনা
হারায়ে ছিল হে যাহা ; বাজিবে কি একখানি গানে
বিশীর্ণ কুসুমরাজি যাবে ফুটে বসন্ত উদ্যানে।

পৃথিবীর প্রান্ত হতে লক্ষকোটী সূর্যোদয় যবে
ছড়াইবে রশ্মিজাল অনন্তের শুভ শঙ্খ রবে
বাজিবে বসন্ত বীণা। ফাল্গুনের ঝরাপত্র সুর
সেথা কোন উন্মাত্তরে মুখরিবে কত বহুদূর।
প্রথম প্রাণের ছন্দ নিখিলের অশ্রু হতে লভি
রচিবে অমর কাব্য যুগান্তের সেই মহাকবি।
আমরণ সাধনার রিক্ত প্রান্তে অস্ত গোধূলি
হয়েছিল কবে শেষ অতীতের কত স্বপ্নগুলি
ধরণীর রাত্রি দিন। সুষুপ্তির কেন্দ্র হতে খসি
নিখিল কাব্যের গন্ধে কবি মোর উঠিবে উচ্ছ্বসি'
আপন বেদন ভরে অশ্রুনীর করিয়া রচনা
প্রথম শ্লোকের ছন্দে সুন্দরের সৌম্য আরাধনা
ঘোষিবে উদ্দাম সুরে।
আদিগন্ত অনির্বাণ কালে
সঙ্গীতের মুক্ত গাথা অব্যাহত শুভলগ্ন তালে
প্রকাশিয়া সুপ্ত ব্যথা বাজিবে সে অমর রাগিণী
নাহি শেষ কবি তার। অনাদ্যন্ত অশান্ত কাহিনী
কোন্ পথে আসে তারা কোথা পায় নবজন্ম দান
কোন শিল্পী রচে শুধু কোথা তুমি ওগো ভাগ্যবান।
বিপুল ক্ষমতা তব যুগে যুগে কালের অঙ্গনে
যাপিছ কঠিন রাত্রি সাধনার নিঃসীম বন্ধনে
ছড়াও গভীর আলো প্রাণপূর্ণ জ্যোতির্ময় লিখা
রচিছ আকাশ ছন্দে। ধাবমান অনলদীপ্তশিখা
পরিপূর্ণ ভাবাবেগে জ্বলে ওঠে দিক দিশাহীন
প্রাণের দিগন্তে সেই কাব্যগন্ধী রাগিণীর বীণ
বাজাও গম্ভীর সুরে।
হে কবি, সাজাও ধরণীরে
গীত-ছন্দ স্বপ্ন রাগে নিয়ে চল বেদান্তের তীরে
হাস্যরস উন্মেলিতা স্বরগের বাদিত্র বাদিনী
কবিতা কল্পনা দেবী প্রজ্ঞানের অমৃতদায়িনী
আশীষ করুণ হস্তে দিবে তার শেষ ভিক্ষা দান
পৃথিবী রহিবে বাঁচি। বিষাদের হবে অবসান
সমুদ্র কল্লোল ধ্বনি-মুখরিত ধারা বরিষণে
উষার মরুস্থ ক্ষেত্রে হিল্লোলিয়া প্রশান্ত পবনে
হাসিবে জ্ঞানের সূর্য; উন্মুখর তারি মন্ত্রকথা
অসীম উদাস বক্ষে সে কবির ভাব-চঞ্চলতা
চকিতে মিলিবে যবে মুহূর্তের মাধুরী সন্ধানে
সুন্দরের স্বপ্নে ঝরা বিমোহিত একখানি প্রাণে।

ভারতের তীর্থদর্শনে :
শ্রীঅবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(পূর্বানুবৃত্তি)

যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্র মথুরাপুরী ভারতের অতি প্রাচীন ও একটি প্রধান তীর্থস্থান। মোক্ষদায়িনী সাতপুরীর মধ্যে ইহা অন্যতম ও বিষ্ণুপুরীর অন্তর্গত। মথুরার প্রাচীন নাম "মধুরা বা মধুবন"। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে এখানে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এই ক্ষেত্র অনাদিকাল থেকেই পরম পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুবকে দেবর্ষি নারদ এই মধুবনেই তপস্যা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।' পরম পবিত্র মধুবনে শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত থাকেন। ধ্রুব এখানে তপস্যা করেন ও ভগবদ্দর্শন করেন। সেই সময়ে এখানে কোনও নগর বা সহর ছিল না। পরে মধু নামক রাক্ষস এখানে মধুরা বা মধুপুরী নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ঐ নাম পরিবর্তিত হইয়া মথুরা হইয়াছে। মধু রাক্ষসের পুত্র 'লবণ' রাক্ষসকে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন বধ করেন এবং মথুরাপুরী শত্রুঘ্নের ও পরে তাঁর বংশধরগণের রাজধানী ছিল। এখানেই দুরাচারী রাজা কংসকে ধ্বংস করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই স্থানের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পায়। বরাহপুরাণে এই পুরীর মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে :

"মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং লভতে দেবি। মথুরায়াং দিনে দিনে।
পূর্ণবর্ষ সহস্রং তু বারাণস্যাং হি যৎ ফলম্। তৎফলং লভতে দেবি। মথুরায়াং ক্ষণেন হি।
কার্ত্তিক্যাং চৈব যৎপুণ্যং পুষ্করে তু বহুদ্ভবে। তৎফলং লভতে দেবি। মথুরায়াং দিনেদিনে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু যাত্রী প্রত্যহ মথুরা দর্শন করিতে আসেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরাপুরী ও তার আশপাশের স্থান সকল ব্রজমণ্ডল নামে অভিহিত। সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডলের বিস্তার ৮৪ ক্রোশ। মথুরা সমগ্র ব্রজমণ্ডলের কেন্দ্রস্থান। ব্রজমণ্ডলের কোন তীর্থে যাইতে হইলে এখান হইতেই যাইতে হয়। ইহার চতুর্দিকেই ব্রজতীর্থসকল অবস্থিত। নানাদিকে অবস্থিতির জন্য মথুরাপুরীই এই সকল তীর্থস্থানে যাওয়ার একমাত্র পথ। ব্রজমণ্ডলের প্রধান প্রধান তীর্থগুলিতে যাতায়াতের জন্য এখন সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। মোটর বাস, টাঙ্গা ও রিক্সা প্রভৃতিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সমগ্র ব্রজভূমিই অতি পবিত্র তীর্থস্থান; ইহার ধূলিকণা পর্যন্ত পরম পবিত্র। পবিত্র ব্রজরজ বাতাসে উড়িয়া আসিয়া দেহে লাগিলেও জীবের মুক্তি হয়। প্রবাদ আছে: একবার স্বয়ং 'মুক্তি' ভগবান মাধবকে জিজ্ঞাসা করেন "কেশব, আমার নিজের মুক্তির উপায় কি"? প্রভু উত্তর দিলেন "যখন ব্রজরজ উড়িয়া তোমার মস্তকে পড়িবে, তখন তুমি নিজেকে মুক্ত ভাবিবে"। "মুক্তি কহৈ গোপাল সোঁ, মেরী মুক্ত বতায়। ব্রজরজ উড়ি মাথে পড়ে, মুক্তি মুক্ত হো জায়"।

এই ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত সমগ্র ব্রজক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাখেলা করিয়াছেন, সেজন্য সমস্ত ব্রজভূমিই পবিত্র তীর্থস্থান হইয়াছে। অনেকে এই সমগ্র ব্রজভূমি প্রদক্ষিণ করেন। সমগ্র ব্রজক্ষেত্র প্রদক্ষিণকে 'বনযাত্রা' বলে। বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার বিশেষ বনযাত্রা হয় ও তাহা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে আরম্ভ হয়। এই যাত্রাতে, ঐ সময়ে রাজা, জমিদার ও বহু ধনবান ব্যক্তি সম্মিলিত হন। সহযাত্রী ও রক্ষার সুব্যবস্থা থাকায় অনেক ধর্মপরায়ণ যাত্রীও এই সময়েই তাঁহাদের সঙ্গে বনযাত্রায় বহির্গত হন। মথুরা নগরী হইতেই এই বন-যাত্রা আরম্ভ হয় ও সমগ্র ব্রজভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া এখানে আসিয়াই যাত্রা সমাপ্ত হয়। সমগ্র ব্রজক্ষেত্রে বারটি বন, চল্লিশটি উপবন, পাঁচটি পর্বত, চারটি সরোবর, বারটি কূপ, চুরাশি কুণ্ড, দুইটি পুষ্করিণী, দুইটি শ্রীরাধার মন্দির, তিনটি বলরাম মন্দির, নয়টি দেবী মন্দির ও দশটি মহাদেবের মন্দির পাওয়া যায়।

দিল্লী হইতে রওনা হইয়া রাত্রি দেড়টায় মথুরা পৌঁছিলাম। মধ্য রেলওয়ের বড় ও ছোট লাইনের সকল গাড়ি ও দক্ষিণ রেলওয়ের দিল্লী যাতায়াতের যত গাড়ী সব মথুরা দিয়া যাতায়াত করে। আধুনিক ধরণের সব রকমের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন ভাবে মথুরা জংসন ষ্টেশনটী তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্ল্যাটফরম্ সকল বহু বৈদ্যুতিক আলোতে সজ্জিত। এত জায়গায় ঘুরিলাম, কিন্তু কেবলমাত্র মথুরা ষ্টেশনেই দেখিলাম: যাত্রীদের জন্য পৃথক রান্নাঘর। মধ্যে রান্না করিবার মত যথেষ্ট জায়গা, জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলো আছে। রান্নাঘরের সম্মুখে যাত্রীদের সুরক্ষিত গাড়ীগুলি রাখা হয়। পাণ্ডাগণ পূর্ব হইতেই খবর রাখেন তীর্থযাত্রী-গাড়ী কখন আসিবে। গভীর রাত্রি হইলেও

তীর্থযাত্রীদের এখানে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে বহু পাণ্ডা বড় বড় খাতাপত্র কাঁধে লইয়া উপস্থিত হন ও যাত্রীদিগকে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া খাতায় আপন আপন যজমানদের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে থাকেন।

মথুরা ও আশপাশের তীর্থসকল সাধারণভাবে দর্শন করিতেও চার দিন সময় লাগে। সেজন্য আমাদের যাত্রাগাড়ী এখানে চার দিন থাকিবে। প্রথম দিনে মথুরাপুরীই দর্শন করা সাব্যস্ত হইল। রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সহর। যাতায়াতের রাস্তা সুন্দর। টাঙ্গাগাড়ী ও সাইকেল রিক্সা যথেষ্ট পাওয়া যায়। যাত্রীদের বাসের জন্য সহরের মধ্যে নানাস্থানে ও যমুনা নদীর তীরে অনেক ধর্মশালা আছে। অনেক যাত্রী পাণ্ডাদের বাড়ীতেও থাকেন। সহরটি বেশ বড় এবং এখানে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে সজ্জিত অনেক দোকানও আছে। সহরের ভিতরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত।

আধুনিক মথুরা নগরী যেখানে অবস্থিত, সে স্থানের পুরাতন সহর দুইবার ধ্বংস হইয়াছে। এই বসতি তৃতীয় বার। মথুরা বড় রমণীয় স্থান। সুন্দর সুন্দর বসতবাটী ও বহু দেবমন্দির এই সহরের শোভা বর্ধন করিতেছে। যমুনা নদীর তীরে অর্ধচন্দ্রাকারে সহরটি অবস্থিত। সহরের ভিতরে যাইতে বৃন্দাবন-ফাটক, ভীম-দরজা, ভরতপুর-ফাটক ও হোলী-দরজা নামক চারটি বৃহৎ ফাটক আছে। মথুরার চারিদিকে চারিটি শিবমন্দির আছে। যমুনা নদীতে অনেক বাঁধান ঘাট আছে, তন্মধ্যে বিশ্রাম-ঘাটই প্রধান। কংসকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই ঘাটের নাম হইয়াছে বিশ্রাম বা বিশ্রান্ত ঘাট। স্নানার্থী যাত্রীদের ভীড় এই ঘাটেই বেশী হয়। জলের ধারে ও মধ্যে আছে অসংখ্য কচ্ছপ; নির্ভয়ে বা আরাম করিয়া স্নান করিবার উপায় নাই, কোন্ সময়ে কামড় দিয়া গায়ের মাংস তুলিয়া লইবে—এই ভাবনা। নদীতীরে বানরেরও উৎপাত কম নয়। স্নানার্থী-দিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, নতুবা তাহাদের কাপড় চোপড় বানর লইয়া পলাইবে। অনেক যাত্রী কৌতুক দেখিবার জন্য জলের ধারে কচ্ছপদের মধ্যে ছোলাভাজা ও মুড়ি প্রভৃতি ছড়াইয়া দেয়। সে-সব কচ্ছপেরা খায়, কচ্ছপদের পিঠের উপর বসিয়া বানরেরাও খায়। এ দৃশ্য বড় সুন্দর। সন্ধ্যাকালে যমুনার আরতি এই ঘাটের প্রধান দর্শনীয়। যম-দ্বিতীয়ার এই ঘাটে স্নানার্থীদের অত্যন্ত ভীড় হয়। পূর্বে অনেক ধনী ও ধার্মিক ব্যক্তি অনেক সময় এই ঘাটের উপরে 'তুলা-দান' করিতেন। ঐ দানের দাঁড়িপাল্লা ঝুলাইবার পাথরের সুদৃশ্য ফাটকগুলি আজও বিদ্যমান। ঘাটের নিকটেই শ্রীবল্লভাচার্যের বৈঠক।

বিশ্রাম-ঘাটের অদূরে বড় রাস্তার পার্শ্বে মথুরার প্রধান ও দর্শনীয় হইতেছে শ্রীদ্বারকাধীশের মন্দির। মন্দিরটি লম্বা ও চওড়াতে এখানকার সব মন্দির অপেক্ষা বড়। মন্দিরের ভিতরের ছাদে কৃষ্ণলীলার বহু রঙীন চিত্র অঙ্কিত আছে। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গান রহিয়াছে। মন্দিরটি বল্লভ সম্প্রদায়ের অধীনে। মূর্তির সেবা-পূজা প্রভৃতি ঐ সম্প্রদায়ের

নিয়ম অনুসারেই হয়। মন্দির সর্বদা খোলা থাকে না। সেজন্য যে সময় খোলা হয়, তখন দর্শনার্থীদের বেশ ভীড় হয়। মন্দিরের মধ্যেই দেবতার কাঁচা ও পাকা প্রসাদ বিক্রয় হয়। মন্দিরটি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র রাজ্যের পাজাকী মথুরার ধনী শেঠ পারিখজী তৈয়ারী করান।

দ্বারকাধীশের মন্দিরের দক্ষিণে গতশ্রম নারায়ণের মন্দির। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির এক পার্শ্বে রাধা ও অন্যপার্শ্বে কুব্জার মূর্তি আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রম নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গতশ্রম নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারকাধীশের মন্দিরের পিছনে বরাহদেবের মন্দির। ভগবানের বরাহ মূর্তি এখানে অবস্থিত। সম্মুখে গরুড়ের মূর্তি। রাক্ষসরাজ হিরণাক্ষকে বধের জন্য ভগবান বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বরাহদেবের মন্দিরের অদূরে গোবিন্দজীর মন্দির; মন্দিরটি অতি সুন্দর এবং ইহার শিল্পকার্যও প্রশংসনীয়। ইহার অগ্রে স্বামীঘাটে বিহারীজী ও গোবর্ধননাথজীর মন্দির। গোবর্ধননাথের মন্দিরটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়।

অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় মথুরা নগরীও প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে প্রদক্ষিণ করিতে। সাধারণতঃ শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশীতে ইহার বিশেষ প্রদক্ষিণ হয়। প্রদক্ষিণ পথে মোক্ষতীর্থ ও সপ্তঋষির টিলা পাওয়া যায়। সপ্তঋষি টিলার মৃত্তিকা সাদা এবং ইহাকে যজ্ঞভস্ম বা বিভূতি বলা হয়। এখানে ঋষিরা হাজার হাজার যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখনও টিলার উপরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। টিলাটী দেখিতেও তপস্বীদের তপোভূমি বলিয়া মনে হয়। টিলার উপরে সপ্তঋষির ও অরুন্ধতীর মূর্তি আছে। এই টিলার কাছেই বলি-রাজার টিলা। এখানের মাটি কিন্তু কাল এবং ইহাকেও বিভূতি বলে। বলি রাজার যজ্ঞস্থল ছিল এই টিলা। এখানে একটি ছোট কুঠ্‌রীতে বিষ্ণুর বামন-অবতারের মূর্তি আছে। কাছেই শুক্রাচার্য গোপাল ও বলি রাজার মূর্তি। অপর একটি কুঠ্‌রীতে বামনদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি; মূর্তির পায়ে খড়ম্ ও দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু। অদূরে রাবণ টিলা; এখানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তারপরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে কট্‌রা বলে। এই স্থানে ৮০০ ফিট্ লম্বা ও ৬৫০ ফিট্ চওড়া এক বিশাল চত্বরের উপর একটী মসজিদ তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই স্থানেই কেশবদেবের বড় ও প্রাচীন মন্দির ছিল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই মন্দির ধ্বংস করিয়া, তাহারই উপাদানে মসজিদটি করান। এত বড় মসজিদ মথুরাতে আর দ্বিতীয় নাই। কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির ভারতযাত্রী বর্ণীয়র ও টেভর্ণির সাহেব দেখিয়াছেন ও তাহার বড় সুন্দর বর্ণনা তাঁহারা করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের পূর্বেই কেশবদেবের প্রাচীন মূর্তিটী মেওয়ারের রাণা রাজসিংহ এখান হইতে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের যে বিপুল সম্পত্তি সবই মুসলমানেরা লুটপাট করিয়া লয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির নিকটে যে সুন্দর পুষ্করিণী আছে, তাহাকে পোতরাকুণ্ড বলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে এখানে তাঁহার পোতরা অর্থাৎ বিছানা প্রভৃতি ধৌতকরা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম পোতরাকুণ্ড হইয়াছে।

সরোবরের নিকটে একটি কুঠরীতে শিশু শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীর মূর্তি আছে। ইহার নিকটেই রাজা কংসের কারাগার; এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। পোতরাকুণ্ডের নিকটে কেশব দেবের নূতন মন্দির। মন্দিরটী মথুরার অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন। ঔরঙ্গজেব কেশবদেবের পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে মসজিদ তৈরী করার পর, ঐ মসজিদের পিছনে কেশবদেবের নূতন মন্দিরটী তৈরী হইয়াছে ও দ্বিতীয় মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে। জন্মভূমির কিছুদূরে একটি টিলার উপরে মন্দিরের মধ্যে মহাবিদ্যা, মহামায়া ও মহামেধার মূর্তি আছে। মন্দিরে যাইতে ৫০টি সিঁড়ি উঠিতে হয়। নামিবার জন্য অন্যপাশে সিঁড়ি আছে। মহাবিদ্যা মন্দিরের অদূরে বৃন্দাবন যাইবার পথে কৈলাসনাথ নামে আরও একটি টিলা আছে। এখানে গোকর্ণেশ্বর শিবের মন্দির; মন্দিরের মধ্যে তিন হাত উঁচু ও মোটা শিবমূর্তি। মূর্তিটীর বড় বড় চোখ, লম্বা জটা ও দাড়ি আছে। এক হাতে খর্পর ও অন্য হাতে ফুলের তোড়া। মূর্তিটী প্রাচীন। এই মন্দিরে গৌতম মুনির সমাধি মন্দির রহিয়াছে। এখান হইতে কিছুদূরে ৭০ ফিট উচ্চ অম্বরীষ টিলা। প্রবাদ: মহর্ষি দুর্বাসা মুনির কোপ হইতে সুদর্শনচক্র রাজা অম্বরীষকে এখানেই রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে একটী মহাবীরের মূর্তি আছে। নিকটেই ধ্রুব টিলাতে ভক্ত ধ্রুবের চরণযুগল রহিয়াছে।

সরস্বতী সঙ্গমের সম্মুখে জয়সিংহের ঘোড়াতে অনেকগুলি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে, আবার মাটি খুঁড়িয়া অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি বাহির করা হইয়াছে ও সে সকল স্থানীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ঘেড়ার মধ্যে সওয়াই রাজা জয়সিংহের নির্মিত পুরাতন মহল আছে। ইহার অগ্রে কংসের দুর্গ। বাদশাহ আকবর এই দুর্গের পুনর্নির্মাণ করান। বর্তমানে দুর্গটি ভগ্নস্তূপে পরিণত। এখানে একটি মন্দির মধ্যে দেবমূর্তি রাখা আছে। অম্বিকুণ্ডা ঘাটের কিছু আগে লাল পাথরের তৈরী একটি উচ্চ বেদী আছে, ইহাকে 'সতীবেদী' বলা হয়। অনেক পতিব্রতা স্ত্রীলোক এখানে সতী হইয়াছেন।

মথুরা ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সিদ্ধক্ষেত্র চৌরাসী নামে গ্রামটি জৈনধর্মাবলম্বীদের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে অন্তিমকেওলী শ্রীজম্বুস্বামী, মহামুনি বিদ্যুচ্চর ও তাঁহাদের অনুগত পাঁচশত মুনি কঠোর তপস্যার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। তাঁহাদের স্মরণার্থে এখানে ৫০০ শত স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখানে জৈন মন্দিরও আছে। মথুরাতেও, ছয়টী জৈন মন্দির ও জৈন ধর্মশালা আছে।

মথুরা সহরের মধ্যভাগে বিশাল জামা মসজিদ। মুসলমান রাজত্বকালে এখানকার

স্থানীয় শাসক আবদুল নবীখান্ এই মসজিদ তৈরী করান। প্রাচীন হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াই তৎস্থানে ও তাহারই উপাদানে মসজিদটী প্রস্তুত হইয়াছে—তাহা এখনও পর্যন্ত দেখামাত্রই স্পষ্ট বোধ হয়।

সঙ্গ্রহের মধ্যে মিউজিয়ামে বহু প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি; সে সময়ের টাকা পয়সা, শিলালেখ, প্রস্তরস্তূপ প্রভৃতি রক্ষিত আছে। মথুরার ভাষাকে ব্রজ ভাষা বলে, শুনতে বড় মধুর। এখানে পিতলের তৈরী নানা দেব-দেবীর মূর্তি, নানাবিধ বাসন ও ছাপান সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মথুরার পেঁড়া ও খুরচন্ প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব বিখ্যাত। কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইফোঁটার দিনে এখানে বিশেষ মেলা হয়।

মথুরা থেকে দশ মাইল দূরে আগরা যাইবার পথে রূপকতা নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাকেই রেণুকা-ক্ষেত্র বলে। এখানেই মহর্ষি জমদগ্নি মুনির আশ্রম ছিল। একটি উচ্চ টিলার উপর মহর্ষির মন্দির; তাহাতে জমদগ্নি ও রেণুকার মূর্তি আছে। নীচে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও পরশুরামের মন্দির। নিকটেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ ত্রিদেবের মন্দির। গঙ্গাদশহরা, পরশুরাম জয়ন্তী ও সোমাবতী অমাবস্যায় এখানে মেলা হয়। মহাকবি সুরদাস এখানে অনেকদিন বাস করিয়া ছিলেন। যমুনা এখানে পশ্চিম বাহিনী।

মথুরাপুরীর ছয় মাইল উত্তরে প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন তীর্থ যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বৃন্দাবন ভগবানের ভক্ত ও প্রেমিকদের নগর। প্রায় পাঁচ, ছয় শত মন্দির এখানে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল এই পবিত্র ভূমিতেই অধিক হইয়াছে। কংস যখন গোকুলে নানা উৎপাত করিতে লাগিলেন, নন্দ তখন গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনেই বসবাস করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের সঘন কুঞ্জ সকল, মনোহর বন উপবন এবং কালিন্দীর পবিত্র কূল প্রভৃতি এখনও পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চতুর্দিকের শ্যামল ক্ষেত্র ও বিস্তীর্ণ চারণ-ভূমি এখনও এখানে কৃষ্ণ-লীলার সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই পবিত্র তীর্থস্থানের মহিমা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে:

"গুহাদ্ গুহ্যতমং রম্যং মধ্যং বৃন্দাবনংভুবি।
অক্ষয়ং পরমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্॥
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্ম সুধাশ্রয়ম্।
মুক্তিস্তত্র রজঃ স্পর্শাৎ তস্মাদ্বাস্যং কিমুচ্যতে॥"

প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের জন্য ভারতের সর্ব প্রদেশ হইতে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ এখানে হয়।

॥ শংকরম ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th. September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

In seconding the Resolution, Babu Amarendra Nath Chatterjee begged leave to express his thanks to the Committee of Arrangement for the part they had assigned him, as it gave him an opportunity, as a Hindu of honouring the young Hindu reformer Swami Vivkaenanda, on whom, it appeared, as if the mantle of the *Rishis* had fallen to uphold and maintain and propagate the doctrines on our faith in foreign lands. It was a matter of rejoicing that Hinduism, so much at a discount with his English-educated countrymen, should have engaged the attention, and gained the respect of the philosophers of Europe and America, and it was no inconsiderable gain to the cause of Hindnism that it had found advocates in persons of light and leading, as Professor Max Muller and Mrs. Besant. He, the speaker, hoped and trusted that the effect of the triumph of the Hindu reformer in America would lead to permanent results in rekindling and reviving the enthusiasm of our countrymen, and in remodelling our educational system, in which religious and moral culture formed no part. He, the speaker, also hoped that our ancient religion would be found adapted to the circumstances of the times, and harmonise with the ideas of an ever-advancing civilization. from which large results are to be expected to elevate our position as Hindus.

Babu Hemendra Nath Mitter, M.A., B.L., in supporting the Resolution, said :—Brethren—It is with very great diffidence that I rise to address such a vast assembly on an occasion like this. The duty, which I have been called upon to perform, ought to have been entrusted to some one better fitted by a higher spiritual training to discharge it. Were it not for the occasion, I should have thought thrice before venturing to address from the platform of a hall which has resounded with the voices of some of our greatest living orators. But considering, as I do, that the meanest and the best cultured amongst us, whose good fortune it is to pride in a Hindu name, has a right to give vent to his feelings, I did not so much as once bestow a solitary thought on the propriety or otherwise of my rising to say the few words that I shall presently say. There are occasions, brethren, when it is the feeling that inspires and incites us to speak, and the language, which is only the medium of communication, is not to be taken into consideration, and I have no doubt but that you would show me the indulgence, which I consider I am entitled to receive at your hands.

Speaking in a meeting, specially convened for the purpose of expressing our deep sense of gratitude to, and appreciation of the services of Swami Vivekananda, one cannot help recalling to his mind his august and venerable preceptor and *Guru*, the Lord Ramkrishna Paramahansa Dev. Born in the petty village of Kamarpookur in the District of Hughly, he fixed as his place of *Sadhan*, the root of that tree, ever to be associated with the sacred name of Mahadeva, the *Bel tree* and a grove of trees, well-known as the *Panchavati* in the *Ka'liba'ti* at Dakshineswar. There in the eternal longing of a soul that pants for truth and higher spirituality, enshrined within the majesty of his own self, shutting up, as it were, the five organs of our material senses, after the right Oriental fashion, he made Self, and Self alone, his study, his contemplation. Unlike the modern scientists of the day, who seek in vain to evolve spiritual truths from material ones, he recognized the ancient principle that a perfect spiritual knowledge could be attained only by the spirit, and through the spirit. And so centering his whole inner consciousness in his inner self, he directed the same towards the attainment of *Brahmagnan* till grade after grade, step after step, that was to him an accomplished fact. Then, became manifest that splendid fire, one spark of which has set

ablaze a whole continent, and burnt to the very foundation the most advanced and the most civilized portion of the globe. For, were it not for the higher spiritual force, induced in him by his *Guru*, think you that Swami Vivekananda could have achieved what he did? Others with a so-called better education, with a so-called higher training, visited the continent on missionary tour, but it was reserved for Swami Vivekananda alone to impress the foremost scientists of the day with the majesty and beauty of our ancient *Aryan* teachings. The reason is obvious, and not far to seek. The great Master breathed into his ear the sacred word, and induced in him a spirituality which cultivated and developed as it was in his case, and moulded daily by the muttered shout of his *Diksha'-mantra*, fitted him for the great and arduous task he was destined to perform. For in his case, the *Mantra* came from a *Mukta-purusha*, from one who knew the key-note of the life he was to mould and impart to it the same that was to keep it harmonious right through. What wonder, then, that Swami Vivekananda should make his voice heard whenever and wherever it was sounded.

To the Swami, perhaps, any word of approbation or thanksgiving that we may offer to give expression to, is of absolutely no value, for has he not attained that height which the voice of praise and censure reaches not alike. But absorbed and engrossed, as we are, with one thousand and one longings and yearnings, we fail to realize that truth, and feel very great pleasure in doing what we have met here this evening to do. It is with the greatest pleasure, therefore, that in response to the call of your Chairman, I support the Resolution which has just been read over to you.

The Resolution was further supported by Babus Manoranjan Guha and Jotindra Lal Mittra in Bengali.

[The substance of their speeches is given below in English. For the original speeches *Vide* Appendix.]

Babu Manoranjan Guha said :—

Gentlemen—We are asked by many "Why is it a matter of congratulation that Hinduism has been successfully represented before the American people by Vivekananda?" Surely it cannot be expected that the *Mlacchas* will turn Hindus, because Hinduism has been ably expounded before them. To me it seems, however, that the

work of the Swami is not only a source of glory to us but will lead to good both spiritual and temporal.

In the first place, his work is a source of national glory. Ther was in former days, an empress who was deprived of her territorie and reduced to the condition of a beggar. She lived in a strange land, was clad in rags, dwelt in a hut, depending upon the charity of others But it was not known to anybody that in the midst of her wretchedness she had all the while a priceless jewel concealed in her bosom. When this fact came to the knowledge of the public, she was visited by thousands of people who in spite of her poverty accorded to her the honours due to an empress. Such is the condition of poor India of the present day. In former days she occupied the highest position among nations. Now she is a begger dependent upon others. But, my dear countrymen, remember that the priceless jewel of Hinduism still lies hidden behind her rags, in this day of her misfortune. The Swami has told the Americans of this hidden jewel, and they have been all taken by surprise. It is now beyond question that the glorious name of India shall be proclaimed throughout the world.

In the second place, allow me to dwell upon the temporal good sure to be brought about by Vivekananda's work. It is well known that our rulers are related by blood to the great American people. They belong to the same race, and speak the same language.

If equally with the Americans they are convinced that we are a noble people, who have made great spiritual progress, who possess a noble literature, a profound philosophy, then it may be hoped that we shall receive a kind and considerate treatment at their hands.

In the third place, it may be asked what is the spiritual good done by the Swami's work ? It seems to me that if the relation between the Governor and the governed be one of cordiality it is a state of things singularly favourable for spiritual culture. Good-will and peace must always be the basis of spiritual progress ; but it is idle to expect the promotion of such peace and good-will in the absence of those cordial relations.

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীগুরু প্রসঙ্গ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়। মূল্য—তিন টাকা, পৃষ্ঠা—২৬৪।

"শ্রীগুরু প্রসঙ্গ" শ্রীগুরু পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়ে প্রকাশ-ক্ষণকেই স্মরণ-সুন্দর শুধু করে নি, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মৃতি-অনুধ্যান ব্যক্তি অনুভূতিতে মিশে মুমুক্ষু মানুষের কাছে লোভনীয় করে তুলেছে। ধ্যানলোকের চেতনা কালো অক্ষরের বাঁধনে হয়েছে স্পন্দমান, শ্রীমুখের কথায় ঝরেছে অমৃতধারা, আর তাঁর মূর্তিটা সুবলয়িত হয়ে উঠেছে পাঠকের মনের কাছে। আপন গুরুদেবের পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন স্বামী জগদীশ্বরানন্দ; গ্রন্থের নামকরণে তারই সংকেত, সেই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যে বর্ণরাগ লেগেছে তাতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে।

নামকরণ যাই হোক নৈবেদ্যের ডালায় আলোচাল,-কলা,-বেলপাতা ছাড়াও দুএকটি সন্দেশ আছে, যেমন—চণ্ডীদাস, বাচস্পতি মিশ্র, শাক্ত কবি ও শাক্ত সঙ্গীত, পদাবলীতে গোপাললীলা প্রবন্ধগুলি—প্রত্যেকটিই তথ্যভারাক্রান্ত, উদ্ধৃতিবহুল। বৈচিত্র্যের জন্যে সংযোজিত হলেও, লেখক ইচ্ছা করলে নূতন আলোকপাত এগুলিতে করতে পারতেন। সাধারণ পরিচিতির সীমা পেরিয়ে যাওয়া বোধহয় লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

প্রশস্তি, পুণ্যস্মৃতি, তুরীয়-সংবাদ, তাপসপ্রসাদ, জীবন্মুক্তি, আশীর্বাদ (মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজের পত্রমালার সংকলন); গুরুবাণী, পথের আলো-শীর্ষক আলোচনাগুলিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। স্বামীজির আলোচনার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো সংস্কারমুক্ত এবং স্বল্পায়তনের মধ্যে বলার কথাগুলি সব উল্লেখ করা; রচনার ঢং স্বচ্ছ ঝরণার মত; মনের তৃপ্তি এবং চোখের আনন্দ দুইই পাওয়া যায়। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ওপর অনেক বই লেখা হতে পারে, কিন্তু স্বামী জগদীশ্বরানন্দের এই আলোচনার সুর স্বতন্ত্র, জ্ঞানপন্থী শিল্পের অনুভূতিরস এখানে মুখ্য কথা হয়ে উঠেছে। যীশুখ্রীষ্ট প্রবন্ধটা অপূর্ব—লেখক যে নানা শাস্ত্রে নিষ্ণাত তার চূড়ান্ত পরিচয়—এটা বহন করে।

লেখকের অপরাপর গ্রন্থের মত সদ্যপ্রকাশিত এই "শ্রীগুরু প্রসঙ্গ" পাঠক মহলে নিজের পরিচয় নিজেই দেবে।

অ. ক. হ.

॥ সংঘ-বার্তা ॥

অভেদানন্দ-জন্মতিথি-উৎসব :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিগত ২০শে আশ্বিন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ৯৩তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরে মঙ্গলারতি ও নাটমন্দিরে সমবেত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক স্তব ও ভজনাদি গীত হয়। তৎপরে পূর্বাহ্নে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, ভোগারতি, হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। উৎসব উপলক্ষে রচিত বিরাট ও সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের একদিকে উচ্চ বেদীতে শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের বৃহৎ প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। চারিদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের ছবি টাঙ্গানো হইয়াছিল। ধূপ, দীপ, ফুলের মালায়, আলোক সজ্জায় উৎসবস্থানে মনোহর ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজিদের স্তুতিমূলক গান শুনাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দদান করে। মধ্যাহ্নে সমাগত সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে অন্ন প্রসাদ বিতরিত হয়।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত সহযোগে কথকতায় পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের পুণ্য জীবন ও বাণী বর্ণনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী সর্বাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রচুর লোক-সমাগম হইয়াছিল। প্রারম্ভে শ্রীমৎ স্বামী দুর্গানন্দজী কর্তৃক পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে স্তুতি-বাচনের পর, মঠের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী সভার কার্যক্রমে গতানুগতিকতার ব্যতিক্রমের বিষয় বুঝাইয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এবারের নির্ধারিত ব্যবস্থা মত প্রথমে সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে পূজ্যপাদ অভেদানন্দজীর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তৎপরে এই সভার একমাত্র নির্বাচিত বক্তা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বামীজী মহারাজের অসাধারণ মনোবল, গুরুভক্তি, ত্যাগ ও তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করেন। সভায় সুগায়ক শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ভক্তিমূলক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভান্তে প্রসিদ্ধ বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল ও সম্প্রদায়ের বংশীবাদন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জন্মোৎসব :

আগামী ১৬ই পৌষ ১৩৬৫, বৃহস্পতিবার, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠানাদি হইবে। উৎসবের বিস্তৃত কর্মসূচী ১৬ই পৌষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত থাকিবে।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা - স্বামী অভেদানন্দ

পৌষ, ১৩৬৪
২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

STUDENTS

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। ফাল্গুন ১৩৬৪, বিশ্ববাণীর ২০শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা পঁচিশ নঃ পঃ, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ নঃ পঃ। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। বৎসরের যে কোন মাসে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়া যায়।

২। সাধারণতঃ, প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নামে বিশ্ববাণী পেশ্‌ট করা হইয়া থাকে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করিতে চাহিলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ চার পাতার এবং কবিতা এক পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। তবে কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদক কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৮। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনদাতা অনুগ্রহপূর্বক বিশ্ববাণী আফিসে আসিয়া অথবা আমাদিগকে পত্র লিখিয়া বা ফোন করিয়া উক্ত বিষয়ে সবিস্তার জানিয়া লইবেন।

● কাগজ ও মুদ্রণকার্যের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য আগামী ১৩৬৫ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে বিশ্ববাণীর বাৎসরিক মূল্য ৪·৫০ ন. প. ধার্য্য করা হইবে।

ম্যানেজার, 'বিশ্ববাণী'
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। শ্রীমা সারদা দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৫২৭	স্বামী দুর্গানন্দ
২। বৈদিক-সংস্কৃতি	... ৫৩৫	ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ
৩। ভাষ্যকার কি প্রতিবিম্ববাদী ?	.... ৫৪০	স্বামী সত্যানন্দ
৪। সংহিতা-দর্শনের ভূমিকা	... ৫৪৪	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি., ডি.এস ই.
৫। ভাষ্যের ত্রয়ী	... ৫৫০	অধ্যাপক শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর
৬। সংশয় (কবিতা)	... ৫৫৩	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
৭। সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ	... ৫৫৪	শ্রীকৃষ্ণদেব রায়, এম. এ.
৮। নন্দন	.... ৫৫৮	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	আমেরিকায়	.... ৫৬২	শ্রীরাধাবল্লভ দে, বি. এ., বি. এড.
১০।	ভারতের তীর্থদর্শনে	... ৫৬৫	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১১।	গ্রন্থ-সমালোচনা	... ৫৬৭	-
১২।	সংকলন	... ৫৬৯	
১৩।	সংঘবার্তা	... ৫৭৩	
১৪।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	... ৫৭৪	

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

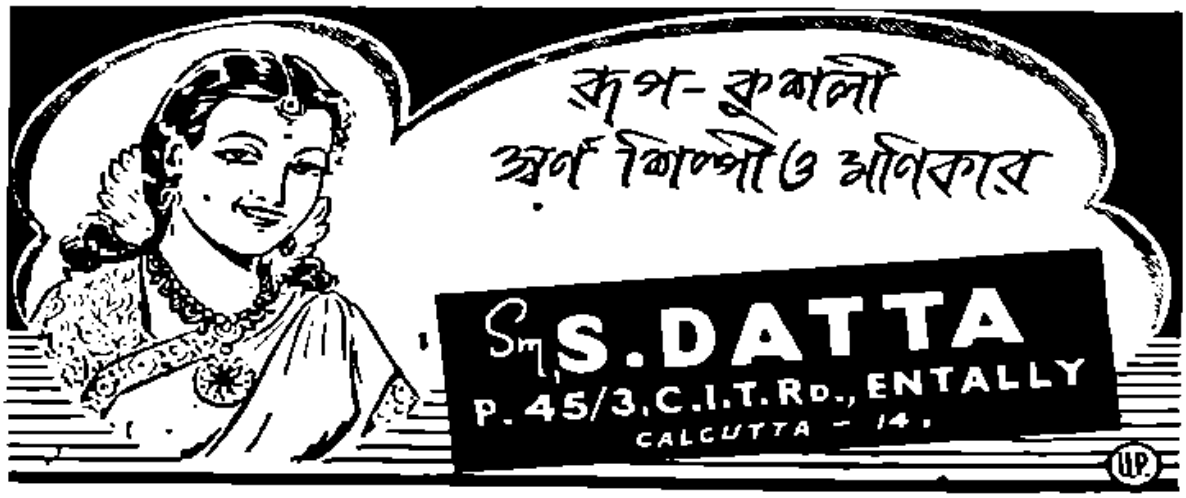

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সদাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য ফোঁড়ের মধ্যে দিয়ে দূষিত ও অবিশুদ্ধ রক্ত বেরিয়ে যায়, তাই রক্তকে পরিষ্কার করে; তাই রক্তদোষ প্রকাশের প্রধান উপায় বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিষের তীব্র যাতনা আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা রক্ত দুষ্ট করার যাবতীয় কারণের সর্বপ্রকার রক্তদোষ আরোগ্যকল্পে প্রযোজ্য। সর্বপ্রকার অসাধ্য রোগের বিরুদ্ধে ফোঁড় পাঠায় হয়, ফোস, পাঁচড়া, দূর হয়, একজেমা প্রভৃতি সকলরকম চর্মরোগ, রক্ত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিশুদের বিশেষ উপকারে হয়, মুখ ব্রণ শরীর হতে শরীর স্ফুর নিরোগ সুন্দর হয়ে যায়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল — বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লঙ্গথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্নিজেব্রাঞ্জ

অম্বল বমনোদ্রেক কৃমি পরিপাক বিশিষ্ট যাবতীয়
ট্যাবলেট আকারে প্রস্তুত

সক্রিয় যকৃৎগুণ সমন্বিত

চরক-বিজ্ঞানের ফলে ট্যাবলেটে ডেকক্সটোজ ২৫ গুণে বৃদ্ধি
পাইয়াছে বলিয়া ইহা সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (১ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

৮১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (হাতিবাগান বাজার) কলিকাতা ৪

ডাক্তার **ইন্দুমাধব মল্লিক**, এম. এ., এম্. ডি., বি. এল, আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—**ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড,** ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

শুভবিবাহে কাজের উপযোগী আধুনিক রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব সুসম্পন্ন নবকল্পিত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্, শাড়ী
জহরলাল পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ বেনারস, অমৃতসহর

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা: সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ভক্তির ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—**স্বামী শ্যামানন্দ** (গ্রন্থকার)
১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**
১৯বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা:-৬

ইহাই আদি ও অকৃত্রিম

ASCHARYA MALAM CHEMICAL WORKS PRIVATE LTD
KADMTALA HOWRAH

বিশেষ অবদান :—**"আশ্চর্য্যমহামৃত" সালসা**

মেহ, প্রমেহ, প্রভৃতি রোগে বিশেষ স্ত্রীরোগে এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ইহা অদ্বিতীয়।

"লিভালেক্স"

যাবতীয় যকৃৎঘটিত পীড়ায় বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে নিয়মিত সেবনে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

এই ঔষধগুলি খুব ভাল বলেই এত চাহিদা ?

- **গ্যাষ্ট্রোজাইম :** পেটের যাবতীয় পীড়া, পেটে বায়ু ও বেদনার জন্য খুবই কার্য্যকরী।
- **এসিডো :** অম্লরোগে ও অম্লত্বে অব্যর্থ।
- **ভি. অয়েন্টমেন্ট :** পোড়ায়, দাদ, একজিমা, গলিত কুষ্ঠ, কাটা, পোড়া ও সকল চর্ম্মরোগে অদ্বিতীয় মলম।
- **ও. কে. আইড্রপস্ :** চক্ষুরোগ ২৪ ঘণ্টায় সারায়।
- **সেপ্টোসিল :** ক্রিমি রোগে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ, শিশু ও বয়স্কদের সম উপকারী।

করুনজী কেমিক্যালস্ (প্রাঃ) লিঃ.
৭-ডি, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-১০

টেলিগ্রাম : পরিচর্য্যা। **ফোন :** ২৪-৩১৪৭

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

সবিনয়ে জানাইতেছি যে, বর্তমানে কাগজ, মুদ্রনকার্য প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক চাঁদা সডাক ৪।০ আনার স্থলে সডাক ৪৸০ আনা ধার্য করিতে বাধ্য হইলাম।

আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা এই সঙ্গত মূল্য-বৃদ্ধির কারণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কর্মসচিব
'বিশ্ববাণী'

STUDENTS' COMMON-ROOM P. G. A.

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ১১শ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৬৫

শ্রীমা সারদা দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

শ্রীমতী সারদাদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন মাত্র তিনি ষষ্ঠ বর্ষের বালিকা। কামারপুকুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রামকৃষ্ণের সহিত সন ১২৬৬ সালে বৈশাখ মাসে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যে বয়সে বিবাহ হইয়াছিল তখন বিবাহ যে কি তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেন না; সুতরাং খেলাঘরে পুতুলের বিবাহের মতই তাঁহার একটা ধারণা হইয়াছিল বলা যায়। বিবাহের পর প্রায় আট বৎসরের মধ্যে আর তিনি স্বামীকে দেখেন নাই। ১২৭৪ সনে যখন তিনি চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করেন তখনই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম তিনি স্বামীকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন হইতে তিনি শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বামী কলিকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরে এক ঠাকুরবাটীতে দেবীপূজায় নিযুক্ত আছেন; বিবাহের পর তথায় গিয়াছেন, কিন্তু তদবধি আর বাটীতে আসেন নাই এবং বর্তমানে তথায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তিনি উন্মাদের মত আচরণ করেন, মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেন, পরণের কাপড়ের ঠিক থাকে না ইত্যাদি। দিনের পর দিন লোকমুখে নানাপ্রকার প্রবাদোক্তি শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রাণের মধ্যে আঘাত লাগে, কিন্তু লজ্জাশীলা বালিকা কাহাকেও তাঁহার মনের ব্যথা প্রকাশ করিতে পারেন না, কেবল দুশ্চিন্তাই হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ইচ্ছা হয় স্বচক্ষে একবার স্বামীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু উপায় কি?

কয়েকদিন এইভাবে দুশ্চিন্তায় কাটিতে কাটিতে একদিন কামারপুকুর হইতে পিত্রালয়ে লোকমুখে সংবাদ আসিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন এবং

তাঁহার শ্বশ্রূমাতা পুত্রবধূকে নিজালয়ে লইয়া যাইবেন, তাই দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন। এই শুভ সংবাদে সারদাদেবীর বিমর্ষ চিত্ত উৎফুল্ল হইল এবং তিনি শুভক্ষণে স্বামীকে দর্শন করিবার প্রতীক্ষায় থাকিলেন। যাহা হউক পরদিন প্রভাতে তাঁহার পিতামাতা কন্যাকে নির্দিষ্ট শুভ-ক্ষণে শিবিকাযোগে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে পাল্কী কামারপুকুরে পৌঁছিল এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণী অগ্রে গিয়া সাদরে পাল্কী হইতে বধূকে নামাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে পাল্লীবাসিনী রমণীরাও ঐকালে উপস্থিত ছিল, তাহারা নূতন বউকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। শ্বশুরালয়ের আগমনী আনন্দ সারদাদেবী কিন্তু বেশ উপভোগ করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামী উন্মাদ—সেই দুশ্চিন্তাই তাঁহার দৃষ্টিকে অন্যদিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। যাহা হউক অবিলম্বেই তাঁহার সৌম্যদর্শন স্বামীকে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন যে, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই আছেন এবং প্রফুল্ল মুখে সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অনেক উপশম হইল, তিনি আশ্বস্তা হইলেন। অবশেষে সাক্ষাৎকালে তাঁহার সদয় ব্যবহার ও মিষ্ট আলাপে সারদাদেবীর বদ্ধমূল সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইল। পত্নীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সদালাপ করেন, তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, সদুপদেশ প্রদান করেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ লইয়া আনন্দ করেন। জগন্মাতার প্রসঙ্গ করিতে করিতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে মা মা বলিয়া ক্রন্দন করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে উন্মাদ শ্রেণীভুক্ত বলিয়াও মনে হয় না। ভাবাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান না থাকিলেও অন্য সময় তাঁহাকে সাধারণ লোকের মতই মনে হয়। সহজ অবস্থায় দেখিলে কেহই তাঁহাকে উন্মাদ বলিবে না। প্রেমিক স্বভাব, কিন্তু তথাকথিত লৌকিক দাম্পত্য প্রেমের ধার ধারেন না, ইহাই বিচিত্র কথা।

রমণীগণের মধ্যে জগজ্জননীর প্রকাশ দেখিয়া আজীবন মাতৃজ্ঞানে তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতেন; সুতরাং তিনি পত্নীর সহিত কখনও দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারেন নাই, বরং সখা বা সুহৃৎ বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতেন ও সুযোগ পাইলে ধর্মালোচনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্যবহারে সাধারণ দৃষ্টিতে দাম্পত্য মিলনের দিক হইতে এখানেই তাঁহার প্রভেদ দেখা যায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীমাও ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ভঙ্গ করিয়া কোনদিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের কাছে বলিয়াছেন,—"ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা কে বলিতে পারে? বিবাহের পর মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে—মা, আমার পত্নীর ভিতর হইতে কাম ভাব এককালে দূর করিয়া দে,—ওর (শ্রীমার) সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া এই কালে বুঝিয়াছিলাম মা সে কথা সত্যসত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন"।

চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই প্রথম স্বামীদর্শন হইলেও তখন তিনি বালিকাস্বভাব-সম্পন্নাই ছিলেন। দাম্পত্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ববোধ তখনও তাঁহার হয় নাই; সেই শক্তি, মাত্র বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল। কামগন্ধহীন নিঃস্বার্থ স্বামীর সঙ্গলাভে ও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আদর-যত্নে এবং অপূর্ব সদুপদেশে শ্রীমার পবিত্র হৃদয় কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন: "হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে"। কয়েক মাস পরে শ্রীমা এই অতুল আনন্দ-সম্পদের অধিকারিনী হইয়া জয়রামবাটীতে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পূর্ববৎ শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী মাতার পূজা-কার্যে ব্রতী হইলেন।

এই ঘটনার পর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; সারদাদেবীর ভাগ্যে আর স্বামী দর্শনের সৌভাগ্য বা সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, কিম্বা স্বামীও তাঁহার কোন সংবাদ আদান-প্রদান করেন নাই। লোকের মুখে মাঝে মাঝে শুনিতে পান যে, তাঁহার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এইরূপ প্রবাদ শুনিতে শুনিতে আবার তিনি বিচলিতা হইয়া উঠিলেন এবং কি উপায়ে সেই দেবোপম স্বামীকে দেখিতে পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বামীর দিক হইতে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের ত্রুটী হইলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্তব্য রহিয়াছে সারদা দেবীর মনে তাহাই মাঝে মাঝে আঘাত করিতে লাগিল। লোকাচার, দেশাচার ও শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে সেই কঠোর কর্তব্য পালন যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফাল্গুন মাস, দোল পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানের যোগ; পল্লীগ্রামের স্ত্রীপুরুষগণ এই যোগে অনেকেই বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নানে যায়। এই যোগে তাঁহাদের গ্রামেরও অনেক স্ত্রীপুরুষ গঙ্গাস্নানে যাইবেন, এই কথা শুনিয়া সারদাদেবীও তাঁহাদের সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, এই সুযোগে তিনি স্বামীকে দেখিতে যাইবেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কন্যার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঐ সকল যাত্রীর সহগামী হইলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে হাঁটিতে হাঁটিতে সারদা দেবী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে প্রবল জ্বরে আক্রান্তা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পিতা তখন গত্যন্তর না দেখিয়া এক চটিতে (পান্থশালায়) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক সেদিন তথায় বিশ্রাম করিয়া জ্বর ত্যাগ হইল। পরদিন প্রাতে দুর্বল শরীরে অতিকষ্টে আসিবার পথে, একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহাকে সেই শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বৈদ্যবাটী গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে নৌকা যোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রাত্রি নয়টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপ অসুস্থ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ কুটীরে পৃথক শয্যায় তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে···আর কি আমার মথুর আছে যে তোমার যত্ন হবে?" মথুর, রাণী রাসমণির দেব জামাতা, এবং তিনি রাণীর এষ্টেটের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ঠাকুরকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহযত্ন এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। কয়েক মাস পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাই ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া ঐকথা বলিলেন।

১২৭৮ সালে ফাল্গুন মাসে শ্রীমা ঠাকুরের নিকট পৌঁছিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের যত্নে ও ঔষধ-পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারিদিনের মধ্যেই শ্রীমা আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ঐ কয়দিন ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়া যথানিয়মে ঔষধ-পথ্যাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সুস্থ হইলে তাঁহাকে নহবৎ ঘরে আপনার জননীর নিকট থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীমার মনে এতদিন পরের কথায় যত কিছু সন্দেহ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, ঠাকুরকে স্বচক্ষে দেখিয়া ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সেই সকল আবর্জনা মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়া গেল। তিনি দেখিলেন তাঁহার দেবোপম স্বামী দেবতাই আছেন। এই দেখিয়া তিনি সন্তুষ্টা হইলেন এবং শ্বশ্রূদেবীর কাছে থাকিয়া প্রাণের উল্লাসে দেবতা ও দেব-জননীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। সারদা দেবীর পিতা কন্যাকে আনন্দে থাকিতে দেখিয়া কয়দিন পরে তাঁহাকে রাখিয়া হৃষ্ট চিত্তে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীমা এখন স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিলেন এবং পরিচর্যার মধ্য দিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বভাব এখন পঞ্চম বর্ষীয় বালকের মত হইয়াছে। দেখিলেন—দিব্যদর্শন সরল বালক ক্ষণে ক্ষণে মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকেন। অনুত্ত লোকে সেই দিব্য ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করে, কিন্তু ভাবাবস্থায় তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ মূর্তি দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত হয়? যে নাস্তিক পাপাচারী ও পাষণ্ড তাহারও চিত্ত বিগলিত হইয়া থাকে। স্বামীর এই দেবভাব লক্ষ্য করিয়া সারদাদেবী তাঁহাকে এখন আরাধ্য দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিলেন। স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া দক্ষিণেশ্বরের নহবৎ ঘরে যে দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তিনি স্বামী ও শ্বশ্রূদেবীর সেবায় কালাতিপাত করিতেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুঃসহ কষ্ট কিরূপে নীরবে সহ্য করিতে হয় শ্রীমা তাহা দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া অভ্যাস করেন এবং সেই সহনশীলতা লোকশিক্ষার জন্য আজীবন তিনি পালন করেন। আদর্শ জননীরূপেই তিনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সন্তান প্রসব না করিয়াও সন্তান-পালনের যে অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, নারীচরিত্রের যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, ভারত ও ভারতেতর দেশের জননীদের অবশ্যই তাহা অনুসরণীয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার

একনিষ্ঠ সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ মার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে যেন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণের আগমন হয়, মাও সে-কথা সত্যসত্যই শ্রবণ করেন এবং আদেশ দেন যে, অবিলম্বেই ঐ সব ভক্ত আগমন করিবে এবং তাহারা শিক্ষত্ব গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ সকল অন্তরঙ্গ ভক্তকে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক লোকশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, কথিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমা সারদাদেবীই তাঁহার প্রথম ভক্ত-শিষ্যা। * *

স্বীয় পত্নী সারদাদেবীকে ঠাকুর কি চক্ষে দেখিতেন ও কিভাবে কাছে রাখিয়াছিলেন, তাহারও ইঙ্গিত আমরা তাঁহার ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠানে পাইয়াছি। আমাদের মনে হয় তাঁহার এই মহাপূজার অনুষ্ঠান অসংযত ভোগৈকসর্বস্ব মানবসাধারণের শিক্ষার জন্য। অবতার পুরুষগণের ইহাই ধারা,—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিতেন: "আমি ষোল টাং করলাম, তোরা এক টাং অর্থাৎ ষোল ভাবের এক ভাগও করবি বলে"। কথামৃতে আছে: "মেয়েমানুষের কাছে থেকে এত সাবধান থাকতে হয়; ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই"।

শ্রীসারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী কালিকা পূজার রাত্রে, তাঁহারই গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সোপচারে ষোড়শী পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরাসুন্দরী ইহারই নামান্তর। ষোড়শী পূজায় শ্রীশ্রীভগবতীর কোন ভয়ঙ্করী মূর্তি কল্পনা করা হয় না। মহামায়া এখানে সর্বসৌন্দর্যময়ী সর্বকল্যাণদাত্রী ও আনন্দময়ী—এই ভাবেই ধ্যান করিবার বিধান আছে; যাহা হউক পূজার আয়োজন সুসম্পন্ন হইলে শ্রীসারদাদেবীকে নহবৎ ঘর হইতে ঠাকুর নিজকক্ষে আনিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন এবং শ্রীমাও অবিলম্বে তথায় আগমন করিলেন। ঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী তিনি নববস্ত্র পরিধান করিলেন এবং আলপনা দেওয়া নির্দিষ্ট পিঁড়ির উপর উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণদ্বয়ে আলতা পরাইয়া কপালে সিন্দূর ও চন্দনের তিলক দান করিলেন। পরে ধূপদীপাদি উপচার প্রদানপূর্বক বিহিত বিধানে পূজা করিতে করিতে শ্রীমার মধ্যে শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরীদেবীর সাক্ষাৎ ধ্যানমূর্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন মায়ের শ্রীপাদপদ্মে তিনবার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলী প্রদানপূর্বক আপনার জপমালাটিও সমর্পণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীশ্রীসারদাদেবীও সত্য সত্য আপন অন্তরে জগদম্বার পূর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। ষোড়শী পূজার এই অপূর্ব অনুষ্ঠান জগতে সত্যই অভিনব ব্যাপার। এই মহাপূজার পুণ্যফলেই বিবাহিত জীবনেও উভয়েই আকুমার ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী এবং সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। দৈহিক সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে শুধু আত্মায় আত্মার এরূপ মধুর মিলন কল্পনারও অতীত। শ্রীমার মধ্যে ঠাকুর যে ঈশ্বরী মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং তিনি ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

STUDENTS

তিনি বলিয়াছেন,—"মার যত রূপ দেখেছি, তাঁর রাজরাজেশ্বরী মূর্তি সৌন্দর্যে অনুপম—তার তুলনা নেই"। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও তাঁর সখীভাব সাধনায় ইতিপূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি পুনরায় তিনি সখীভাবেই এ সময় থাকিতেন। আপনাকে জগন্মাতার সখী বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করায় মন হইতে তাঁহার পুরুষভাবটি সরিয়া গিয়াছিল এবং সেই সখীভাব অবলম্বন করিয়াই তিনি সারদাদেবীকে আপন শয্যায় স্থান দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: "তা না' হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখে-ছিলাম কেমন ক'রে? দু'জনেই সখী ভাব"। এ ঘটনা সত্যই অতুলনীয়।

উন্নিখিত ষোড়শী পূজার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি আরও গভীর ভাবে হইতে থাকিল, ফলে সারদাদেবীকে সেজন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া সতর্কে থাকিতে হইত। এক এক রাত্রে এমন প্রগাঢ় ভাবসমাধি হইত যে, কিছুতেই তাহা ভঙ্গ হইত না, সেজন্য তিনি ভীতা হইয়া পড়িতেন। একদা ঐরূপ হইলে শ্রীমা আশঙ্কিতা হইয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামলাল তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে মার নাম শুনাইতে থাকিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমাকে ঐরূপ অবস্থায় মার নাম শুনাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমা তদবধি গভীর সমাধি উপস্থিত হইলে নাম শুনাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেন। ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে রহিয়াছেন, কি করিতেছেন, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীমা রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণিত প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ভাবেই তিনি নিজের জীবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকিবে তিনি তাঁহাকেই দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে"।

স্বামীর নিকট নিরন্তর অবস্থান করিয়া এবং তাঁহার এইরূপ জ্ঞানভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া, কিরূপে সংসারে থাকিয়াও ভগবান লাভ হয় তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিয়া-ছিলেন। তাঁহার স্বামীকেই তিনি ইষ্টবোধে পূজা করিতেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকিতেন। লজ্জা, ধৈর্য, দয়া, ক্ষমা, স্নেহ ও সেবার সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি দিবারাত্রি অবস্থান করিলেও, কালীবাড়ীর কর্মচারী কৃত্য পূজক সাধু অতিথি অভ্যাগত কত শত লোক নিত্য দেবালয়ে আসা-যাওয়া করিত কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইত না, এমন কি তাঁহার তথায় অবস্থিতিও কেহ কখন টের পাইত না; এমনই নিঃশব্দে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও কোনদিন তাঁহার কথার স্বর পর্যন্ত শুনিতে পাইতেন না। গভীর নিশীথে

সকলেই যখন নিদ্রাভিভূত তখনই তিনি জাগরিতা হইতেন এবং স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিতেন। যিনি ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিয়া শ্রীমার তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই একনিষ্ঠ সেবক স্বামী যোগানন্দজী বলিয়াছেন : "আমি মাকে লইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, বহু তীর্থস্থানে লইয়া গিয়াছি, গাড়ী হইতে নামান উঠান পর্যন্ত আমাকেই করিতে হইয়াছে, কিন্তু মার শ্রীচরণের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই"। হিন্দু সমাজের মহিলা চরিত্রে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

নহবতের স্বল্প পরিসর কক্ষে কিরূপ কষ্টে তিনি দিবারাত্রি কাটাইতেন তাহা ভাবিলেও অন্তস্তপ্ত হইতে হয়। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শয্যা, আহারীয় দ্রব্যাদি ও বাসনপত্রাদি রাখিয়া, মাত্র একটু বসিবার স্থানও সংকুলান হইত না; এইটুকু সংকীর্ণ স্থানেই আবার রান্না খাওয়ারও ব্যবস্থা করিতে হইত। এরই মধ্যে আবার ভক্তগণের আতিথেয়তাও অনেক সময় করিতে হইত। সংসার বিরাগী সন্তানগণের জন্য ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে অনেক সময় খাদ্যাদিও প্রস্তুত করিতে হইত। সরলা মা, নির্বিকার চিত্তে সানন্দে ঐ সকল ঝঞ্ঝাট ঝামেলা অবাধে সহ্য করিতেন, এমনই ছিল ধৈর্যশীলতা।

একদা শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না; পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল—তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর!" এইরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিতে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাব-ভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। * * * ঐরূপে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিককাল গত হইল কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ঠাকুরাণীর সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিল না। এমন কি ক্ষণেকের জন্যও ভুলিয়াও তাঁহাদিগের মন প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না। * * * এই সময়েই একদিন শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই"। পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না ঠাকুরাণীর এই কালের এইরূপ লীলাবিলাসের যে অপূর্ব কথা তাঁহার সন্তানগণ

ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোন মহাপুরুষের সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হয় নাই।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবনোপদেশগুলিও কিছু কিছু উদ্ধৃত ও সংযোজিত করিলাম :

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভগবদ্ভাবে বিভোর, ঐশ্বরিক প্রেমে উন্মত্ত, ভগবান ভিন্ন অন্য কোন লৌকিক ভোগের চিন্তা যাঁহার মনে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পাইত না, কেন তিনি তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন? তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা তাহার গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারি। তিনি বাল্যকালের মনোভাব স্মরণ করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন : "এতো ভেবেছিলাম, বিয়ে করবো, শ্বশুরবাড়ী যাবো, সাধ-আহ্লাদ করবো, কি হয়ে গেল"। তিনি অনুভব করিতেন,—অন্তরে কে একজন তাঁহাকে সকল কার্যে নিয়োজিত করিতেছেন, বিচার করিয়া তিনি কিছু করিতে পারিতেন না। সুতরাং দেখা যায় তাঁরই প্রেরণায় সরল বালকের মত তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন। পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া নয়, উদার চিত্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ;—আবার বলিতেন, ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কার পালনীয় তাই বিবাহ করিতে হয়। যাহা হউক তাঁহার বিবাহ-সংস্কার হইয়াছিল ঈশ্বর দর্শনের পর। তিনি বলিয়াছেন, "আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। কাঁচা মন সংসারে রাখতে গেলে মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, কলঙ্ক না লাগে গায়'। আর তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে দুধে রাখলে মিশে এক হয়ে যায়; আর খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দুধকে নির্জনে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর জলে মিশবে না। নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে। জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসার-জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।" ● ● ● তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দু'জনে করে। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী বোধ করে ও সেবা করে। ছেলেদের খাওয়ায়—যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছে। তবে এরূপটী হতে গেলে দু'জনেরই ভাল হওয়া উচিত। "ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার—কামিনী কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান"।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অভূতপূর্ব আচরণ, পবিত্র চরিতাবলী ও তাঁহার অমূল্য উপদেশ বাণী আমাদের ন্যায় অজ্ঞান সন্তানগণের কল্যাণের জন্য। কল্যাণকামী মানবের পক্ষে, দাম্পত্য জীবনে এ আদর্শ একান্ত অনুসরণীয়।

বৈদিক সংস্কৃতি
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ
(দ্বিতীয় পর্যায়)

গীতা বেদার্থের সার। গীতার সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে, বৈদিক সংস্কৃতির বিষয়েও তাহা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। মানুষের আসুরিক প্রকৃতি তাকে কাম ক্রোধ লোভ মোহের রাজ্যে আবদ্ধ রাখে। মানুষকে এই সব দুষ্প্রবৃত্তির প্রতাপকে খর্ব করতে হবে, তার আচরণ—তার চরিত্রকে উচ্চতর ও মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাই ত ঋগ্বেদে প্রার্থনা পাই :

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
মা সুচরিতে ভজ।
উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতা ২ ঽ অভূম।

হে দ্যুতিময় পাবক, দুশ্চরিত্র হইতে আমাকে পরিত্রাণ করো, অসত্যের ও অকল্যাণের মার্গ থেকে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করো; দেবগণের অমৃত জীবনের পথে আমি উঠেছি—আয়ুর দিব্য তেজে আমার উন্নয়ন, যে আয়ু সৎ ও সাধু কর্মে নিরত, সেই ক্ষেমঙ্কর শিবময় আয়ুতে অধিষ্ঠান হয়েই আমার উত্থান। চারিত্রিক পরিশুদ্ধি তাই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান। মানুষ সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় স্বস্তি পন্থার অনুসরণ করবে :

স্বস্তি পন্থামনু চরেম
সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা
জানতা সংগমেমহি।

সূর্য ও চন্দ্র জ্যোতির্লোকের দুই প্রদীপ্ত প্রহরী—অলঙ্ঘ্য অনতিক্রম্য বিধানে তাদের প্রতিনিয়ত গতি। কল্যাণের পথে মানুষের চাই এই অনমনীয় দৃঢ়তা—এই দুর্জয় অনুরাগ এই দুর্লভ আসক্তি। তার জন্য চাই সাধুসঙ্গ। সৎসঙ্গে মানুষের উন্নয়ন ও অভ্যুদয়, তাই তাঁদেরই সহবাস কর্তব্য—যাঁরা দাতা, উদার হৃদয়ে যাঁরা ত্যাগ করেন, যাঁরা অন্বেষী অহিংসক, মৈত্রী ও করুণায় যাঁরা পরিপূর্ণ, যাঁরা জ্ঞানী—সত্যের উপলব্ধিতে যাঁরা ভাস্বর ও প্রদীপ্ত।

এই ঊর্ধ্বাভিসারের পথে মনকে গড়তে হবে। মনের সৃষ্টিই ত বিশ্বজগৎ—সেই মনকে শুভ সংকল্প নিতে, শুভ ব্রত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যজুর্বেদে এই শিব সংকল্পের চমৎকার শ্লোকমালা আছে—তার একটি মাত্র এখানে তুলছি :

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ
যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্ প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে
তন্মে মনঃ শিব সংকল্পমস্তু॥

মনেই ত সর্ব কর্মের প্রতিষ্ঠা। সেই মনেই ভদ্র জীবনের আকূতি যেন জাগে। শক্তি ও সাধুতার প্রেরণ যেন সেখানেই উৎসের মত কাজ করে। কারণ মনই ত প্রজ্ঞানের, চিত্তের পরমা ধৃতির জন্মস্থান। জীবলোকের অন্তরে মনই অমৃতজ্যোতি—যে মনের ইঙ্গিত না পেলে কোনও কর্মই সম্পন্ন হয় না—আমার সেই মন শিব-সংকল্প হোক, শুভব্রতে তার আসক্তি জাগুক, কল্যাণ কর্মে তার উদ্দীপনা জাগুক।

রাজস ও তামস প্রকৃতির অধোগতি হতে মানুষকে উঠতে হবে সাত্ত্বিক প্রকৃতির আলোকে। সত্য ও ঋতের দীপ্ত প্রভায় সেই পথই উচ্চতর দেবজীবনের সোপান—আত্মার অভ্যুদয়ের ও জাগরণের সেতু।

ভদ্র ও কল্যাণময় নৈতিক জীবনের যাত্রা যখন দৃঢ়, তখনই মানুষের মাঝে দ্বিজত্বের সূচনা। পাশব ধর্মের ও আসুরিক প্রকৃতির স্তর থেকে মানুষ তখন দেবলোকে ও দেবচিত্তে আরোহণ করে। বেদ সেই প্রার্থনাই করেছেন :

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজুয়তাম্
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং
দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে॥

ঋগ্বেদের সর্বোত্তম কবি গোতম রাহুগণ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। তিনি বলছেন : "দেবগণের কল্যাণী সুমতি সরল হয়ে আসুক আমাদের জীবনে—তাঁহাদের প্রসন্ন প্রসাদে আমরা যেন সমৃদ্ধ হই, দিন তাঁহারা বরাভয়, দিন অমোঘ আশীর্বাদ, আমাদের জীবনে নামুক দেবতাগণের সখ্য—

আমরা যেন দেবগণের সমপ্রাণতা লাভ করি—আমরা যেন পুণ্য ও পাবন জীবনের বিবর্ধনের জন্য দীর্ঘ আয়ু লাভ করি।

কিন্তু দেবগণের সহিত সমপ্রাণতা বলতে কি বুঝব? বুঝবার প্রথম কথা দেবতা কি? দেবতা কি তথাকথিত প্রাকৃতিক শক্তি? না, আমাদের ঋষিরা জানতেন দেবতা সেই একেরই মূর্তি। বিশ্বকর্মা ভৌবন ঋষি বলছেন:

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥

যিনি আমাদের জনক, যিনি পালয়িতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি সর্বলোককে চেনেন, সর্ব বস্তুকে জানেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। দেবগণ সেই একেরই বিচিত্র এবং বিভিন্ন নাম—তাঁকেই সকলে সপ্রশ্ন উদ্গমন করে। অতএব দেবতার সখ্য—সেই পরমেরই সখ্য—সেই অব্যক্ত অনন্তের ভাবাধিগম।

বৈদিক-সংস্কৃতি তাই ভাগবত জীবনের আমন্ত্রণ। সমস্ত জীবনই যজ্ঞ, সমস্ত কর্মই আরাধনা। মানুষকে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে—সেই পিতা, সেই বন্ধু, সেই ভ্রাতা—সেই আত্মার পরমাত্মীয়কে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণই যোগ, ইহাই সাধনা, ইহাই যজ্ঞ ও তপস্যা।

যাঁরা ভাবেন বেদ কেবল কর্মবহুল যাগের কথাই বলেছেন, তাঁরা বেদের নিগূঢ়ার্থ বোঝেন না। কিন্তু নিগূঢ়ার্থ না জেনেও দেখা যায়—বেদ যজ্ঞের অন্তরে যাওয়ার কথাই বলেছেন:

ন কিষ্টং কর্মণা নশদ্
যচ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্ত্তম্ ঋভ্বসম্
অধৃষ্টং ধৃষ্ণোনসম্॥

যে পরমের ক্রিয়া এই বিশ্বভুবন, যিনি সদা বৃদ্ধিলাভ করছেন, কেহই তাঁকে কর্মকাণ্ডের আড়ম্বরে লাভ করতে পারে না। ইন্দ্র, যিনি সর্বজনপ্রিয়, যিনি অপরাজেয়, ওজস্বিতায় যিনি মহাসাহসী—তিনি কেবল যজ্ঞের দ্বারা লভ্য নন।

অধ্যাত্ম-জীবনের চরম কথা—আত্মনিবেদন। কায়মনোবাক্যে যখন মানুষ দেবশক্তির নিকট আপনাকে সমর্পণ করে, তখন সেই জ্যোতিশিখা মানুষকে পথ দেখিয়ে নেয়। সেই সচ্চিদানন্দের আনন্দে তখন সবই পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। তখন সকলই মধুময় হয়ে যায়। তখন মানুষ চোখে দেখে ভদ্র, কাণে শোনে ভদ্র, তখন তার সকল কর্ম দেবকর্ম হয়—সকল চেষ্টা পূজা ও আরাধনায় পরিণত হয়, তখন তার আয়ু দেবহিতে নিয়োজিত হয়।

চাই কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। বাসনার কলুষে কলুষিত জীবন থেকে আলোকের কর্ণধারায় নিজেকে ধুয়ে নিতে হবে—চাই শ্রদ্ধা, চাই নিষ্ঠা, চাই অন্তরের গভীরতম বিশ্বাস।

ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা হুত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।

হে জীবাত্মা—তুমি চন্দ্রমাস্বরূপ, তুমি সোম, তুমি পরব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত হও সোম-ধারার মত। তুমি ঋত বচনের অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে, সত্যের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে, শ্রদ্ধা ও তপস্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে প্রবাহিত হও। মানুষের জীবনের সমস্তই যখন এই ভাগবতরসে সিঞ্চিত, ভাগবতদ্যুতিতে আলোকিত, ভাগবত-বীর্যে উদ্দীপিত, তখনই এই সংসারেই আসে পরমা শান্তি, মুক্তি ও ব্রাহ্মী স্থিতি।

বৈদিক ঋষি পরমাত্মার প্রসন্ন প্রসাদ যাচ্ঞা করেন—কারণ মেধার দ্বারা বা প্রবচনের দ্বারা ব্রহ্ম লভ্য নন। যখন বুদ্ধি ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়, তখনই পাই করুণা—সেই করুণার জন্যই ব্রহ্মচর্য। বাক্ যেখানে বলছেন :

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রাহ্মণং তং ঋষিং তং সুমেধাম্।

আমি নিশ্চিত বলছি—এই বাক্য দেব ও মানুষ—উভয়েরই প্রিয়। যাকে আমি ভালবাসি তাকেই দেই শক্তির সাম্রাজ্য, ব্রহ্মবিদ্যার পাণ্ডিত্য, তাকেই করি ঋষি ও সুমেধা। অতএব আমরা গর্ব ও অহঙ্কার ভুলে মাথা নত করতে শিখি বিশ্ববিধাতার চরণতলে লুটিয়ে, চোখের জলে সকল অহঙ্কার ঘুচিয়ে আমরা যেন পাই সেই অহেতুক কৃপা—সেই দৈবী প্রসাদ—সেই ভাগবতী আশীর্বাদ।

বৈদিক সংস্কৃতি অমৃত-বিদ্যা। মানুষকে সে জলদগম্ভীর স্বরে বলছে—"উত্তিষ্ঠ জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্ নিবোধত"। মানুষ হয়েই যখন আমরা জন্মেছি, তখনই পরমাত্মার বীর্য আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—তাইত আমরা হীন নই, দীন নই, ক্লীব নই, আমরা সকলে অমৃতের সন্তান।

অমৃতের আলোক তাই অপ্রাপ্যের প্রাপ্তি নয়—যা কেবল ছিল আচ্ছন্ন, যা ছিল আবরিত—এ তারই উদ্ভাসন। তিমিরের যবনিকার অপসারণ হলেই জলবে সেই সর্বজ্যোতিস্মর মহিমা।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বিশ্বধাম্ আদিত্য বরুণ ঋষি : "শৃণ্বন্তু অমৃতের পুত্রগণ। তোমরা সকলে দিব্যধামবাসী—তোমরা শোনো—শোনো"। মানুষের দেহ তাই ঘৃণার নয়—সে যে দেবমন্দির শুচিশুভ্র ও

পাবন। আর সেই মন্দিরে বাস করেন আপনি পরমাত্মা—যিনি অমৃতময়, আনন্দময়, সুখময়, শিবময় ও জ্যোতির্ময়।

বৈদিক-সংস্কৃতির নাম শুনলে যাঁরা ভয় পান, যাঁরা আতঙ্কিত হন,—ভাবেন এই পুরাতন-প্রীতি সর্বনাশের পথ। তাঁদের বলব—হে সুপ্রিয়! জনরবেই বিচলিত হয়ো না—আস্বাদন কর, বেদ-বিদ্যার সুধাধারা আস্বাদন কর।

বেদ মানুষকে তুচ্ছ করেন নি। অথর্ববেদে পাই :

তস্মাদ্ বৈ বিদ্বাম্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি মানুষকে যখন জানেন, তখন জানেন মানুষ সেই ব্রহ্মের স্বরূপ—গাভী যেমন গোষ্ঠে থাকে, তেমনই সব দেবতারা মানুষের অন্তরে বিরাজমান থাকেন। সেই আত্মদর্শনেই সর্ব দর্শন।

অকাম ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্॥

সেই পরমাত্মা কামনাহীন, মৃত্যুহীন—অমৃতের উৎসবে তাঁহার মহোৎসব, তিনি স্বয়ম্ভূত, তিনি আনন্দময়, তিনি পরম পরিপূর্ণতা—কাহারও ন্যূন ন'ন,—সেই আত্মাকে জানো, সেই আত্মাকে চেনো; ধীর, জরাহীন, চিরযুবা সেই আত্মাকে জানলেই আর মৃত্যুভয় থাকে না।

মানুষকে তাই হতে হবে নিষ্কাম। ফলাশায় যে কর্ম, তাহা ব্যর্থ। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে যখন কাজ করি, তখন সে কাজ অধ্যাত্ম-উপাসনায় পরিণত হয়, ভাগবত-যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব তাকে যেন বিচলিত না করে—কারণ আত্মা চির শান্ত, চির ধীর। মৃত্যু মানুষের নয়। দেহের নাশ আছে—দেহীর নেই। বিশ্বভুবন মধুতে ওতঃপ্রোত—সেই মধুধারায় অবগাহন করো—সবই আনন্দময় হয়ে যাবে। তখন তুমি পরমানন্দরসে ডুবে থাকবে। তখন তোমার শক্তি ও বীর্য হবে অসীম—কারণ তুমি শক্তি, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের মূল কেন্দ্র থেকে পাবে অনন্ত প্রবাহ। বৈদিক-সংস্কৃতি এই মহিমময় মন্ত্রের ধারক ও বাহক—আসুন আমরা ভারতের সেই গুরুতরা প্রজ্ঞা গ্রহণ করে স্মরণীয় ও বরণীয় হই।

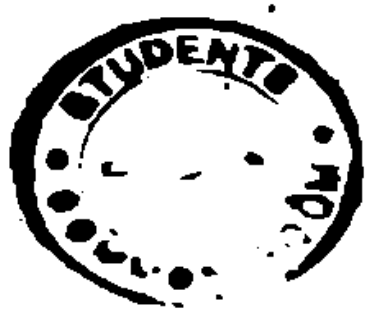

ভামতীকার কি প্রতিবিম্ববাদী ?

স্বামী সদানন্দ

আচার্য বাচস্পতি অদ্বৈত বেদান্তের স্তম্ভস্বরূপ। ষড়্‌দর্শনের টীকাকার হিসাবে তাঁহার নাম ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর তাঁহার 'ভামতী'-টীকা স্থানে স্থানে অতিশয় দুর্বোধ্য ও গম্ভীর। এই টীকায় বাচস্পতি মিশ্র অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি এতই অভিনব যে, তাঁহার টীকার নামানুসারে 'ভামতী'-প্রস্থান নামে অদ্বৈত বেদান্তের একটী স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে তাঁহার ভাষা ও রচনাকৌশল অতীব জটিল, এইজন্য তাঁহার মতবাদের কোন কোন অংশে পণ্ডিতগণের সংশয় আছে। আমরা এইরূপ একটী স্থল লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী না প্রতিবিম্ববাদী ?—এই বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন আছে। আধুনিক কোন কোন গ্রন্থে বলা হয় যে, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী। আধুনিক কোন কোন পণ্ডিতও এইরূপ মত পোষণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি। অবশ্য প্রাচীন কালেও বাচস্পতির মতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ ছিল। তাহা না হইলে 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকা-গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিত এই বিষয়ে বিভিন্ন মতের বিচার করিতেন না। তিনি তাঁহার টীকায় 'বাচস্পতি প্রতিবিম্ববাদী না অবচ্ছেদবাদী' এই বিষয়ে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উভয় মতের পক্ষে ভামতীর বাক্যসকল সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অপ্পয় দীক্ষিতের এইভাবের বিচার অনেক সময় বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি অপ্পয় দীক্ষিতের সকল বাক্য সুষ্ঠু বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী ছিলেন। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দুইটীর যে কোন মতবাদ গ্রহণ করিলেও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের

কোন ক্ষতি হয় না, তবুও ভামতীকারের দার্শনিকতা বুঝিতে হইলে এই সন্দেহের সমাধান প্রয়োজন।

আলোচনার প্রথমে দেখা দরকার অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার 'কল্পতরু-পরিমল'-এ কোন্ পক্ষে রায় দিয়াছেন। 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকা 'কল্পতরু'-র টীকার টীকা। 'কল্পতরু' আবার 'ভামতী'-র টীকা। ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ সূত্রের ব্যাখ্যার শেষে 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকায় বিস্তৃত-রূপে আলোচনা হইয়াছে যে, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী না অবচ্ছেদবাদী। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকায় এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত এমন ভাবে করা হইয়াছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ঠিক করা কঠিন যে, ভামতীকার কোন্ পক্ষে। তবে আমরা যদি 'ভামতী', 'কল্পতরু', 'কল্পতরু-পরিমল' এবং অন্যান্য আচার্যগণের উক্তির সামঞ্জস্য করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব ভামতীকারের মতবাদ কোন্‌টী। সেইজন্য 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকায় যে ভাবে পক্ষদ্বয় উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই প্রধান আলোচ্য।

এই টীকায় প্রথমে দেখান হইয়াছে যে, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী। প্রত্যেকটী যুক্তির বিশ্লেষণ করা যাক্।

১। অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতীকার কৌশলে পূর্বপক্ষীর হইয়া এমন কথা বলিয়াছেন যাহাতে মনে হয় তিনি প্রতিবিম্ববাদী। পূর্বপক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ এই যে, রূপবান্ দ্রব্যই অন্য কোন রূপযুক্ত দ্রব্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে।(১) এইরূপ উক্তির দ্বারা পূর্বপক্ষী বলিতে চান যে, যে-বস্তুর রূপ আছে উহাই অন্য কোন রূপযুক্ত বস্তুর ছায়া বা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। যেমন দেখা যায়, স্ফটিক মণির নিকটে রক্তবর্ণের ফুল থাকিলে, ঐ রক্তবর্ণের ফুলের ছায়া স্ফটিক মণিতে পড়ে। মণি ও ফুল উভয়েই রূপবান বস্তু। এইস্থলে পূর্বপক্ষী প্রতিবিম্ববাদের কথা বলিতে চান, ইহা সহজেই বুঝা যায়। 'ভামতী'র টীকা 'কল্পতরু' এবং উহার টীকা 'কল্পতরু-পরিমল, উহাদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ অর্থেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। টীকাকারেরা বিন্দুমাত্র বলেন নাই, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিতেছেন কিনা। এইস্থলে আরো একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহা বলা হইয়াছে পূর্বপক্ষের মুখ দিয়া। যদি ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ না করেন, তবে ঐ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহাও তিনি করেন নাই। মুস্কিল হইয়াছে সেইজন্যই। পূর্বপক্ষীর উপরোক্ত স্থলের যুক্তি এইরূপ: রূপযুক্ত বস্তু যেহেতু অন্য কোন রূপযুক্ত বস্তুর ছায়া গ্রহণ করে, ইহাই নিয়ম, তখন আত্মা রূপশূন্য বলিয়া তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবে ? অতএব আত্মার প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

যাঁহারা ভামতীকারকে প্রতিবিম্ববাদী বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ: সাধারণতঃ দেখা যায় পূর্বপক্ষের যে-সকল মতের সহিত একমত হওয়া যায়, ঐ

(১) "রূপবদ্ধি দ্রব্যম্ অভিধীয়তে রূপবতো দ্রব্যান্তরস্য তদ্বিবেকেন গৃহ্যমানস্যাপি ছায়াং গৃহ্ণাতি।"

সকল মতের সিদ্ধান্তে খণ্ডন করা হয় না। তখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্বপক্ষের ঐ সকল মত সিদ্ধান্তেও স্বীকৃত হইয়াছে। এইস্থলে ভামতীকার পূর্বপক্ষকে দিয়া প্রতিবিম্ববাদের খণ্ডন করিয়াছেন। যদি ঐ খণ্ডন তাঁহার মনঃপূত না হইত, তাহা হইলে তিনি উহার খণ্ডন করিতেন। কাজেই বুঝিতে হইবে প্রতিবিম্ববাদ ভামতীকার স্বীকার করেন না।

কিন্তু যাঁহাদের মতে ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী তাঁহারা বলেন যে, সত্যই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ভামতীকার খণ্ডন করেন নাই এবং উহাতে মনে হইতে পারে যে, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী। তবুও বলা যায় যে, খণ্ডন না করার পিছনে ভামতীকারের উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হইল, পূর্বপক্ষের যুক্তি অসার, সেইজন্যই উহার খণ্ডনের প্রয়োজন হয় না।(১) রূপবান বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে এমন কোন নিয়ম নাই। এমন অনেক বস্তুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে দেখা যাইবে যে, অরূপ বস্তুরও প্রতিবিম্ব পড়ে।(২) এই কারণেই ভামতীকার ঐ মতে খণ্ডন করেন নাই। খণ্ডন করেন নাই বলিয়া তিনি প্রতিবিম্ববাদী ইহাও মনে করা ঠিক নয়।

২। প্রতিবিম্ব পক্ষই সূত্রকার, ভাষ্যকার প্রভৃতির মত। 'আভাস এব চ' এই সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। এই সূত্রটী সিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্বপক্ষের প্রশ্ন, আত্মা এক না বহু? যদি এক হয় তাহা হইলে একজনের কর্মফল অন্যজন ভোগ করিবে। কাজেই বলিতে হইবে, তত্ত্বতঃ আত্মা বহু। ইহার উত্তর উপরোক্ত সূত্রটী। 'আভাস'-শব্দের দ্বারা যে প্রতিবিম্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয়। "জল-সূর্যের মত জীব পরমাত্মার আভাস.....অতএব কোন জলাশয়ের সূর্য কম্পমান হইলে অন্য জলাশয়ের সূর্য কম্পমান হয় না"।

ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি প্রতিবিম্ববাদের কথা স্মরণ করিয়াই জল ও সূর্যের উদাহরণ দিয়াছেন। কাজেই বুঝিতে হইবে, সূত্রের 'আভাস' শব্দের অর্থ ভাষ্যকার প্রতিবিম্বই করিয়াছেন। ভামতীর টীকাকার বাচস্পতিও প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিয়া এইস্থলে পূর্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। "মোক্ষ অনর্থযুক্ত নয় যেহেতু প্রতিবিম্বই জ্ঞানতা হয়, বিম্বের কিছুই হয় না"।(৩) এই পংক্তির ব্যাখ্যায় 'কল্পতরু'-র টীকাকারও যাহা বলিয়াছেন তাহা ভামতীকারেরই পুনরুক্তি। এই উভয় টীকাকারের বিবরণে স্পষ্টই প্রতীত হয়, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী ছিলেন। অবশ্য এই উক্তি কয়টী পূর্বপক্ষের মতবাদ ব্যাখ্যার সময় প্রযুক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত সূত্র 'আভাস এব চ' এবং ঐ সূত্রে প্রতিবিম্ববাদের কোন

---

(১) "অনাদরঃ চন্দ্রবদ্ ইতি অনাদরোপি তদনুকারোপপত্তেঃ।"—(কল্পতরু-পরিমল)

(২) "রূপবত এব প্রতিবিম্ব ইতি ব্যাপ্তি নিয়মঃ; রূপসংখ্যা-পরিমাণসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বসুখাদি-জাতীনাং প্রতিবিম্বদর্শনাৎ।"—(কল্পতরু-পরিমল)

(৩) "ন চ মোক্ষস্য অনর্থযুক্ততা যতঃ প্রতিবিম্বাত্মনৈব জ্ঞানত্বমাত্মতে, ন বিম্বস্য।"—(ভামতী)

খণ্ডন হয় নাই। এইজন্যই স্বীকার করিতে হইবে, প্রতিবিম্ববাদ আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের সম্মত। 'কল্পতরু'-কারও মনে করেন যে, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী। ভামতীর মঙ্গলাচরণের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'কল্পতরু'-কার বলিয়াছেন যে, প্রতিবিম্বের মত জীবগুলি ব্রহ্মের বিবর্ত। ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ভামতীকার স্বতন্ত্র নিজের বাক্যে অবচ্ছেদবাদের পরিপোষক কোন বাক্য বলেন নাই।[১]

যাঁহাদের মতে ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী তাঁহাদের পক্ষ হইয়া অপ্পয় দীক্ষিত কোন্ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখা যাক্।

১। প্রতিবিম্ববাদ ভাস্করাচার্য 'ন স্থানতোঽপি' এই অধিকরণে খণ্ডন করিয়াছেন। এই অধিকরণে অন্যান্য সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সূর্য ও উহার প্রতিবিম্বের কথা উঠিয়াছে। সুতরাং মনে হইতে পারে, প্রতিবিম্ববাদ ভাস্করাচার্য-সম্মত। কিন্তু উহা ঠিক নয়। এই অধিকরণে একটি সিদ্ধান্ত-সূত্রে ভাস্করাচার্য প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য বলিতে চান যে, যদিও শাস্ত্রে সূর্য ও উহার প্রতিবিম্বের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে, তাহা হইলেও উহার তাৎপর্য প্রতিবিম্ববাদ স্থাপনে নয়। উহার তাৎপর্য, নীরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। সূর্য ও উহার প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু সাদৃশ্য প্রতিবিম্ব-অংশে নয়। 'কোন অংশে সাদৃশ্য ?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করাচার্য বলিতেছেন : "জলের মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব জল বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পায়, জলের হ্রাস হইলে হ্রাস পায়; জল চলিলে চলে, ভিন্ন ভিন্ন জলে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব হয়, ইত্যাদি প্রকারে প্রতিবিম্ব জলের ধর্ম অনুযায়ী রূপ লাভ করে; কিন্তু পারমার্থিক-দৃষ্টিতে প্রকৃত সূর্য ঐ প্রকার হয় না"।[২]

এই বিষয়ে অপ্পয় দীক্ষিত যে-পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আরো পরিষ্কার। তাঁহার বলার তাৎপর্য সূর্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত প্রতিবিম্ববাদ স্থাপনের জন্য নয়।[৩]

২। ভামতীকারের অধ্যান-ভাষ্যের অন্য প্রকার অর্থ হইবে। তিনি পূর্বপক্ষের হইয়া বলিয়াছেন, রূপবান্ বস্তুতে রূপবান বস্তুর প্রতিবিম্ব হয়। ঐ বাক্যের অর্থ হইবে চাক্ষুষ পদার্থে চাক্ষুষ পদার্থের প্রতিবিম্ব হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভামতীকার প্রতিবিম্ব-অংশে কোন সাদৃশ্য দেখান নাই।

'আভাস এব চ' এই সূত্রের তাৎপর্য অনুরূপ। যাঁহারা ভামতীকারকে প্রতিবিম্ববাদী

---

(১) "নতু স্বতন্ত্রেণ স্ববাক্যেন জীবাবচ্ছেদে ইতি ক্বচিদপি উক্তম্।" (কল্পতরু-পরিমল)

(২) "জলগতে হি সূর্যপ্রতিবিম্বে জলবৃদ্ধৌ বর্ধতে জলহ্রাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যতে ইত্যেবং জলধর্মানুযায়ী ভবতি, ন তু পারমার্থিকঃ সূর্যস্য তথারূপতি"।—(ভাষ)

(৩) "যথা সূর্যাদি প্রতিবিম্বস্য জলাদ্যুপাধিগতবৃদ্ধিহ্রাসাদ্যধীনবৃদ্ধিহ্রাসাদিতাত্বম্ এবম্ আত্মবোঽপ্যাভাসঃ করণাদি গতবৃদ্ধিহ্রাসাদ্যধীনবৃদ্ধিহ্রাসাদিতাত্বম্ ইত্যেতাবতা জলসূর্যাদিদৃষ্টান্তীকরণং, নতু প্রতিবিম্বত্বেন; দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সর্বথা সাম্যস্য অনপেক্ষিতত্বাৎ ইতি"।—(কল্পতরু-পরিমল)

বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় সূত্রকার ও ভাষ্যকার প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ সূত্রকার ও ভাষ্যকার এইরূপ বলিতে পারেন না। 'আভাস এব চ' এই সূত্রে প্রতিবিম্ববাদের সমর্থন এবং 'ন স্থানতোঽপি' এই অধিকরণে উহার খণ্ডন, এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি সম্ভব নয়। কাজেই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বলা উচিত, 'আভাস এব চ' এই সূত্রের 'আভাস'-শব্দের অর্থ প্রতিবিম্বের সদৃশ, ঠিক প্রতিবিম্ব নয়। এইরূপ সামঞ্জস্যে কোনই অসুবিধা হয় না। এই বিষয়ে আরো বলা যায় যে, 'আভাস এব চ' এই সূত্রের 'আভাস'-শব্দটি প্রতিবিম্ব বা প্রতিবিম্বের সদৃশ কিছুই বুঝায় না। এই সূত্রের তাৎপর্য 'এব'-শব্দটির উপর। 'আভাস' শব্দটি অনুবাদক। মীমাংসকগণ বলেন, অনুবাদক-শব্দে কোন তাৎপর্য থাকে না; অতএব ভামতীকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিলে কোন দোষ হয় না।

অপ্পয় দীক্ষিত ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ সূত্রের শেষে যে-ভাবে প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদের উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অভিনব। তিনি প্রথমে প্রতিবিম্ববাদের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়াছেন; এবং বলিয়াছেন, ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদী। তারপর তিনি অবচ্ছেদবাদের পক্ষে যুক্তি দিয়া বলিয়াছেন, অবচ্ছেদবাদের পক্ষেও ভামতীর বচনের সামঞ্জস্য হয়। সন্দেহ হইতে পারে, অপ্পয় দীক্ষিত প্রথমে অবচ্ছেদবাদের যুক্তি দেখান নাই কেন? ইহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ উপস্থাপনার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ভামতী-কল্পতরু ও কল্পতরু-পরিমলকারের বিচার-কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যায়, অবচ্ছেদবাদের কথা পরে বলার তাৎপর্য আছে। বিচার-কৌশলটি আলোচনা করা যাক্।

সাহিত্য-দর্পণের ভূমিকা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি., ডি.এস.ই.
(পঞ্চম পর্যায়)

রসপ্রকাশ

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ভরত মুনি, তাঁর নাট্য-শাস্ত্র লিখেছিলেন। তাঁর পূর্বেও অনেকে অলঙ্কারাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।' ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তাঁদের নামের উল্লেখ আছে বটে, তবে তাঁদের গ্রন্থাদি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভরতাচার্যের নাট্যশাস্ত্র মূলতঃ দৃশ্য কাব্যের সম্বন্ধে আলোচনা হলেও এতে আনুষঙ্গিকভাবে শ্রব্য কাব্যেরও অনেক জিনিষেরই বিচার আলোচনা আছে। এতে নাট্যশাস্ত্রের গুণের বিচার, অলঙ্কারের বিচার, বৃত্তির বিচার, দোষের বিচার ও রসের বিচার আছে। এই রসের বিচারই সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

ভরত এবং তাঁর সম্প্রদায়গত আলঙ্কারিকগণের মতে রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বহু যুক্তির স্থাপন ও খণ্ডনের পর বলেছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। তাঁর মতে শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি দোষ এই রসের অপকর্ষতা ঘটায়, আর গুণ, রীতি প্রভৃতি তার উৎকর্ষ বিধান করে। দোষ যেন কাব্য-শরীরের কাণত্ব খঞ্জত্ব জাতীয় জিনিস, গুণ হচ্ছে শৌর্যাদির মত, অলঙ্কার কবচ কুণ্ডলের মত এবং রীতি অবয়ব সংস্থানের মত জিনিস। কিন্তু ঐ কাব্য-শরীরের আত্মা হচ্ছে রস।

ঃ রসের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

রস্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে আস্বাদন। সুতরাং যে জিনিসটা আস্বাদন করা যায়, সেটাই হচ্ছে রস, যেমন মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ প্রভৃতি। কিন্তু সাহিত্যিক রস এই রকম লৌকিক বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস নয়; সেটা অন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য পদার্থ।

রসের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে সেটা শব্দের অভিধা শক্তির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। রস হচ্ছে সহৃদয় পাঠকের কাছে ব্যঞ্জনাবেদ্য পদার্থ। লেখক যদি বলেন "আমার বড় হাসি পাচ্ছে", তা হলে পাঠকের মনে হাস্য রসের অনুভূতি জাগে না। কিন্তু একটি বিখ্যাত গল্পে যখন পড়া যায় হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচ তার পিতা ভীমসেনকে সাধারণ মানুষ মনে করে তার খাদ্যের পারণের জন্য ধরে নিয়ে গেছে এবং স্বল্প বস্ত্রাবৃতা হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের আকস্মিক

মিলনে "ছি ছি আর্যপুত্র লজ্জায় মরি" বলে হিড়িম্বা জিভ কেটে তার কাপড় চোপড় সামলাতে চেষ্টা করছে, তখন সৃষ্ট হয় সত্যিকারের হাস্য রসের। অতুল গুপ্ত দেখিয়েছেন রঙ্গলালের বিখ্যাত কবিতা "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" এই দম্ভোক্তির চেয়ে, রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে" এই কবিতাটিতে সত্যিকারের বীর রসের সৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশী।

এই যে কাব্য রস, এর বাহ্য উপাদান হচ্ছে বিভাব ও অনুভাব এবং আন্তর উপাদান হচ্ছে স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব। এই শব্দগুলির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সেটা যথা স্থানে দেওয়া হবে। তবে আপাততঃ বলা যেতে পারে যে, মানব-মনের স্থায়ী ভাব যখন কাব্যশিল্পের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দরদী পাঠকের মনে ফুটে ওঠে, তখনই হয় রসের সৃষ্টি।

॥ স্থায়ী ভাব ও রস ॥

প্রশ্ন আসতে পারে এই স্থায়ী ভাবটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে মনোবিজ্ঞার আবেগ (emotion) জাতীয় জিনিস। প্রত্যেক মানবের মনের মধ্যেই সেগুলি অস্ফুট (potential) এবং স্থায়ীভাবে বিরাজ করে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেগুলির উদয় হয়। এগুলি প্রধানতঃ আটটি (বা নয়টি); যথা—রতি বা যৌন ভাব, (sex emotion) হাস (sense of the ludicrus), শোক (pathos), ক্রোধ (heroic), উৎসাহ (anger), ভয় (fear), জুগুপ্সা (disgust), বিস্ময় (wonder) এবং শম (control over passions)।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেথ অষ্টৌ প্রোক্তা শমোঽপি চ॥

লৌকিক কারণে অর্থাৎ প্রকৃত উত্তেজক পেলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই চিত্তবৃত্তিগুলি ফুটে ওঠে। ফলে ভয়ের বস্তু দেখলে আমরা ভীত হই, ক্রোধের কারণ ঘটলে ক্রুদ্ধ হই ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যাপারটা হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার,—কাব্যতত্ত্ব বা রসতত্ত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটাই অর্থাৎ emotion-এর সৃষ্টিটাই যখন লৌকিক কারণে সংঘটিত না হয়ে কাব্য বা নাটকের কলাকৌশলের দ্বারা সংঘটিত হয়, তখন সেই emotionটা হয়ে ওঠে কাব্যতত্ত্বের ব্যাপার। সেইটিই হচ্ছে রস। ভাবের পরিণতিতেই এর সৃষ্টি। স্থায়ী ভাব যখন শিল্পকলার প্রভাবে একটা রসাত্মক বা কৃত্রিম emotion-এ অভিব্যক্ত হয়ে আস্বাদমান বা ভোগের বস্তু হয়ে ওঠে, তখনই হয় রসের সৃষ্টি। এই রসই কাব্যের প্রাণ। কবিকর্তৃক রসসৃষ্টিতে কাব্যের আরম্ভ, আর সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে সেই রসের উপলব্ধিতে হয় কাব্যের (বা নাটকের) সার্থকতা। তাই কালিদাস বলেছেন :

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্"

রসেই কাব্যের জন্ম এবং পাঠকের রসোপলব্ধিতেই তার সার্থকতা। সুতরাং রসকে কাব্যের বীজ এবং ফল দু'ই বলা যেতে পারে। তাই ভরতাচার্য বলেছেন :

যথা বীজাৎ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতা ॥ ৩।৪২ (১)

আমরা পূর্বেই বলেছি স্থায়ী-ভাবই শিল্পীর কলাকৌশলের প্রভাবে রসে পরিণত হয়। পূর্ববর্ণিত নয়টি স্থায়ী-ভাব এই নয়টি রসে পরিণত হয়, যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসা শান্ত তথা মতঃ ॥

এদের মধ্যে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং অদ্ভুত এই চারটি হচ্ছে মূল রস এবং বাকী চারটি হচ্ছে ঐ রসগুলিরই বিকৃতি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্য জিনিসটা শুধু সখের সামগ্রীই নয়; সাহিত্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফলপ্রাপ্তি হয়, অথচ তার জন্য কঠোর সাধনা করতে হয় না, অল্পবুদ্ধি লোকেরাও সাহিত্য উপভোগের মধ্য দিয়ে আনন্দের পথেই পায় চতুর্বর্গের ফল। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্য-দর্পণের ভূমিকায় বলেছেন :

চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি সুখাদল্প ধীয়ামপি
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎ স্বরূপং নিরূপ্যতে ॥ ১।২

ভামহ ভরতাচার্য প্রভৃতি আরও অনেকেই ঐ জাতীয় কথাই বলেছেন। কাজেই ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্য-কলা-সৃষ্ট প্রত্যেক রসটিই ধর্মার্থ কাম মোক্ষের কোন না কোনটির সহায়ক। তাঁরা বলেছেন শৃঙ্গার (এবং তার সহকারী হাস্য) রস হচ্ছে কাম-প্রধান, রৌদ্র (এবং করুণ) রস অর্থপ্রধান, বীর (ভয়ানক বীভৎস ও অদ্ভুত) রস ধর্মপ্রধান এবং শান্ত রস মোক্ষপ্রধান।

কোন্ স্থায়ী ভাবটি কোন্ রসে পরিণত হয় এবং কোন্ রসটা কোন্ পুরুষার্থের সহায়ক, সেটা নিম্নলিখিত "টেবিল"টি থেকেই বুঝতে পারা যাবে—

স্থায়ীভাব	রস	পুরুষার্থ
রতি	শৃঙ্গার রস	কাম
হাস	হাস্য রস	কাম
ক্রোধ	রৌদ্র রস	অর্থ
শোক	করুণ রস	অর্থ
উৎসাহ	বীর রস	ধর্ম
ভয়	ভয়ানক রস	ধর্ম
জুগুপ্সা	বীভৎস রস	ধর্ম
বিস্ময়	অদ্ভুত রস	ধর্ম
নির্বেদ	শান্ত রস	মোক্ষ

অনেকে ভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতিকেও রস বলে স্বীকার করেন। কিন্তু দেবতার প্রতি ভক্তি প্রাণিজীবনের অবশ্যম্ভাবী চিত্তবৃত্তি নয়। বাৎসল্যও সম্ভবতঃ তাই। কাজেই এই রস দুটি স্থায়িভাবপ্রসূত জিনিস নয়, - এগুলি ব্যভিচারীভাবপ্রসূত জিনিস। এইজন্য ভরতাচার্য ভক্তি বা বাৎসল্যকে রস হিসাবে স্বীকার করেন নি। ভক্তির রসত্বের দাবী সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে বলা হবে।

॥ রসের আনন্দস্বরূপতা ॥

স্থায়ী ভাব কাব্যকলার প্রভাবে রসে পরিণত হয়ে একটা আনন্দের জিনিস হয় বটে, কিন্তু নিছক স্থায়ী ভাবগুলি সব সময়েই আনন্দের জিনিস নয়। সেগুলি কখনও সুখ কখনও বা দুঃখের সৃষ্টি করে। সুখের সময়েও তার মধ্যে এমন একটা প্রক্ষোভগত (emotional) আলোড়ন থাকে, যেটা ঠিক উপভোগ্য জিনিস নয়। কিন্তু ঐ স্থায়ী ভাবগুলিই যখন কাব্যের মায়া বলে রসে রূপান্তরিত হয়, তখন সেটা অলৌকিক চমৎকারিত্বে ঝলমল করে ওঠে। রসজ্ঞ পাঠক তাতে তন্ময় হয়ে একটা "ব্রহ্মস্বাদ সহোদর" অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ শোক, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের কথাই ধরা যাক্। বাস্তব জীবনে শোক বা ক্রোধ সুখেরও নয়, কাম্যও নয়; কিন্তু কবি-প্রতিভায় যখন সেগুলি করুণ বা রৌদ্র রসের সৃষ্টি করে, তখন সেগুলি পরম রমণীয় পদার্থ হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনে জ্ঞাতি ভ্রাতার বক্ষ-রক্ত-পান বা উরুভঙ্গের উৎসাহ আদৌ রমণীয় জিনিস নয়। কিন্তু "বেণীসংহার" নাটকে "উৎসাহ" নামক স্থায়ী ভাব থেকে তৈরী "বীর রসে" রসায়িত হয়ে ঐ ঘটনাগুলিই যখন নাটকে রূপায়িত হয়, তখন সেটা হয়ে ওঠে পরম উপভোগ্য। বাস্তব জীবনে কেউই শোক-কামনা করে না; কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকে স্থায়ী ভাব "শোক" থেকে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয়, সেটা উপভোগ করার জন্য হাজার হাজার লোক অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে প্রেক্ষাগৃহে ভীড় করে। দুঃখ ভোগের জন্য তারা অভিনয় দেখতে যায় না। করুণ রসের অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগের জন্যই যায়। বাস্তব জীবনে শোক দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্য-কৌশলে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয়, তাতে চখের জলে বুক ভেসে গেলেও মন হয়ে ওঠে আনন্দে মাতাল। কোন্ জিনিষের প্রভাবে এটা সম্ভব হয়? এটা সম্ভব হয় কাব্য-রস বা নাট্যরসের প্রভাবে। এই রসের স্রষ্টা হচ্ছে প্রতিভাবান্ কবি, আর ভোক্তা হচ্ছে সহৃদয় পাঠক। এই রসের আনন্দের জন্যই রসিক তরুণ পাঠক অভিভাবকের দৃষ্টি এড়িয়ে নাটক নভেল পাঠ করে, আর চখের জলে বালিস ভেজায়। এই রসের প্রভাবেই আমাদের "Saddest thoughts"এর গানগুলি "Sweetest" ভাবে প্রতিভাত হয়, এই রসের চমৎকারিত্বই দুঃখিনী সীতা, বিরহিনী রাধা বা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী এই কঠোর বাস্তবতার যুগেও মানুষের মনকে চুম্বকের মতই আকৃষ্ট করে।

॥ রসসৃষ্টির কৌশল ও রসের উপাদান ॥

এই রসসৃষ্টির কৌশল কি? তার জন্ত কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়? ভরতাচার্য বলেছেন "বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" ১।২৭ বা বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারি ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন—"ভরতাচার্যের এই সূত্রটিতে স্থায়ী ভাবের উল্লেখ নেই। তা ছাড়া "সংযোগ" কথাটির অর্থ মহর্ষির মতে কি ছিল, তাও স্পষ্টভাবে জানা যায় না। "নিষ্পত্তি" শব্দটির অর্থও তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। ফলে ভরতের ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁর সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভট্ট লোল্লটের "উৎপত্তিবাদ" ভট্ট শঙ্কুকের "অনুমিতিবাদ" ভট্ট নায়কের "ভুক্তিবাদ" এবং অভিনব গুপ্তের "অভিব্যক্তিবাদ" প্রধান। তবে অভিনব গুপ্তই হচ্ছে রসবাদের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তাঁর অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটি হচ্ছে "সামাজিকই রসের আস্বাদয়িতা; এবং স্থায়ীভাবসমূহ যে সকল সামাজিক চিত্তে অনভিব্যক্ত অবস্থায় (unmanifested state) ছিল, সেইগুলিই অভিনয় দর্শন এবং কাব্য পাঠাবসরে সমুচিত বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের দ্বারা "অভিব্যক্তি" লাভ করে "রসরূপে" পরিণত হয়ে থাকে"।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন :

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্ত সঞ্চারিণা তথা
রসতামেতি রত্যাদি স্থায়ী-ভাব সচেতসাম্" । ৩১

অর্থাৎ রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবগুলি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে সহৃদয় ব্যক্তির মনে রসত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সূত্রটি ভালভাবে বুঝতে হলে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ বুঝতে হবে—

বিভাব : "বিভাব" কি? "বিভাবয়ন্তি ইতি বিভাবঃ"। বিভাব হচ্ছে স্থায়ীভাব তথা রসের বস্তুগত কারণ (objective conditions)। এই বিভাব দু' ভাগে বিভক্ত,—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যে ব্যক্তিকে অবলম্বন করে রসের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে আলম্বন বিভাব, যেমন অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলাকে অবলম্বন করে দুষ্মন্তের রতিভাবের উদয় হয়েছে, অতএব এই নাটকে শকুন্তলা হচ্ছে **আলম্বন বিভাব**।

আলম্বন বিভাবের দ্বারা সৃষ্ট ভাবটি যার সহায়তায় পরিপুষ্টি লাভ করে বা উদ্দীপ্ত হয়, তার নাম হচ্ছে **উদ্দীপন বিভাব**। যথা কুমারসম্ভবে বসন্ত সমারোহ, বেণীসংহারে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি। আলম্বন বিভাবে যে ভাবটি জেগে ওঠে, উদ্দীপন বিভাবে সেটাই অধিকতরভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। এর কাজ হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, এর দ্বারাই প্রতিপাদ্য রসটির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কাজেই রসসৃষ্টির প্রাথমিক কারণ (efficient cause) না হলেও এটা হচ্ছে সহকারী কারণ (auxiliary cause)।

ভাষার ত্রয়ী

অধ্যাপক শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর

ভাষার মুখ্য-রূপ তিনটি : ইঙ্গিতরূপ, ধ্বনিরূপ, লিপিরূপ। ইঙ্গিতরূপ আবার ধ্বনিরও হতে পারে, আকারেরও হতে পারে, অর্থাৎ, ধ্বনি ও আকার—এই দুইএর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। ইঙ্গিতকে শরণ নিতে হয় ধ্বনি ও আকারের। কিন্তু, বাচ্যবস্তু-প্রকাশের সম্পূর্ণ সামর্থ্য ধ্বনি ও আকারের নেই বলে ধ্বনি ও আকারের ভেতর ইঙ্গিতত্ব থেকেই যায়। অর্থাৎ, ধ্বনি ও আকার যে ইঙ্গিত-নিরপেক্ষ তা নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইঙ্গিত যেমন ধ্বনি ও আকার-নির্ভর, ধ্বনি ও আকার তেমনি ইঙ্গিত-প্রত্যাশী, মানে এরা পরস্পর-নির্ভর।

ভাষার ইঙ্গিতরূপের ইতিহাসের কোন চর্চা হয়েছে বলে জানি নে। কেমন করে মাথা-নাড়া, কপাল-কোঁচকানো, চোখ-টেপা, চোখ বোজা ঠোঁট-চাপা, হাঁ-করা, হাত-নাড়া, হাত-তোলা, জোড়হাত-করা, আঙুল-মটকানো, আঙুল-কামড়ানো, আঙুল দিয়ে-দেখানো, হাত-কচলানো, গালে-হাত-দেয়া, চিবুকে হাত দেয়া নখ-খোঁটা, হাত-দিয়ে চোখ-ঢাকা, হাই-গাড়া, পা-তোলা ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন অবস্থায় ও ভাবে বিভিন্ন অর্থ-দ্যোতনা করতে পারে, কিসে থেকে এগুলোর উৎপত্তি তা ভেবে দেখার ও খোঁজ করার বিষয়। ওগুলো তো গেল অঙ্গভঙ্গী বা একপ্রকার আকারের ইঙ্গিত। এ ছাড়া আছে ধ্বনির ইঙ্গিত; এ ধ্বনি কিন্তু স্পষ্ট-নির্দিষ্ট অর্থবাচক শব্দধ্বনি কি পদধ্বনি নয়। এ হচ্ছে আস্ফুট অঙ্গধ্বনি, যেমন—মুখধ্বনি, হস্তধ্বনি, অঙ্গুলিধ্বনি, বাহুধ্বনি, বক্ষধ্বনি, পদধ্বনি প্রভৃতি। এই ধ্বনিগুলোরও বৈচিত্র্য আছে, যথা—মুখধ্বনির বিবিধ প্রকার—অ, আঁ, অ্যাঁ, আঃ, আহা, ইঃ, ইশ, ইস্, উঃ, উহু, উঁ, উঁহুঁ, এঃ, এ্যাঃ, ও, ওঃ, ওহোহো, চাঃ (অন্তর্মুখী ধ্বনি), চুকচুকচুক্, ছি, ছিঃ, ছ্যাঃ, জা, জাঃ, জ্যাঃ টক্ (অন্তর্মুখী ধ্বনি), তইতই, তি-তি, তু-তু, থু, থুঃ, ধেঃ, ধুৎ, ধ্যেৎ, ধ্যাৎ, ফ্যা, ফ্যাঃ, ফুঃ, বু, বুঃ, ভুঃ, হুঃ, হুঁ হুঁঃ হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাট্, হ্যাৎ, হুশ্ ইত্যাদি। বাহু ও হস্তধ্বনির প্রকার-ভেদ হচ্ছে,—বাহুস্ফোট, (বাই-ঠোকা), করতালন, তালি। অঙ্গুলিধ্বনির রূপ—তুড়ি। বক্ষধ্বনি, যথা—বুক-চাপড়ানো। এমনি, কপাল-চাপড়ানোও একরকম ধ্বনির ইঙ্গিত। বিভিন্ন প্রকারের পদধ্বনিকেও ধ্বনিময় ইঙ্গিত বলে ধরা যেতে পারে। আকারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত ইঙ্গিতগুলোর রূপবৈচিত্র্য ব্যবহৃত হয় নৃত্যকলায়; কয়েকটি ধ্বনির ইঙ্গিতও, যেমন বক্ষধ্বনি, করধ্বনি, বাহুধ্বনি, তালি, তুড়ি।

কিন্তু, ভাষার এই আকার ও ধ্বনিময় ইঙ্গিতরূপ ভাষার বিবর্তনে কী সাহায্য করেছে?

লিপিরূপ ও ধ্বনিরূপে তার কোন যান আছে কিনা খোঁজ করা দরকার। এ শুধু অনুমান যে, আকারের ইঙ্গিত থেকে কোন-কোন লিপির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা না হলে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে এই অনুমানের পথ ধরে গবেষণা চালানো যেতে পারে মনে হয়।

তবে ধ্বনির ইঙ্গিতগুলি যে স্ফুট ভাষার ধ্বনিরূপের মূল তা, অনুমান হলেও, অনেকখানি প্রত্যয়নীয় বলে ধারণা হয়।

ভাষার ধ্বনিরূপ এবং আকাররূপ—এ দুটোর ভেতর কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে এ বলা খুব কঠিন। সমকালীনও হতে পারে এরা। এদের দুইয়েরই আপন-আপন অভিপ্রায় আছে; একের কিন্তু শক্তি অপরটিতে নেই। তাই, প্রকাশের উপায়ের কোন অভাব এটিকে দিয়ে, কোন অভাব ওটিকে দিয়ে মেটাতে হয়েছে। দুইয়ে মিলিয়ে প্রকাশ সহজ হবার পথ পেয়েছে।

ভাষার ধ্বনি ও আকার-রূপের মুখ্য উদ্দেশ্য এক। তা হচ্ছে ভাব, ভাবনা, অনুমান, ধারণার প্রকাশ এবং পরিবেশের পদার্থনিচয়ের নামায়ন। এদের লক্ষ্যগত ঐক্য থাকলেও স্বভাব-লক্ষণে বেশ-কিছু পার্থক্য আছে।

ভাষার ধ্বনিরূপ বলতে কথিত রূপ, আর, আকাররূপ বলতে লিখিত রূপ বুঝি। ভাষার রূপমাত্রই পরিবর্তন ও বিবর্তন-ধর্মী। তবু, দুইয়ের পরিবর্তন-বিবর্তন-রীতিতে তফাৎ আছে। ভাষার ধ্বনি বা কথিত রূপের পরিবর্তন-বিবর্তন যত ত্বরিত, লিখিত বা লিপি-রূপের তত নয়। তাই, দুইয়ের উৎপত্তির যৌগপদ্যের কথা যদি বা ভাবা যায় তো সমগতিত্ব দেখা যায় না। লিখিত ভাষা তাই তাল রেখে চলতে পারে না কথিত ভাষার, ঘষিচ, কথিত ভাষার অনুগমন তাকে করতেই হয়। তাতে অবশ্য তার লাভ বই ক্ষতি হয় না। লিখিত ভাষা যে কথিতের কাছে অধমর্ণতাই করে তা নয়; সেও কিছু স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব দেয় কথিতকে। তাতে স্থিতি-ভাবেরই প্রাধান্য, কথিতে যেমন গতি-ভাবের। ভাষার লেখ্যরূপের দাবিতে বিশেষ করে পদ্যসাহিত্যে ছন্দের অনুরোধে শব্দের রূপের বাক্যগঠনেও কখন-কখন নতুনত্ব আসতে লক্ষ্য করা যায়। এও অবশ্য দেখা যায় যে, পদ্যসাহিত্য সুবিধার জন্যে কথ্যভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে ভাষার সমৃদ্ধি আনে। নাট্যসাহিত্যেরও এই গুণ আছে। লেখ্যভাষা প্রধানতঃ কবি ও কোবিদের ভাষা। তাই, তাতে অপর ভাষা থেকেও শব্দ আমদানি হবার উপায় থাকে। লেখ্য ভাষায় বাঁধুনি বেশী। তাই, বিভিন্ন উপভাষাগুলিকে ঐক্যসূত্রে গাঁথার ক্ষমতা তার থাকে। তবু, স্থিতিধর্মিতা ও বন্ধনপ্রিয়তার জন্যে পুরোনো, বিবর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা তারই আছে। তাই, তখন আবার এক নতুন, সমন্বিত, সমরস ও সমৃদ্ধ কথ্যভাষাকে লেখ্যভাষা করে নেবার তাগিদ আসে। আর তা নিতেও হয়। নইলে কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার এমনই পার্থক্য ঘটে যে, পরেরটা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার ভয় দেখা দেয়। আর, এই

তফাৎটা যত কম থাকে ততই বোধ করি নানা কারণে ভালো। তাতে চল্‌তি নানা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবধান কমে আসে, অর্থাৎ ভাষার ঐক্য জমাট বাঁধতে থাকে; আর পরভাষীর পক্ষেও সে ভাষা শেখা অনেকটা সোজা হয়। কথ্যভাষার রূপ লেখ্যভাষায় নিলে ভাষার বিশিষ্ট পরিবর্তনের নিদর্শন স্থায়ী ও প্রমাণ হয়ে থাকে।

কিন্তু নতুন করে কথ্যভাষার নিদর্শরূপকে লেখ্যভাষা করে নিলেও যদি পরিবর্তমান ধারার সঙ্গে তার যোগাযোগ বরাবর না থাকে তো সেই নবরূপের লেখ্যভাষার আবার ঘুরান্তরিত হবার কারণ ঘটে। কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার ফারাক বাড়তে না দিতে হলে এই অবহিত্তি বিশেষ দরকার। লেখ্যভাষার প্রথম যুগে কথ্যভাষার সঙ্গে তার কোন পার্থক্য ছিল না বলেই সহজে অনুমান করা যায়। পরে লেখ্যভাষাকেই চূড়ান্ত-রূপ, 'সাধু'-রূপ বলে মনে করার মানসিক জাড্য পেয়ে বসায় এবং লেখ্যভাষার আদিম ইতিহাস না জানায় বা ভুলে-যাওয়ায় কথ্যভাষাকে হেনস্তা করা হয়। তাই দুইয়ের মাঝখানে ফাটল দেখা দেয় ও ক্রমে বাড়তে থাকে। লেখ্যভাষার প্রাচীন রূপের সঙ্গে আধুনিক রূপের মিল রাখতে হবে —এই ধারণায় আধুনিক রূপকে অবহেলা করা হয়। যেন আধুনিক রূপের সঙ্গে ভাষার মিল বা যোগ রাখাটা একটা কথাই নয়। তাই, বর্তমানকে সইতে হয় অতিপরিচয়ের অনাদর। অথচ তাকে দিয়েই বেশি প্রয়োজন মেটানো হয়। তর্ক তোলা যেতে পারে: প্রয়োজন মেটানো এক কথা, আর, সাহিত্য-রচনা অন্য।—কিন্তু প্রয়োজন-মেটানোও যেমন হয় তেমনি সাহিত্য রচনাও হতে পারে চলিত ভাষায়। অতীতের সঙ্গে যথাসম্ভব যৎসংগত যোগ রেখেও মর্যাদা নিয়েই ব্যবহার করা যায় চল্‌তি ভাষার। অতএব দেখা যাচ্ছে নিদর্শ কথ্য বা চলিত ভাষাকে লেখ্যভাষা করে নেয়াতেই সব দিক থেকে সুবিধা। অচলিত ভাষাকে চলিত করার কোন সম্ভাবনা নেই; তাতে লাভও নেই, নেই তার দরকারও। তার মধ্যে যেটুকু রক্ষা করার তা রক্ষিত হয়েই আছে, আর, যেটুকু তার যুগোপযোগী সেটুকু চলিত লেখ্য ভাষাতেই রক্ষিত হতে পারে। অচলিত লিখিত ভাষায় যা রক্ষিত হয় নি বা হবার নয় তা নতুন লিখিত ভাষায় হতে পারে। আসল কথা হচ্ছে এই: লেখ্যভাষার আদিযুগে কথ্যভাষার সঙ্গে পার্থক্য ছিল না, কেননা, তখন কথ্যভাষা ছাড়া অন্য ভাষাই ছিল না; আর, গোড়া থেকেই লেখ্য ভাষাকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে—এ অসংগত কল্পনা। যেমন আদিযুগে ছিল না তেমনি কোন যুগেই যথাসম্ভব থাকা বিধেয় নয়, থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া দায়। তবে, একটা ভাষার নানা উপভাষার মধ্যে থেকে একটাকে নিদর্শ কথ্য ও লেখ্য ভাষার ঠাট হিসেবে নিতে হয়। নানা কারণে তা দাঁড়িয়েই যায়। তাকেই মেনে নেওয়া অবস্থা-তৎপরতা। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা আছে: 'সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে'।

সংশয়

শ্রীশকানন চট্টোপাধ্যায়

আজ মনে হয়,
যদি মোর সমস্ত সংশয়
দূর করে দিতে পারিতাম,
ক্ষণেকের তরে যদি নিতাম বিশ্রাম—
মধুর আলস্যভরে চোখ দুটি বুজে—
পৃথিবীর অনন্ত সমুদ্রে,
অতলান্ত প্রশান্তির অসীম মায়ায়,
অরণ্য মথিত করা দুঃসহ হাওয়ায়—
চোখে মোর জ্বালা থাকিত না।
হয়তো পেতাম খুঁজি—সুমিষ্ট সান্ত্বনা।
ইতিহাস হয়ে চলে যতো অগ্রসর,
ঘূর্ণ্যমান গতিবেগে সমস্ত প্রহর,
বিজন গহনে লাগে—উদ্বেগের ছোঁয়া,
লজ্জায় ধূসর হয় নগরীর ধূলি আর ধোঁয়া।
কালিমার আবরণে আলো হাতে নিয়ে—
ইতিহাস চলেছে এগিয়ে।
নিষ্ঠুর চোখেতে নেই লেশমাত্র ক্ষমা।
সভ্যতার করদণ্ড—অনাবিল, উদ্যান বোমা—
সৃষ্টির উদয়াচলে জাগায় শিহর,
আতঙ্কিত শ্মশান সহর।
জীবনের ভিন্ন অর্থ চাই,
সেই কথা বিশ্বেরে শুধাই।
শুধায়েছি আদিযুগে সমুদ্রে পর্বতে,
যাইবার পথে—
চিহ্ন রেখে এসেছি প্রশ্নের।
পথ-প্রান্তরের
বুকে আজো আঁকা আছে অনন্ত জিজ্ঞাসা,
আজো খুঁজি—মৃত্যু নয়, অন্তহীন
আশা, ভালোবাসা।

স্মরের গুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজয়দেব রায়, এম. এ.

●

গ্রীষ্মের তপনতপ্ত বৈশাখের শুষ্ক ধূলিধূসর দিন এই সবে শেষ হ'ল—সারাদিনের কর্মকলরবে ক্লান্ত পুরবাসী বিশ্রামের কোলে আশ্রয় নিতে আগ্রহী—এমন অসময়ে মহাকবির পুণ্য জন্মদিনের স্মরণোৎসব।

একদিন কাব্যবিলাসরত কবি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর কবিতা শত বর্ষ পরেও আমরা কৌতূহল ভরে পড়ব। হয়ত তাঁর অনুমান ব্যর্থ হবে, শতবর্ষ তো দূরের কথা—ইতিমধ্যেই আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। তাই প্রয়োজন হয়েছে, প্রতি বছরে একদিন মিলিত হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের, তাঁকে স্মরণ ক'রে পরম ভক্তিভরে অর্ঘ্যদান করার। কিন্তু এ কাজ তো করছেন দেশের নেতারা, তাঁর স্মৃতিজড়িত বড় বড় প্রতিষ্ঠান, আমাদের ন্যায় একটা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কি প্রয়োজন এই স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করার। কিন্তু—

চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এস যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই।
সংসার তাহাদের তোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
যাদের যায় ছিন্ন চাকা জনতার পারে,
ভাবাহারাদের সাথে মিল যায়।—

সেই সভাঘরের বাইরের শ্রোতারা আমরা করেছি তাঁর এই স্মরণানুষ্ঠান।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আড়ম্বর দেখে একটি কথাই কিন্তু বারবার মনকে ব্যথিত করছে যে, তিনিই কি শুধু আমাদের দেশের একমাত্র কবি? তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—জগৎকবির সভায় তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব—বাঙালী যে আজ গানের রাজা, বাঙালী যে নয় গর্ব—একথা সত্য। কিন্তু তাঁকে নিয়েই আমাদের ভুলে থাকলে কি চলবে?

'বাঙালী বড়ই আত্মবিস্মৃত জাতি'—তাই সে ভুলে গিয়েছে সম্পূর্ণরূপে তার অন্যান্য কবিদের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিসভার তো আয়োজন হয় না? একদিন তাঁর গানই জাগিয়ে দিয়েছিল জাতিকে—তাঁর কাব্য, তাঁর গান হয়ে উঠেছিল জনগণের সম্পদ। আজ কেন তাঁকে স্মরণ করব না? অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্র সেন, গোবিন্দদাস প্রমুখ রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিদের নাম পর্যন্ত আজ বাঙালী বিস্মৃত হয়েছে।

হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় তাঁরা ম্লান হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রতিভাশালী কবি যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, যতীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমুদরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ, শ্রীকালিদাস রায় ও মোহিতলাল মজুমদারকে কেন এ সঙ্গে অবহেলা করব? তাঁদের জন্মদিন পালন করাও আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

মনে হয় তাহলে হয়ত কেবল কবি সাহিত্যিকরূপে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি না। তাঁর কীর্তি দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর আছে নিজস্ব গড়া প্রতিষ্ঠান, শিল্পমণ্ডলী। কবির নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না। সাহিত্যের পাঠ্যমঞ্চ ছাড়া সেগুলি আর পঠিত বা আলোচিত হয় না। এই রীতিপ্রাবল্যই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়—গানের ভিতর দিয়ে তিনি অন্তরের অন্তরতম সত্তাকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। গানই তাঁকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে, সুরই দিয়েছে তাঁর সৃষ্টিকে অক্ষয়তা।

তিনি যে সুরের গুরু—আমাদের দিয়ে গিয়েছেন তিনি সেই সুরের দীক্ষা, এই নিত্য বেসুর বাজা জীবনে তাঁর সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত, তাকেই পাথেয় করে আমরা চলতে পারি। ঢেলে দিয়েছেন তিনি সুরের অবিরাম ধারা, পান ক'রে তৃপ্ত ক'রে চলেছি রসতৃষ্ণা। তাঁর সুরের আলো ফেলেছে ভুবন ছেয়ে, দুঃখের আঁধারে পথ পেয়েছি তাতেই। তাঁর সুরের আগুনে পুড়ে গিয়েছে জীবনের যত গ্লানি। গানভোলা ফিরে পেয়েছে গান।

সারা জীবনের সাধনার শেষে তিনি তো আর কিছু চান নি, চেয়েছেন কেবল—

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
নিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।

অপ্রয়োজনের আনন্দে, অকাজের মাঝে চেয়েছেন তিনি তাঁর গান গাইতে; তাঁর কামনা তিনি গানের সুরের আসনখানি পথের ধারে পেতে রাখবেন—সেখানে যুগে যুগে ক্লান্তে ক্লান্তে নব নব পথিক এসে সমাসীন হয়ে জীবনপথের ক্লান্তি দূর করবে।

সারাজীবনের নানা রঙের শেষে এসে তিনি সার বুঝেছেন কালের কষ্টি পাথরের

বিচারে কি টিকবে, কি টিকবে না। চিরকালই দূরের হাওয়া এসে ডাক দেবে এমনই ভাবে সুরের পাগলাকে—তাই তিনি করেছেন গানকেই 'তাঁর শেষ পারানির কড়ি'।

এই গানই তাঁকে বিশ্বকবির সিংহাসন থেকে টেনে এনে বসিয়ে দিয়েছে আমাদের সন্ধেধূলির আসনে।

তাঁর গানকে তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন নস্তকণা-বিচলিত পণ্ডিতপাড়ায় যেতে, ধনী অভিজাতদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করতে, নিয়ম বাঁধা কানুনগড়া সুরনবীশদের কবলে পড়তে, সংসারের সহস্র বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে। সেখানেই তাঁর গানের অবাধ প্রবেশ, যেখানে —

যেথায় সুখে তরুণ যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুকে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায় পুষ্প লতাপাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ববীণার ধ্বনির মাঝে যেতে কি বাধ আছে ?

শুধু সেখানেই নয়, যেখানে যে কেউ সাধনা করছে—যেখানে যে কেউ হৃদয়ধর্মের অনুশীলন করছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি গানের কুসুমের ডালি সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন। তাই বলেছেন :

তোমার তরে যে-জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে।

সমগ্র জীবনই তাঁর সুরের সাধনা, গানের সুরের মোহিনী মায়ায় জগৎকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। জীবন যখন বারবার শুকিয়ে যাবে, ব্যথা যখন বার বার হৃদয়দ্বারে হানা দিয়ে যাবে—তখন এই সুরই দেবে সান্ত্বনা, শুনাবে আশার ভাষা, গানের টানে পারবে না কেউ রইতে দূরে। শুধু কি তাই ? হে কবি, অন্তবিহীন অনিধারায় যে সুর তুমি বেঁধেছ, নিঠুর মূর্ছনায় আঘাত ক'রে যে সুর তুমি অহরহ সৃষ্টি করছ, তা-ও নিতে হবে সানন্দে, অকাতরে, প্রাণভরে। কেবল মৃদু সুরের খেলায় তুমি মুগ্ধ কর নি। তুমি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছ।

তারপর একদিন যখন সমস্ত বাধাবিঘ্নের অবসান হবে, সকল চাওয়া-পাওয়া ঘুচে যাবে তখন 'একমনে তোর একতারাতে একটি যে সুর সেইটি বাজা'।

কিন্তু জীবন তো কেবল দুঃখের অঙ্ক দিয়েই গড়া নয়, জীবনে আছে আনন্দ, জগতের আনন্দযজ্ঞে রয়েছে সবার আমন্ত্রণ—তুমি বলে গিয়েছ :

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশী,
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি ॥

তুমি ব'লে গিয়েছ :

সুন্দর এসে নন্দন নিকুঞ্জ হতে নীরব বীণাখানি তুলে নিয়ে মৃদুমন্দ ভালে ঝঙ্কার তুলবে, বিভাস রাগিণীতে ভোরের কাকলী তোমার ঘুম ভাঙাবে, গানের পালে এসে লাগবে হাওয়া—প্রেমের তরী যাবে ছেড়ে। তারপর—

সুরের সাথে মিশিয়ে বাঁশী দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া চাইছে যেতে বাসা ছেড়ে।

যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান তখন বাজবে হিয়ায়, গীতসুধা বর্ষিত হয়ে পিপাসিত চিত্তকে ক'রে তুলবে তৃপ্ত।

শরতের ছায়াবটে, বর্ষার মল্লারে, বসন্তের বাহারে অকারণে গাওয়া গান যূথীমল্লিকার সুবাসে মিশে ভেসে বেড়াবে। আপন গানের টানে ঘরছাড়া কোন পথের পানে নিয়ে যাবে টেনে।

বর্ষে বর্ষে এই আনন্দোৎসবে তিনি থাকবেন না, থাকবে তাঁর গান। আসা-যাওয়ার পথের ধারে যে গান গেয়ে তাঁর দিন কেটেছিল—সুরগুলি সেদিন তিনি নানাভাবে পুষ্প পরাগের মত ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন—মীড়গুলি মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় বিলীন ক'রে রেখেছেন, কবে কোন চৈত্র মাসে বকুলচাকা বনের ঘাসে তাঁর মনের কথার টুক্‌রাগুলি কোন উদাসীন কুড়িয়ে পাবে, সেই আশায়।

তিনি আমাদের এই খেলাঘরে একদিন গান গেয়েছিলেন, আমরা যেন সেই কথাটি মনে রাখি এবং বর্ষে বর্ষে আমাদের এই খেলাঘরে যেন তাঁর গান দিয়েই 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি'।

মন্তব্য
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় পর্যায়)

মাষ্টার মশাই তখন কাগজের টুকরো দিয়ে (হেলা-ফেলার কাজ) নানা রকম ছবি করছেন, এ নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর একটি লেখা বেরিয়েছিল।

সেদিন ৩রা জুলাই ১৯৫৩ সাল, ছুটির শেষে তাঁর কাছে যাই দেখা করতে। যাওয়া মাত্রই তিনি আমায় পাঠান কাগজ টুকরো দিয়ে করা "বর কোনের" কথা উল্লেখ করে বল্লেন, দেখ,—টুকরো কাগজ দেখে মনে হয় খুব সোজা কিন্তু ঠিক তত সোজা নয়, প্রচুর জ্ঞান থাকা চাই আকার সম্বন্ধে আর ষ্ট্রাডিরও দরকার প্রচুর। এই বলে তিনি কাগজের টুকরো দিয়ে একটি নেউল করে দেখালেন, সেদিন আর বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি এ সম্বন্ধে।

বহুদিন বাদ আজ আবার ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৮ সাল, গেছি তাঁর কাছে, এই "হেলা ফেলা"র কাজ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন সেদিন। নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিলেন এ ধরণের কাজের উপকার কোথায়, আর কি জ্ঞান বাড়ে। বল্লেন, "দেখ! এ এক ধরণের খেলাই বলতে পার। দেখবে ছোটরা যেমন পুতুল দিয়ে সংসার পাতার খেলা খেলে, তোমরাও তেমন টুকরো কাগজ দিয়ে ছবির সংসার পাততে পার। প্রত্যেক খেলার যেমন নিয়ম থাকে এ খেলারও তেমন নিয়ম থাকবে। যেমন—ভেবে কাগজ ছিঁড়তে পারবে না, ছিঁড়ে ভাবতে হবে; এলো-মেলো ভাবে ছিঁড়তে হবে, আরও নিঃসন্দেহ হ'তে হবে অপরকে দিয়ে কাগজ ছিঁড়িয়ে নিয়ে। তারপর এই ছেঁড়া টুকরো নিয়ে ভাবতে হবে এটা কি হ'তে পারে, দ্বিতীয়তঃ হয়তো কোথাও একটু বাদ দিলে (ছেঁড়া টুকরো থেকে) একটি আকার দাঁড়াতে পারে, সে ক্ষেত্রে এক কিংবা খুব বেশী দু'বারের বেশী ছিঁড়তে পারবে না। আর তারপর মাত্র কয়েকটি কালির আঁচড় দেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। যে যত কম ছিঁড়ে,

আর কম আঁচড় দিয়ে আকার (ফর্ম্) করবে তার তত বাহাদুরী, আর তার তত নম্বর (যদি নম্বরের মাধ্যমে খেলা হয়) । এ খেলা শিল্পীদের খেলা, এতে উপকার কি জান ? যেমন ধর—একটি কাগজের টুকরো নিয়ে নানারকম জীবজন্তুর, গাছপালার আকার (ফর্ম্) ভাবতে থাকলে । এমনও হতে পারে যে, তুমি একটি আকার ভাবলে, আর অপর একজন অন্য একটি আকার ভাবলো ; হয়তো তুমি অপর মনের আকার সম্বন্ধে ভুলেও ভাব নি, তাতে তোমার উপকার হলো এই যে, তুমি সেই আকার (ফর্ম্)-টি দেখলে আর সেইটি আবার নূতন ক'রে ভাবলে, এইভাবে তোমাদের ক্রমশঃ আকারের জ্ঞান বাড়তে থাকবে, আর সে জিনিষ হয়তো মনের মধ্যে একবারও চিন্তা করো না, আজ এ খেলার জন্য তা চিন্তা করতে হ'লো । এ খেলা সবচেয়ে তারই ভালো হবে যার যত আকারের জ্ঞান থাকবে । আর এই খোলা-মেলা খেলার ভেতর তুমি ক্রমশঃ আকার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে পড়বে, নতুন আকার দেখবার বাসনা জাগতে লাগলো মনে । আসল কথা, এই কাজে যা অতি সহজ সাধারণ খেলায় ভেতর আকারের জ্ঞান ও ভীতি হয় প্রচুর" । এর পর তিনি ছেঁড়া টুকরো দিয়ে ঐ ধরণের কিছু কাজ করতে লাগলেন ।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাঁর অসুখ দিতে গেছি, বল্লেন, "চলো আমার বসার ঘরে (এটা তাঁর ছবি আঁকা ঘর) । আজ আবার এক নতুন খেলার ধরণ বের করেছি" । দেখবে ঘরে এসে একটি কার্ড নিলেন আর চোখ বন্ধ করে এলো-মেলো ভাবে কয়েকটি আঁচড় টানলেন, তারপর চোখ খুলে সেই টানা আঁচড়ের ভেতর আকার খুঁজতে লাগলেন । যেই আকার পেলেন অমনি আঁচড় দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে বল্লেন : "এও একপ্রকারের "হেলা ফেলা" কাজের মতন বলতে পার। কিন্তু ভেবে আঁচড় কাটতে পারবে না, কেটে ভাবতে পার এটা কি হ'তে পারে । যদি এটা খেলতে চাও তবে "হেলা ফেলা" কাজের মতই এর নিয়ম হবে । এ ছাড়া ধর —তোমাদের কাছে কাগজও নেই, পেন্সিলও নেই, তখন কি করবে ? তখন সবাই মিলে "নামকরণ" খেলতে পার—কেউ বললো বটগাছ, কেউ নিম আর কেউ হয়তো বললো আম । এইভাবে সবাই এক একটি গাছের নাম ক'রে যেতে লাগলো, কিন্তু কেউ একটি গাছের নাম দু'বার করতে পারবে না, যে করে ফেলবে তাকে খেলা থেকে বিদায় নিতে হবে । এমনি করেই নানাপ্রকার গাছের নাম জানা যাবে ; আর শুধু যে গাছ দিয়েই খেলা খেলবে তা নয়, ফুল, ফল, পাহাড়, শিল্পী, সাহিত্যিক ও আরও অনেকের নাম দিয়ে । এতে উপকার হবে কি জান ? তুমি যা জান না তা শিখলে আর কেউ হয়তো যা জানে না তাকে তুমি শেখালে । এতে উভয়েরই উপকার হলো" ।

সেদিন দুর্গাপূজার নবমী ১৩৬৫ সাল । সকালে তাঁর কাছে গেছি, কথাপ্রসঙ্গে এই "হেলা ফেলা" কাজ নিয়ে কথা উঠলো, বল্লেন, "দেখ ! এ ধরণের কাজ আমি প্রথম শুরু করি গৌরীর (মাষ্টার মশাইয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) বাড়ীতে গাছতলায় বসে । দিনটা আমার ঠিক মনে

নেই—কলাভবনের ছেলেমেয়েরা ছাপ টাপ্তি করতে এসেছে গৌরীর বাড়ীতে। ওদের দেখাদেখি আমারও করতে ইচ্ছা হলো ; কিন্তু পেন্সিল, কাগজ বা কার্ড কিছুই ছিল না আমার কাছে। সঙ্গে ওষুধ রাখেতুম, তার একটা পুরিয়ার কাগজ ছিঁড়ে ঐ ভাবে কিছু টাপ্তি করলুম। "হেলা ফেলা" কাজের গোড়ার কথা হচ্ছে তোমার,—ছবিতে যেমন যত ভাব তত আকার (ফর্ম্) কিন্তু এটার বেলায় যত ফর্ম্ তত ভাব। কোন ভাব ছাড়া ফর্ম্ নেই জানবে"। এর পর নানা রকম আলোচনা হ'তে লাগলো।

সেদিন ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৮ সাল। বিনোদদা (শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়) এসেছেন মাষ্টার মশাইয়ের কাছে। কথাপ্রসঙ্গে "হেলা ফেলা"র কাজ নিয়ে কথা উঠলো। বল্লেন, "অনেকের ধারণা অবনবাবুর (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) "কাটুম কুটুমের" মতই কিন্তু আসলে তা নয়, "কাটুম কুটুমের" কাজের সাথে "হেলা ফেলা" কাজের তফাৎ আছে"। বিনোদদা বল্লেন—"অবনবাবু অনেকটা Textureএর উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন"।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সাল। এদিন নিজের কিছু কাজ নিয়ে গেছি তাঁর কাছে দেখাতে। তাঁর বাড়ীর এক মেয়েন (সাঁওতালী মেয়েদের বলে) তার দেশ (দুমকা, বিহার) থেকে এসেছে, গলায় একটা বিকট হাসুলী পরেছে। অত বড় জিনিষটা ঠিক তার গলায় মানানসই হচ্ছিলো না। আমি মাষ্টার মশাইয়ের কাছে সেই কথা বলায় তিনি বল্লেন, "দেখ। বিউটির কোন ক্যাটেগরী নেই, ও যে দেখেছে, আর ওকে যে খারাপ লাগছে, তা ও বুঝতে পারছে না। যে সাজে তাকে যদি চোখে আঙুল দিয়েও দেখিয়ে দাও—ওরে! তোকে খারাপ লাগছে, তবুও সে বুঝতে পারবে না"। তারপর হঠাৎ একজন পুরাণো ছাত্র আসায় এ বিষয়ে আর সেদিন বিশেষ কোন আলোচনা হ'লো না।

২৭শে ফেব্রুয়ারীতে বিউটি নিয়ে যে কথা বলেছিলেন, ১৪ই মার্চ '৪৮তে আবার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন—"দেখ, বিউটির কোন ডেফিনেশন নেই। কেউ ছক কেটে বেঁধে ব'লে দিতে পারে না যে, এই কয়টী থাকলে তবে সেটি বিউটির পর্যায়ে পড়বে ; আর যদি না থাকলো তবে সেটি পড়লো না। তা হয় না—তবে হয়তো প্রশ্ন মনে উঠতে পারে, তাহলে কোন্‌টিকে বিউটির পর্যায়ে ধরবো? দেশের দশজন গুণী লোক, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি যাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ধরে নেওয়া হয় তাঁরা যেটাকে বিউটি বলেন সেটাকে ধরা যেতে পারে। এটা জানবে বিউটীতে সর্বদা অ্যাড্ হয়, ওর লিমিটেশন্ নেই। যদি বলো একটি বৃদ্ধের ভেতর বিউটি আছে। আমি বলবো, না। যে বৃদ্ধের মুখে ইন্‌টেলেক্টের ছাপ আছে তার বিউটি আছে, যেমন ধরো গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তিনি বৃদ্ধ হ'য়ে গেলেও তাঁর বিউটি ছিল, অর্থাৎ তাঁকে দেখলে ইন্‌টেলেক্টের ছাপ পাওয়া যায়। বিউটি মানেই ফর্সা নয়, একটি কালো সাঁওতালী মেয়েও সুন্দরী হ'তে পারে তার শরীর ও গঠন যদি ভালো হয়। আর যদি একটি খুব ফর্সা মেয়ে দেখা হয় তাহলে তার বিউটি নেই ব'লবো।

যেমন জাতের কুকুর হলেও যদি তার গায়ের লোম যা হ'য়ে উঠে যায় তাহলে তার বিউটি নেই, আর সাধারণ দেশী কুকুরের শরীর যদি তেল-চিক্‌চিকে হয়, ভাল স্বাস্থ্য থাকে তাহলে ব'লবো তার বিউটি আছে"।

৯ই মার্চ '৫৮ সাল। তিনি যাওয়া মাত্রেই বল্লেন, "হরিপ্রসাদ (একজন কলাভবনের ছাত্র) বেনারস থেকে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে—ওখানে প্রকৃতি নেই, ফুল নেই, পাতা নেই, শুধু বাগান সাজানোর জন্যে কতকগুলো মৌসুমী ফুল আছে"। এর উত্তরে তিনি বল্লেন: "আর্টিষ্টের আবার প্রেজুডিস কেন? ফুল তা সে যাই হোক—মৌসুমী হোক আর যেমনই হোক, আর ফুলপাতাই কি প্রকৃতি নাকি, মানুষ কি প্রকৃতি না? আমি বেনারসে থাকতে অলিতে গলিতে স্কেচ্‌ ক'রেছি, আবার ওখানকার যে সমস্ত কাঠের পুতুল আছে তা ভালো ক'রে দেখেছি, শুধু দেখেছি নয়, যারা তৈরী করে তাদের বাড়ীতে গিয়ে তৈরী করার ধরণ, রঙ দেওয়ার ধরণ লক্ষ্য করেছি। যখন ট্রেণে চলতুম তখন চট্‌ ক'রে সাবজেক্ট বেরিয়ে যেতো। তাই করতুম কি কার্ডে নোট করে রাখতুম। যেমন ঝাঁকাওয়ালা চলেছে, বেগুন আছে কিংবা আরও চলত কিছু আছে এমন। কারণ যা জিনিষ (সাবজেক্ট) দেখলুম সেটি ক্যামেরার মত স্ন্যাপ্‌-শট্‌ হ'য়ে গেল মনের ভেতর আর তার নোট রাখলুম। বাড়ীতে গিয়ে নম্বর মিলিয়ে ফিল্ম (মাথা) ঘোরাতে লাগলাম। মাথার ফিল্মের সাথে যেই আমার নোট করা কার্ডের নম্বর মিলে গেল ওমনি কার্ডে ছবি হয়ে গেল। এই মাথার ভেতর সবই আছে—শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার করতে হয়। এও হচ্ছে স্কেচ্‌ করার আর একটি ধরণ"।

গ্রামোন্নয়ন

শ্রীরাধাবল্লভ দে, বি. এ., বি, এড.

ভারতবর্ষের অস্তিত্ব গ্রামে। সেইজন্য ভারতে গ্রামোন্নয়ন সমস্যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা। গ্রাম-জীবনের আবশ্যকতা অনেক, তাহাদের মধ্যে তিনটী অনিবার্য আবশ্যকতা হইল—আহারের জন্য খাদ্য, পরিধানের জন্য বস্ত্র, এবং বাসের জন্য গৃহ। ইহা ব্যতীত চতুর্থ আবশ্যকতাও একটী আছে যাহা মানব-জীবন সার্থক করিবার পক্ষে অপরিহার্য। ইহা মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের পরিপূরণ—অর্থাৎ পঠন, পাঠন ও সংস্কৃতি সাধনের এমন সুবিধা থাকা প্রয়োজন যাহার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণের বিকাশ হইতে পারে।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা, কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষি লইয়াই থাকে এবং কৃষিই অনেকের জীবিকার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কুটীর-শিল্প লুপ্তপ্রায় হওয়ায় গ্রামের জমির উপর বহু ভার পড়িয়াছে। অন্যান্য বৃত্তিধারী লোকেরাও কৃষিকার্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর, ক্রমশঃ ভাগ করিতে করিতে জমি ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ঈর্ষা ও অজ্ঞানতার জন্য পরিশ্রমের মধ্যে সহযোগিতা নাই। প্রতি বৎসর বন্যার সময় অধিকাংশ জমি ডুবিয়া যায়। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। দারিদ্র্যের জন্য ভাল বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। জ্ঞানের অভাবে সরকারী কৃষি বিভাগের সহযোগও কার্যকরী করা যাইতেছে না। সামাজিক কুরীতিপ্রসূত ঋণ শোধের জন্য কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় গ্রামবাসীদের সমবেত চেষ্টায় লুপ্ত কুটীর-শিল্পকে উদ্ধার করিতে হইবে। কৃষিকার্যের অবসরে এই সব শিল্পে হাত দিতে হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের দ্বারা

জমি ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করা বন্ধ করিতে হইবে। আর যেসব জমি ভাগ হইয়া গিয়াছে উহা পুনরায় এমনভাবে ভাগ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক চাষী চাষ করিবার মত যথেষ্ট জমি পায়।

বন্যা হইতে জমি রক্ষা করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে সমবেত চেষ্টায় ক্ষেতের চারিধারে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। অনাবৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য গ্রামে বারোয়ারী কূপ খনন করা প্রয়োজন। গ্রামে এক সমবায় ভাণ্ডার এবং ব্যাঙ্ক খোলা আবশ্যক, যাহা হইতে প্রয়োজন মত চাষের জন্য চাষীরা টাকা, যন্ত্রাদি, সার এবং বীজ সংগ্রহ করিতে পারে। অন্যান্য উন্নতশীল দেশের মত ভারতের কৃষকদেরও বৈজ্ঞানিক রীতিতে কৃষিকার্য করিতে হইবে। জমির উৎপাদন শক্তিও বর্ধন করিতে হইবে। এক কথায় যতদূর সম্ভব মিলিয়া মিশিয়া আপনাদের প্রয়োজন পরিপূরণের পদ্ধতি শিখিতে হইবে। পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা কৃষি, পশ্বাদির উন্নতি, জল সেচনের উপকরণের উদ্ভাবন এবং কৃষিকার্যের স্থায়ী সংস্কার করা প্রয়োজন। মোট কথা, খাদ্যে গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বী ত হইতেই হইবে, উপরন্তু উদ্বৃত্ত শস্যাদির বিনিময়ে যথাসম্ভব অর্থাগমের পথও সুগম রাখিতে হইবে।

জীবনের দ্বিতীয় প্রধান আবশ্যকতা বস্ত্রের। প্রতি গ্রামে কৃষির সঙ্গে বস্ত্রোৎপাদনও করিতে হইবে। কারণ, বস্ত্র বিষয়েও গ্রাম স্বাবলম্বী নহে। যখন পেশা যাহাদের সেই জোলা, তাঁতি ছাড়া বস্ত্র বয়ন গ্রামবাসীদের ভিতর প্রায় দেখা যায় না। মিলের প্রতিযোগিতায় খাদির কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রতি গ্রামে প্রয়োজনমত কার্পাসের চাষ চালাইতে হইবে। কার্পাস দুই প্রকারের হইয়া থাকে (১) এক বার্ষিক, (২) বহুবার্ষিক। এক বার্ষিক গাছ মকাই, অড়হর, চ্যাড়শ প্রভৃতির সঙ্গে লাগাইলে গৃহস্থের খাদ্যেরও অনেকটা সমাধান হইতে পারে। আবার বহুবার্ষিক গাছ বাড়ীতে ওরকারির বাগানের ধারে ধারে বা অন্য সুবিধামত স্থানে লাগাইলে বহুদিন ফসল পাওয়া যায়। এই কার্পাসের চাষের সঙ্গে সঙ্গে সূতা কাটা ও কাপড় বোনারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিদিন আধ ঘণ্টা সূতা কাটিলে প্রতি ব্যক্তি আপনার জন্য বৎসরের কাপড়ের সংস্থান অনায়াসে করিতে পারে। প্রতি গ্রামে কতকগুলি বস্ত্র বয়নের তাঁতও নিশ্চয় থাকা চাই।

জীবনের তৃতীয় প্রধান আবশ্যকীয় দ্রব্য হইল গৃহ। এই গৃহনির্মাণকালে অজ্ঞানতা-বশতঃ গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যবিধিসম্মত গৃহনির্মাণ করিতে জানে না। ঘরের ভিতরকার মেঝে যথেষ্ট মাটি দিয়া ভরানো উচিত। ঘরের দেওয়ালে অল্প অল্পভাবে দু'চারটি জানালা রাখা উচিৎ। সম্ভব হইলে গৃহের দৈর্ঘ্য যেন উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে হয়। উহার মুখ পূর্ব দিকে হইবে। বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় নালীর জলনিকাশ, মলমূত্র ত্যাগের স্থানের ব্যবস্থা, কূপ খনন এসবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

সারা ভারতে অক্ষরজ্ঞানী বালক-বালিকার এবং পুরুষ-নারীর সংখ্যা কম। ইহার ফলে

আমাদের গ্রামসমূহে অধিবাসীগণের মধ্যে মূর্খতা ও তজ্জনিত অন্ধ বিশ্বাস, চৌর্য, মাদকদ্রব্য সেবন, অপব্যয় ইত্যাদি কু-অভ্যাস প্রবল। প্রতি গ্রামে পাঠশালা এবং যথাসম্ভব উচ্চ বিদ্যালয় খুলিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিস্তারে অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। বালক, প্রৌঢ়ও স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়। এ ব্যবস্থা নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদ্বারা করিতে হইবে। আর, প্রতি গ্রামে পাঠাগার, কথকতা এবং মধ্যে মধ্যে শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পর্বোৎসবাদিতে কীর্তন, ভজন, উপদেশসহ পর্বোৎসবের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বুঝাইতে হইবে। নারীদের সেলাই, সূতাকাটা, সতরঞ্চ ও চাটাই বোনা, নক্সার কাজ ইত্যাদি কুটির-শিল্পের শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া দেওয়া কর্তব্য। এখন, গ্রামের তরুণ বংশধরেরা যদি গ্রামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যত্ন ও সহানুভূতির সহিত সাহায্য করেন তবেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান সম্ভব।

ভারতের তীর্থদর্শনে

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময়ে মথুরা নগরীতে অনেক লোকের বসবাস হইয়াছিল, কিন্তু তখন মথুরার নিকটে চারিদিকে ঘন বন ছিল। সেই সকল বনের মধ্যে বৃন্দাবন অন্যতম। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে: "সত্যযুগে মহারাজ কেদারের কন্যা বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য এখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। বৃন্দার পবিত্র তপোবন হওয়ার জন্য এই স্থানকে বৃন্দাবন বলে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলাবলীর প্রধান রঙ্গস্থলী—এই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী। বৃন্দা নামে বহু প্রাচীন একটি দেবীমন্দিরও এখানে আছে।

মথুরা হইতে বৃন্দাবনের দূরত্ব রেলপথে নয় মাইল আর মোটর-বাস ও টাঙ্গা প্রভৃতিতে যাইলে ছয় মাইল। মোটর বাসের রাস্তা খুবই ভাল। রাস্তার দুই ধারে নানাপ্রকারের গাছ আছে। কোন কোন গাছের ডালে অনেক ময়ূর বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও শুক-সারীরা আনন্দে গান গাইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্বে নাকি পথের ধারে অমিতে হরিণের দল বিচরণ করিত। যাই হউক আজকাল জঙ্গলে অনেক নীল বর্ণের গাভী দেখিতে পাওয়া যায়। রেলপথে যাইলে এইসব দৃশ্য ও আর কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না; সেজন্য বহু যাত্রী টাঙ্গা, রিক্সায় অথবা পদব্রজে বৃন্দাবন যান।

মথুরা হইতে কিছুদূরে বিরলাজীর সুবিখ্যাত সুদৃশ্য গীতা মন্দির। মন্দিরে শঙ্খচক্রধারী, বনমালা বিভূষিত বনমালীর শ্বেত মর্মরের ত্রিভঙ্গ মূর্তিটি নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত থাকে। এই মন্দিরপ্রাঙ্গে সমগ্র গীতার শ্লোকগুলি শ্বেত পাথরের উপর খোদিত রহিয়াছে। নির্জন

মনোরম স্থানটী সাধন-ভজনের উপযুক্ত। অপর পার্শ্বে সুন্দর ধর্মশালা ও গীতা ভবন। এখান হইতে আর কিছু দূরে এলেই বৃন্দাবন। দূর হইতে দেব-মন্দিরের উচ্চ চূড়ারাজি দর্শনে মনে বিমল আনন্দের উদয় হয়, মুখে আপনা-আপনি উচ্চারিত হয়—

"জয় বৃন্দাবন-বিহারী-লাল কী জয়"।

বৃন্দাবন সহরটি বেশ বড়; কিন্তু রাজপথগুলি অপ্রশস্ত। নানাবিধ পণ্য ও খাদ্যের দোকান আছে অনেক। যাত্রীদের জন্ত অনেক ধর্মশালাও রহিয়াছে। যাত্রীদের প্রধান কর্ম এখানে—যমুনাস্নান ও দেবদর্শন। অনেকে বৃন্দাবন সহরটী প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ পথ চার মাইল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয়। অনেক ভক্ত আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে পরিক্রমা করেন। পূর্বে তপনতনয়া যমুনা বৃন্দাবন সহরের নিকটেই প্রবাহিত ছিল; বর্তমানে সহর হইতে কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে জল বাড়িলে আবার সহরের কাছেই প্রবাহিত হয়।

বৃন্দাবনে প্রাচীন মন্দির আছে চারটী: গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, যুগলকিশোর ও মদন-মোহনের। গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও প্রাচীন। টাঙ্গার রাস্তায় সহরের মধ্যে প্রবেশের পথে প্রথমেই পড়ে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সুন্দর ও বিশাল মন্দির। মন্দিরটী লাল পাথরের তৈরী; ইহার শিল্পকার্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। এরূপ শিল্পকলাপূর্ণ মন্দির উত্তর ভারতে আর নাই বলিলেও চলে। এই মন্দির, বৃন্দাবনের অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। একদা ইহা পাঁচতলার ছিল। উপরের পাঁচতলাটী ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করেন। এখন ইহা চারতলার। প্রবাদ আছে: কোন সময়ে এই মন্দিরের শিখরদেশে প্রতিদিন একমন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলিত। মন্দিরটী রূপ ও সনাতন গোস্বামীর আদেশে রাজা মানসিংহ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করান। গোবিন্দদেবের প্রাচীন মূর্তিটী রূপ গোস্বামী নন্দগ্রাম হইতে আনিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নন্দগ্রামে বজ্রনাভ ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের এই মন্দির ধ্বংস করিবার পূর্বেই প্রাচীন মূর্তিকে আগ্রের দুর্গের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়; এবং পরিশেষে, জয়পুর সহর নির্মাণ হইলে ও আগ্রের হইতে রাজধানী বদল হইয়া জয়পুরে হইলে, সেখানকার রাজমহলের মধ্যে মূর্তিকে রাখা হয়। তদবধি মূর্তিটী জয়পুর রাজ-প্রাসাদের মধ্যে একস্থানেই আছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ৩৮০০০ টাকা ব্যয় করিয়া গোবিন্দদেবের ভগ্ন মন্দিরের কিয়দংশ পুনরায় নির্মাণ করান। এখনও পর্যন্ত মন্দিরের উপরিভাগ ভগ্ন অবস্থায় আছে। পুরাতন মন্দিরের পিছনে অপর একটি নূতন তৈরী মন্দিরে গোবিন্দদেবের অন্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন মন্দিরেও অন্য একটি মূর্তি রহিয়াছে। গোবিন্দদেবের পূজারী সব বাঙ্গালী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ প্রণীত। অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকাসহ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৩নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫, কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩।০ টাকা।

জীবের নিত্যকালের প্রার্থনা, 'পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি', 'তুমি আমাদের পিতা, সেই বোধ আমাদের দাও।' কিন্তু সেই বোধ আসিবে কেমন করিয়া? ঋষিরা বলিয়াছেন, অভ্যাসের দ্বারা। আবার ইহাও বলিয়াছেন শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত সেই অভ্যাসের প্রেরণা আসে না। ঈশ্বরের উপলব্ধি তর্ক লভ্য নয়, যুক্তি লভ্য নয়, ইহা একান্তই অনুভূতিলভ্য। যুগে যুগে মহামানব, সদ্‌গুরুর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, অভ্যাসের মার্জনে চিত্ত আলোকিত করিয়াছেন, অরূপকে অনুভব করিয়াছেন; বাক্যে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। স্বীয় অনুভূতি বুঝাইতে উপমা ও রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন, গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। যে সকল মহামানব ঈশ্বরলাভ একান্ত উদ্দেশ্য মনে করিয়া স্মরণ মনন জপযাজনে অন্তর কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধির ইঙ্গিত ভগবৎ প্রসঙ্গে পরিব্যাপ্ত আছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুসরণ করিয়া ইষ্টলাভ করিলেন মহাত্মা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত ও পথে উদ্বুদ্ধ হইলেন সাধু শ্রীহেমচন্দ্র রায়। যাঁহারা শ্রীহেমচন্দ্রের সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণে ক্ষণিকের জন্যও দৈনিক জীবন বিস্মৃত হইয়াছেন, আশা করি তাঁহার সেই প্রাণস্পর্শী বাণী তাঁহাদের স্মরণে আছে। শ্রীহেমচন্দ্রের সুযোগ্য শিষ্য, মুক্তপুরুষ শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ বর্তমান 'ভগবৎ প্রসঙ্গ'-এ গুরু-শিষ্যের কথোপকথনে সেই মর্মস্পর্শী প্রাণবন্ত বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎসহ শ্রীহেমচন্দ্রের বচনমাধুর্য, সরল বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লেখক ভারতবর্ষের ধর্মপথ বিকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছেন। সীতারামের পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণের অপার্থিব দিব্য সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন।

শ্রীহেমচন্দ্রের স্মৃতিকথা বলিয়াছেন গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ে অবতার, কর্মফল ও সমর্পণ-রহস্য, শ্রীগুরু ও জন্মমৃত্যু বিষয়ে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের অন্তর্গূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যানে বহু গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়াছেন অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত সব সন্দেহ, সব সংশয় মিটে না; ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির বিষয় বস্তুতে বিবিধ ভাবে উক্ত সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। গ্রন্থে উল্লিখিত গুরু ও লেখক শিষ্য উভয়েই নিজ নিজ অন্তর্মুখী প্রতিভাযুক্ত ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়া, সংসারে ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, ঈশ্বর দিয়া সব কিছু আবৃত বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে নানাভাবে এই কথাটি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বর দিয়া সব কিছু আবৃত বলিয়া উপলব্ধি করিতে যাঁহারা কৃতসংকল্প, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা 'ভগবৎ প্রসঙ্গ'-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

কাব্য-কাহিনী—শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান: শ্রীগুরু-লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১৲

নূতন কবি এই কাব্যগ্রন্থে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানির বিষয়—১। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ২। দ্রৌপদী, ৩। রামের প্রতি সীতা, ৪। শিবের প্রতি সতী, ৫। নর-নারী, ৬। মীনাক্ষীর মনোবেদনা। ৪৪ পৃষ্ঠার এই বইতে বেশ খানিকটা প্রাণ তর্পণের আয়োজন করা হয়েছে, কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুপ্রাণিত হলেও কাব্যবিচারে ছন্দ আদৌ অমিত্রাক্ষর নয়, উপমা আর তন্দীগুলি প্রগল্‌ভ। যতিপর্বের ঘন ঘন ক্রিয়মতা পাঠককে পীড়িত করে।

"তুমি আস আর আমি আসি
উভয়ের হৃদয়ের নাড়ীর টানেতে।
ধর যেমন, একটা পজিটিভ আর
নিগেটিভ এর মিলনে মহান সৃষ্টি।"

এ জাতীয় উদাহরণ প্রচুর আছে। গদ্য কবিতা নয়, পদ্যও নয়, মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত নয়, অমিত্রাক্ষর নয়;—আধুনিক কবিতা নয়, তবু যে এটা কবিতার বই তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উৎসর্গের পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ আছে—"প্রীতি-প্রতিম শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের শ্রীচরণ কোকনদে—"।

যত তাড়াতাড়ি "কাব্য-কাহিনীর" দ্বিতীয় নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল।

অ. ক. হ.

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th. September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

STUDENTS COMMON

There is another reason. Hinduism is an extremely catholic religion. All other religions are intended for individuals or classes of individuals; but Hinduism is intended for all mankind. This catholic spirit of Hinduism, if successfully preached before men of other religious denominations, is sure to strike at the root of sectarianism. Will this not help on the cause of religious culture in all other countries as well as in this?

The signs of the times appear to me to be singularly favourable to the Swami. The people of America as well as of Europe are all anxious to be enlightened on the subject of Hinduism. In this connection Prof. Max Muller writing to one of us, says, that Europeans are not particularly attracted by the utterances of Indians on political and other matters; but that he and others like him would be quite prepared to give a respectful hearing to those who had anything to say on the Religion and Philosophy of the Hindus.

Before closing I think it my duty to pronounce the hallowed name of Vivekananda's Great Master Ramkrisna Paramhansa, the root of that majestic plant out of which Vivekananda has come forth as a splendid flower. Paramhansa Dev was the living Impersonation of the Catholic Spirit of Hinduism. Now, if the disciple is great it is because the Master is greater. And need I add that in rendering thanks to the disciple for the good work that he has been doing, we are at the same time offering our humble tribute of honour and reverence, to that Great Master, who has made the existence of men like Vivekananda possible in this 19th century. I will only conclude by giving my hearty support to the Third Resolution.

Babu Jotindra Lall Mittra said :

Gentlemen—Let me first of all salute to the feet of the Lord God, the Life of all living creatures, the Ruler of the universe ; and while rendering thanks to Vivekananda and the American people, let me in all humility couple the name of God with that of the Lord Ramkrishna Paramhansa Dev, the Great Spiritual Guide who is unquestionably the root of the present religious revival, inspired by whom the Swami has been capable of making such a successful appeal to the Americans by his exposition of Hinduism, and whose advent has made it possible for a layman like myself without learning, without social position, without spiritual culture to make a speech before this august assembly. I am deeply convinced that the proceedings of this great meeting cannot possibly be complete unless the hallowed name of the Lord Ramkrishna Paramhansa Dev is uttered with reverence in this hall. As regards the Swami's work and the generous treatment received by him at the hands of the Americans, it seems to me that we have three great lessons to learn. In the first place, we are taught that it is to the American's love of Truth that their appreciation of Hinduism is due, a religion which in its catholicity, its wisdom and its purity, is based upon Truth. It is remarkable that the Americans who feel a real thirst for spiritual culture arranged for a Parliament of Religions in connection with the World's Fair.

In the second place we are taught that the time is come when Hinduism will cease to be regarded as a superstitious, idolatrous and worthless religion, but will be looked upon as *Sanatan*, that is, a universal, living, scientific, infallible religion.

In the third place, we are taught that the principles of Hinduism cannot be communicated through the medium of speeches, or through printed publications. The *Aryan Rishi* showed this by his daily life, a life with the minutest incidents of which—sitting, standing, walking, lying down, or sleeping, eating, bathing etc.—his religion is intimately bound up. The Hindu and his religion are inseparable from each other. His religion is mixed up with his very blood and must be assimilated to his very bones and marrow. Let us give up words and turn our attention once more to real work as prescribed by our *Shastras* which alone shall enable us to attain

the end of life. With these remarks I have much pleasure in supporting the Third Resolution.

The Resolution was then put to the vote and carried unanimously.

The Chairman then read before the meeting the following letters from the leading Orthodox members of the Hindu Community who had expressed their regret for their inability to be present at the meeting.

I

From Rajah Rajendra Narain Deb Bahadur.

Shovabazar, Raj-Bati.
5th September, 1894.

To

The Chairman of the meeting.

Dear Sir,

I regret that my ill-health disables me from attending the meeting. I would therefore request you to convey to the meeting my hearty sympathy with its object. I need hardly say that Swami Vivekananda richly deserves the thanks of the Hindu Community for his very able exposition of the essential principles of Hinduism.

Yours faithfully,
(Sd.) **Rajendra Narain Deb**

II

From Sir Romesh Chandra Mitter, K.T.

Bhowanipur
5th September, 1894.

To

Babu Narendro Nath Sen.

My Dear Narendro Babu,

Owing to my health [and other causes I am unable to be present at the Town Hall meeting of to-day. That great services have been rendered to the cause of Hinduism by Srimut Vivekananda Swami at the Parliament of Religious at Chicago, and that they are gratefully appreciated by the Hindus, cannot in my opinion be questioned. But I have heard that some persons professing other religions think that the address of the Swami to the Parliament of Religions on the 19th September, 1893, is not a correct exposition of the Hindu Religion. I believe that this opinion proceeds from

their ignorance of the principles upon which the Hindu Religion is founded.

Yours Sincerely,
(Sd.) **Romesh Chandra Mitter.**

III

From Babu Issan Chandra Mookerjee.

To

Pundit Rajkumar Nyayaratna and others.

Gentlemen,

Since the meeting was proposed and it was arranged that I should be one of those who would convene the meeting, I have come to Ghazipur in the N. W. Provinces and I regret I am thus precluded from attending the meeting and taking part in its proceedings. I hope, however, that the meeting will be unmerously and respectably attended and that its proceedings will be conducted in a befitting manner, in short that the meeting will be a complete success.

Nothing in this age of progress and enlightenment has been so much misunderstood and misrepresented by foreigners pretending to understand it, as Hinduism. Swami Vivekananda has succeeded in dispersing the mist that gathered round this subject and placing it in a proper light before the American Public. As it is not unlikely that men whose interest it is to disparage and disrate Hinduism may endeavour to make people believe that the Hinduism expounded by Swami Vivekananda at the Parliament of Religions at Chicago is not the Hinduism of the *Shastras*, it behoves us as Hindus to lose no time in offering our congratulations to our distinguished countryman for his successful representation of our Religion and thus practically declaring to the world that in expounding Hinduism in the way he has done, he has only echoed our sentiments and those of our *Shastras*.

The American public who have accepted the exposition of Swami Vivekananda with such a liberal and charitable spirit and who have accorded him such warm reception are also entitled to a share of our gratitude, and in congratulating the Swami we should take this occasion to record our thanks to the Americans.

These are the business of to-day's meeting and I hope my colleagues have arranged for their disposal in a proper manner.

GHAZIPUR,
The 3rd Sept. 1894.

Yours faithfully,
(Sd.) Issan Chandra Mookerjee

॥ সংঘ-বার্তা ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিগত ২রা কার্তিক হইতে ৬ষ্ঠ কার্তিক শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রতিমায় যথাবিধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন পূজান্তে অগণিত নরনারী শ্রীশ্রীদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলী দান করিয়াছেন। প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল পূজার কয়টী দিন ধরিয়া সমাগত ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে।

এবারের পূজায় বিভিন্ন দিনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান-সূচী ছিল :

২রা কার্তিক, রবিবার—পটলডাঙ্গা নামকীর্তনসমিতিকর্তৃক খোলকীর্তনসহকারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' গান। ৩রা সোমবার—বাগবাজার বিশ্বনাথ কালীকীর্তনসমিতি কর্তৃক "শ্যামাসঙ্গীত" এবং শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল ও সম্প্রদায়কর্তৃক বংশীবাদন। ৪ঠা; মঙ্গলবার —সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী বর্ণা পাকড়াশীর সহযোগীতায় শ্রীভবীশ-চন্দ্র মিত্রকর্তৃক স্বরচিত নাটকের সংলাপ ও সংগীত-মাধ্যমে "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা" বিষয়ে কথকতা। প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানেই বহু শ্রোতৃ-সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ৫ই কার্তিক, বুধবার পূর্বাহ্নে দশমীবিহিত পূজা ও দর্পণে দেবীর বিসর্জন সম্পন্ন হয়। তৎপরে—দলে দলে মহিলাগণ সমবেত হইয়া সিন্দুরোৎসবের মাধ্যমে দেবীর কৃপা তথা বৎসরান্তে তাঁহার পুনরাগমনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা : ১০ই কার্তিক সোমবার কোজাগরী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা এবং ২৫শে কার্তিক, সোমবার নিশীথে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপূজার রাত্রে কুমারী আলো ঘোষ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজনের ভজনগান হইয়াছিল। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার রাত্রে সংগীত বিশারদ বীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীদুর্গাদাস সেন, কুমারী মীরা বসু ও শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর মহাশয় শ্যামাসঙ্গীত করিয়াছিলেন। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীলের বংশীবাদনও হইয়াছিল। শ্যামাপূজা শেষ হইতে ভোর হয়। বহুভক্ত নরনারী সমস্ত রাত্রি পূজা দেখিয়াছিলেন এবং পূজান্তে মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরম শান্তি অনুভব করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথকতা : ২২ কার্তিক, শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেদশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথকতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব : আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৯, ১৭ই মাঘ, ১৩৬৫ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৯৭তম জন্মতিথি। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। উৎসবের বিস্তৃত কর্মসূচী ৩১শে জানুয়ারীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত থাকিবে।

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, গ্রন্থাগার, কলিকাতা
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(প্রতিপক্ষে শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায়)

১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৫৮
বিষয় : **বাউলধর্ম**
বক্তা : ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, জয়পুরিয়া কলেজ।

২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৫৮
বিষয় : **গিরীশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য**
বক্তা : ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১০ই জানুয়ারী, শনিবার, ১৯৫৯
বিষয় : **মৈমনসিংহ-গীতিকা**
বক্তা : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

●

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ, অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় শঙ্করভাষ্যসহ 'কঠ-উপনিষৎ' আলোচনা করিতেছেন।

● পণ্ডিত শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করেন।

● সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি রবিবার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা" করেন।

● শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, সঙ্গীত-বিশারদ ও সম্প্রদায় প্রতি শনিবার বেলা ৩টায় "শ্রীরামনাম" গান করেন।

বিশ্ববাণী

প্রতিষ্ঠাতা • স্বামী অভেদানন্দ

মাঘ, ১৩৬৫
২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

STUDENTS
COMMON-ROOM

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। ফাল্গুন ১৩৬১, বিশ্ববাণীর ২১শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা পঁচাশি নঃ পঃ। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। বৎসরের যে কোন মাসে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়া যায়।

২। সাধারণতঃ, প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নামে বিশ্ববাণী পোষ্ট করা হইয়া থাকে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করিতে চাহিলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে উহা জানাইবেন।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী না পাইলে সে সংবাদ সেই মাসের ২০ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে বিশ্ববাণী অফিসে আসা চাই। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। প্রবন্ধ দুলক্ষেপ চার পাতার এবং কবিতা এক পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। তবে কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমতসাপেক্ষ। বিশ্ববাণীতে সমালোচ্য পুস্তকও সাদরে গৃহীত হয়। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

৮। বিশ্ববাণীতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনদাতা অনুগ্রহপূর্বক বিশ্ববাণী আফিসে আসিয়া অথবা আমাদিগকে পত্র লিখিয়া বা কোন করিয়া উক্ত বিষয়ে সবিস্তার জানিয়া লইবেন।

● পৌষ ১৩৬৫, বিশ্ববাণীতে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৩৬৬, ফাল্গুন সংখ্যা হইতে বিশ্ববাণীর বাৎসরিক মূল্য ৪·৭৫ ন. প. ধার্য করা হইয়াছে।

ম্যানেজার, 'বিশ্ববাণী'
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৮০৫

বিশ্ববাণী

মাঘ, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। শ্রীবিবেকানন্দাষ্টকম্	... ৫৭৫	অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, সাহিত্যশাস্ত্রী
২। সমাজবাদী স্বামী বিবেকানন্দ	... ৫৭৮	শ্রীমতী লেখা ঘোষ, বি. এ.
৩। ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ	.... ৫৮১	স্বামী দুর্গানন্দ
৪। উমা-হৈমবতী	... ৫৮৫	শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ
৫। সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা	... ৫৯০	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি., টি.এস.ই.
৬। ভাষতীকার কি প্রতিবিম্ববাদী ?	... ৬০০	স্বামী সদানন্দ
৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস	... ৬০৪	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
৮। নন্দন	... ৬১০	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	প্রতীক্ষা (কবিতা)	৬১৪	শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী
১০।	মহাপিপাসা (কবিতা) ...	৬১৫	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
১১।	গ্রন্থ-সমালোচনা ...	৬১৬	
১২।	সংকলন ...	৬১৯	
১৩।	সংঘ-বার্তা	৬২০	
১৪।	সাংস্কৃতিক বৈঠক	২২৭	

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্, পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৪ লাইন)

শাখা :— বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

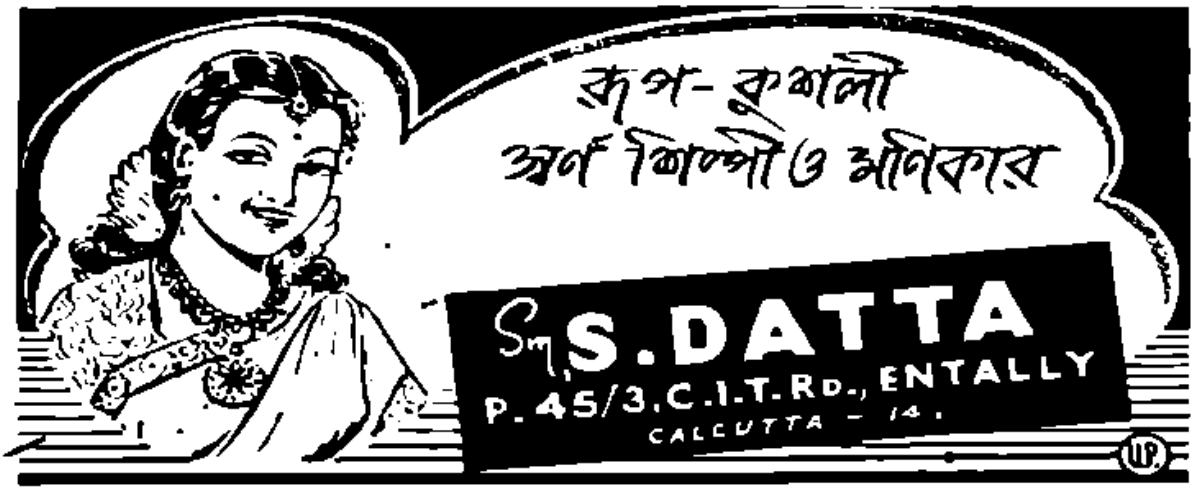

বিশ্ববাণী

মাঘ, ১৩৬৫

সম্পাদক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

স্বামী দুর্গানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রী বিমলকৃষ্ণ দত্ত

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সহায়কমণ্ডলী :

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদেবকুমার বসু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শিল্পীমণ্ডলী :

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ বসু

প্রকাশক :

ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার

মুদ্রাকর :

শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশ-স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ মোহন মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে শরীর ও শক্তির সঞ্চার হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তার পুষ্টিসাধন করে; তাই রক্তকে প্রবাহমান প্রবল টনিকও বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদ্যি সালসা প্রতি ফোঁটা অব্যর্থ ভাবে রক্তের সমস্ত সমস্যারই রক্ত শোধক মহৌষধরূপে দেখিয়ে। সারিবাদ্যি সালসা সেবনে বিষাক্ত ফোঁড় পরিষ্কার হয়, ঘোলা, পাতলা হয়ে যায়, প্রক্রিয়া প্রকৃতি সবলিত হয়ে ওঠে, রক্ত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শরীরের ত্বকের স্বাভাবিক হয়, মুখ ও শরীর হয়ে শরীর প্রচুর বিশুদ্ধ রক্তে পূর্ণ হয়ে রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদ্যি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

স্বনাম ধন্য কবিরাজ শ্রী, এম, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, কবিভূষণ (স্বর্ণ), এ, বি, এস (আয়ুর্বেদ) মহোদয় কর্তৃক প্রস্তুত।

ঠিকানা: সেবাশ্রম রোড, ঢাকা-২

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

ফোন ৩ ঢাকেশ্বরী-পুরীর সর্বত্র

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্

— ১নং মিল — কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

— ২নং মিল — বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহাই আদি ও অকৃত্রিম

ASCHARYA MALAM CHEMICAL WORKS PRIVATE Ltd.
RADHTALA HOWRAH

বিশেষ অবদান :—"আশ্চর্য্যমহামৃত" সালসা

মেহ, প্রমেহ, প্রভৃতি রোগে বিশেষ স্ত্রীরোগে এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ইহা অদ্বিতীয়।

"লিভাজেষ্টস্"

যাবতীয় যকৃৎঘটিত পীড়ায় বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে নিয়মিত সেবনে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

এই ঔষধগুলি খুব ভাল বলেই এত চাহিদা ?

১ গ্যাষ্ট্রোভাইম : পেটের যাবতীয় পীড়া, পেটে বায়ু ও বেদনার জন্য খুবই কার্য্যকরী।

● এসিডো : অম্লরোগে ও অম্লরক্তে অব্যর্থ।

● ভি. অয়েন্টমেন্ট : পোড়াঘা, দাদ, একজিমা, গলিত কুষ্ঠ, কাটা, ফোঁড়া ও সকল চর্ম্মরোগে অদ্বিতীয় মলম।

● ও. কে. আইড্রপস্ : চক্ষুরোগ ২৪ ঘণ্টায় সারায়।

● সেপ্টোসিল : কৃমি রোগে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ, শিশু ও বয়স্কদের সম উপকারী।

করমজী কেমিক্যালস্ (প্রাঃ) লিঃ
৭-ডি, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-১০

টেলিগ্রাম : পরিচর্য্যা। ফোন : ২৪-৩১৪৮

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ., এম্. ডি., বি. এল, আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্, শাড়ী
জহরলাল
পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ বেনারস, অমৃতসহর

৮১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (হাটিবাগান বাজার) কলিকাতা-৪

সর্বপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজন সমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

—অসাড় কুষ্ঠ—

গলিত কুষ্ঠ, ধাতুগত, পায়ে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, সর্বশরীরব্যাপী বা, অসাড়তা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যে স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত

রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, পি. বি. ৭, হাওড়া (ফোন—৬৭-২০৫৯)

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

অগস্ত্যকল্পধ্বজ

যজ্ঞস্থলে সুগন্ধিদ্রব্যের ধূমায় পরিণত বিশিষ্ট ঘনত্বের ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্‌গুণ মকরধ্বজ

চরক-বিধানের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (১ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

রামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ৫৷৷০ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—স্বামী শ্যামানন্দ (গ্রন্থকার) ১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৬

এবং—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী ফাল্গুন মাস হইতে "বিশ্ববাণী"-র ২১শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। আমাদের সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে, আমরা পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও যেন তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হই। আগামী বৎসরের চাঁদা (চারি টাকা পঁচাত্তর ন. প.) অনুগ্রহ করিয়া ৩০শে মাঘের মধ্যে পাঠাইবেন। যাঁহারা অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকিতে পারিবেন না, তাঁহারা যেন মাঘ মাসের ২০ তারিখের মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া পত্রদ্বারা আমাদিগকে জানান। যথাসময়ে টাকা অথবা চিঠি না পাইলে আমরা ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা ভিঃ পিঃ-তে পাঠাইতে বাধ্য হইব। তাহাতে তাঁহাদের ভিঃ পিঃ খরচ বাবদ ।৶০ আনা অনর্থক বেশী লাগিবে এবং ফাল্গুন সংখ্যার বিশ্ববাণী পাইতেও অযথা বিলম্ব হইবে। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া তাঁহারা আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না আশা করি।

নিবেদক

কর্মসচিব—'বিশ্ববাণী'

STUDENTS' COMMON ROOM

বিশ্ববাণী

বিংশতি বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৫

শ্রীবিবেকানন্দাষ্টকম্

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম. এ.,
সাহিত্যশাস্ত্রী

আসীদ্ যস্য পিতামহঃ কিল গৃহত্যাগী নবে যৌবনে
শ্রীদুর্গাচরণঃ পিতা শুভমতিঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ কৃতী।
মাতা শ্রীভুবনেশ্বরী পশুপতে র্ভক্তা শিবাংশশ্চ যো
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥১

আধাল্যা রসিকঃ সুতর্কনিপুণস্তত্ত্বার্থচিন্তাপরঃ
সংসারে বিরসঃ পরার্থনিরতো বৈরাগ্যসত্যাশ্রয়ী।
চারিত্র্যেণ গুরুঃ শুচিঃ প্রকৃতিতো নেতা চ যোঽভূচ্চিরং
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥২

হিত্বা ব্রাহ্মমতাদপূর্বচরিতং শ্রীরামকৃষ্ণং প্রভুং
যোঽবিন্দৎ খলু দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকামন্দিরে।
রাজ্ঞ্যা রাসমণে র্বংশসুরভিনি ত্রিস্রোতসঃ সৈকতে
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৩

আসাদ্যাদ্ভুতবৎ বিচিত্রমসকৃদ্ গুরুং পরীক্ষ্যাত্মন-
স্তুষ্ট্যৈ চ গুরোঃ সদা তদপদে তস্যা প্রতিষ্ঠাপ্য তম্।
যিষ্টে স্তেন শনৈঃ সুতীব্রতপসা যঃ সিদ্ধিমাপোৎ পরাং
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৪

তস্মিন্ নিস্তুতয়া স্বশক্তিমমিতাং সঞ্চার্য লীলাত্যয়া-
দাচার্যেঽগ্রকটে শুচাখিল গুরুস্রাতুর্নশান্তান্তরঃ।
আহূয়াশ্রমিনো যতীনপি মঠং সঙ্ঘঞ্চ যোঽস্থাপয়দ্
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৪

পূজাধ্যানতপোজপাদিকবিধিং নিত্যং ব্যবস্থাপ্য তা-
মাচার্যস্য পদে তদার্চিতপদাং দেবীং নিবেদ্যাগ্রহাৎ।
নির্বেদাৎ তপসে হৃদন্তিরপি যঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাব্রজদ্
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৬

তপ্ত্বা কৃচ্ছ্রতপঃ স্বদেশমখিলং তীর্থান্যপাস্যাপি যো
দৃষ্ট্বা জন্মভুবোঽপ্যকিঞ্চনদশা মা সেতুবন্ধং বহন্।
রাজ্ঞঃ পামরকৈঃ সমং স্ববশগান্ কৃত্বা প্রতীচীং গতো
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৭

আদেশাৎ স্বগুরোঃ প্রচার্য জগতঃ কল্যাণসেবাব্রতো
ধর্মাদর্শমথো সমন্বয়ময়ং বেদান্তগং তত্ত্ববিৎ।
প্রত্যাগতঃ ততঃ স্বভূমিমপি যো যোগাৎ তিরোঽধূধুনা
ব্রহ্মিষ্ঠঃ স জয়ত্যলং ভুবি বিবেকানন্দ ইত্যাদৃতঃ ॥৮

শ্রদ্ধয়েদং কৃতং স্তোত্রং শ্রীদুর্গাদাস শর্মণা।
বিবেকানন্দভক্তানাং সদা কণ্ঠেঽস্তু মাল্যবৎ ॥৯

বঙ্গানুবাদ : কথিত আছে, যাঁহার পিতামহ শ্রীদুর্গাচরণ নবীন যৌবনে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, যাঁহার পিতা শ্রীবিশ্বনাথ ছিলেন শুভকার্যেমতিসম্পন্ন কৃতী পুরুষ, যাঁহার জননী শ্রীভুবনেশ্বরী মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং যাঁহার নিজের শিবাংশে জন্ম, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।১

যিনি বাল্যাবধি রসিক, সুতর্ককুশল, তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ, সংসারবিতৃষ্ণ, পরার্থনিরত, বৈরাগ্য ও সত্যাশ্রয়ী, দৃঢ়চরিত্র, পবিত্র এবং চিরদিন স্বভাব-নেতা ছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-নামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।২

যিনি ব্রাহ্মমতসমূহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরবর্তী রাণী রাসমণির যশঃসৌরভপূর্ণ দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীকালিকামন্দিরে অলৌকিকচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৩

যিনি বিচিত্র অনুভূতি লাভ করিয়াও আত্মতুষ্টির জন্য গোপনে পরীক্ষা করিয়া পূর্বকথিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিত্য অভয়পদ স্বীয় গুরুদেবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা ধীরে ধীরে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৪

তাঁহার প্রতি স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত স্বকীয় অপরিমিত শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত করিয়া লীলাবসানে আচার্যদেব অপ্রকট হইলে, যিনি শোকে অধীরচিত্ত হইয়া সমস্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগকে আহ্বান করিয়া মঠ ও সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-নামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৫

যিনি তদনন্তর নিত্য পূজা, ধ্যান, জপ, তপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া আগ্রহভরে স্বীয় গুরুদেবকর্তৃক অর্চিতপদা দেবীকে আচার্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং নিজে বৈরাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসী বন্ধুবর্গের সহিত তপস্যার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৬

অনন্তর, যিনি কঠোর তপশ্চর্যা করিয়া, সমগ্র স্বদেশ ও তীর্থধাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেতুবন্ধ পর্যন্ত জন্মভূমির দারিদ্র্যদশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বহু রাজা ও সাধারণ লোককে স্বমতে আনিয়া পাশ্চাত্যযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৭

যিনি নিজ গুরুদেবের আদেশক্রমে জগতের কল্যাণ ও সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া, সেই দেশে (পাশ্চাত্য দেশে) বেদান্তানুগত সমন্বয়কারী ধর্মাদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন এবং তৎপর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে যোগবলে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দনামে জগতে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রহ্মিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করুন।৮

শ্রীদুর্গাদাস শর্মকর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে রচিত এই স্তোত্র বিবেকানন্দভক্তবৃন্দের কণ্ঠে মাল্যের ন্যায় চিরকাল বিরাজ করুক।৯

সমাজবাদী স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীহুলেখা ঘোষ, বি. এ.

শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শে অনুপ্রাণিত জনসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকারী, সংগঠক ও স্বদেশপ্রেমিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি সংস্কার ও গঠনমূলক কার্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন সমাজ-সংস্কারক অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার ও সুদূরপ্রসারী। মানুষের ধর্মজীবন যে কতকগুলি আচার-নিয়মের সমষ্টি নয়—তাহা রাজনৈতিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনও নয়—মানুষ যে তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে ভগবৎ সেবায় পরিণত করিতে পারে এবং এখানেই যে জীবনের চরম সার্থকতা—এ কথা স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ-সেবার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন করিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

একদিক দিয়া ইহার মধ্যে যেমন রহিয়াছে অভিনবত্ব, তেমনি উহাই আবার মানুষের ধর্মজীবনেরও সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। মানবজাতির প্রতি গভীর প্রেমই তাঁহাকে সমাধির আত্মানন্দে ডুবিয়া থাকিতে দেয় নাই। মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের মধ্যে সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপনের দাবীই তিনি সকল সময়ে সর্বপ্রকার কর্মের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে দেখিতে পাইয়াছিলেন আর নিজের মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছিলেন সমগ্র মানবসমাজকে।

সমাজ-জীবনে ভীরুতা, কাপুরুষতা ও কর্মবিমুখতাকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন এবং এই দুর্বল পদদলিত ও সর্বহারাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বার বার জাতির কর্ণে উপনিষদের অভীঃ মন্ত্র শুনাইয়াছেন। আর ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমাজসংস্কারকে অধ্যাত্মবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে। তাই তাঁহার মুখে আবার শুনিতে পাই "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়"। একদিক

দিয়া ধরিতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, কোন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তথাপি সমাজকে বৃহত্তরভাবে গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসীও কোন অবস্থায়ই সমাজের অতীত বা সমাজ-বহির্ভূত হইতে পারেন না। সামাজিক ইষ্টানিষ্ট চিন্তার সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট থাকিতেই হয়। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসবাদ—কর্মবাদেরই নামান্তর মাত্র। এদিক দিয়াও তাঁহাকে আমরা পুরাপুরি একজন সমাজতন্ত্রীরূপেই দেখিতে পাই। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনে আমরা দেখি: অবনত, প্রপীড়িত, দরিদ্র ভারত-বাসীদের জন্য ও কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারায়ণ যাহারা পথে-ঘাটে দুই মুষ্টি অন্নের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য একটা আকুল কর্মপ্রচেষ্টা। ইহা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁহাদের পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কারকগণ অপেক্ষা ভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে সমাজ-সংস্কার করিয়া কোন ফল হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ না করিলে, কেবল ধর্মের ও সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করিলেই বিশেষ কোন শুভ ফল হইবে না। সেই কারণেই বোধ হয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদির পরিবর্তনের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ হইতেছে:

"আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজসকল আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কার্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। আমার কার্যপ্রণালী দেশকালোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া প্রাচীন আচার্যগণের কার্যপ্রণালী অনুসরণ"।

এক কথায় ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী। তবে এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার-সম্পন্ন অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন আবশ্যক। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ব্যক্তিদের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন—প্রথম ও প্রধান বলিয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

স্বামীজি একজন বিপ্লবী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সারা জীবন তিনি কঠোরতার সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট সমগ্র জীবন ছিল একটি তপস্যা ও শ্রীভগবানের উদ্দেশে অঞ্জলিস্বরূপ। সত্যোপলব্ধির পথ যেমন দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ, সমাজ-সংস্কার এবং যে কোন প্রকার জনহিতকর কার্য যে তেমনি বিপদসঙ্কুল এবং সংঘর্ষময়, এ কথা তিনি সর্বোপরি বিশ্বাস করিতেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের দিয়া গিয়াছেন গভীর অধ্যাত্মবোধের পরিচয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক নবতর চেতনার

প্রদীপ্ত প্রেরণা। মানবজাতির পক্ষে ইহা এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সমাজ-সংস্কারক রূপে এই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাসূত্রগুলির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যেমন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বহুধাবিভিন্ন ভারতকে তেমনি একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টাও তাঁহার কম ছিল না। সামাজিক সমস্যা সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলির মধ্যে "ভারতে বিবেকানন্দ", "পরিব্রাজক", "ভারতীয় নারী" প্রভৃতি দেশে-বিদেশে বহুল প্রচার ও সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ্যযুগের "পুরোহিতবাদ" উচ্ছেদ সম্পর্কে বহু বক্তৃতাদি দিয়াছেন এবং জাতিভেদ প্রথার কুফল দূরীকরণের চেষ্টাও করিয়াছেন। জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করিয়া প্রকৃত মানুষ পদবীতে উন্নীত করিবার নিমিত্ত স্বামীজির এক নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা ছিল, এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, নালন্দার আদর্শে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সকল জাতির ও সকল দেশের ছাত্রছাত্রীদের একত্রিত করিয়া ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর ভাবধারা ও কৃষ্টির সমন্বয় ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা। স্ত্রী-শিক্ষারও তিনি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষাও ভারতের পক্ষে অপরিহার্য এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষদের মত নারীদেরও চিন্তা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র হইবে সুদূরপ্রসারী।

স্বামী বিবেকানন্দ গণমুক্তির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ব্রহ্মবিদ এই সন্ন্যাসী মানব জীবনের অতি সাধারণ ভূমিতে অবতরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারকরূপে মানবজাতির কল্যাণ কামনায় মহান ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী দুর্গানন্দ

(ষষ্ঠ পর্যায়)

শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য-শাস্ত্রবিধিসম্মত ব্যবস্থা প্রদান করিলেন বটে, তথাপি আবার এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। যজন-যাজন-ক্রম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই দেশাচার ও পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া রাণীর স্থাপিত দেবালয়ে সাহসপূর্বক পূজকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। রাণী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমারকেই বিনয়সহকারে অনুরোধ করিয়া পূজকের পদ গ্রহণে প্রার্থনা জানাইলেন। নিমন্ত্রণ-পত্রে রাণী লিখিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থা-বলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভমুহূর্তে ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজক পদ গ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা-কার্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এই বিষয়ে যাহা হয় শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না এ কথা বলাই বাহুল্য"।

কথিত আছে, রামকুমারের স্বদেশবাসী ও পূর্বপরিচিত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাণী রাসমণির সেরেস্তার কর্মচারী ছিলেন। তিনিই ঐ নিমন্ত্রণ পত্রখানি লইয়া গিয়া রামকুমারকে প্রদানপূর্বক সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাকেই পূজকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করান। শ্রীযুক্ত রামকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় কিন্তু বলিয়াছেন: কৈবর্ত (মাহিষ্য) জাতীয়া রাণীর দান গ্রহণ করিলে পাছে সমাজে নিন্দিত হইতে হয় এই ভাবিয়া রামকুমার প্রথমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বশ্রেণীর অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদায়গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনিও পত্র গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে কালী বাড়ীতে উপস্থিত হন। রামকুমার মন্দিরে আসিয়া দেশের কোন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা

ও পূজাকার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন এবং তিনিও সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠা কার্যে ব্রতী হন এবং পরে ৺কালীমাতার নিত্যপূজক হইতে কোন আপত্তি করেন নাই।

সে যাহাই হউক এইরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে নির্লোভী দেবীভক্ত রামকুমার সুযোগ্য পূরকের অভাবে নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বিকার প্রতিষ্ঠা-কার্য বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই পূরকের পদে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং পরে রাণী ও তাঁহার তৃতীয় জামাতা মথুরবাবুর অনুরোধে জীবনের অবশিষ্টকাল পর্যন্ত ঐ স্থানেই রহিয়া গেলেন। সন ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রা দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নব মন্দিরে শ্রীযুক্ত রামকুমারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তদবধি নিত্যপূজার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। "লীলাপ্রসঙ্গ"-এ বর্ণিত আছে যে, প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সুদূর কাণ্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়া ঐ দিবসে প্রত্যেকে রেশমী-বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপ এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার ভার রামকুমারের উপরেই অর্পিত হয়। গদাধরও দাদার সহিত কালীবাড়ীর উৎসব দেখিতে আগমন করিয়াছিলেন এবং রামকুমারের সঙ্গে থাকিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন। সেদিন গদাধরের দিব্যকান্তি, কর্মতৎপরতা, সরলতা, উদারস্বভাব ও মধুর ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া রাণী রাসমণি ও তাঁহার মুরুব্বি জামাতা মথুরবাবু উভয়েই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গদাধরও সারাদিন তথায় মহামহোৎসব দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চারিদিকে অগণন লোকসমাগম, স্থানে স্থানে যাত্রাগান, কীর্তন ও কথকতা এবং রাত্রে মন্দির-প্রাঙ্গণ, উপবন নানাবিধ আলোকমালায় সুসজ্জিত দেখিয়া গদাধর বলিয়াছিলেন, "রাণী যেন রত্নতন্ত্রিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়াছেন"। শুনা যায় গদাধর সেদিন তথায় উৎসবে কোন আহার্য গ্রহণ না করিয়া এক পয়সার মুড়কী কিনিয়া খাইয়া রাত্রে একাকী কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আবার পরদিন অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য প্রত্যুষেই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া ভ্রাতাকে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে যে, রামকুমার নিত্যপূজকের কর্ম স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এইভাবে আরও কয়েকদিন গদাধর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করিয়াছিলেন। অবশেষে রামকুমার কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকিতে নির্দেশ দিলে গদাধর ভ্রাতার আদেশমত কলিকাতার বাসা উঠাইয়া কালীবাড়ীতেই থাকিতে সম্মত হন। কিন্তু কতদিন পরে তিনি আসিয়াছিলেন তাহা বলা সম্ভব নয়।

ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বাধ্য হইলেও গদাধরের মনে হইত, তাহার পিতা ছিলেন অশুভ প্রতিগ্রাহী, কিন্তু অবস্থার বিপর্যয়ে তাহাদিগকে শূদ্রযাজন এবং অবশেষে

দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইল। ইহাই তাহার পক্ষে বেদনাদায়ক হইয়াছিল। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে: "দেবল, নক্ষত্র-যাজক, গ্রাম-যাজক ও শুদ্ধগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালতুল্য"। দেবল ব্রাহ্মণ নিন্দিত হইবার কারণ এই যে, বেতন লইয়া দেবপূজা করিতে করিতে পূজক শ্রদ্ধাভক্তিহীন হয়। ভগবানের পূজা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিণত হইয়া থাকে। এমন কি বেতনস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান বা ধর্মদান করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য ঘটে। শুনা যায় এইরূপ অপাঙ্‌ক্তেয় কর্ম শুধু দারিদ্র্যনিবন্ধনই করিতে হইয়াছিল বলিয়া গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অশ্রুপাত করিয়াছিল; কিন্তু পরে বুঝিয়াছিল, যে, সবই 'মা'র ইচ্ছা। মা, তাহাদিগকে যেরূপ করাইতেছেন, সেইরূপই করিতে হইবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মা যন্ত্রী আর সে মার হাতের যন্ত্রস্বরূপ। তাই সময় সময় খেদ করিয়া বালকের মত কাঁদিয়া মাকে বলিতেন, "মা! শেষে কৈবর্তের (মাহিষ্যের) ভাত খাওয়ালি? বেতনভোগী হইয়া তোমার পূজা করিতে হইল? ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গদাধর অগ্রজের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার আহারাদির সম্বন্ধে বড়ই অসুবিধা ঘটিল। কারণ, যে অন্নই হউক, মন্দিরের প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করিতে তাহার আপত্তি ছিল। কেহ বলেন, কৈবর্তের (মাহিষ্যের) ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদী অন্ন ভক্ষণ করিলে নিষ্ঠাভক্তির হানি হইবে ভাবিয়া ঐরূপ করিয়াছেন। কেহ বলেন, রাণী রাসমণির ব্যবস্থা ছিল যে, 'প্রসাদী-অন্ন, মন্দিরের পূজারী, পরিচারক ও কর্মীবৃন্দ এবং অতিথি, অভ্যাগত ও দরিদ্রগণকে বিতরণ করা হইবে'। সুতরাং গদাধর এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয় ভাবিয়া অন্নের প্রাপ্যে বাধা দিতে কিম্বা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজে গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই। যাহা হউক এই উভয় যুক্তিই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ পরবর্তীকালে দেখা যায় অন্নের উদ্দেশ্যে আনীত খাদ্যদ্রব্য তিনি খাইতে পারিতেন না। তাহার বিশুদ্ধ স্বভাব স্বতঃই যেন তাহাকে ঐ অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে নিরস্ত করিত। তাঁহার শুদ্ধবুদ্ধি কিরূপে উহা বুঝিতে পারিত তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আর নিষ্ঠাভক্তির সম্বন্ধেও তিনি যে "কৈবর্তের ভাত খাওয়ালি" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই অনুমান করা চলে।

যাহা হউক রামকুমার প্রথমে গদাধরকে বুঝাইয়া বলিলেন: গঙ্গাতীরে, দেবালয়ে, গঙ্গাজলে রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ভোগ নিবেদন করা হইয়াছে, সেই প্রসাদী অন্ন ভোজনে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু গদাধর কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় অগত্যা রামকুমার 'সিধা' লইয়া তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক আহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সাময়িক এই সব ব্যবস্থা হইলেও, কিন্তু বেশীদিন তাহাকে ঐভাবে রন্ধন করিতে হয় নাই। কারণ মন্দিরের পূজক পদে বৃত হইবার পর তাহার প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি হয় নাই। ইহাতে আমাদের উল্লিখিত অনুমান অসঙ্গত মনে হইবে না। মনোরম দেবালয়, সুশোভিত

পুষ্পোদ্যান, নিম্নে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী গঙ্গা, তাহার তীরে স্বহস্তে বৃক্ষতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে কত তৃপ্তি, তাহা যাঁহারা কখন বনভোজন করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। এইভাবে কিছুদিন চলিতে চলিতে তাহার মনে বেশ স্ফূর্তি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা অনুমান করিতে পারি অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ, পুণ্যবতী রাণী রাসমণির ও মথুরবাবুর ভক্তি প্রভায় গদাধর তথায় বেশ শান্তি ও আনন্দেই কাটাইতেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রামকুমারের পিসতুতো ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কার্যকর্মের অনুসন্ধানে একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—মাতুলদের সহায়তায় একটি চাকরী জুটাইতে পারিবেন। সমবয়স্ক মাতুল গদাধরকে দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। কারণ বাল্যকালে একত্রে কতদিন খেলাধূলায় কাটাইয়াছেন, সুতরাং ছোট মাতুল সেই হিসাবে বাল্যবন্ধু। গদাধরও তাহাকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে তিন চারি বৎসরের ব্যবধান। গদাধর বিশে বর্ষে পড়িয়াছে হৃদয়রামের বয়স তখন ষোড়শ বর্ষ। উভয়েরই উভয়ের প্রতি বেশ ভালবাসায় আকর্ষণ এবং মিলও যথেষ্ট ছিল। আকস্মিকভাবে উভয়ের পুনর্মিলন রহস্যজনক মনে হইলেও উদ্দেশ্য-বিহীন নহে। ঘটনা-পরম্পরায় তাহার পরিচয় আমরা পরে জানিতে পারিব।

উমা-হৈমবতী

শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

কেনোপনিষদে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে একবার দেবতারা বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া আকাশে একটি যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই যক্ষের পরিচয় জানিবার জন্য সর্ববুক অগ্নিকে পাঠাইলেন, কিন্তু অগ্নিদেবতা যক্ষের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র তৃণকে দাহ করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর সর্ববহ বায়ু গিয়াও সেই তৃণটিকে নড়াইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অগ্নি ও বায়ুদেবতার নিকট যক্ষের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তারপর গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি যক্ষের নিকট পৌঁছিতেই যক্ষ অদৃশ্য হইয়া গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাশে (তস্মিন্নেব আকাশে) বহুশোভমানা স্ত্রীরূপিনী উমা-হৈমবতী আবির্ভূতা হইলেন। দেবরাজ সেই নারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ইন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যে, ঐ যক্ষই ব্রহ্ম ; এবং ঐ যক্ষ-ব্রহ্মের মহিমায়ই দেবতারা বিজয়ী হইয়া ঐশ্বর্যময় হন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন : কেনোপনিষদের পূর্বখণ্ডে বিজ্ঞের নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞাত এবং অজ্ঞের নিকট বিজ্ঞাত বলিয়া ব্যাখ্যা করায়—ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং সেইজন্য ব্রহ্মের সত্ত্ব গুণ প্রকাশার্থ এই কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। অথবা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য, কিম্বা ব্রহ্মের দুর্বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শনার্থ একটি আখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তিনি যক্ষ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মহদ্ভূতম্"। দেবতারা দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না, সেইজন্য ইহা মহৎ ও বিস্ময়কর—এই অর্থে যক্ষ।

হৈমবতী উমার ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেছেন, উমা তত্ত্ববিদ্যা। 'বহুশোভমানা' অর্থে বহুগুণযুক্তা। এবং হৈমবতী অর্থে হেমাভরণসম্পন্না, অথবা সর্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা হিমালয়সুতা।

কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে : যিনি বলেন, আমি মন দ্বারা ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, তিনিই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কেননা তাঁহারই নিকট ব্রহ্মের বিরাটত্ব প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা না হইলে তিনি এরূপ বলিতে পারিতেন না। আর যিনি বলেন, আমি মন দ্বারা ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। সোজা কথায় দাঁড়াইল—যিনি নিজকে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানী বলেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, আর যিনি নিজকে সেই স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানী বলেন—তিনি প্রকৃত অজ্ঞানী (কেন ২।২-৩)।

উপরোক্ত ভাবের অজ্ঞানী কি ভাবে ব্রহ্মের বিরাটত্ব উপলব্ধি করেন, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে : প্রতিবোধের দ্বারা মন সংযত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়—"প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্, অমৃতত্বং হি বিন্দতে" (২।৪)। প্রত্যক্ষ-প্রতিভাতজাত জ্ঞানের নাম প্রতিবোধ। বিবরণ পড়িয়া ও চিত্র দেখিয়া তাজমহল সম্পর্কে একপ্রকার জ্ঞান জন্মে, কিন্তু আগ্রায় গিয়া তাজমহলের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, বিবরণ ও চিত্র হইতে অর্জিত সমস্ত জ্ঞান স্তব্ধ হইয়া যায়, এক নূতন ধরণের প্রতিবোধ বা প্রতিভাত জ্ঞান (revelation) জন্মে। ব্রহ্ম সম্পর্কে ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে : "আত্মনাবিন্দতে বীর্যং, বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্" (২।৭)। শারীরিক পরিশ্রম, চেষ্টা ও উদ্যম এবং অর্থব্যয় করিয়া যেমন আগ্রায় যাইতে হইল, ঠিক সেইভাবে ব্রহ্মের জন্যও নিজকে খাটাইতে হইবে ; মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যার দ্বারা হইবে না ; বলপ্রয়োগ করিতে হইবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বৈদিক যুগের ব্রহ্মজ্ঞ সাধক অঙ্গিরস সম্প্রদায়ও সর্বদা বলের কথা বলিতেন : "বলমিতি বল-মিত্যুপাসীত" (ঐ অ১৮।৫)। এইভাবে আত্মসাধনার দ্বারা বল অর্জিত হইলে ব্রহ্ম আপনা-আপনি প্রতিভাত হইয়া পড়েন। অবশ্য মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি-আদিও একেবারে অনুকূল যায় না, তার দ্বারা অমৃত লাভ হয়,—কিন্তু অমৃতই ব্রহ্ম নয় ; অ-বিদ্যা অবস্থা না হইলে বীর্য হয় না, এবং বীর্য না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। ঈশোপনিষদেও একই ভাবের কথা বলা হইয়াছে: "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে" (ঈশ-১১)। এখানে 'অবিদ্যা' অর্থে মূর্খতা নয়,—সমস্ত বিদ্যার বহির্মুখী ধর্মের অন্তর্মুখী হইয়া কেন্দ্রীভূত ও স্তব্ধ হওয়া।

তাহা হইলে আবার প্রশ্ন জাগে : এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ইহজগতে জীবিতাবস্থায় সাধ্য —না দেহান্তে ? মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ হইবে—সেই আশায় সাধনা করিতে হইবে, না এই জীবদেহেই ব্রহ্মলাভ হইবে ?—উত্তর হইল—"ইহ চেৎ অবেদীৎ, অথ সত্যম্ অস্তি" (২।৫) এই জগতে, এই দেহে এবং এই চেতনাতে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলেই—ইহাকে সত্য বলিয়া জানা যায়। আর "ন চেৎ ইহ অবেদীৎ, মহতী বিনষ্টিঃ" (২।৫) মৃত্যুর পরপারের

আশায় রাখিয়া দিলে সব নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাৎ (ঋগ্বেদের ভাষায়) "মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ" (ঋ ১।১১০।৪) হইতে হইবে, এবং নাথ-যোগীর মতে—

"মরৌরে যোগী মরণা ছাড় মিঠা। তিস্ মরণ মরৌ যিস্ গোরখ দীঠা॥
জীবিত মরিবা—মরি করি জীরবা। অমী মহারস ভরি ভরি পীরবা॥"

সেইজন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই জগতের প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া চালনীতে চাউল-চালনী করার মত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া (বিচিত্য—sifting), ইহজগতের বাহ্যাসক্তি হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক (প্রেত্য) অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি ধাবিত হইয়া নিজেরা অমৃত হইয়া যান—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ, অমৃতা ভবন্তি" (২।৪) অর্থাৎ তখন শুধু "ব্রহ্মম্ অশ্নুতে" নয়, একেবারে "ব্রহ্মৈব ভবতি"।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে, এবং তারপরই তৃতীয় খণ্ডে আলোচ্যমান আখ্যায়িকার অবতারণা। দ্বিতীয় খণ্ডের কথার পর স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে—জীবদেহে সাধক কি পদ্ধতিতে জগতকে চালনী-ঝাড়া করিয়া অজ্ঞানী সাজেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নিজে অমৃতের অমৃতত্ব হইয়া যান? তৃতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকায় সেই সাধন-পদ্ধতির কথাই বলা হইতেছে।

যক্ষ :—সাধনমার্গে একটি চিরপ্রচলিত কথা আছে—'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে পিণ্ডে' অর্থাৎ জীবদেহরূপ পিণ্ডটি এই মহাব্রহ্মাণ্ডের একটি অবিকল প্রতীক। এই ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অথর্ব বেদ কেন-সূক্তে বলা হইয়াছে :

"অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরয়োধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়ো কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষা আবৃতঃ॥" (অথ ১০।২।৩১)

যাহার মধ্যে আটটি চক্র এবং নয়টি দ্বার আছে, এরূপ অযোধ্যা স্থান দেবগণের পুর। ঐ পুরের অন্তস্থলে স্বর্গময় কোষরূপ জ্যোতিরাবৃত স্বর্গ।

নরদেহে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার—এই সাত চক্র ব্রহ্মাণ্ডের ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকের প্রতীক। সহস্রারের উর্ধ্বে "বিজ্ঞানের স্থল—'সূক্ষ্ম চক্র' নাম তার" (গোরখ বাণী)। দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, মুখ, গুহ্য ও উপস্থ—নবরন্ধ্র।

"তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥" (ঐ—৩২)

তিন অর (শলাকা—spoke) প্রান্তে তিনটি কেন্দ্রযুক্ত সেই হিরণ্ময় কোষে যে আত্মবান যক্ষ থাকেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদেরা ধ্যান করেন।

যে নিজের ধনসম্পত্তি আঁকড়াইয়া থাকে, যাহাকেও দিতে চায় না—নিজেও ব্যবহার করে না, তাহার নাম যক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে ঋগ্বেদে আত্মা

দেওয়া হইয়াছে—বাম-পথী বৃদ্ধ হোতা—"অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুঃ" (ঋ ১।১৬৪।১)—অন্যত্র বলা হইয়াছে : সুগন্ধিযুক্ত ও পুষ্টিবর্ধক উর্বারক নামক ফলের কেন্দ্রকোষে যেরূপ অমৃতোপম সার কেন্দ্রীভূত থাকে সেইরূপ "সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারকমিব" (ঋ ৭।৫৯।১২)। উপরোক্ত ঋষিদেব সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দাদার কোষ হইতে কোনও কিছু বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিলে গিলিয়া ফেলে এবং তৃতীয় ভ্রাতা যেন ঘি-ছিটানো আগুন। দাদার ভাণ্ডারের সব ধন টানিয়া বাহির করিয়া আনে এবং তাঁর সপ্ত পুত্রের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়াইয়া দেয়। অর্থাৎ কেন্দ্রকোষস্থ বামদেবের ভাণ্ডার হইতে বলপ্রয়োগ না করিলে কিছুই বাহির করা যায় না। তিনি একজন যক্ষ।

ঋগ্বেদে ঐরূপ আর এক শ্রেণীর যক্ষবাণিয়ার কথা আছে ; তাঁহারা 'পণী' নামে আখ্যাত। তাঁহারা পর্বতের গহ্বরে বাঁকা নাসাতে দেবতাদের গাভীগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রাণবায়ুরূপিনী সরমা কুকুরী গিয়া তাঁহাদিগকে ইন্দ্রের শক্তি-সামর্থ্যের ভয় দেখাইয়া গরুগুলি লইয়া আসিতে চাহিলে পণীরা সোজা কথা বলিয়া দিল—কি রকম তোমার ইন্দ্র—"কীদৃঙ্ ইন্দ্রঃ" ? আমাদের এই ভাণ্ডার পর্বতোপম প্রাচীরবেষ্টিত—"অয়ং নিধিঃ অদ্রিবুধ্নঃ" ; বিনা যুদ্ধে ইহা পাইতে কে আশা করে—"কস্ত এনা অব সৃজাদ যুধাভ্যঃ" ? (ঋ ১০।১০৮।৩,৭,৫)। পরে ইন্দ্র বৃহস্পতি (ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি)-কে সঙ্গে লইয়া গিয়া বজ্রদ্বারা পর্বত উড়াইয়া দেয় এবং পণিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাক্‌রুদ্ধা গাভীগুলিকে মুক্ত করিয়া দেন।

'গো' শব্দের অর্থ স্পন্দন, শব্দ, বাক্, জ্ঞান। যেখানে গরু চরিয়া ঘাস খায়, তাহার নাম গো-চর ; আর যেখানে চরিতে পারে না, তাহা অ-গোচর। যেখানে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা অ-গোচর ; এবং কর্তৃপক্ষের জ্ঞানরূপ গো চরাইবার জন্য—অর্থাৎ গো-চরার্থে দরখাস্ত নিবেদন করা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জীবের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারীও যক্ষ, এবং বিনা যুদ্ধে নাহি দেয় তিল-পরিমাণ। স্বাধ্যায় ও আত্মবল প্রয়োগ ভিন্ন যক্ষের ভাণ্ডারের কিছুই পাওয়া সম্ভবপর নয়। পণিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইন্দ্র যোদ্ধা, বৃহস্পতি সহায় এবং মরুদ্‌গণ পথপ্রদর্শক সৈন্য ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অতএব, যাহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তাহার স্থিতি ও প্রলয়, তাহার কেন্দ্রকোষই (Nucleus) যক্ষ। তাঁহার ভাণ্ডারের ধন বা তাঁহার সম্পর্কে জ্ঞান বিনা স্বাধ্যায়ে ও বিনা বলপ্রয়োগে লাভ করা যায় না—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। এই অর্থেই উপনিষদ ও বেদে যক্ষ সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হইয়াছে ; মহৎ ও অদ্ভুত আত্মবলিক স্বভাবমাত্র। অথর্ববেদ বলিতেছেন :

যজুর সঙ্গিনী :

"প্রজাজনানাহরিণীং যশসা সংপরীবৃতাম্।
পুরং হিরণ্যয়ীং ব্রহ্মা বিবেশ অপরাজিতাম্॥" (১০।২।৩৩)

তেজস্বিনী, যশোমণ্ডিতা, হিরণ্ময়ী ও অপরাজিতা হরিণীর সহিত সেই দেহ-ব্রহ্মপুরের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে বলা হইয়াছে : বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে অন্ধকারাবৃত অন্ধকারের কেন্দ্রকোষে বায়ুহীন অবস্থায় প্রাণক্রিয়া থাকার ন্যায় যে একজন ছিলেন তিনি—"স্বধয়া তদেকং, তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চন আস" (ঋ ১০।১২৯।২)—স্বধার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এক হয়েছিলেন, এবং সেই একের বাড়া আর কিছুই ছিল না। এক ত বটে, কিন্তু তার মধ্যে জড়িতা ছিলেন স্বধা—"যস্মিন্ ধীয়তে, শ্রিয়তে, আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধা মায়া" (সায়ণ)। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিতেছেন : ঐ স্বধার সহিত যুক্ত থাকা হইল "স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ" (১।৪।৩)—নারীপুরুষের সঙ্গমাবদ্ধ অবস্থার ন্যায়। শৈব ও শাক্ত বলেন : ইহা শিব-শক্তির সামরস্যভাব। বৈষ্ণব বলেন তখন "ন স রমতে না হাম্ রমতী"। ইহা ঠিক ডাইনামো (Dynamo) যন্ত্রের আর্মেচার (armature) নামক কোষে (Core) উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির (Eletricity) ন্যায়;—পুরুষ (positive), প্রকৃতি (negative) ভেদ নাই, দুই ধারার শক্তি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া এক হইয়া আছে। পরে commutator slip-ring বা Transformer-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে ঐ এক শক্তি দুই হইয়া দুই পৃথক তারে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে প্রবাহিত হয়। কিন্তু আবার কোন কাজ (সৃষ্টি) করিতে হইলে দুইটি তার পরস্পরের মুখচুম্বন রত হইতে বাধ্য না হইলে কোন কাজই হয় না।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন : তপের গুণে ঐ এক অবস্থা হইতে মনস্ প্রকটিত হয়, এবং মনসের রেতঃ (emanation, radiation) কামরূপে প্রতিভাত হয়। এই কামই (কামনা—primordial elemental passion) সৃষ্টির প্রথম স্তর। অথর্ব বেদ বলিতেছেন :

"না তে কাম দুহিতা ধেনুরুচ্যতে যামাহুর্বাচং কবয়ো বিরাজম্" (৯।২।৫) অর্থাৎ হে কাম! ঋষিরা যাহাকে বাক্ ও বিরাজ বলেন, তোমার সেই দুহিতাকে ধেনু বা গো-ও বলা হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে 'গো' শব্দের অর্থ স্পন্দন, শব্দ, বাক্, জ্ঞান। এখন বুঝা গেল, সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর হিসাবে যে মনসের রেতঃকামের জন্ম হইয়াছিল, সেই কামের দুহিতা রূপে স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে। স্পন্দনই সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে—"যাবৎ ব্রহ্মবিষ্ঠিতং তাবতি বাক্" (ঋ ১০।১১৪।৮), "ত্রিংসদ্ধাম বিরাজতি বাক্" (ঋ ১০।১৮৯।৩)। সেইজন্যই বলা হয়—শব্দই ব্রহ্ম। আবার এই বাকই বলিতেছেন—আমিই এই বিশ্বের মূর্ধায়

আমার যোনিমধ্যস্থ কারণ সলিল সমুদ্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা জগৎপিতা ব্রহ্মাকে প্রসব করি "অহং সুবে পিতরং অস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্ অন্তঃ সমুদ্রে" (ঋ ১০।১২৫।৭)।

এই বাক-শক্তী কাম হইতে প্রকটিতা হইবার সময় অর্থাৎ শব্দ প্রথম প্রকটিত হইবার সময়, ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। বোম-বাজী ফাটিবার সময়, বা মেঘের গর্জনের সময়—প্রথম ঝলক, তারপর শব্দ হয়—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। তাহা হইলে বাক্-শক্তী যখন জ্ঞান বা বোধ, তখন প্রাতিভসংবিৎ (Primordial consciousness) ও জ্যোতির্ময়ী-বিদ্যুৎরূপা—হিরণ্ময়ী—মহিমময়ী—অপরাজিতা। তিনিই ছিলেন স্বধা, তিনিই ছিলেন শিবের গাত্রসংলগ্না শক্তি, তিনিই যজ্ঞের হবির্ভূ। এখন বিকাশার্থ (বি) এলাইয়া পড়িয়াছেন (মুশ্) অর্থাৎ বিমর্শা হইয়াছেন। এবং এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে মনস্-এর সঙ্গে—অর্থাৎ "মনসা সংহি জজ্ঞে" (ঋ ১।১৬৪।৮)।

সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন শান্তাতীত ও নিস্পন্দ অবস্থার কোন বোধই ছিল না। তারপর যখন তাহার মধ্যে ক্ষোভ উপস্থিত হইল, তখন নিস্পন্দ অবস্থাও নয় অথচ অন্য কিছু নূতন অবস্থা হয় নাই—এরূপ একটি অবস্থা হয়। ইহার নাম "অ" অবস্থা বা বর্ণ। ঠিক যেমন অন্যচিন্তায় মগ্ন ব্যক্তিকে ডাক দিলে প্রথমে বলেন—"অ"। ইহার পর নূতন অবস্থার প্রতি একটি উন্মুখতা ভাব আসে; ইহা 'উ' (Spronting)। তারপর বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া সৃষ্টির পূর্ণ ব্যঞ্জনা—"ম" (ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণ) হয়। এই 'অ-উ-ম' বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়ার সাঙ্কেতিক ফরমূলাবাচক বর্ণত্রয়,—এবং ইহাই ওঁ বা প্রণব। 'অ'র মধ্যে 'ম' অধিষ্ঠিত (আ) থাকার সময়—ইহার নাম "অমা"; এবং পরবর্তী স্ফুটনোন্মুখ অবস্থা "উ"র মধ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় "উমা"; ইহা পূর্বোক্ত বিদ্যুৎপ্রকাশের প্রারম্ভিক অবস্থা।

তারপর স্পন্দন চলিতে লাগিল, এবং তাহাদের আবর্তন, বিবর্তন ও সংঘাতের ফলে (mutation, chain reaction, fission) নানা প্রকার শক্তিরশ্মি ও বাস্তব সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান সৃষ্ট হইতে লাগিল—"তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্" (ঋ ১০।১২৯।৫)। সেই রশ্মির সীমা-সংখ্যা নাই :

"কিরণাশ্চ সহস্রংচ দ্বিসহস্রংচ লক্ষকম্।
কোটির্কুদমেতেষাং পরা সংখ্যা ন বিদ্যতে।" (ভৈরব যামল)

আধুনিক বিজ্ঞানও বলেন : একটি পরমাণু-বোমা হইতে নিষ্ক্রান্ত শক্তির সামান্যতম অংশ দ্বারা একটি নগর ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু আরও কত শক্তি যে বিচ্ছুরিত হইয়া গিয়া কোথায় কি করিতেছে, সেই বিষয়ে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর অনুসন্ধানের পর কিছু বলা যাইতে পারে।

উমা যখন সৃষ্টির বৈচিত্র্য-সাধনে উপরোক্ত রূপে ব্যাপৃতা হন, তখন তাহার 'গো'-র মধ্যে রূপায়িকা শক্তি (ঋ) ক্রিয়াবতী হয়, এবং তখন তিনি গৌ+র্+ঈ—গৌরী রূপ ধারণ করেন। স্পন্দনের অর্থই শব্দ এবং ইহা অবিরাম চলিতে থাকে এবং মন্থন (Wavy and

gliding) করিয়া চলে—ঠিক যেন অনবরত চীৎকার করিয়া পলায়মানা গৌরী মৃগী। ইনিই যজ্ঞের হরিণী।

"গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষ্যত্যেকপদী, দ্বিপদী, সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী, নবপদী, বভূবুষী—সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্।" (ঋ ১।১৬৪।৪১)।

এই সব শক্তির রশ্মিধারা নিম্নমুখে প্রবাহিত হইয়া (fallout) বিশ্বের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশপূর্বক প্রত্যেক বস্তুর স্বধর্ম বিকাশ করিতেছে। ঠিক যেমন দুর্গম পর্বতশিখরে পতিত বৃষ্টির জল সব দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন নদী-নালারূপে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়—

"যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥" (কঠ ২।১।১৪)।

এই অবস্থায় তিনি দুর্গা।

ঋগ্বেদে এই তিন প্রকার প্রবাহকে "স্বধয়া ত্রিস্রো দেবী" বলা হইয়াছে এবং নাম ও গুণ-বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং, ইলা-দেবী, ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ (সর্বব্যাপিকা)—(ঋ ২।৩।৮); এবং সরস্বতী হইলেন—"অম্বিতমে, নদীতমে, দেবিতমে" (ঋ ২।৪১।১৬)।—প্রত্যেকেই 'স্বধা'র রূপায়ণ মাত্র। সায়ণাচার্য স্বধাকে বলিয়াছেন মায়া, শাক্ত বলেন—'মহামায়া'। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যতই বিরুদ্ধে বলুন না কেন,—বেদ-উপনিষদ কিন্তু আদিকাল হইতে শক্তিবাদকে এড়াইয়া চলেন নাই।

বাক্ বা স্পন্দনের সমগ্র ব্যাপারটির জগৎ-সৃষ্টির ক্রিয়াকে ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নমুখী প্রবাহিতা স্রোতধারার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেইজন্য ইহা গো-মুখী। ঐতরেয়োপনিষদ বলিতেছেন: ব্রহ্ম জীবদেহের মস্তকে একটি ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন—"স এতমেব সীমানংবিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" (১।৩।১২)। বিশ্বামিত্রও গায়ত্রীমন্ত্রে বলিতেছেন, সবিতার কেন্দ্রকোষ বা ভর্গ হইতে আগত শক্তি জীবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রচোদিত করে। তাহা হইলে বিদ্যুৎ-প্রভা, হিরণ্ময়ী, প্রাতিভ সংবিৎরূপা উমাও জীবদেহের মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া—"বিদ্যুৎভবন্তী প্রতি বস্ত্রিম্ ঔহত" (ঋ ১।১৬৪।২৯)—প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যুৎরূপে নিজের ঘোমটা খুলিয়া প্রকাশিতা হন। যোগমার্গে নরদেহের মেরুদণ্ডকে পর্বত বলা হয়। এই পর্বতের শিখরদেশে মস্তিষ্কের ভিতর তুষারনিভ পদার্থময় সহস্রার চক্র; সুতরাং ইহা হিমবান পর্বত, উপরোল্লিখিত প্রবাহময়ী উমা ঐ হিমালয় হইতে নামিয়া আসেন—এবং এইজন্যও তাহার নাম হৈমবতী।

ঋগ্বেদ যাহাকে প্রাক্‌সৃষ্টির কেন্দ্রকোষস্থ "স্বধয়া তদেকং" বা পরমব্যোমেস্থিত বিশ্বের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, অথর্ববেদ যাহাকে যক্ষ-ব্রহ্ম বলিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তাহাকেই 'শিব' বলিয়াছেন:

"যদা অতমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সৎ ন চ অসৎ, শিব এব কেবলঃ। তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" ॥ (৪।১৮)

সেই শিবই অক্ষর, সবিতার ভর্গ এবং তাহা হইতেই আদি প্রজ্ঞা বা বাক্‌জ্যোতির্ময়ী উমা নিষ্ক্রান্তা হইয়াছেন।

এখন কেনোপনিষদোক্ত সাধন-পদ্ধতির আলোচনা করা যাউক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা দেহ-পিণ্ডকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়:

(১) নিম্ন-ত্রিলোকী—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ; দেহপক্ষে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরঃ ভূলোক।

(২) মধ্যত্রিলোকী— স্বঃ, মহঃ, জনঃ ; " —মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধঃ অন্তরীক্ষ।

(৩) ঊর্ধ্বত্রিলোকী— জনঃ, তপঃ, সত্য ; " —বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার : দ্যুলোক।

সাধন: (১) ভূলোক: দেবতা—ভূরগ্নি ; যাজ্ঞিকপক্ষে লাগতিক অগ্ন্যাহুতি ; যোগীপক্ষে—"স্বদেহং অরণিং কৃত্বা" অগ্নিপ্রজ্বালন ও মণিপুরস্থ ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ।

ইহা কঠোপনিষদের নচিকেতার যমগৃহে প্রথম রাত্রি উপবাস।

(২) অন্তরীক্ষ: যাজ্ঞিকপক্ষে বৈশ্বানর অগ্নি, দেবতা—সূর্য-বিষ্ণু। যোগীপক্ষে প্রাণবায়ু, হৃদয়স্থ অনাহতপদ্মে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। অনাহতের বাহক ও গৌরমৃগ।—নচিকেতার দ্বিতীয় রাত্রি উপবাস।

(৩) দ্যুস্থান: যাজ্ঞিকপক্ষে বিদ্যুতাগ্নি, দেবতা—ইন্দ্র। যোগীপক্ষে আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোটি সূর্যসম জ্যোতিঃদর্শন।—নচিকেতার তৃতীয় রাত্রি উপবাস।

প্রথম স্তরে অগ্নির এবং দ্বিতীয় স্তরে প্রাণবায়ুর সাধনায় ব্রহ্মসম্পর্কে কোন জ্ঞানই হয় না,—এইগুলি প্রস্তুতি মাত্র। তৃতীয় স্তরে সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মন সংযত হইয়া যাইতেই —যাহা যক্ষ ছিল তাহার স্থানে কোটি সূর্যসম জ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎপ্রভা উমা-হৈমবতী প্রজ্ঞা আবির্ভূতা হইয়া পড়িলেন। ঐ নারী যখন স্বয়ং যক্ষ-ব্রহ্মের দেহপ্রসূতা, তখন তিনি তাঁহার পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু, যক্ষ-ব্রহ্মকে ধরাইয়া দিতে পারেন না।—ইহার পরের তুরীয় স্তরে না গেলে তাহা সম্ভবপর নয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে হইবে,—নচিকেতাকে যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাপড়া করিতে হইবে,—তখনই "লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্, ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজো বিমৃত্যুঃ" (কঠ ২।৩।১৮) হওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেনোপনিষদের যক্ষ ও উমা-হৈমবতীর আখ্যায়িকাটি শুধু ব্রহ্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক নয়, পরন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তির যৌগিকসাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত।

সাহিত্য-দর্পনের ভূমিকা
(রসপ্রস্থান)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.,
বি. টি., ডি. এস. ই.
(ষষ্ঠ পর্যায়)

॥ অনুভাব ॥

অনুভাব কি? বিভাব দ্বারা স্থায়ীভাবের যে অভিব্যক্তি হয়, সেটাই হচ্ছে অনুভাব। মনস্তত্ত্বের ভাষায় এটা হচ্ছে আবেগের বহিঃপ্রকাশ (physical manifestation of emotions)। বিভাব রূপ উত্তেজকের (Stimulus) প্রতিক্রিয়া (response) হিসাবে যে জিনিষগুলি বিভাবের পরেই (অনু) আছে, সেইগুলিই হচ্ছে "অনুভাব" (পশ্চাৎ ভাব)। হাসি কান্না পতন মূর্ছা চীৎকার প্রভৃতি সমস্তই অনুভাব। শুধু এইগুলি কেন, নায়ক নায়িকার অনুকূলিজাত সব কাজগুলিই অনুভাব। দুষ্মন্তকে দেখবার জন্য শকুন্তলার কুরুবক শাখা থেকে বল্কল মোচনের চেষ্টা বা পা থেকে কুশকাঁটা ছাড়াবার ছল, শ্রীকৃষ্ণমনে রাধিকার মেঘের দিকে চেয়ে থাকা বা তমাল তরুকে আলিঙ্গনের চেষ্টা, এ সমস্তই অনুভাব।

॥ ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব ॥

রসসৃষ্টির জন্য বিভাব অনুভাব ছাড়া আর একটি জিনিষের প্রয়োজন হয়; সেটা হচ্ছে ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব। ভরত মুনি বলেছেন বি এবং অভি এই দুটি উপসর্গের পর গমনার্থক "চর" ধাতুর যোগে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। রসসমূহের অভিমুখে নানা ভাবে চলে বলেই এ গুলিকে ব্যভিচারি-ভাব বলা হয়। সঞ্চারীভাব কথাটার উল্লেখ নাট্য-শাস্ত্রে নেই। পরবর্তী আলঙ্কারিকরা এই শব্দটি সৃষ্টি করেছেন। এটা ব্যভিচারি ভাবের সঙ্গে একার্থবোধক শব্দ। স্থায়ীভাবের সঙ্গে (সম্) সঞ্চরণ করে, অথবা ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলে এর এই রকম নাম হয়েছে। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিনোপি তে" [ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২।৩।১] একটা তারের যন্ত্রে একটা প্রধান স্বরের সঙ্গে under tone মিশ্রিত হয়ে যেমন প্রধান সুরটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে, রাজার শোভাযাত্রায় তার

অনুচরবৃন্দ যেমন তাঁর যাত্রা উৎসবটিকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে, জলস্রোতের সঙ্গে তরঙ্গ-রঙ্গ যেমন কখন প্রকাশমান, কখনও অপ্রকাশমান হয়ে স্রোতোবেগকে পরিস্ফুট করতে করতে চলে, তেমনই একটি স্থায়ীভাবের সঙ্গে বহু ব্যভিচারীভাব চলতে থাকে। স্থায়ীভাবের মূল সুরটি তাতে ব্যাহত হয় না, সমৃদ্ধই হয়।

॥ ব্যভিচারী ও অন্যান্য ভাবের সংখ্যা ॥

আলঙ্কারিকেরা তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাবের উল্লেখ করেছেন। যথা—নির্বেদ গ্লানি শঙ্কা অসূয়া মদ শ্রম আলস্য দৈন্য চিন্তা মোহ স্মৃতি ধৃতি ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগ জড়তা গর্ব বিষাদ ঔৎসুক্য নিদ্রা অপস্মার সুপ্ত বিবোধ মাৎসর্য অবহিত্থ (চিত্তসংযমের ছল) উগ্রতা মতি ব্যাধি উন্মাদ মরণ ত্রাস এবং বিতর্ক।

এইগুলি ছাড়া আটটি সাত্ত্বিক ভাবও আছে। সাত্ত্বিক ভাবের অর্থ হচ্ছে, একমনস্কতা বা সমাধি। এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব আটটি স্থায়ীভাবের পোষকতা করে।

স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বর-ভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ-অশ্রুপাত এবং চিত্তপ্লুততা—এই আটটি হচ্ছে সাত্ত্বিক ভাব। কাজেই মোটামুটি ৮টি স্থায়ীভাব, ৩৩টি ব্যভিচারীভাব, আর ৮টি সাত্ত্বিক ভাব—এই ৪৯টি ভাব আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। শমকে স্থায়ীভাব বলে স্বীকার করলে ভাবের সংখ্যা হয় ৫০। এদের মধ্যে স্থায়ীভাবকেই বলা হয়েছে ভাবের রাজা।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে এই ৫০টি ভাবের মধ্যে মাত্র ৮।৯টিকে স্থায়ীভাব বলে প্রাধান্য দেওয়া হল কেন? অভিনব গুপ্ত তার উত্তরে বলেছেন "স্থায়িত্বং চ এতাবত্ত্যামেব জাত এব হি জন্তু বিষয়ৌঘৈঃ সংবিদ্ধি পরীতো ভবতি" (১।২৮৪) জাতমাত্রই জন্তু এই কয়টি চিত্তবৃত্তিদ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তাই এগুলিকে স্থায়ীভাব বলে। কিন্তু ব্যভিচারীভাবের সত্তা নিরন্তর নয়। বিশেষ বিশেষ কারণে ঐগুলির সৃষ্টি হয় এবং ঐগুলি স্থায়ীভাবকে পুষ্ট করে।

॥ স্থায়ীভাবের সঙ্গে সঞ্চারীভাবের সম্পর্ক ॥

স্থায়ীভাবের সঙ্গে সঞ্চারীভাবের সম্পর্ক কি রকম? অভিনব গুপ্ত বলেছেন: স্থায়ী-ভাবগুলি হচ্ছে রঙীন সুতার মতো, আর সঞ্চারীভাব হচ্ছে ঐ রঙীন সুতার বর্ণচ্ছটা-পরিলিত স্ফটিক খণ্ডের মত। তাদের নিজস্ব কোনও বর্ণ নেই সত্য, কিন্তু কেন্দ্রস্থ স্থায়ীভাবকে তারা উদ্ভাসিত করে তাকে বিপুলভাবে আস্বাদ্যমান করে তোলে। স্থায়ীভাবগুলিই রসত্বে পরিণত হয় এ কথা ঠিক, তবে সঞ্চারীভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট না হলে রসের রসত্বও থাকে না।

"পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্" (ধ্বন্যালোক ৩।১৪ বৃত্তি)

স্থায়ীভাবের পুষ্টির জন্য এবং রসত্বে পরিণতির জন্য সঞ্চারী ভাবের (এবং বিভাব অনুভাব প্রভৃতির) কতটা প্রয়োজন সেটা শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় তাঁর "কাব্য জিজ্ঞাসা" গ্রন্থে চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। তিনি মহাকবি ব্যাসদেবের মহাভারত থেকে তাঁর রসতত্ত্বের

উদাহরণ দিয়েছেন। মূল মহাভারতের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদটুকু দেওয়া হল : পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণাসভায় স্থির হলো শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের কাছে পাঠান হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে সকলেই মত দিলেন, যুদ্ধ না করে শান্তিতেই যাতে মীমাংসা হয়, সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "যাতে শান্তি স্থাপন হয়, সেই চেষ্টা কোরো। দুর্যোধনকে উগ্র কথা না বলে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ো। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন "ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব। এ যেন তারহীন পর্বত, তাপহীন অগ্নি।". কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজাসুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন।

তখন "ঘোর কৃষ্ণ আয়তকেশা যশস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী ধর্মরাজের ধর্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্ত ভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পুরস্কৃতঃ অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন : 'হে কেশব! এই ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার তুল্য নারী আর কে আছে। আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদীসমুদ্ভিতা, কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, আয়তীচ্কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও পক্ষ ইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্লিষ্টা হইয়াছি, পাপপরায়ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিদ্যা ও ভীমসেনের বলে ধিক্ যে দুর্যোধন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করো'।

অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র সুদর্শন ঘোর কৃষ্ণ সর্বগন্ধাধিবাসিত সর্ব লক্ষণসম্পন্ন মহাভুজগসদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ বাম হস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "হে পুণ্ডরীক! যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিয়ো। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হয়েন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণের সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন পাংশু-লুণ্ঠিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে"! আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। (মহাভারত—উদ্যোগপর্ব)

শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত দেখিয়েছেন যে, এই উদ্ধৃতিটির প্রধান রস হচ্ছে রৌদ্ররস। রৌদ্র-

রসের উপাদানীভূত স্থায়ীভাব হচ্ছে ক্রোধ। বাস্তব জীবনে ক্রোধ মনোহারী জিনিস নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব রসমূর্তিতে পরিণত করেছে..... কিন্তু রৌদ্ররসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হতো, তবে এর কাব্যাংশের শতাংশও অবশিষ্ট থাকতো না। আলঙ্কারিকেরা বলবেন কয়েকটি সঞ্চারীভাব এর রৌদ্ররসকে আশ্চর্য সরসতা ও পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নবরসের দুটি প্রধান রস এবং কয়েকটী ব্যভিচারী—বিষাদ গর্ব দৈন্য রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোককম্পিত অশ্রুলোচন বিষাদ মূর্তিতে কাব্যের আরম্ভ হলো। তারপর দ্রৌপদীর পিতৃকুল পতিকুল মিত্র সৌভাগ্যের যে গর্ব, তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে। আর শোকের অন্তরে ক্রোধ তার রৌদ্রের দ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজল রক্তের রাগরঙ্গই ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায়ায় মিলিয়ে গেছে।.....অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হলেও সে করুণ রস মুখ্য রৌদ্ররসকে নির্বাপিত না করে তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে বিষাদ, গর্ব ও দৈন্য এই তিনটি সঞ্চারীভাব, স্থায়ীভাব, ক্রোধ তথা রৌদ্ররসকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। এই রসসৃষ্টির জন্য আলম্বন বিভাব হচ্ছে দ্রৌপদী, উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে তার মহাকুরুক্ষয় সমূহ বেণী, অনুভাব হচ্ছে কম্পান্বিত কলেবর প্রভৃতি।

॥ স্থায়ীভাবও কখন কখনও সঞ্চারীভাবের কাজ করতে পারে ॥

অনেক সময় হয়ত একই কাব্যে নানা রস থাকতে পারে। তখন দেখা যাবে একটি রসই প্রধানভাবে কাজ করে, আর বাকী রসগুলি তার পরিপোষক হয়ে সঞ্চারীর কাজ করতে থাকে—

"প্রবন্ধোঽপি প্রবন্ধা নানাং নানা রস নিবন্ধনে
একে রসোঽঙ্গী কর্তা বা তেষা মুৎকর্ষ মিচ্ছতা" (ধ্বন্যালোক ৩।২১)

অর্থাৎ এক কাব্যপ্রবন্ধে নানা রস একত্রে থাকলেও দেখা যায় কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটি রসকেই প্রধান করেন, তখন বাকী স্থায়ীভাবগুলি হয়ে ওঠে অপ্রধান বা সঞ্চারী।

"অতএব স্থায়িনঃ এতে তু ব্যভিচারিনোঽপি ভবন্তি"
(অভিনব ভারতী ১।২৭০)

আমাদের উদ্ধৃত উদাহরণে প্রধান ভাবে ফুটে উঠেছে দ্রৌপদীর বাক্যের রৌদ্র রস। এতে বিষাদ গর্ব দৈন্য প্রভৃতি পরিচিত সঞ্চারীভাবগুলিই যে সঞ্চারীর কাজ করছে তা নয়; কয়েকটি স্থায়ীভাব—যেমন উৎসাহ শোক এবং তৎপ্রসূত বীর এবং করুণ রসও এতে সঞ্চারীর কাজ করছে।

শুধু তাই নয়, দ্রৌপদী তেজস্বিনী হলেও সুন্দরী নারী; সে পঞ্চ পাণ্ডবের আদরিণী

জীবন-ঘনিষ্ঠতা ; তাই তার স্নেহের কথাগুলির মধ্য দিয়েও ফুটে উঠেছে অভিমানিনীনায়িকার কোপ-সুন্দর আস্ফালন ; তাই তার মধ্যে একটা মধুর বা শৃঙ্গার রসের মাধুর্যও অভিব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই শৃঙ্গার রস বা রতি স্থায়ীভাবটিও এখানে সঞ্চারীর কাজ করছে এবং তার জন্য কাব্যের মাধুর্যও সমৃদ্ধতর হয়েছে।

॥ রস, ভাব ও রসাভাস ॥

রসের আলোচনাপ্রসঙ্গে রসভাব ও রসাভাসের পার্থক্যটুকু মনে রাখা প্রয়োজন। রসের মূল কথা হচ্ছে সেটা শব্দের নিছক অভিধা শক্তির দ্বারা প্রকাশ্য জিনিষ নয়। তার প্রকৃতিই হচ্ছে শব্দের আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া। এই জিনিষটার নাম "ধ্বনি"। আঘাতের পর মুখ্য ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেলেও তার অনুরণন চলতে থাকে। তেমনিই অনেক সময় একটি বাক্যের আভিধানিক বা লাক্ষণিক অর্থ শেষ হয়ে গেলেও একটা নূতন ইঙ্গিতের স্পন্দন চলতে থাকে। ফলে কথা ফুরিয়ে গেলেও তার অর্থ ফুরায় না,—শব্দের মধ্যেই আভিধানিক অর্থের অতীত আর একটি অর্থ স্পন্দিত হতে থাকে, তাতে মনে চমক লাগে। এই জিনিষটার নামই ধ্বনি। ধ্বনি তিন রকমের হতে পারে : অর্থধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি আর রসধ্বনি। ধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করা হবে। তবে উপস্থিত আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে, রসের মধ্যে একটা ধ্বনির (রসধ্বনির) লীলা আছে। তাই যেটা রসের কাব্য, সেটা হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়, আর সহৃদয় ব্যক্তিরাই সেটাকে উপলব্ধি করতে পারে। অভিধানের পাতা খুলে শব্দের অর্থ বুঝলেই কাব্যের মর্মকথা বুঝতে পারা যায় না। তার জন্য দরকার রসিক মনে রসের উপলব্ধির।

সাহিত্যদর্পণকার রসের উদাহরণপ্রসঙ্গে অমরুশতক থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন :

যথা—　　"শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
নিদ্রা ব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালা চিরং চুম্বিতা" ॥

ভাবানুবাদ—নির্জন ঘরে শয়ন ছাড়িয়া গোপনেতে বালা করিয়া চুরি,
কপট নিদ্রা লুলিত পতির মুখখানি হেরি নয়ন ভরি,
পুলক আবেশে সে মুখ যখন চুমিল সাহসে,—সহসা পতি
হাসিয়া প্রিয়ার লাজনত মুখে চুম্বন দিল আবেশে অতি ॥

এখানে নায়ক হচ্ছে আলম্বন বিভাব, নির্জন ঘর হচ্ছে উদ্দীপন বিভাব, নায়ককে চুম্বন হচ্ছে অনুভাব, আর লজ্জা হচ্ছে সঞ্চারীভাব। এর রসটি হচ্ছে "সম্ভোগ শৃঙ্গার"।

এই শ্লোকটির সঙ্গে দশাবতার বন্দনার নিম্নলিখিত শ্লোকটির তুলনা করলেই রসের সঙ্গে ভাবের পার্থক্য বুঝতে পারা যাবে :

'যস্যানীয়ত শঙ্ক সীম্নি জলধিঃ, পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং,
দংষ্ট্রাগ্রাং ধরণী, নখে দিতি সুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ, শরে দশমুখঃ, পাণৌ প্রলম্বাসুরো,
ধ্যানে বিশ্ব মসাব ধার্মিক কুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥'

ভাবানুবাদ—শঙ্ক সীমায় সাগর যাহার, পৃষ্ঠে বহে যে জগৎভার,
দন্তে ধরণী, নখে দিতিসুত, স্বর্গমর্ত চরণে যার।
ক্রোধে ক্ষত্রিয়, শরে দশমুখ, প্রলম্বাসুর বাহুর ভারে,
ধ্যানেতে বিশ্ব লীন হল যার, অসিতে যবন, প্রণমি তারে ॥

এই শ্লোকটির ভাব—উপাদান রসের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি, কারণ দেবতার প্রতি রতি স্ত্রী-পুরুষের রতির মত স্বাভাবিক পদার্থ নয়। কাজেই এর ভাবটি "স্থায়ীভাব" নয়, আর পূর্বেই বলা হয়েছে স্থায়ীভাব ছাড়া অন্যভাব রসত্বে পরিণত হয় না।

সাহিত্যদর্পণকার রসের সঙ্গে রসাভাসের তুলনা করবার জন্য কুমারসম্ভবের বসন্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যথা—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥"

ভাবানুবাদ—ফুল-পিয়ালায় পান করে মধু, মধুপ তাহার প্রিয়ার পরে
সুখে বোজা আঁখি মৃগীদেহে মৃগ শৃঙ্গ বুলায় সোহাগ ভরে ॥

—অপূর্ব এই শ্লোকের প্রসঙ্গ। পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন সংঘটনের জন্য দেবতাদের চক্রান্ত চলেছে, বসন্তের বিপুল সমারোহের মধ্যে নিখিল বিশ্বে প্রেম-বিহ্বলতার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে: চক্রবাক চক্রবাকীকে অর্ধোপভুক্ত মৃণাল খণ্ড দিয়ে পরিতৃপ্ত করছে, হস্তিনী সোহাগ-ভরে পদ্মরাগ-সুরভিত জলগণ্ডূষ তার প্রিয়তম হস্তীকে পান করাচ্ছে, সামান্য প্রাণী ভ্রমর, সেও ভ্রমরীর অনুবর্তন করে তার পিতাবশিষ্ট মধুটুকু একই কুসুম-পাত্র থেকে পান করছে, কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গ দিয়ে তার ঘরিতার দেহ কণ্ডূয়ন করছে, ঘরিত-স্পর্শ সুখে মৃগীর চোখ নিমীলিত হয়ে আসছে, শীত-শ্রম-দূরিত কিন্নরীর সুন্দর মুখটিতে মুগ্ধ কিন্নর মাঝে মাঝে চুম্বন দিচ্ছে, পুষ্প-স্তবক-স্তনা লতা-বধূকে শাখাবাহু দিয়ে বৃক্ষসকল আলিঙ্গন দিচ্ছে,—এই জগৎ জোড়া প্রেমলীলার মধ্যে

"পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"

গৌরীর আবির্ভাব হলো, তাঁর নিঃশ্বাস-সৌরভে আকুল হয়ে একটি ভৃঙ্গ তাঁর বিম্বাধরের কাছে উড়তে লাগলো, লীলাকমল সঞ্চালিত করে তিনি সেই ভৃঙ্গটিকে অপসারিত করছিলেন,

—এই সময়েই প্রেমের দেবতা ভাবলেন মহাদেবের সংযম-স্তিমিত মনকে উমার লাবণ্যে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

এই বর্ণনার মধ্যে উল্লিখিত শ্লোকটি অপরূপ কৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে—যেন জড়োয়া অলঙ্কারে হীরকখণ্ডের মতই তার দীপ্তি। সমগ্রের অংশ হিসাবে এর রসবত্তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিতভাবে এর বিচার করে সাহিত্যদর্পণকার এই শ্লোকটিকে রসের উদাহরণ বলে স্বীকার না করে একে রসাভাসের উদাহরণ বলে পরিচয় দিয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত রস প্রথম শ্লোকটির (শূন্যং বাসগৃহং ইত্যাদি) মত সম্ভোগ শৃঙ্গার হলেও এতে রূপায়িত হয়েছে নিম্নপ্রাণীর রতিবিলাস, তাই মানুষের মনে সেটা ঠিক রসতন্ময়তা আনতে পারে না।

সাহিত্যদর্পণকারের যুক্তি থেকে রস ও রসাভাসের পার্থক্যটা বুঝতে পারা গেলেও সাহিত্য-বিচারের সময় একটা সমগ্রের অংশীভূত একটি শ্লোক বেছে নিয়ে তার রূপণ সমালোচনা করা বিশ্বনাথের পক্ষে ঠিক হয়েছে কিনা জানি না।

ভামতীকার কি প্রতিবিম্ববাদী ?

(শেষাংশ)

স্বামী সদানন্দ

ভামতীকার অধ্যাসভাষ্যে অধ্যস্তবস্তুর ক্ষণস্থায়ীত্ব বুঝাইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : পূর্বে যে-বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় ও উহার পরে একই অধিষ্ঠানের উপরে যদি অন্য একটি বস্তু উপস্থিত হয় এবং ঐ উপস্থাপিত বস্তু-দুইটি যদি পরস্পর নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ কোনটাই যদি অন্য কোনটিকে অবলম্বন না করিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পরের বস্তুটির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, পূর্বেরটির নহে।[১] এই নিয়মের সাহায্যে অপ্পয় দীক্ষিত অবচ্ছেদবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পর পর দুইটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কোনটিই কোনটির উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই উক্ত নিয়ম অনুসারে বলা যায়, অপ্পয় দীক্ষিত ভামতীকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়াই মনে করেন। অবশ্য অপ্পয় দীক্ষিতের এইরূপ মনোভাব আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। অন্য একটি স্থলে অপ্পয় দীক্ষিত যে-কথা বলিয়াছেন তাহাতে এইরূপ কল্পনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' এই সূত্রের ভাষ্য-টীকায় ভামতীকার প্রতিবিম্ববাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভামতীকারের উদ্দেশ্য, প্রতিবিম্ববাদের সাহায্যেও সূত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে। ভামতীর 'কল্পতরু'-টীকায় ভামতীকার ঐ মনোভাবের আভাষ দিয়াছেন। কিন্তু 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকায় অপ্পয় দীক্ষিত যে-কথা বলিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান। অপ্পয় দীক্ষিত বলিতে চান যে, সূত্রের 'লীলা' শব্দটীর ব্যাখ্যা প্রতিবিম্ববাদকে গ্রহণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে।[২] এবং ঐ সামঞ্জস্যের কথাই 'কল্পতরু'কার স্বীকার করিয়াছেন।

---

(১) 'প্রেক্ষা অর্থাপেক্ষিতয়ং যাবতে হেতুং, ন যাবতে' ।—ভামতী

(২) 'প্রসঙ্গাৎ প্রতিবিম্ববাদে লৌকলীলাশব্দসামঞ্জস্যাহ' ।—কল্পতরু-পরিমল

ভামতীকার যদি অবচ্ছেদবাদী না হইতেন তাহা হইলে 'অন্তর্যামী'-অধিকরণের ব্যাখ্যাই তিনি অবচ্ছেদবাদকে গ্রহণ করিয়া করিতেন না। কেবল তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই নয়, অবচ্ছেদবাদ গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্বের ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। এইজন্যই ভামতীকার জীবের বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন : জীব উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন পরমাত্মাই।[৩]

আনন্দময়াধিকরণের আরম্ভেও ভামতীকার দেখাইয়াছেন যে, অবচ্ছেদবাদ গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের বাক্যসকলের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হয়।

অপ্পয় দীক্ষিত কেবলমাত্র 'কল্পতরু-পরিমল'-টীকায় ভামতীকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়াছেন, তাহাই নহে। 'সিদ্ধান্তলেশ'-গ্রন্থেও তিনি ভামতীকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে 'জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ' অধ্যায়ে 'অন্যেতু' বলিয়া একটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও 'অন্যেতু' এই শব্দের দ্বারা তিনি কোন্ আচার্যকে বুঝাইতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তথাপি সমগ্র মতবাদে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভামতীকারের মত। অন্য কোন ব্যক্তির মতবাদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, অপ্পয় দীক্ষিতের মতে ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী।

এখন দেখা উচিৎ আচার্য বাচস্পতি নিজের মতবাদ সম্বন্ধে ভাষ্য-টীকায় কোথাও কিছু আভাষ দিয়াছেন কিনা। অনেক স্থলে তিনি 'প্রতিবিম্ব' শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'কল্পতরু' ও 'কল্পতরু-পরিমল'-কারদ্বয়ের মতে ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য প্রতিবিম্ববাদে নয়। এখন দেখিতে হইবে অবচ্ছেদবাদের কথা ভামতীকার উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, যদি উল্লেখ করেন, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে 'কল্পতরু' ও 'কল্পতরু-পরিমল'-কারদ্বয়ের মত কি।

'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় ভামতীকার বলিতেছেন : "তথাপি অনাদ্যনির্বচনীয়াবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য"। এই বাক্যাংশে ভামতীকার অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়াছেন, অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত বলেন নাই। মনে রাখা প্রয়োজন, ভামতীকার এরূপ কথা সিদ্ধান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্বপক্ষের হইয়া বলেন নাই।

ঐ সূত্রের অন্য এক স্থলে ভামতীকার বলিয়াছেন : শুদ্ধচৈতন্য নিত্য হইলেও উপাধিযুক্ত হইয়াই অনিত্য কার্যরূপে প্রতিভাত হয়, যেমন আকাশ ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়।[৪] এইস্থলেও ভামতীকার অবচ্ছেদবাদ বুঝাইতে 'ঘটাবচ্ছিন্ন' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্য উপরোক্ত বাক্যটী পূর্বপক্ষের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) "যো জীবঃ নিয়ন্তা লোকে নিত্যঃ স পরমাত্মৈবোপাধ্যবচ্ছেদকল্পিতভেদঃ"। ভামতী (১-১-২০)

(৪) "চৈতন্যস্য শুদ্ধস্য নিত্যস্যেপি উপাধিযোগাৎ সৎ অনিত্যং কার্যং, আকাশমিব ঘটাবচ্ছিন্নম্। ভামতী

যদিও এইমত সিদ্ধান্তেও স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সন্দেহ হইতে পারে, ইহা ভামতীকারের নিজস্ব মত নয়। সুতরাং দেখা দরকার ইহার উত্তরে ভামতীকার কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভামতীকার বলেন: প্রকাশস্বরূপ চৈতন্য বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইলে কার্যরূপে পরিগণিত হয়।[৫] এই সিদ্ধান্তবাক্যেও ভামতীকার অবচ্ছেদবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় অন্য একস্থলে ভামতীকার বলিয়াছেন: হউক অনাদ্য আকাশে ঘট প্রভৃতি উপাধির দ্বারা অবচ্ছেদের বিভ্রম[৬]—ইহা পূর্বপক্ষের সন্দেহ। কিন্তু এই সন্দেহই প্রমাণ করে যে, পূর্বপক্ষ অবচ্ছেদবাদকে স্বীকার করিয়াই তাহার সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, সিদ্ধান্তী অর্থাৎ ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে 'স্বতেশ্চ' সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তরূপে ভামতীকার বলেন: অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব।[৭] এই বাক্যে স্পষ্টই ভামতীকার অবচ্ছেদবাদের কথা বলিয়াছেন।

'অদৃষ্টাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ' সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় ভামতীকার জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন: জীবাত্মা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসকল ভামতীকারের অনেক উক্তির কিঞ্চিৎ। উহারাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী ছিলেন। আচার্য বাচস্পতি নিজেকে যখন অবচ্ছেদবাদী ঘোষণা করিতেছেন, তখন অন্যান্য আচার্যও ঐভাবে তাঁহাকে অবচ্ছেদবাদী বলিবেন, ইহা আশ্চর্যের কিছু নাই। প্রতিবিম্ববাদী বলিয়াছে যে, ভামতীকারের অবচ্ছেদ-বাদের পরিপোষক কোন বাক্য নাই, তাহা অসার।

অদ্বৈতবাদের অন্যান্য আচার্যের মধ্যে আচার্য মধুসূদন শিরোমণি। তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হইতে পারে না। দেখা যাক্, তিনি এই বিষয়ে কিরূপ মত পোষণ করেন। 'সিদ্ধান্ত-বিন্দু' নামক টীকা গ্রন্থে আচার্য মধুসূদন বাচস্পতি-সম্মত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। সেখানে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তিনি উপসংহার করিয়াছেন: ইহাই অবচ্ছেদবাদ।[৮] এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীও যাহা বলিয়াছেন তাহা অবচ্ছেদবাদকেই সমর্থন করে। বাচস্পতি অবচ্ছেদবাদী এমন স্পষ্টরূপে বোধ হয় আর কোন প্রসিদ্ধ আচার্য বলেন নাই। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী ছিলেন।

---

(৫) "বিষয়াবচ্ছিন্নপ্রকাশঃ কার্যম্" ;—ভামতী

(৬) "ভাদেতৎ—অনাদাবপি ব্যোম্নি ঘটাদ্যুপাধিকৃতো ভবতু এব অবচ্ছেদবিভ্রমঃ"। —ভামতী

(৭) "অবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব জীবভাবঃ"।—ভামতী

(৮) "অয়মেব অবচ্ছেদবাদঃ"।

'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' আচার্য মধুসূদনের এবং অদ্বৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই গ্রন্থে বাচস্পতি-সম্মত অবিদ্যা জীবে আশ্রিত এই তত্ত্বের বিচার হইয়াছে। বিচারের সময় সিদ্ধান্তরূপে বলা হইয়াছে: অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদকরূপে উহার উপপত্তি হইতে পারে, যেমন, ঘট ও উহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ।* এই বাক্যাংশের দ্বারা মধুসূদন পরিষ্কার জানাইতে চান যে, ভামতীকার অবচ্ছেদবাদী।

উপরোক্ত বিচারে যে-সকল টীকা গ্রন্থের এবং আচার্যের বাক্যসকল উদ্ধৃত করা হইল, তাঁহারা সকলে একবাক্যে ভামতীকারকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা সকলেই ভুল করিয়াছেন, একথা প্রলাপোক্তি। যদিবা তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় তাঁহারা সকলেই ভুল করিয়াছেন, তাহা হইলেও ভামতীকারের নিজস্ব উক্তিগুলির ব্যাখ্যা কি প্রকারে হইবে ? যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সকল আচার্যের বাক্যসকল্ ভুল প্রতিপন্ন করিয়া ভামতীকারের উক্তিসকল প্রতিবিম্ববাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তিনি ভারতীয় দর্শনের একটা বিরাট ভ্রম দূর করিয়া ধন্যবাদার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই। সমস্যাটা সুধীজনের নিকট নিবেদন করিতেছি।

(*) "অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবঘটাদ্যুপপত্তেঃ, ঘটাদ্যবচ্ছিন্নাকাশবদিতি"।—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শত ভার স্বর্ণ গো কোটী কন্যা দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

• • •

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ (চৈঃ ঃ ঃ)

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের সংবাদ পাইয়া নদীয়ার সমস্ত লোক ধাইয়া আসিল, প্রভুর শূন্য বাড়ী দেখিয়া নদীয়ার লোক কাঁদিতে লাগিল, প্রভু গঙ্গা পার হইয়া কণ্টক নগরে (কাটোয়া) পুণ্যবান কেশব ভারতী সন্নিধান আসিলেন; দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন, এবং কাতরতার সহিত বলিলেন, প্রভু! আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমি ভিখারী অনুগ্রহপ্রার্থী।

অনুগ্রহ মোরে কর মহাশয়।
পতিতপাবন তুমি মহাকৃপাময়॥ (চৈঃ ভাঃ)

গৌরাঙ্গের এই সময় ২০ বৎসর উত্তীর্ণ না হওয়ায় তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম দেওয়া কর্তব্য নয় বলিয়া ভারতী, মহাশয় নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন, এবং কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ও বৃদ্ধা জননীর দুঃখের সীমা থাকিবে না, এইরূপ আরও নানা উপদেশ দিয়া, প্রভুকে নিরস্ত

করিতে বহু চেষ্টা করিলেন। কেশব ভারতী প্রভুর ভক্তি দেখিয়া স্তুতি আরম্ভ করিলেন, এবং বলিলেন : গৌরাঙ্গ, তোমার ভক্তির সীমা নাই, তোমার ভক্তি দেখিয়া পরাস্ত হইলাম।

"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে।"

প্রভু বলেন— "মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন শিক্ষা দেও যেন হও কৃষ্ণদাস।"
এই মতে কৃষ্ণ কথা আনন্দ প্রসঙ্গে।
রহিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা সঙ্গে॥
প্রভাতে উঠিয়া সর্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখর প্রতি॥

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেসোমহাশয়। বলিতে গেলে একমাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয়, অভিভাবক। প্রভু তাঁহার মেসোমহাশয়কে সবিনয়ে বলিলেন :

বিধি যোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।
তোমাকেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥ (চৈঃ ভাঃ)

তৎপর সর্ব জগতের প্রাণ মহাপ্রভু বলিলেন :

'করিতে শ্রীশিখার অন্তর্ধান,'

এইরূপে প্রভুর কাটোয়ার ভাগীরথী তীরে বটবৃক্ষতলে কেশব ভারতীর আশ্রমে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে পর, মুকুন্দ কৃষ্ণনাম গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন সকলে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এমনসময় প্রভুর শ্রীশিখা মুণ্ডনের জন্য ক্ষৌরকার আসিল।

প্রভু বলিলেন : "খালাস করহ নাপিত বৃন্দাবন যাই"

ক্ষৌরকার মধুসূদন প্রভুর মস্তকমুণ্ডন ও শ্রীশিখার অন্তর্ধান করিতে বিশেষ আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন "আমার সর্বনাশ হউক সেও ভাল, তথাপি আমি প্রভুর মাথায় হাত দিতে পারিব না"।

মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউক সর্বথায়।
কেমনে দিব হাত তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ মোর নরকে যাক্ তবহ গৌরাঙ্গ॥ (চৈঃ মঃ)

গৌরাঙ্গদেবের মাথায় হাত দিয়া ক্ষৌরকার্য করিতে হইবে এবং ইহার পর ঐ হাত যার-তার গায়ে লাগাইতে হইবে তজ্জন্য বোধ হয় ক্ষৌরকার শ্রীশিখা মুণ্ডনে আপত্তি করিলেন। (অঃ নিঃ চঃ)

ক্ষৌরকার প্রভুর নিকট বহু প্রকার উপদেশ পাইয়া পশ্চাৎ প্রভুর নিকট পরাস্ত হইলেন,

এবং যথাবিধি ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপর কেশব ভারতী হরিধ্বনির কোলাহল-মধ্যে প্রভুর দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিলেন। এই সময় চতুর্দিকে হরিনামের রোল পড়িল।

চতুর্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলেন বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি। (চৈঃ ভাঃ)

সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুর "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নাম প্রকাশ হইল:

হেন মতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্মনাম "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ (চৈঃ ভাঃ)

চৈতন্যের সন্ন্যাসে দেশময় যে দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা শত শত গানের মাধ্যমে বঙ্গের ঘরে ঘরে এখনও করুণা জাগাইয়া তোলে।

শচীমা মৃতপ্রায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্না।

যেদিন হইতে প্রভু ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িলা বিষ্ণুপ্রিয়া। (প্রেমদাস)
হের দেখ ভোরে মাতা শচী অনাথিনী।
কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশুপক্ষী লতাপাতা এ পাষাণে ঝরে॥ (চৈঃ চঃ)
নবদ্বীপ অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়া গেল।
হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ ধ্বনি পড়িল॥
শচীমাতা বারদিন উপবাসী হইলেন।
দ্বাদশ উপাসে রাই করিলা ভোজন॥ (চৈঃ চঃ)

যে মাঘ মাসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহার পরবর্তী ফাল্গুন মাস হইতে এক বৎসর কাল বিষ্ণুপ্রিয়া যে দারুণ বিচ্ছেদ শেল-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, ঐ বারমাসী তৎ-কালীন বৈষ্ণবকবি লোচনানন্দ ঠাকুর তাঁহার লিখনী দ্বারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবির বর্ণিত ঐ "বারমাসী" স্মরণ করিলে কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

কবি লোচনানন্দের বারমাসী:

(১) ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপ গন্ধে।
সংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল, বৃদ্ধ, যুবা॥

(২) চৈত্রে চাতকপক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! আমি কি বলিতে জানি।
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥

(৩) বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলী বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সেরূপ না দেখি মুই জীব কোন ছান্দে॥

(৪) জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপ্ত সিকতা।
কেমনে রহিবে প্রভু পাদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছট্‌ফট্‌ করে যেন জল বিনে মীন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

(৫) আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দারুণীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ, ময়ূরের নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাও॥

(৬) শ্রাবণে ললিত-ধারা মন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে রহিব প্রভু, কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তুমি দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥

(৭) ভাদ্রে ভাবত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! বিষম ভাদ্রের খরা ।
জীবন্ত মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা ॥

(৮) আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা-মহোৎসবে ।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে ॥
শরৎ সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে ।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে । মোরে কর উপদেশ ।
জীবনে মরণে মোর করিও উদ্দেশ ॥

(৯) কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা ।
কেমনে কৌপিন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী ।
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! তুমি অন্তর যামিনী ।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥

(১০) অঘ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে ।
সর্ব্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাট নেত জোটে, প্রভুর শয়ন কম্বলে ।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি, আমি পদতলে ॥
হে গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া ।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে, রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥

(১১) পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে ।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে ।
বিরহ অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! পরবাস নাহি সহে ।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে ॥

(১২) মাঘে বিগুণ শীত কত নিবারিব ।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি ।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সম্ভতি ॥

হে গৌরঙ্গ প্রভু হে। মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥ (অঃ নিঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি ভক্ত ছিলেন। জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভগবদ্ভক্তি তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ একই উদ্দেশ্যমূলক। উভয়ের গৃহত্যাগ-ঘটনার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শ্রীমতী গোপার এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার পরবর্তী জীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আপনি দুঃখ সঞ্চার করে।

রাজকুমার গৌতম ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া জীবের নির্বাণ পথ আবিষ্কার করিলেন, অপর দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবের ঐকান্তিক দুঃখ দূর করার জন্য দরীব ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়া চিরকালের জন্য গৃহত্যাগী হইলেন। এই দুই মহাপুরুষই সর্বত্যাগী পরম জ্ঞানী ভক্ত।

মহারাজ শুদ্ধোধন কুমারের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান তথাগত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কত ভাষাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা সর্বজনবিদিত। তিনি ভারতবর্ষের বহু ভাষাতে সুপণ্ডিত থাকায়, বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলছেন :

"জীবের দুঃখ দেখি মোর প্রাণ বিদরে।
সর্ব্বজীব পাপ যোরা প্রভু দেও মোর শিরে ॥
জীবের দুঃখ লইয়া মুই করি নরক ভোগ।
প্রভু ঘুচাও জীবের ভব রোগ ॥"

তাই বলা হয়, তথাগত গৌতম এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের পশ্চাৎ ছিল তাঁহাদের সর্বজীবে দয়া।

সম্পাদক
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(তৃতীয় পর্যায়)

১৩ই মার্চ, ১৯৫৮ সাল। মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গেছি। দু'একটি কথাবার্তার পর তিনি বল্লেন : দেখ, আজকাল অনেক শিক্ষক বলে থাকেন, সময় নেই নিজের কাজ করার জন্যে বা ঠিক মনের মতন পরিস্থিতি পাই না ইত্যাদি। আর্টিষ্টের আবার সময়, যে-কোন পরিস্থিতিতে সময় করে নিয়ে ছবি আঁকবে, হয়তো সকালে উঠেই ক্লাসে যেতে হয়, তখন করবে কি ছাত্রদের মাঝে বসেই ছবি আঁকতে শুরু করবে। তাতে নিজেরও হাত ঠিক রইলো আর ছাত্রদেরও শেখা হলো। আমার সময় আমি প্রায়ই তাই করতাম। ছাত্ররা চারপাশে বসে কেউ আমার রং গুলে দিত, কেউ আমার জল পাল্টে দিত ইত্যাদি। তাতে ওদের অনেক বেশী শেখা হতো, কেননা মুখে বলার চেয়ে কাজে দেখিয়ে দিলে অনেক বেশী উপকার হয়। 'বোলপুরের রাস্তা' (টাচের কাজ) বলে যে কাজটি আমার দেখো সেটি ছাত্রদের কাজের সঙ্গে বসেই করেছি। আমার সময় কলাভবনে একটা-না-একটা ছবির প্রদর্শনী রাখতাম। যেমন কোন সময় হয়তো নানা দেশের রাবিংস (কালো কালির ছাপ), কখনো পুরোনো রাজপুত মোগলের ছবি, আবার কখনো তিব্বতী টাংগা বা হয়তো কলাভবনের ছাত্রদের করা ভালো ভালো কিছু ছবি থাকতো। শুধু যে সাজিয়েই রাখা হতো তা নয়, সব ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হতো কোন্‌টিকে কি বলে। কোন্ দেশের শিল্পী এটি এঁকেছে বা কেন এটিকে শ্রেষ্ঠ ছবি বলা হলো ইত্যাদি। এতে উপকার হতো যে, ছাত্রদের নানা ধরণের কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটতো, আর নিজের দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের শিল্পী ও শিল্পের সাথে পরিচিত হতো। এ'ছাড়া 'এপিডায়স্কোপ' দিয়ে প্রায় সন্ধ্যায় উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টিগুলি দেখানো হতো, যেমন

অজন্তা, ইলোরা, বাঘ ইত্যাদি। কেননা সবাইয়ের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়ে উঠতো না এসব স্বচক্ষে দেখার—তাই ঐভাবে দেখালে চোখে দেখার সামিলই হতো।

তখন কয়েকটি পুরোনো ছাত্রের কাজের ঘরে কয়েকজন নূতন ছাত্র সঙ্গে দিতুম। তাতে যারা নতুন আসতো পুরোনোদের সঙ্গে থাকার দরুণ তাদের "করণপদ্ধতি" ধরতে খুব সুবিধা হতো। কেবল ঘরে বসেই তারা ছবি আঁকতো না হঠাৎ হয়তো সবাই মিলে কয়েক-দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনের বাইরে ষ্টাডি করার জন্যে ক্যাম্প করে থাকতুম; খুব বেশী দূরে যাওয়া হতো না। কয়েকজন ছেলে প্রতিদিন তাদের খাবার এখান থেকেই (শান্তিনিকেতন) সেখানে নিয়ে যেতো। বেশ কিছুদিন ষ্টাডি করে আবার ফিরে এসে ছবি আঁকতুম, এতে একঘেয়েমিও কাটতো, আর ছবি আঁকার নতুন বিষয়বস্তুও পাওয়া যেতো। এ'ছাড়াও ছেলেদের সঙ্গে করে রোজই কাছাকাছি জায়গায় স্কেচ্ করতাম। তোমরা যেমন স্কেচ্ করে এসে খাতা বন্ধ করে রেখে দাও, আর একটিবারও উল্টে দেখো না, তাতে কিন্তু কোন উপকারই হয় না বলবো। সকালে বিকালে যে স্কেচ্ করবে রাত্রিবেলায় ঘরে বসে তার উপর পাতলা ট্রেসিং পেপার ফেলে ঠিক করে নেবে, এই রকম ভাবে কিছুদিন ঠিক করতে থাকলে মূল স্কেচে অনেক ভুল শুধরে যাবে, দেখবে স্কেচ্ করার সময় সব সময় গড়ন ঠিক থাকে না, কিন্তু ঐভাবে যদি ট্রেসিং পেপার ফেলে হাত ঠিক করতে থাকো তাহলে অনেক উপকার পাবে।

তখন একটা-না-একটা স্কেচো চলতোই, আমার সময় স্কেচো করানো কাজটা অন্য পদ্ধতিতে শেখাতাম। যেমন ধরো—আমি কোন দেওয়ালের স্কেচো করছি, সঙ্গে হয়তো চারটি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র নিলুম, আর যথাক্রমে থার্ড ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ারের দু'একটি করে ছাত্র নিলুম, হয়তো বলবে ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র আপনার সঙ্গে কি করবে? যেমন ধরো—ফাইনাল ইয়ারের ছাত্ররা ছবির ভেতরের রং দিতো, থার্ড ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র বর্ডার বা টুকিটাকি জায়গায় রং দিয়ে ওয়াট করতো, আর যারা ফার্স্ট ইয়ার তারা কেবল উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের কথামত কাজ করে যেতো। একটি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে প্রথম বছর রং গোলা ও প্রত্যেকের জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এই সব কাজ করতো, ঐসঙ্গে দেখতে লাগলো, তার উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা কিভাবে কাজ করে। ঠিক সেই ছেলেটি যখন সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারে উঠলো তখন সে টুকিটাকি রং ওয়াট করার অধিকার পেলো, আবার ফাইনালে উঠে ছবির ভেতরের রং লাগাতে থাকলো। তাহলেই বুঝতে পারছো শেখানোর পদ্ধতিটা কি ধরণের। বাংলায় যোগানদার ব'লে একটা কথা আছে জান তো? তারাই একদিন অধিকার পেতে পেতে মিস্ত্রী হয়। আমার নেওয়া ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেটি আস্তে আস্তে স্কেচো করার অধিকার পেলো।

তাই বলছি শিক্ষকরা সর্বদা ছাত্রদের ভেতর থেকে যদি কাজ ক'রতে থাকেন, শুধু যে

ছাত্ররা তাতে উপকৃত হবে বা উপকার পাবে তা নয়, শিক্ষক অন্যান্তে নিজেও উপকৃত হবেন। ছাত্র-শিক্ষকের ভেতর সঙ্কোচ বোধটাই মারাত্মক জানবে, উভয়ে উভয়ের প্রতি টান থাকলেই যথার্থ কাজ দেখা হবে। ছাত্রদের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকবে যে, তারা শিক্ষককে দেখলেই তাঁর কাছে ছুটে আসবে। আগে আমার সঙ্গে সর্বদাই কিছু-না-কিছু ছাত্র থাকত। যেখানেই যেতাম তারা আমার সঙ্গ ছাড়তো না—এর কারণ কি জানো? আমি তাদের ভালোবাসতাম, তারাও আমায় ভালোবাসতো।

বড়দিনে শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক ভবনেই ছাত্ররা কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যেতো। এতে তাদের প্রত্যেককে কিছু-কিছু টাকা দিতে হ'তো; কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে, এখানকার খরচ কুলিয়ে উঠে তা দিতে পারে। তাই করলাম কি বড়দিনের আগে যে পৌষমেলা হয়, তাতে কলাভবনের তরফ থেকে একটি 'কার্ড-ষ্টল' দেওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। তাতে ছাত্রদের হাতে-আঁকা ছোটখাটো স্কেচ্ ধরণের কাজ থাকতো। শিক্ষকরা দিতেন, আমিও কিছু কাজ দিতুম। সে বছর বেশ কিছু টাকার কার্ড বিক্রী হলো। তাতে করলাম কি—যে ছাত্ররা যেতে অক্ষম তাদের ঐ টাকা দিয়ে দিয়ে দিলুম, আর যা টাকা বেশী রইলো তা দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দরকার, তা ধীরে ধীরে কিনতে থাকলাম। এখন তোমরা যা বাসন-পত্র বা তাঁবু ও ঐ জাতীয় যে সব জিনিষ ব্যবহার করো তা আমাদের ঐ 'কার্ড-ষ্টল'-এর টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। খরচ কম অথচ সবাই এক সঙ্গে যেতে পারবো এমন একটি জায়গা বেছে নিলুম। জায়গা দেখার জন্য জায়গা যাইতুম না, সবাই মিলে এক সঙ্গে আনন্দ করার জন্য বাইরে যেতুম। একই জায়গায় হয়তো পর পর তিনবার গেছি তাতে কোন আনন্দের ঘাটতি হয় নি, এর কারণ কি জানো? কোন একটা জায়গা দেখতে যাওয়া এক জিনিষ, আর সবাই মিলে আনন্দ করার জন্য এক জায়গায় যাওয়া আলাদা জিনিষ। রাজগীর (বিহার) নালন্দা পর পর সাত বার গেছি, কই এক-ঘেয়েমি তো লাগে নি। রাজগীরের কথায় একটি দিনের কথা মনে পড়লো, তোমায় বলি।

কোন্ বারটা ঠিক আমার মনে নেই। সঙ্গে মাসোজী—এঁরা সব ছিলেন। রাজগীর-মন্দিরের সামনেই ঠিক পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছোট একটি বটগাছের নীচে আমরা ক্যাম্প করতুম। সামনে একটি কুঁয়ো আছে। ক্যাম্প-ট্যাম্প করে বেশ আরাম করে সবাই বসেছি—একটু মেঘের আভাস দেখা গেল। সঙ্গে বেশ কন্‌কনে হাওয়া চলতে থাকলো। আনন্দের নেশায় সেদিকে খুব বেশী একটা নজর দিই নি। খাওয়া-দাওয়া করে কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে আর সবাই ক্যাম্পের মধ্যে আগুন জেলে গান-টান করছে। হঠাৎ মাঝরাতে খুব বৃষ্টি আর হাওয়া। তাঁবুগুলি ঠেকিয়ে রাখা দায়। মেয়েরা তো তাঁবুর ধারে ধারে বাক্স-টাক্স রেখে তাঁবু পড়ার মুখ থেকে আপ্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। ওদিকে চেষ্টা করলে হবে কি, বৃষ্টির জলে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় তাঁবুর সাথে টোকা কাঠিগুলি সব উঠে যেতে থাকলো। মাসোজী করলেন

কি ছেলেদের নিয়ে ঐ খুঁটির উপর বসে রইলেন, যাতে খুঁটি উপড়ে না আসে। ছেলেদের তাঁবু তো পড়েই গেল। শুধু বাক্স-বিছানা এক জায়গায় করে তার উপর তাঁবুটি রইলো এবং ভেতরেও সবাই মিলে একসঙ্গে গান জুড়ে দিয়েছে। সে এক আনন্দের দিন গেছে। এতবড় যে একটা ঝঞ্ঝাট গেলো তা কারোর মুখ দেখে ধরতে পারবে না। এর কারণ কি জানো? মনে আনন্দ ছিল বলেই তো কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয়নি।

তোমাকে যে স্কেচের পর পাতলা ট্রেসিং পেপার ফেলে সংশোধন করে নেওয়ার পদ্ধতি বল্লাম, তার সাথে সাথে আর একটা জিনিষ অনুশীলন করাবো—সেটি হচ্ছে বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পস্রষ্টাদের করা ষ্টাডির বা ছবির নকল। যেমন ধরো—মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো-ডি-ভিঞ্চি ইত্যাদি শিল্প-মনীষীদের করা স্টাডির নকল, কেননা তাঁরা স্টাডির চরম করে গেছেন। সেই সব স্টাডি থেকে হাত, পা, মুখ সব নকল করতে থাকবে, তাতে তোমার স্কেচের এ ছবির বহু সাহায্য হবে। এ'ছাড়া পুরাতন রাজপুত, মোগল ও কাংড়ার ছবি সব নকল করবে। এতে রঙের জ্ঞান ও ব্রাসের লাইনও ভালো হবে। এ রকম ভাবে যদি নিষ্ঠা রেখে কাজ করে যাও তাহলে এর ফল একদিন ভালোই হবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্ররা স্কুল থেকে (আর্ট স্কুল) বেরিয়ে গিয়ে স্কেচ্ করা ছেড়ে দেয়। কারণ অনেকের ধারণা স্কেচ্ তো স্কুলে করেছি আবার তা থেকে বেরিয়ে এসে স্কেচ্ করার আর কি প্রয়োজন আছে। স্কেচ্ সারা জীবন ধরে করতে হবে। তা নয়তো স্টাডি হবে কি করে বা নতুন বিষয়বস্তু পাবে কোথা থেকে। আমি এখনও পর্যন্ত স্কেচ করি, স্টাডি করি। স্টাডির কি আর শেষ আছে। প্রকৃতি রোজ নিত্য নতুনরূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। কলা-ভবনে থাকতে শুনেছি যে, মাষ্টারমশাইয়ের কাছে কয়েকজন শিল্পী ছাত্র দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁরা স্কেচ্ করেন কিনা। তার উত্তরে ছাত্ররা বলেন যে, তৃতীয় বর্ষ থেকে তাঁদের আর স্কেচ্ করতে হয় না। শুনে মাষ্টারমশাই বলেছিলেন "আমি এখনও তৃতীয় বৎসর শেষ করতে পারি নি, তাই এখনও স্কেচ্ করি"। এরপর তাঁর কাছ থেকে কতকগুলো স্কেচ্ করার ধরণ দেখে নিয়ে, প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

প্রতীক্ষা

শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী

সভ্যতার প্রেতনৃত্য চলিয়াছে উদ্দাম উত্তাল,
লণ্ডভণ্ড একাকার আকাশ-পাতাল,
মহাকাল হয়েছে মাতাল।
কালের আবর্তে আজ কাণ্ডারীর পড়ে ডাক-হাঁক,
পৃথিবী পুড়িয়া হয় খাঁক।
মর্মচোরা সভ্যতার আবরণ গেছে খুলে,
মিথ্যার মুখোস আজ ফাঁক।
কলরব, হট্টগোল, একাকার পাগোল-ছাগোল,
জমানা উলটি চলে, সৃষ্টি হয় নূতন ভূগোল।
এখাতে বিবেক নাই, আনন্দের নাই অনুভূতি,
ভিয়ার-বিয়ারে মত্ত, রামা-শ্যামা-যদু-মধু,
নিকুচি করিছে স্মৃতি-শ্রুতি।
সত্য-শিব-সুন্দরের অপমানে করি দন্ত আর আস্ফালন,
প্রকৃতির নিয়মের কভু নাকি না হয় লঙ্ঘন।
অতশত বুঝিনাকো, এই বুঝি আর পারিনাকো,
'নির্বিকল্প সমাধি'-তে আর কেন মগ্ন হয়ে থাকো।
কোটি 'নর-নারায়ণ' ক্লিষ্ট-পিষ্ট-ব্যথিত-মথিত,
তোমার বিবেক বাণী নহে সেতো কেবলি কল্পিত।
কোন্ ঈশ্বরের খোঁজে, প্রভু কোথা ঠিকানা না জানি,
বারেক আবার আসি অজ্ঞান অশুচি যত অভাগারে
বক্ষে লহ টানি'।
হে নরেন্দ্র! নরশ্রেষ্ঠ আনন্দের অনন্ত আধার!
ব্যাকুল প্রতীক্ষারত, প্রাণী যত এই বসুধার।
পাঠাও গুরুরে তব—রামকৃষ্ণ মুক্ত অবতার,
মর্ত্যের ফিরাও মোড়—প্রেমমন্ত্র করহ প্রচার।
কাতর প্রার্থনা মোর ব্যর্থ কভু নাহি হবে জানি,
শবরীর সে-প্রতীক্ষাও সার্থক হয়েছিল জানি।

মহাপিপাসা

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য

এমন দিনটি আসবে কবে
যেদিন দ্বন্দ্ব ভুলে, বিবাদ ভুলে
মিলন-মধুর হাসবে সবে।
হিংসা, দ্বেষ ও লোভের পথে
ছুটবেনা কেউ কোনোমতে,
শুধু পরম সুখে লুটিয়ে বুকে
ভালবাসায় ভরে রবে
এমন দিনটি আসবে কবে।

এমন ফুলটি ফুটবে কবে
যেদিন মধুর তাহার গন্ধসুধায়
বিশ্বহৃদয় পূর্ণ হবে।
দুঃখ, শোক ও বেদন যত
পরশে তার হবে গত,
শুধু আনন্দেরি উদার হাওয়া
উধাও হয়ে বয়ে যাবে
এমন ফুলটি ফুটবে কবে।

এমন গানটি শুনবো কবে
যখন সুরটি তাহার লক্ষ প্রাণে
আলোর জোয়ার বইয়ে দেবে।
অন্ধকারের জটার জালে
বন্দী যারা কালে কালে
তারি উতল তানে তাদের কাণে
বাজবে মুক্তি মধুর রবে
এমন গানটি শুনবো কবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

●

যুগে যুগে যার আসা—সত্যানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬। মূল্য—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা—২০১।

মর্ত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে অমর্ত্যের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে লীলাবিভাস তার অমের দ্যুতি কালান্তরের সীমারেখায় প্রসারিত। মন্দিরের চতুঃসীমায় যে ঠাকুরে আছে শুচিতা, দর্শনের অধ্যাত্মপীঠে তিনি হয়েছেন উজ্জীন মুক্ত বিহঙ্গ, সারল্যের সৈকতে তিনি হয়েছেন মনের মানুষ, বৈদগ্ধ্যের আসরে তিনি হয়েছেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ক্রান্তদর্শী। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই বহুমুখী বিচ্ছুরণ অধুনাতন নানা লেখকের লেখায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থের দ্বিতীয় লেখক সত্যানন্দের নির্মল মনোমুকুরে শ্রীঠাকুরের জীবন-আলেখ্য সামগ্রিক রূপে প্রতিফলিত হয়েছে—এই 'সামগ্রিক স্বাদ' ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থে প্রথম সংযোজন।

গভীরভাবে দেখার একটা সাঙ্গীতিক ছন্দ আছে, লেখকের বাক্‌শৈলী তার অভ্রান্ত পরিচয়। নমগাঁথার কৌশল ঠিক নয়, ভাবের কলমর্মর পাঠককে প্রতি পদে পদে আপ্লুত করে। শুরু থেকে শেষাবধি সে যেন তীব্রবেগে ছুটে চলেছে, সর্বত্রই নৃত্যচপল; রূপতীর্থের এই বিচিত্র আলিম্পন কালো রেখার বন্ধনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। একটা যে কোন উদাহরণে কথাটা স্পষ্ট হবে—"তখন দখিনা বায়ুতে মায়াপুরীর প্রভাতী সুর আসছে ভেসে—অলকানন্দার সে ধ্বনি হচ্ছে ছন্দিত—গগনে ভুবনে স্পন্দিত হচ্ছে,—'লীলা—লীলা'—মঙ্গল লীলা।" (পৃষ্ঠা—৬৮)

গ্রন্থটি শুধুমাত্র জীবনকাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন-আলোচনা এবং ভাষ্য। বিষয়-বিন্যাসকৌশল গভীর চিন্তাপ্রসূত; যুগ এবং পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এই পরমপুরুষকে লেখক তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লব; সারা জগতের মনীষী-মনে নব চেতনার জোয়ার—ঠাকুরের ভাববাদ বিশ্বকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করলো; এদিক দিয়ে "ভাবমুখে থাক"—কথাটার সুন্দর তাৎপর্য লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। জগতের প্রাণ-

কেন্দ্রে যাঁর আসন পাতা, যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় পৃথিবী অন্ধকারে প্রহর গণনা করে, যাঁর কথা শাস্ত্রকারেরা বলে শেষ করতে পারলেন না। নানা যুগনিকেরা যাঁর সন্ধান অনাদি-কাল ধরে করছেন সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ ভূমিতে এসে ভূমানন্দের করেন আয়োজন। পৃথিবীর গতি-পরিক্রমায় তিনিও গতিমুখর। এইদিক দিয়ে গ্রন্থের নামকরণ "যুগে যুগে যাঁর আসা"—গভীর অর্থদ্যোতক, সংশয় অথবা অলৌকিকতার আবরণ এতটুকু নেই—অনন্ত আশ্বাস এর পাতায় পাতায়।

বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের নিজের জীবন এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, সব কথাই হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে। টলষ্টয় যাকে বলেছেন "আন্তরিকতা"—তার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য গ্রন্থখানি দিতে পারে। ভক্তিমদমত্ততার—যা এই ধরণের গ্রন্থের নামকরণে মনে পড়ে—বালাই লেখককে লক্ষ্যচ্যুত করেছে এবং তারই পরিণতি স্বরূপ প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে ঊর্ধ্বায়ণের অঙ্গুলি সঙ্কেত। শুধু কাব্যরসের অঞ্জলি নয়, মননশীলতার নিবিড় একটা সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারে এ কথা লেখক জানেন এবং জানেন বলেই "রামকৃষ্ণ-সারদাগত এমন একটি প্রাণ যুগে যুগেই একা"—(পৃঃ ১৬৫) এ কথা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। আধুনিক যুগে ঠাকুরের প্রভাব কতদূর, তিনি এর ভাবজগৎকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন তাও লেখক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠকের কাছে নূতন চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়েছেন, সুতরাং গ্রন্থখানি স্বাগত গ্রন্থ, নিঃসন্দেহ।

পরিশিষ্টে "কথামৃতের কল্পলতা" এবং "দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শ্রীঠাকুর"—দৈত আলোচনায় লেখক আর একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন।

"কথামৃত আজ বিশ্বের বাইবেল বলে গণ্য হতে চলেছে" (পৃষ্ঠা ১৯২) এই মন্তব্যের পেছনে গ্রন্থকার কথামৃতের অমৃতনিস্যন্দী ভাষার যে উল্লেখ করেছেন তা' সত্যই উপভোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের 'বাক্-বৈখরী' যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের বাগ্‌বৈভবের চেয়েও অবিসংবাদিত-ভাবে শ্রেষ্ঠ। আর 'দর্শন'? ঠাকুর যা দেখেছেন তার চেয়ে কোন নতুন দর্শনের জন্ম আজও হয় নি। আর 'মনোবিজ্ঞান'? ঠাকুরের মানসিকতা মাপতে বিজ্ঞান এখনো অপারগ।

—অ. ক. হ.

গীতায় ঈশ্বরবাদ (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন। প্রকাশক : শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা— ৩৯১ ; মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

"গীতায় ঈশ্বরবাদ" পুস্তকখানি দর্শন-সাহিত্যে সুপরিচিত গ্রন্থগুলির অন্যতম। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়া গ্রন্থখানি যে বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে—ষষ্ঠ

সংস্করণই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থখানি একুশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে, 'ষড় দর্শনের মূল কথা' 'কর্ম ও কর্মযোগ', 'বেদান্ত ও গীতা', 'জীব ও ব্রহ্ম', 'ব্রহ্মের স্বরূপ', 'ব্রহ্মের সাধন', 'গীতোক্ত জীবতত্ত্ব', 'ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় ও ফল' এবং 'গীতার ত্রিবেণী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষড়্দর্শনের সহিত গীতার তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা সুধী গ্রন্থকার 'গীতায় ঈশ্বর তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং "গীতায় ঈশ্বরবাদ"-রূপ অপূর্ব বস্তুই যে সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস তত্ত্বরূপায়ণ—ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্বারা সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ধর্মজিজ্ঞাসুদের চিত্তে গীতার এক নবতর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গুণীজনের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

আলোচনাপ্রসঙ্গে দার্শনিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন: 'ন্যায়দর্শন' 'বৈশেষিকদর্শন', 'মীমাংসাদর্শন' ও 'সাংখ্যদর্শন'-এর যথাক্রমে অপবর্গ, নিঃশ্রেয়ঃ জ্ঞান, মুক্তি ও কৈবল্যলাভের উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, উক্ত দর্শনশাস্ত্রগুলির উদ্ভাবিত প্রণালীদ্বারা অপবর্গ, নিঃশ্রেয়ঃ, মুক্তি, জ্ঞান ও কৈবল্যলাভে কোনপ্রকার বাধা নাই। আবার পতঞ্জলির 'ঈশ্বর' ও গীতার 'ঈশ্বর সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ দিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রণিধান তাহাদিগের অন্যতম—মুখ্যতম নহে। কিন্তু গীতার মতে 'ঈশ্বর'-এ চিত্তসংযোগই যোগ; এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ অসম্ভব।

সুতরাং গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-ই যে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ রূপ দান করিয়াছে একথা সহজেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

—শ্রীআশুতোষ ঘোষ

॥ শংকরম ॥

Proceedings of the
PUBLIC MEETING
of the Hindu Community
held on Wednesday,
the 5th. September, 1894.
at the
Town Hall of Calcutta
To Thank Swami Vivekananda
and the American People.

IV

From Babu Sirish Chandra Bose

GHAZIPUR,
4th September, 1894.

Dear Sirs,

It gives me extreme pleasure to learn that a public meeting is going to be held to consider how best to express gratitude to Swami Vivekananda. Better late than never, for Bengal would have done better to thank its Bengali representative earlier. But Vivekananda is a personage whom now the whole world may claim as its own. I hereby express my entire satisfaction for the steps taken by the promoters of the meeting.

Yours faithfully,
(Sd.) Sirish Chandra Bose
Munsiff, Ghazipur.

V

From Rai Bahadur Gagan Chandra Roy

GHAZIPUR,
4th September, 1894.

To

Pundit Rajkumar Nyayaratna and others.

Gentlemen,

I regret my inability to join the meeting for expressing our gratitude to Swami Vivekananda for his able representation of

Hinduism at the Parliament of Religious at Chicago, and to thank the American people for the cordial reception they have accorded to him.

Expressing my warm sympathy with the object of the meeting.

I remain,
Gentlemen,
Yours faithfully,
(Sd.) Gagan Chandra Roy.

The speeches evoked constant and enthusiastic applause, and created in the minds of the audience, a feeling of deep reverence for Swami Vivekananda and of profound sympathy for the noble and glorious work done by him, to the cause of Hinduism.

With a Vote of thanks to the chair proposed by Kumar Dinendra Nath Roy and seconded by Babu Nanda Lall Mookerjee the meeting separated at 7-45 P.M.

APPENDIX

The original speeches in Bengali

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন মহাশয় বলিলেন :

সভ্যমহোদয়গণ! চাতক পক্ষী যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়, তখন সে মেঘের নিকটই জলের প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। অনন্ত আকাশের বিস্ফারিত বক্ষোদেশে দাঁড়াইয়া সে মেঘের মুখের দিকে এক দৃষ্টে জলের জন্য তাকাইয়া থাকে। তাহার প্রাণের পিপাসা মেঘ ভিন্ন আর কেহ মিটাইতে পারে না। পৃথিবীর নদ, নদী, সরোবরের জল উপেক্ষা করিয়া চাতক, যে জলধারা আকাশ হইতে ক্ষরিত হয়, তাহারই জন্য ভিখারী হইয়া থাকে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ জল—পৃথিবীর ময়লা, মাটি-মাখা, দূষিত সলিলরাশি চাতকের মর্ম্মগত তৃষ্ণা বিদূরিত করিতে সমর্থ নহে। সেইরূপ বর্ত্তমান অবনতিগ্রস্ত ভারতবর্ষও নানাবিধ অভাব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পড়িয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় ব্যাকুল প্রাণে, কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন : আমায় এক বিন্দু জল দাও, আমার পিপাসা-বিশুষ্ককণ্ঠে এক বিন্দু শান্তি-সলিল ছিটাইয়া দাও। কিন্তু পৃথিবীর জলে—পার্থিব উন্নতিরূপ সঙ্কীর্ণ জলের ফোয়ারায় ভারতের প্রাণের পিপাসা মিটিবে না; যে জলধারা আকাশ হইতে ক্ষরিত হয়, আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বর্গীয় মন্দাকিনী হইতে যে সুশীতল সলিলরাশি প্রবাহিত হয়, বর্ত্তমান ভারতবর্ষ আজ তাহারই জন্য লালায়িত। কেননা, সে যে তৃষিত চাতক। যাঁহারা বর্ত্তমান কালে কেবল রাজনীতি,

অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, জড়বিজ্ঞানাদি পার্থিব জলধারায় ভারতের অভাব, ভারতের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন, তাঁহারা ভারতের মর্মকথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা ভারতের হৃদয়ের আর্তনাদ শুনিতে পান না। পৃথিবীর জলে ভারতের প্রাণের পিপাসা মিটিবে না। যাঁহারা মেঘ, যাঁহারা আকাশবিহারী জীব, যাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যের উচ্চস্তরে বাস করেন, তাঁহারাই ভারতের তৃষ্ণা, ভারতের হৃদয়ের অভাব, আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সমর্থ। তাই আজ বিবেকানন্দ স্বামীর মত মহাত্মা সুদূর আমেরিকার প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যের উচ্চআকাশে অবস্থিত হইয়া যে ধ্বনি করিতেছেন, সেই মেঘগর্জনে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, আজ তৃষ্ণার্ত্ত চাতক বহুদিন পরে মেঘনিঃসৃত জল পান-আশায় আনন্দের বৈদ্যুতিক তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যেরূপ হিন্দুধর্মের আন্দোলন-তুফান প্রবাহিত করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে আনন্দিত করিয়াছেন, এইরূপ আনন্দ-চিহ্ন বহুদিন দেখা যায় নাই। আজ স্বামী বিবেকানন্দ যদি রাজনীতির কথা, বাণিজ্যনীতির কথা কিম্বা অন্য কোনরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধের কথা লইয়া আমেরিকায় যাইতেন, তবে এত আন্দোলন হইত কিনা সন্দেহ। তিনি হিন্দুর আত্ম-বিদ্যার কথা লইয়া আমেরিকায় চর্চ্চা করিয়াছেন তাই আজ এত আনন্দের দুন্দুভি বাজিতেছে। বাস্তবিকই যদি হিন্দুর কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে, তবে এই অধ্যাত্মবিদ্যাকে লইয়া—হিন্দুর সর্ব্বস্বধন ধর্ম্মকে লইয়া। কিন্তু হায়! আমাদের এই নিজস্ব ধন, আমাদের এই পিতৃ-পিতামহদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আমরা নিজে অনাদর করিতেছি, আমরা গৃহলক্ষ্মীকে পদতলে বিমর্দিত করিতেছি, আর আমেরিকাবাসিগণ, যাঁহাদের ধর্ম্ম, দেশ, ভাব, সম্পূর্ণ আমাদের বিপরীত, তাঁহারা এই অধ্যাত্মবিদ্যাকে মাথায় তুলিয়া লইতেছেন। ধন্য তাঁহাদের উদারতা! কিরূপ ভাষায় ধন্যবাদ দিলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তেমন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের ভাষা এত অসম্পূর্ণ যে, এই ভাষায় তাঁহাদের উদারতার প্রশংসা করিতে গেলে তাঁহাদের প্রতি অবমাননা করা হয়। বাস্তবিক আমাদের জাতীয় সম্পত্তি আমরা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত নই, কিন্তু বিদেশীয় আমেরিকা-বাসীগণই সেই সম্পত্তিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন, ইহা যখন আমি ভাবি, তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে আমাতে আর আমি থাকি না, মর্ম্মযন্ত্রণায় অধীর হইয়া নির্জ্জনে নীরবে কাঁদিয়া ফেলি। আমার মনে হয় আমাদেরই স্বদেশে—আসাম আদি প্রদেশে রত্নের খনি স্বরূপ উর্ব্বরভূমি সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, এই উর্ব্বর ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিলে কত অর্থ আমরা পাইতে পারিতাম; কিন্তু হায়। আমরা স্বদেশে থাকিয়া আমাদের ঘরের কাছের এই রত্ন-ভাণ্ডারের সংবাদ কিছুই জানিলাম না, পরন্তু বিদেশ হইতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংরাজ ব্যবসায়ী আসিয়া সেই আসামের উর্ব্বর ক্ষেত্রে নীল বা কাফি আদির চাষ করিয়া কত অগাধ টাকা লইয়া যাইতেছেন। সেইরূপ এমন একদিন আসিবে যেদিন আমাদেরই শাস্ত্র আলোড়ন

করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম বিদ্যাকে করতলগত করিয়া পাশ্চাত্য দেশবাসী যোগাদিসাধন-শাস্ত্রের অপূর্ব্ব রত্নকে অধিকার করিয়া জগৎকে চমকিত করিবেন। আর আমরা ভেড়ার দল চিরদিনই জগতের পশ্চাতে পড়িয়া ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইব। আর কেবল বলিব, রাজা আমাদের বিদেশীয়, বিজাতীয়, তিনি আমাদের কিছুই সাহায্য করেন না, তাইত কিছুই উন্নতি করিতে পারিতেছি না। ভাল তুমি হিন্দু, তুমি যদি যোগসাধনাদি দ্বারা নিজ জীবনের উন্নতি কর ত তাহাতে কি ইংরাজ রাজ তোমাকে জেলে দিবেন? বরং এমন স্বধর্ম্ম-রক্ষক রাজার রাজত্বে নিরুপদ্রবে বাস করিয়াও আমরা ধর্ম্ম-সাধনা করিতে পারিতেছি না, ইহা আমাদের নিতান্ত শোচনীয় দোষ। পূর্ব্বে ঋষিরা যাগযজ্ঞ তপস্যাদির যখন অনুষ্ঠান করিতেন তখন রাক্ষসেরা, দস্যুরা আসিয়া কত উপদ্রব অত্যাচার করিত, মুসলমানের রাজত্বেও কত হিন্দুকে উপদ্রব সহিতে হইত; এখন ইংরাজ রাজের কৃপায় সেরূপ কোন অশান্তি নাই। এমন শান্তিপূর্ণ সময়েও যদি আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি না করিতে পারি, তবে এমন পতিত, অলস জাতির দুর্দ্দশা ভোগ করা, ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দোষাবহ নহে।

॥ সংঘ-বার্তা ॥

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মোৎসব : বিগত ১৬ই পৌষ, ১৩৬৫ (ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৯) বৃহস্পতিবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৬-তম জন্মতিথি দিবসে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, পূর্বাহ্নে ঠাকুর মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও তৎপরে হোমানুষ্ঠান হয়। ৯॥ ঘটিকা হইতে, মঠ-প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে রচিত সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শ্রীশ্রীমায়ের নয়নাভিরাম পুণ্য প্রতিকৃতির সম্মুখে শ্রীহরিপদ চন্দ কর্তৃক 'গুরু-বন্দনা', শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'মাতৃ-বন্দনা', সংগীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক 'ভক্তিমূলক গান', শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল ও সম্প্রদায় কর্তৃক বংশীবাদন সমবেত ভক্ত নরনারীকে আনন্দদান করিয়াছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নে উপস্থিত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে সংগীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কথকশিরোমণি মহাশয় সংগীত সহযোগে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন-লীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কথকতা করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যাত্মানন্দজী সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর উদ্বোধন সংগীতের পর সভানেত্রী ডঃ শ্রীরমা চৌধুরী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর অলোকসামান্য জীবনী ও বাণী বিশ্লেষণ করেন। ডঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী স্বরচিত (সংস্কৃত ভাষায়) কবিকা "শ্রীশ্রীজননী সারদামণির জীবনালেখ্য" বিবৃত করেন। কবিকার সংস্কৃত সংগীতাংশ রূপায়ণে এবং অন্যান্য সংগীত পরিবেশনে শ্রীবিমলভূষণ এবং শ্রীমেঘনাথ বসাক, শ্রীকল্পনা দে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকাগণ শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। সভায় শ্রীশ্রীসারদা মাতার মন্ত্রশিষ্য প্রবীন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভাস্করানন্দজী অনাড়ম্বর ভাষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার মানবী-লীলার নানা অপ্রকাশিত তথ্য বর্ণনা করেন।

সভান্তে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভজন সংগীতাদির দ্বারা উৎসবের উপসংহার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব :

আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৯, ১৭ই মাঘ, ১৩৬৫ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মতিথি-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

॥ সাংস্কৃতিক বৈঠক ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৬

(প্রতিপক্ষে শনিবার, সন্ধ্যা ৬॥টায়)

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৫৯, শনিবার

বিষয় : **বিজ্ঞানের প্রগতি**

বক্তা : অধ্যাপক, শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯, শনিবার

বিষয় : **সামাজিক পতন**

বক্তা : অধ্যাপক শ্রীবলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্কতীর্থ, অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৬॥টায় শঙ্করভাষ্যসহ 'কঠ-উপনিষৎ' আলোচনা করেন।

● পণ্ডিত শ্রীচারুচন্দ্র দর্শনাচার্য প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করেন।

● সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি রবিবার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা" করেন।

● শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, সঙ্গীতবিশারদ ও সম্প্রদায় প্রতি শনিবার বেলা ৩টায় "শ্রীরামনাম" গান করেন।

বিংশ-বর্ষ

(ফাল্গুন, ১৩৬৪—মাঘ, ১৩৬৫

সম্পাদক

স্বামী সদাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বার্ষিক মূল্য ৪·২৫ ন. প.]

[প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.

—বিশ্ববাণী—

বর্ষসূচী

(২০শ বর্ষ : ফাল্গুন, ১৩৬৪—মাঘ, ১৩৬৫)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অদ্বৈত বেদান্তে তত্ত্বানুসন্ধান	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৩৫৯
আগেয়গিরির কথা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৩৭১
আণবিক শক্তির গোড়ার কথা	শ্রীসমরজিৎ কর	৪৩৫
আনন্দ বেণু বাজিছে কোথায় (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫১৩
"ইছামতী" ও বিভূতিভূষণ	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	১৭৫
উপনিষদের শিক্ষা	„ বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ	২৫৪
উমা-হৈমবতী	„ রাজমোহন নাথ	৫৮৫
উদ্বোধন (কবিতা)	„ শান্তশীল দাস	৩৭০
ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৬
একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৪৩৯
একটি উপদেশ (কবিতা)	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৪৪৭
ঔদার্য ও সারল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী দুর্গানন্দ ১৪৭, ১৯৫, ২৪৩, ২৯১, ৪৮৩, ৫৮১	
কান্নার দাম (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৪৬
কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	„ মীরা মিত্র ১১৬, ২২০, ৩২৭,	
কুকুরের সামগান	শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ	৩১২
কৃত্রিম উপগ্রহ	„ সমরজিৎ কর	৩২
কৈলাসবাসিনীর আবির্ভাব	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪২৭
গল্প ও শিল্পমন	শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম. এ.	৬২৫
গীতগোবিন্দের ভাবরূপ	„ বিশ্বনাথ ঘোষ এম. এ.	২০২
গীতার জ্ঞেয়তত্ত্ব	„ উমাপদ মুখোপাধ্যায়	১৬১
গ্রীক বনাম প্রাচীন সংস্কৃত নাটক	„ শ্যামাপ্রসাদ আঢ্য, এম. এ.	৮৬
গ্রন্থ-সমালোচনা	১৩৮, ১৮৬, ২৮৫, ৩৭৯, ৫২৫, ৫৬৭, ৬১৬	
গ্রামোন্নয়ন	„ রাধাবল্লভ দে, বি. এ. বি. এড.	৫৬২
চলচ্চিত্রে সামাজিক দায়িত্ব	„ শ্রীপঙ্কজভূষণ দত্ত	৪৬৭
চলার আনন্দ (কবিতা)	„ অমিয়া ঘোষ	১৬৬
চর্যা-সাহিত্যে সাধন রহস্য	„ রাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ	৫৫
চারি মহাতীর্থ	„ রাসমোহন চক্রবর্তী, এম.এ., পুরাণ রত্ন ১০, ৭৬	

জাগো (কবিতা)	„ অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী	৩৩০
জীব ও ব্রহ্ম	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৩
জীবনের উৎকর্ষ ও উপনিষদ	„ বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ	১১১
জীবন্মুক্তি	স্বামী সত্যানন্দ	৪১২
জৈনদর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি. এল., বিদ্যাবিনোদ	১৪
ঝাড়গ্রামের লোকসংগীত	„ অংশুমান রায়	৫০৫
তন্ত্রশাস্ত্র কি আধুনিক	তন্ত্রকুলচূড়ামণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	৩৯১
তামসী-তপস্বিনী (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, এম. এ.	২৮৪
তুমি (কবিতা)	শ্রীহাসিরাশি দেবী	২০৫
তেল ও মোমবাতির রসায়নী ইতিহাস	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কর, বি. এস্‌সি., ডিপ.এস্‌.টেক্‌.	১৩১
দান (কবিতা)	শ্রীকালীপদ কোঙার	২৮৪
দিনের চক্ষুতে লয়ে আলা খড়কুটো (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১২৬
দুর্গোৎসব (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী	৪৪৫
দেবী দুর্গা		৩৮৩
দেবী-মাহাত্ম্যে অদ্বৈততত্ত্ব	শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়তীর্থ	৪৬১
ধন্যবাদ-জ্ঞাপন		৫০
ধর্মগুরু মহাবীর	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি.এল., বিদ্যাবিনোদ	৩৬৩
নন্দন	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৪, ৫৫৮,	৬১৭
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীশান্তিময় ঘোষ, এম. এ.	১৬৫
নব্যভারতের শিল্পচর্চা ও ই. বি. হ্যাভেল	শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য	৪২০
নাটক-কথা	শ্রীবিনয় দত্ত	৪৫১
নাট্যকার দীনবন্ধু	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৫
নৃত্যনাট্য ও কথাকলি	শ্রীমীরা মিত্র	৪৫৭
পঙ্কপথ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৪৪৭
পরমারাধ্য 'শ্রীম'র সহিত কথোপকথন	শ্রীশান্তিকুমার মিত্র	২৪৯
পুষ্পাঞ্জলি (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	১২৫
পূজা (কবিতা)	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র	৪৪৮
প্রতীক্ষা „	„নলিনীরঞ্জন চৌধুরী	৫১৪
প্রসাদী সঙ্গীতে সাধনতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ.	২৯৮, ৩৪৬
প্রাচীন ও নবীন সংগীত	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীতশাস্ত্রী	২৭৪
প্রাচীন রাজগৃহ	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম. এ., বি. এল.	৪৯৯

প্রাপ্তিরহস্য (কবিতা)	শ্রীকণিভূষণ চক্রবর্তী	২৮৩
ফিরে এসো (কবিতা)	শ্রীঅলোককুমার সেন	২৮৩
বাঙ্গালীর জাতীয়তা বোধ ও ভূদেব	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪১
বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও নাটক	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	৫৩১
বাংলা উপন্যাসের জন্মকথা	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ.	৪৭৭
বাংলার মেয়েদের দেওয়া আলপনা	শ্রীহাসিরাশি দেবী	৪৪৫
বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ	শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু	৩৪৫
বিশ-শতকের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	"	৩১৮
বিশ্ববাণীর বিংশবর্ষের বর্ষসূচী		৬২৫
বুদ্ধদেব ও আনন্দ	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, এম.এ., বিদ্যাবিনোদ	১২৭
বুদ্ধদেবের অন্তিম-ভোজন	"	২৭০
বৈদিক সংস্কৃতি	ডক্টর মতিলাল দাস	৪৯০, ৫৩৫
বৈদিক যুগে দেবতার মূর্তি	অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৯৭
বৈষ্ণব সহজিয়া মত	শ্রীআশুতোষ ঘোষ এম. এ.	৪৭৩
বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাববাদ	"	৭১
বৌদ্ধ রামায়ণ	শ্রীঅয়দেব রায়, এম. এ.	৩২৯
বৌদ্ধযুগের নারী	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী	২০৮
ভবঘুরে (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	২৩৬
ভামতীকার কি প্রতিবিম্ববাদী ?	স্বামী সদানন্দ	৫৪০, ৬০০
ভারতের তীর্থদর্শনে	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৩, ২৩১, ৩৭২, ৫১৫, ৫৬৫
ভারতীয় রসায়ন	ডাঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়	২১০, ২৬৬, ৩০৩
ভারতীয় সঙ্গীতে নবযুগ প্রবর্তনে তানসেন	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র	৪১৭
ভাষার ত্রয়ী	অধ্যাপক শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর	৫৫০
ভেদাভেদবাদ	শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০২
[illegible]ন ও বাংলা নাটক	অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৩
[illegible]পুরী নৃত্য	শ্রীরবি বর্ধন	৮১
[illegible]পিপাসা (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য	৬১৫
[illegible]সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী দুর্গানন্দ	৩৮৫
[illegible] (কবিতা)	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪৪৭
[illegible]য়ের বাণী (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৪৫০

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-প্রীতি	শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম.এ.	২৭৮
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী	অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর	৬২
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য তত্ত্ব		৪০১
রামমোহন তীর্থে	ডাঃ শ্রীকণ্ঠভূষণ পাল	৫১১
শঙ্কট আবর্ত মাঝে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২৭
শিল্পী (কবিতা)	শ্রীসুকুমার সুর	৭০
শিশুরা করে মেলা	শ্রীকুমারেশ ঘোষ	৩৬
শুদ্ধাভক্তি ও মুক্তি	স্বামী সদাত্মানন্দ	৩৯১
শ্রীবিবেকানন্দাষ্টকম্	অধ্যাপক দুর্গাদাস গোস্বামী	৫৭৫
শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী দুর্গানন্দ	৫২৭
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম.এ., বি.টি.	৭০
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত	৬০৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বাঙ্গালা সাহিত্য	শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫১, ৯৯
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী	শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১
শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে অভেদানন্দ	স্বামী দুর্গানন্দ	৩০৯
শ্রেয়ঃ বুদ্ধির গোড়ার কথা	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য	৩৫২
সংকলন	৪১, ৯০, ১৩৯, ১৮৯, ২৩৭, ২৮৬, ৩৩১, ৩৭৫, ৫২১, ৫৬৯, ৬১৯	
সংঘবার্তা	৪৭, ৯৪, ১৪৫, ১৯০, ২৯১, ৩০৭, ৩৮১, ৫২৬, ৫৭৩, ৬২৩	
সঙ্গীতে শ্রুতি ও সুর	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	১৮১
সঙ্কলন		৩৩৪
সবিতা	ডাঃ শ্রীমতিলাল দাশ	১০৪
সমাজবাদী স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীসুলেখা ঘোষ	৫০৮
সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মূল সুর	অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর	১৫১
সাংস্কৃতিক বৈঠক	৯৬, ১৪৬, ১৯৪, ২৪২, ২৯০, ৩৩৮, ৩৮২, ৪৭৪, ৬২৪	
সাধনা (কবিতা)	শ্রীবংশীধর মণ্ডল	৫
সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি. ১১৯, ১৬৭, ২৬০, ৫৪৫, ৩০৮,	
সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ	শ্রীজয়দেব রায়, এম. এ.	৫১৫
সংশয় (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	৫
হিউয়েন-সাঙ ও প্রাচীন ভারত	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম.এ., বি.এল.	২৮, ২২৬